ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণের সামাজিক ইতিহাস:

“মনোপলি”-র প্রতিরোধ থেকে স্বরাজের দ্যোতনা ১৮৩২-১৯৪৭

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে ডক্টরেট (Ph.D.) উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

অরুণাংশ মাইতি

পিএইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI1100617

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ২৯/১১/২০১৭

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৪

Certificate

Certified that the Thesis entitled **ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণের সামাজিক ইতিহাস: "মনোপলি"-র প্রতিরোধ থেকে স্বরাজের দ্যোতনা ১৮৩২-১৯৪৭** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of **Dr. Sudeshna Banerjee**, Associate Professor (retired), Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Sudeshna Banerjee
Countersigned by the Supervisor

Date 25/11/2024

Arunangsha Maity
Signature of the Candidate

Date 25.11.2024

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লবণের সামাজিক ইতিহাস গবেষণা করতে গিয়ে নিজের যথেষ্ট লোনা ঘাম ঝরলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহুজনের আলোচনা, সমালোচনা, পরামর্শ, সহায়তায় এই অভিসন্দর্ভ সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন হয়েছে। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য হলেও যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে হয়তো সেই ভার সামান্য লাঘব হতে পারে। লবণেতিহাসের সন্ধানে দীর্ঘ সময়ের এই যাত্রাপথ লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে যাঁর বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা এবং বৌদ্ধিক নির্দেশনায় তিনি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জি। গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নটিকে বারবার মনে করিয়ে দিয়ে, তথ্যসন্ধানে বহুমুখী উৎসের দিকে যেতে উৎসাহ দিয়ে, আবার তথ্যভারে নিজস্ব যুক্তি ও বিশ্লেষণ যাতে পথ না হারায় সে সম্পর্কে সচেতন করে তুলে আমার ভাবনাকে এবং অভিসন্দর্ভের অভিমুখটিকে তিনি নির্দিষ্ট দিশায় সঞ্চালিত করেছেন। শুধু এই গবেষণা পর্বেই নয়, স্নাতকোত্তর স্তরে আমার ‘সামাজিক ইতিহাস’ পাঠের সময় থেকেই তিনি সবসময় আমাকে নতুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, চিন্তা করতে এবং নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে এসেছেন। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ।

আমার গবেষণা উপদেষ্টা কমিটির (RAC) সদস্য ড. অনুরাধা রায় এবং ড. পার্থপ্রতিম বসু প্রতি ছয় মাস অন্তর আমার রিসার্চ রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথির সন্ধান দিয়েছেন, এবং এই গবেষণার সার্বিক মানোন্নয়নে সাহায্য করেছেন। তাঁদের উভয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। ড. রঞ্জন চক্রবর্তী আমায় যেমন গবেষণা সংক্রান্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তেমনই গবেষণা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ড. হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি অফুরন্ত ধৈর্য নিয়ে আমার আলোচনা শুনেছেন, নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন এবং লবণ সংক্রান্ত কোনো নথি পেলে খতিয়ে দেখার জন্য পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতাবদ্ধ। লবণেতিহাস গবেষণা করছি শুনে ড. বলাই বারুই উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং মহাফেজখানার লবণ নথির সন্ধানে একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

২০২০-র অক্টোবর ও নভেম্বরে আয়োজিত ‘সল্ট, প্রোটেস্ট অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া’ শীর্ষক অনলাইন সেমিনার সিরিজে অংশগ্রহণ করে আমি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি। ইতিহাসবিদ ডেভিড আর্নল্ড, মাইলস টেলর, নিকো স্লেট, তনুজা কোঠিয়াল, র‍্যাচেল বার্গার, অশোক মালহোত্রা, রোজালিন্ড পার, কেট বোয়েম, এলিসা ডেকুর্সি, ইন্দ্রজিত রায় সহ প্রমুখ অধ্যাপক ও গবেষকেরা লবণেতিহাসের আর্থ-রাজনৈতিক-

জনস্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই সেমিনার সিরিজের সার্বিক পর্যালোচনায় ড. ডেভিড আর্নল্ড লবণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে গবেষকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য যে, কোভিড-১৯ অতিমারি পর্বে ঘরবন্দী দশায় বহির্জগতের সাথে সেই বৌদ্ধিক সংযোগের অভিজ্ঞতা আমায় ঋদ্ধ করেছে। উক্ত সেমিনার সিরিজে অংশগ্রহণে আমন্ত্রণের জন্য যৌথ উদ্যোক্তা ড. মাইলস টেলর ও ড. তনুজা কোঠিয়ালকে ধন্যবাদ জানাই।

লবণের সামাজিক ইতিহাস গবেষণার উপাদান সংগ্রহে ও আনুষঙ্গিক অধ্যয়নে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সহৃদয় সহায়তা পেয়েছি। কোভিড-১৯ অতিমারির বিধিনিষেধ খানিকটা শিথিল হওয়ার পর নয়াদিল্লির জাতীয় অভিলেখ্যাগারে যখন কাজ করতে যাই তখনো নিয়মের নানা কড়াকড়ি ছিল। তার মধ্যেই রিডিং রুমের কর্মীরা চাহিদা মেনে যথাসাধ্য ফাইল এনে দিয়েছেন। জাতীয় অভিলেখ্যাগারের লাইব্রেরির কর্মীরাও গুরুত্বপূর্ণ নথি জুগিয়েছেন। উপাত্ত সন্ধানে তিনবারের দিল্লী সফর সফল করে তোলার জন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ম অ্যান্ড লাইব্রেরির মাইক্রোফিল্ম সেকশন এবং গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। অতিমারি-পরবর্তী পর্বে যখন মাইক্রোফিল্ম সেকশনে গবেষকদের ভিড় উপচে পড়ছে তারই মাঝে তারা ঠিক সময় বার করে আমায় সংবাদপত্র, কংগ্রেস পেপারস সহ অন্যান্য নথি দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। ২০২৩-এর আগস্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠান নতুন নামে পরিচিত হলেও আমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে পুরোনো নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ম অ্যান্ড লাইব্রেরিকে ঘিরে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অভিলেখ্যাগারের অভিলেখ্যাগারিক ও কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ দেখতে দিয়ে সহায়তা করার জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মীদের, গুরুত্বপূর্ণ বই ও পত্র-পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে জোগানোর জন্য। স্বদেশি পর্বের কিছু পত্র-পত্রিকা যা প্রায় অব্যবহৃত ও অগোচরে ছিল তা তাঁরা খুঁজে এনে দিয়ে আমার কাজের উদ্যমকে বাড়িয়েছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনের কর্মীদের এবং মাইক্রোফিল্ম সেকশনের কর্মীদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি সম্পর্কে তথ্যসম্বলিত গ্রন্থটি শ্রী রথীন্দ্র দত্ত নিজে উদ্যোগ নিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার নিজের কর্মক্ষেত্র টাকি গভর্নমেন্ট কলেজের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থেকে প্রভূত উপকৃত হয়েছি। মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী রণজিত নস্কর সহ গ্রন্থাগারের অন্যান্য সহকর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাই।

আমার নিজের কর্মক্ষেত্র টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অফিসার-ইন-চার্জ ড. শান্তা মুখোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই গবেষণা-সন্দর্ভ লিখতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক বছরের সবেতন ছুটি নেওয়ার প্রাথমিক অনুমতি প্রদানের জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরকে— বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের শিক্ষক উন্নয়ন কর্মসূচি (FDP/FIP) প্রকল্পে আমার এক বছরের সবেতন ছুটির আবেদনে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানাই টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের আমার সহকর্মী বিভাগীয় প্রধান ড. ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ড. উত্তম কুমার দাস, শ্রী সিদ্ধার্থ প্রতিম সিনহা, শ্রীমতী সংযুক্তা ব্যানার্জি এবং শ্রী অসিত দেব-কে; তাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন এবং উৎসাহ জুগিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক (বর্তমানে হিলি সরকারি মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত) ড. আয়ুষ্মান চক্রবর্তীকে, যিনি নানান যুক্তি-তর্কে আমায় সমৃদ্ধ করেছেন এবং পরামর্শ জুগিয়েছেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকত্রয়ী ড. চন্দ্রভূষণ রায়, শ্রী অরূপ কুমার বিশ্বাস ও শ্রী সুশোভন সেনগুপ্ত বরাবর স্নেহ, সাহচর্য ও উৎসাহ দিয়ে এসেছেন এবং গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন। শ্রী অরূপ কুমার বিশ্বাস এই গবেষণার অংশবিশেষ পড়ে নিজের মতামত দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গবেষণায় নথিভুক্ত হওয়ার প্রথম দিন থেকে অনুজপ্রতিম বান্ধব শ্রী সুমিত কান্তি ঘোষ ও শ্রী তপোবন ভট্টাচার্যর সাহচর্য, সান্নিধ্য আমায় সমৃদ্ধ করেছে এবং গবেষণাতে উৎসাহ জুগিয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়ে আমার ইতিহাস বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে গিয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছি। তাদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাই।

এই গবেষণা সম্পন্ন হতে দেখলে সবচেয়ে খুশি হতেন আমার মা। অসময়ে তিনি চলে গেলেও তাঁর অফুরান স্নেহ, কোমলতা, ভালোবাসা নিয়ত অনুভব করি। আমার বাবা গবেষণার বিভিন্ন অংশ পড়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, এবং অনলস উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের গবেষণায় যারা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু হাসিমুখে আমায় অনাবিল উৎসাহ জুগিয়েছে তারা দেবদীপ্তা ও আরুষদীপ্ত— আমার কন্যা ও পুত্র। যখনই হতোদ্যম হয়ে পড়েছি ওরা প্রাণোচ্ছল হাসি, দুষ্টুমি, মজাতে যাবতীয় হতাশার মেঘ সরিয়ে দিয়েছে। দেবদীপ্তা ও আরুষদীপ্তর দাদু-দিদা যেমন অপার স্নেহে তাদের সবকিছুতে প্রশ্রয় দিয়ে চলেন, তেমনই অপত্যস্নেহে আমায় আপন করে নিয়েছেন। নিশ্চিন্ত, নির্ভার মনে আমি এই গবেষণা করতে পেরেছি কারণ আমার সহধর্মিণী মোনালিসা নিজের কর্মক্ষেত্রর পাশাপাশি সাংসারিক যাবতীয় দায়দায়িত্বও একাই সামলে নিয়েছে। পরিবারের সবাই অবশ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ঊর্ধে।

সারাংশ

সাধারণ লবণ কিভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের 'মনোপলি' থেকে স্বরাজের দ্যোতনায় প্রতিভাত হয় তা ভারতীয় এবং আরো বিশেষভাবে বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে এইগবেষণা-অভিসন্দর্ভে অনুসন্ধান করা হয়েছে। ভারতীয় জনজীবনে লবণের অপরিসীম গুরুত্ব শুধু দৈনন্দিনের খাদ্যাভ্যাস তথা শারীরিক প্রয়োজনেই সীমিত নয়, বরং সমাজ-সংস্কৃতি- অর্থনীতি-রাজনীতির বিবিধ মাত্রায় তা প্রতিভাত হয়। সামান্য লবণের সহযোগ যেমন মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তি থেকে রসনার পরিতৃপ্তিতে সহায়ক হয়ে ওঠে, তেমনই তার অভাব সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধিত প্রতীকে পরিণত হতে পারে। ভারতীয় সেনাদের লবণের প্রতি আনুগত্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতে, এমনকি বিশ্বের অন্যত্রও, আধিপত্যের ভিত অটুট রাখতে ভরসা জুগিয়েছিল। ভারতীয় প্রেক্ষিতে লবণেতিহাস চর্চার কাঠামোটি অবশ্য অর্থনীতি কেন্দ্রিক, লবণের বস্তুগত দিকটিই গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। অর্থাৎ লবণ কিভাবে উৎপাদিত হত, উৎপাদক কে, কিভাবে ও কারা তা পরিবহণ ও বাজারজাত করত, ক্রেতা-ভোক্তাই বা কারা, কিভাবে তা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এবং মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল— এই বিষয়গুলিতেই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। সম্প্রতি পরিবেশগত প্রভাবের নিরিখে লবণ ইতিহাসের পর্যালোচনা শুরু হলেও তা অর্থনীতিকেন্দ্রিকতার ধারণাকেই সংহত করে। বলাবাহুল্য যে, লবণের অর্থনীতিকেন্দ্রিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার পরিধিতে বহুতর প্রশ্নের (যার একাংশ অর্থনীতির অনুষঙ্গেই উঠে আসে) উত্তর মেলে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থেই ভারতীয় উপনিবেশে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের বাণিজ্যিক আমদানি ও ক্রমিক আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল, এবং তার ফলশ্রুতিতে বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পের ক্রমবিলুপ্তি ঘটেছিল। অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই বিষয়টি বহুচর্চিত হলেও জাত-ধর্ম-বর্ণভিত্তিক বহুস্তরীয় ভারতীয় সমাজে দেশি লবণের পরিবর্তে 'অপর' বিদেশি লবণের উপস্থিতি কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল তা বিবেচিত হয় না। অথচ লবণের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বর্ণ, আকার, স্বাদ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে কি আবেদন রাখে; বিশেষত ভারতীয় জনরুচিতে কালাপানি পার হয়ে আসা ব্রিটিশ লবণ কিভাবে গৃহীত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজবিজ্ঞানীরাও বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত থেকে পণ্যের 'সামাজিক জীবনের' ধারণাকে তুলে ধরে বস্তুর 'সাংস্কৃতিক জীবনীর' প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই যুক্তি অনুযায়ী বস্তুসমূহের এক "সামাজিক জীবন" রয়েছে যা তাদের ভৌত অস্তিত্ব অতিক্রম করে সম্প্রসারিত হয়। বস্তু কেবল মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত নিষ্ক্রিয় উপাদান নয়, বরং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সম্পর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। বস্তু বার্তা প্রেরণ করতে পারে, সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হতে পারে, এমনকি মানুষের চিন্তা এবং আচরণকে প্রভাবিত করে নির্দিষ্ট আকার দিতে পারে। বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে বস্তুর উপস্থিতি বিভিন্ন অর্থ, তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে। ধর্মীয় আচার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বিভিন্ন বস্তু তথা পণ্য প্রায়শই সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং ক্ষমতার কাঠামো তৈরিতে এবং তা শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ভারতের বহুমুখী লবণ সংস্কৃতির নৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রা যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষিত না হলে লবণের ইতিহাস খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেবা, আনুগত্য এবং সম্মানের ধারণায় লবণের স্থান, রুচি এবং নান্দনিকতার আবহে, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্ররূপে, স্বাধীনতা, ভোগবিলাস, দুরবস্থা এবং শোষণের সূচক হিসাবে লবণ সংস্কৃতির বিচিত্র এবং জটিলতর সম্ভাবনার দিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, পণ্যের সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আজ যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াসই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের মূল লক্ষ্য, যেখানে বস্তুর 'সামাজিক জীবন' সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুসৃত হয়েছে। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে লবণকে কেন্দ্র করে যে বহুতর অর্থ, তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, এবং সময়বিশেষে তা কিভাবে নৈতিক প্রতিবাদ ও সমষ্টিগত প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল— লবণের সামাজিক সেই রূপান্তরের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করাই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের মৌলিক উদ্দেশ্য। দেশীয় লবণের 'অপর' রূপে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের উপস্থিতিই ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে বহুমুখী তাৎপর্য ও প্রতিস্পর্ধী প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছিল, যার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, লবণ যেন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বিদেশি ব্রিটিশ লবণ যদি গুণমানগত শুদ্ধতা ও শুভ্রতা, স্বাস্থ্যসম্মত, কম দাম ইত্যাদির নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে এবং তার সূত্রে দেশীয় লবণের ঔপনিবেশীকরণ ঘটিয়ে থাকে, তাহলে দেশজ ঐতিহ্য ও নৈতিক মূল্যবোধে জারিত স্বদেশী লবণ কিভাবে প্রতিস্পর্ধী অর্থ ও প্রতিক্রিয়ায় বিদেশি লবণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে নাকচ করে এবং ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত তথা স্বরাজের প্রতীক হয়ে ওঠে— সামাজিক ইতিহাসের চৌহদ্দিতেই তা

স্পষ্ট হয়। সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবশ্য বস্তুর 'সামাজিক জীবন' শুধু অতীত নয়, বর্তমান, ভবিষ্যতের দিশায়ও সম্প্রসারিত। ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে লবণকে কেন্দ্র করে যে অর্থ, তাৎপর্য, প্রতিক্রিয়াসমূহ পরিলক্ষিত হয় সময়ের সাথে সাথে তা কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল, আবার কোনো ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় থেকেছে; এবং তার রেশ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চরিত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতা থেকেই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে, বস্তুর 'সামাজিক জীবন'কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করে, অতীতের প্রেক্ষিতে লবণের 'সামাজিক ইতিহাস' অনুসন্ধান করা হয়েছে।

'লবণের আমরা-ওরা: দ্বন্দ্বে ও প্রতিদ্বন্দ্বে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ' শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে মূল আলোচ্য বিষয় হল- ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে দেশীয় লবণের 'অপর' রূপে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের উপস্থিতি কি তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল, এবং তার পরিণামে লবণ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বিদেশি লবণের গুণমানগত শুদ্ধতা, শুভ্রতার ও স্বাস্থ্যমানের নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কিভাবে উপনিবেশে শুচিতা তথা শুদ্ধতার ভিন্নতর ধারণায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তা এখানে আলোচিত হয়েছে। লবণের শুভ্রতার ধারণার মধ্যেই পণ্য বর্ণবাদের সাম্রাজ্যিক রেশ কিভাবে প্রকটিত হয়েছিল, অন্যদিকে বিশ্বাস ও আনুগত্যে নির্ধারিত ভারতীয় লবণ সংস্কৃতিতে তা কিভাবে পাল্টা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, তা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। লবণ কিভাবে বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক স্বার্থ ও মতাদর্শগত লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল আর উপনিবেশিত মানুষের আহার্যে ও জীবনে লবণের অপরিহার্যতার বিষয়টি কিভাবে গৌণ, প্রান্তিক হয়ে গিয়েছিল তা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়।

১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির অভিঘাতে দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তি এবং বাজারে বিদেশি লিভারপুল লবণের রমরমা পরিলক্ষিত হয়, যা অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় 'অবশিল্পায়নের' নিদর্শ রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে অবশিল্পায়নের ফলশ্রুতিতে লবণ কি তাৎপর্য, প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল তার বিভিন্ন মাত্রা **'স্বদেশী পূর্ব লবণ প্রতর্ক: নীতি ও রাজনীতি'** শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। ন্যূনতম নুন বাংলার গ্রামসমাজের স্বয়ম্ভরতায় ও সংস্থানে কি তাৎপর্য বহন করত; করভারের হ্রাসবৃদ্ধিতে নুন বাঙালি মধ্যবিত্তর জীবনে, ভোগের ধারণায় কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল; জাতপাত ও ধর্মীয় সংস্কার সঞ্জাত মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিদেশি লবণ কি অর্থ বহন করেছিল এবং কি প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছিল; উৎপাদনের অধিকার হারানো মলঙ্গীদের জীবনে নুন কি প্রভাব ফেলেছিল, সর্বোপরি এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়াসমূহ কি কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ

করেছিল— এই অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। লবণকে কেন্দ্র করে বিশ শতকীয় স্বদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও তার সামাজিক চরিত্রকে অনুধাবন করতে এই অধ্যয়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে লবণ বয়কটের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কিভাবে বিদেশি ও স্বদেশির পার্থক্য নির্ণীত হয়েছিল তা তৃতীয় অধ্যায় **'বয়কটের আহ্বান: স্বদেশি সমাজ ও লবণ-রাজনীতি'**-তে আলোচিত হয়েছে। বিদেশি লবণ বয়কটের কর্মসূচি কিভাবে কার্যকর হয়েছিল, সামাজিক বয়কটের রাজনীতির সাথে তা কিভাবে সংযুক্ত হয়েছিল, বিদেশি লবণে অশুচিতার ধারণাই বা কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবনের চেষ্ট করা হয়েছে। বিদেশি লবণ বয়কটের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত দরিদ্র, নিম্নজাতিভুক্ত ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, সাধারণ মানুষের জীবনে নুনের অপরিহার্যতার দিকটি কি ভদ্রলোকের লবণ-রাজনীতিতে স্বীকৃত হয়েছিল, সর্বোপরি, স্বদেশি সমাজে 'দেশীয়' লবণ বলতে কি বোঝাত এবং তার উৎপাদনে কি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছিল তা এই অধ্যায়ে তলিয়ে দেখা হয়েছে। বিশ শতকে লবণকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এই অধ্যয়নের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়।

১৯৩০-এ লবণ আইন অমান্যের সূত্রেই গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে লবণ কিভাবে স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠল তা চতুর্থ অধ্যায় **'গান্ধী ও লবণ: স্বরাজের দ্যোতনা'** শীর্ষক অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। গান্ধীর রাজনৈতিক চেতনায় নুন কিভাবে জায়গা করে নিয়েছিল, গান্ধী এবং গান্ধীবাদীদের জীবনে নুন কি তাৎপর্য বহন করত, বিশেষত স্বাদ, সত্যাগ্রহ, ব্রহ্মচর্যে নুন কিভাবে সংযুক্ত বা সমন্বিত হয়েছিল, স্বরাজের প্রতীক রূপে জনতার কল্পনায় ও জল্পনায় লবণ কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সর্বোপরি, সত্যাগ্রহ লবণ কি সাম্রাজ্যিক 'অশুদ্ধি' তথা গুণমান নির্ণয়ের রাজনীতিকে অতিক্রম করতে পেরেছিল — এই প্রশ্নগুলিকে গভীরে তলিয়ে দেখা হয়েছে।

গান্ধীর পদযাত্রা এবং সত্যাগ্রহ কি ভারতের লবণাক্ত পরিসরকে সংযুক্ত হয়েছিল না কি না কি পূর্ববত, দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। ১৯৩০ কি সংযোগের মূহূর্ত, নাকি বিচ্ছিন্ন সময় মাত্র? বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে **লবণে স্বরাজ? আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে ও পরে বাংলার উপকূল** শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে। এখানে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে সংগঠিত সত্যাগ্রহে লবণ কিভাবে উৎপাদিত, বিক্রয় ও ব্যবহৃত হয়েছিল, সত্যাগ্রহ লবণ উপকূলবর্তী প্রান্তীয় মানুষের জীবনে কি অর্থ, প্রতিক্রিয়া সঞ্চার

করেছিল, সত্যাগ্রহের ফলশ্রুতিতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ কি তাদের লবণ উৎপাদনের অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন, এবং উপকূলীয় বাংলায় লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন কি ঘটেছিল তার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনা – বিশেষত, বিদেশি ব্রিটিশ লবণ ও 'মনোপলি'-র বিরুদ্ধে বিবিধ প্রতিক্রিয়া থেকে 'স্বরাজের' প্রতীক হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা – বঙ্গীয় পটভূমিতে বহুমাত্রিক ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক পর্বে কোম্পানির সল্ট মনোপলির সূচনা যেমন আঠারো শতকের বাংলায়, তেমনি উনিশ শতকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত সাক্ষ্যতে লিবেরাল, মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক রামমোহন বাংলায় বিদেশি লিভারপুল লবণের বাণিজ্যকে স্বাগত জানয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের সূচনায় দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তি, এবং বিশ শতকে স্বদেশী আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লবণকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বিবিধ মাত্রাও নিদর্শ বাংলায় পরিলক্ষিত হয়েছিল। গান্ধী স্বয়ং লবণ কর কিভাবে বাংলার মানুষকে "লুণ্ঠন" করেছিল, উৎপাদনের অধিকার থেকে অনৈতিকভাবে বঞ্চিত করেছিল এবং বাংলার অর্থনীতি ধ্বংস করেছিল সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছিলেন। নিজস্ব ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যেই বাংলা লবণের সামাজিক ইতিহাস গবেষণার অন্যতম পটভূমি হয়ে ওঠে।

এই অধ্যয়নের সূচনা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, যখন লিবেরাল মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী রাজা রামমোহন রায় সিলেক্ট কমিটিতে প্রদত্ত লবণ সাক্ষ্যে ভারতে ব্রিটিশ লবণের বাণিজ্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। লবণ বাণিজ্য সহ বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে সেই প্রথম কোনো বাঙালি তথা ভারতীয়র স্বাক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল; সর্বোপরি ভারতীয়দের স্বার্থে তথা হিতার্থে যে ব্রিটিশ লিভারপুল লবণের বাণিজ্য কাম্য এমন মতাদর্শগত সাম্রাজ্যিক দাবিতে 'শাসিতের সম্মতি' আদায়ের দৃষ্টান্তও এটি। অন্যদিকে অধ্যয়নের সমাপ্তিকাল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশিত হয়েছে। ১৯৩০-এ গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ স্বরাজের প্রতীক রূপে গণ্য হয়েছিল। লবণে স্বরাজের ধারণা কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছিল তার পর্যালোচনায় আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী পর্বে উপকূলীয় মানুষের লবণ উৎপাদনের অধিকার, সরকারের লবণ নীতি, দেশীয় লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি প্রসঙ্গে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। লবণের প্রতীকী ধারণা ও বস্তুগত বাস্তবিক ধারণার মধ্যে বেণীবন্ধন ঘটেছিল না ভিন্ন অভিমুখে গিয়েছিল তা এই সময়পর্বের আলোচনায় অনুধাবন করা যায়।

শব্দসংক্ষেপ

(List of Abbreviations)

AICC	**All India Congress Committee**
BLCD	**Bengal Legislative Council Debate**
CWMG	**Collected Works of Mahatma Gandhi**
LAD	**Legislative Assembly Debates**
RNP(B)	**Report on the Native Papers in Bengal**
NAI	**National Archives of India**
NMML	**Nehru Memorial Museum and Library**
WBSA	**West Bengal State Archives**

সূচিপত্র

ভূমিকা [১-৩৮]

প্রথম অধ্যায় ।। লবণের আমরা-ওরা: দ্বন্দ্বে-প্রতিদ্বন্দ্বে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ [৩৯-৮৭]

দ্বিতীয় অধ্যায় ।। স্বদেশি পূর্ব লবণ প্রতর্ক: নীতি ও রাজনীতি [৮৮-১২৬]

তৃতীয় অধ্যায় ।। বয়কটের আহ্বান: স্বদেশি সমাজ ও লবণ-রাজনীতি [১২৭-১৭৬]

চতুর্থ অধ্যায় ।। গান্ধী ও লবণ: স্বরাজের দ্যোতনা [১৭৭-২২৪]

পঞ্চম অধ্যায় ।। লবণে স্বরাজ? : আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে ও পরে বাংলার উপকূল [২২৫-২৭৪]

উপসংহার [২৭৫-২৮৫]

উপাদান [২৮৬-৩০৪]

ভূমিকা

ভারতীয় জনজীবনে লবণের গুরুত্ব অপরিসীম; শুধু দৈনন্দিনের খাদ্যাভ্যাস তথা শারীরিক প্রয়োজনেই নয়, সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতির বিবিধ মাত্রায় তা প্রতিভাত হয়। সামান্য লবণের সহযোগ যেমন মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তি থেকে রসনার পরিতৃপ্তিতে সহায়ক হয়ে ওঠে, তেমনই তার অভাব সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধিত প্রতীকে পরিণত হতে পারে। ভারতীয় সেনাদের লবণের প্রতি আনুগত্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতে, এমনকি বিশ্বের অন্যত্রও, আধিপত্যের ভিত অটুট রাখতে ভরসা জুগিয়েছিল।[1] প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় ঐতিহ্যে লবণের - আহার উপকরণ, পুষ্টিবিধায়ক, ঔষধি, পণ্য, প্রতীক সহ - নানাবিধ গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়; অথর্ববেদ থেকে উপনিষদ,[2] পুরাণ থেকে ধর্মশাস্ত্র,[3] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে বাৎসায়নের কামসূত্র,[4] চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে সুলতানি ও মুঘল যুগের দরবারি ও সামরিক সংস্কৃতিতে যার সাক্ষ্য মেলে।[5] ঔপনিবেশিক পর্বে, উচ্চবর্গ থেকে উপজাতি মানুষের বিবিধ সংস্কারে, আচার-রীতিতে, ধর্মীয় বিশ্বাসে লবণের উপস্থিতি তথা অপরিহার্যতা তুলে ধরে বিদেশি প্রাচ্যবিশারদ জন অ্যাবট ভারতীয় সমাজজীবনে

---

[1] Ravindra Rathee, *True to Their Salt: Indian Soldiers and the British Empire* (Amberley Publishing, 2022); Kate Imy, *Faithful Fighters: Identity and Power in British India* (New Delhi: Bloomsbury, 2023); Shrabani Basu, *For King and Another Country: Indian Soldiers on the Western Front, 1914-18* (New Delhi: Bloomsbury, 2015).

[2] পরবর্তী-বৈদিক, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে লবণের বহুতর গুরুত্ব প্রসঙ্গে দেখুন, Ralph T.H. Griffith, *The Hymns of the Atharva-Veda* [Vol. VII, 76.I,] (Benares: E.J. Lazarus & Co.,1895), 364; F. Max Muller edited, *The Sacred Books of the East: The Satapatha-Brahamana* [Vol. XII, II-I-I.6] (Oxford: Clarendon, 1882), 278; B.D. Basu (ed.) The Sacred Book of the Hindus: *Chhandoga Upanisad* (Allahabad: Panini Office, 1910).

[3] পুরাণে লবণ সমুদ্র ও বিবিধ লবণের উপযোগিতা প্রসঙ্গে J.L. Shastri, *The Garuda-Purāna*, Delhi: Motilal Banarsidas, 1957; অপস্তম্ব, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, গৌতম ধর্মশাস্ত্রে লবণ সংক্রান্ত লোকাচার, বিধিনিষেধের জন্য দেখুন, Patrick Olivelle, *Dharmasutras: The Law Codes of Apastamba, Gautama, Baudhayana and Vasistha* (Delhi: Motilal Banarasidas, 2000).

[4] বাণিজ্যিক পণ্য, করভার ও প্রশাসনিক নিরিখে লবণের উল্ল্যেখ রয়েছে *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*, রাধাগোবিন্দ বসাক অনূদিত (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭০, তৃতীয় সংস্করণ), ৮৩, ১২৪-১২৫; কামোদ্দীপক উপাদান রূপে রূপে লবণের উল্লেখ রয়েছে, Vatsayana Mallanga, *Kamasutra*, translated and edited by Wendy Doniger, Sudhir Kakar (UK: Oxford University Press, 2002) 19, 78.

[5] চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় লবণের ওষধি গুণের বিশদ উল্ল্যেখ রয়েছে, কবিরাজ শ্রী সতীশচন্দ্র শর্ম্মা অনূদিত ও প্রকাশিত, *চরক সংহিতা* (কলিকাতা: ১৩১১ বঙ্গাব্দ); কবিরাজ শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন সরকার, *সুশ্রুত সংহিতা,* (কলিকাতা, প্রকাশক ও সালের উল্ল্যেখ নেই); প্রাচীন ভারতে আহার্যে লবণের ব্যবহার প্রসঙ্গে Om Prakash, *Food and Drinks in Ancient India: From Earliest Times to C. 1200 A.D. (*Delhi: Munshi Ram Manohar Lal, 1961); সুলতানি ও মুঘল পর্বে লবণ (নমক) সংস্কৃতি প্রসঙ্গে Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal frontiers, 1204-1760* (University of California Press, 1993, 177-180.

‘লবণের ক্ষমতা’ বর্ণনা করেছিলেন।[6] অন্যদিকে ১৯৩০-এ গান্ধীর সত্যাগ্রহে লবণ যে ভারতীয়দের কাছে হঠাৎ ‘এক রহস্যময় শব্দ’, ক্ষমতার দ্যোতক হয়ে উঠেছিল, তা স্বয়ং জহরলাল নেহরুই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন।[7]

ভারতীয় প্রেক্ষিতে লবণেতিহাস চর্চার কাঠামোটি অবশ্য অর্থনীতি কেন্দ্রিক, লবণের বস্তুগত দিকটিই গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। অর্থাৎ লবণ কিভাবে উৎপাদিত হত, উৎপাদক কে, কিভাবে ও কারা তা পরিবহণ ও বাজারজাত করত, ক্রেতা ও ভোক্তাই বা কারা, কিভাবে তা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এবং মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল— এমনতর বিষয়েই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। সম্প্রতি পরিবেশগত প্রভাবের নিরিখে লবণ ইতিহাসের পর্যালোচনা শুরু হলেও তা অর্থনীতিকেন্দ্রিকতার ধারণাকেই সংহত করে। বলাবাহুল্য যে, লবণের অর্থনীতিকেন্দ্রিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার পরিধিতে বহুতর প্রশ্নের (যার একাংশ অর্থনীতির অনুষঙ্গেই উঠে আসে) উত্তর মেলে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থেই ভারতীয় উপনিবেশে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের বাণিজ্যিক আমদানি ও ক্রমিক আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল; এবং তার ফলশ্রুতিতে বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পের ক্রমবিলুপ্তি ঘটেছিল, এমনকি দেশি লবণ উৎপাদন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই বিষয়টি বহুচর্চিত হলেও জাত-ধর্ম-বর্ণভিত্তিক বহুস্তরীয় ভারতীয় সমাজে দেশি লবণের পরিবর্তে ‘অপর’ বিদেশি লবণের উপস্থিতি কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল তা বিবেচিত হয় না। অথচ লবণের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বর্ণ, আকার, স্বাদ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে কি আবেদন রাখে; বিশেষত ভারতীয় জনরুচিতে কালাপানি পার হয়ে আসা ব্রিটিশ লবণ কিভাবে গৃহীত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কারণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কেন্দ্র করেও সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আবর্তিত হয় এবং ‘অপর’ সম্পর্কে ধারণায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদ [পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুভূতি] গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[8] লবণ কিভাবে স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠেছিল বা সমষ্টিগত কল্পনার অংশ হয়ে উঠল সেই প্রসঙ্গও অর্থনৈতিক ইতিহাসে নয়, বরং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পর্যালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। কয়েক দশক আগেই সমাজবিজ্ঞানীরা বৃহত্তর

---

[6] J. Abbott, *The Keys of Power: A Study of Indian Ritual and Belief* (London: Methuen & Co., 1932).

[7] Jawaharlal Nehru, *An Autobiography* (London: Bodley Press, 1939 (1936)), 210.

[8] Andrew J. Rotter, *Empires of the Senses: Bodily Encounters in Imperial India and Philippines* (New York: Oxford University Press, 2019).

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত থেকে বস্তুর 'সামাজিক জীবনের' ধারণাকে তুলে ধরেছিলেন এবং তার 'সাংস্কৃতিক জীবনীর' প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।[9] এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও লবণের মতো পণ্যের, যা মানবজীবনে অপরিহার্য, সামাজিক ইতিহাস রচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক যুক্তি অনুযায়ী, বস্তুসমূহের এক "সামাজিক জীবন" রয়েছে যা তাদের ভৌত অস্তিত্ব অতিক্রম করে সম্প্রসারিত হয়। বস্তু কেবল মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত নিষ্ক্রিয় উপাদান নয়, বরং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সম্পর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। বস্তু বার্তা প্রেরণ করতে পারে, সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হতে পারে, এমনকি মানুষের চিন্তা এবং আচরণকে প্রভাবিত করে নির্দিষ্ট আকার দিতে পারে। বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে বস্তুর উপস্থিতি বিভিন্ন অর্থ, তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে। পরিচিতি (Identity) নির্ধারণে এবং গোষ্ঠীভুক্তির অনুভূতি তৈরি করতে বস্তু সক্ষম। বস্তু একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী বা সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের সাথে একাত্মতার ইঙ্গিত দিতে পারে এবং সময়ের সাথে ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্যের অনুভূতি তৈরি করতে পারে। ধর্মীয় আচার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বিভিন্ন বস্তু তথা পণ্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেগুলি প্রায়শই সামাজিক স্তরবিন্যাস ও ক্ষমতার কাঠামোকে নির্মাণ এবং শক্তিশালী করতে সহায়ক হয়।[10] তাছাড়া ভারতের বহুমুখী লবণ সংস্কৃতির নৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রা যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষিত না হলে লবণের ইতিহাস খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই সেবা, আনুগত্য এবং সম্মানের ধারণায় লবণের স্থান, রুচি এবং নান্দনিকতার আবহে, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্ররূপে, স্বাধীনতা, ভোগবিলাস, দুরবস্থা এবং শোষণের সূচক হিসাবে লবণ সংস্কৃতির বিচিত্র এবং জটিলতর সম্ভাবনার দিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।[11]

ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াসই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের মূল লক্ষ্য এবং বস্তুর 'সামাজিক জীবন' সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে এখানে অনুসৃত হয়েছে। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে লবণকে কেন্দ্র করে যে বহুতর অর্থ, তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, এবং সময়বিশেষে তা কিভাবে নৈতিক প্রতিবাদ ও

---

[9] Arjun Appadurai, "Introduction: Commodities and the politics of value"; Igor Kopytoff, "The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process", in Arjun Appadurai edited, *The social life of things: Commodities in cultural perspective* (Cambridge University Press, 1986). 3-63, 64-91.

[10] Arjun Appadurai, "Introduction", ibid.

[11] David Arnold, Salt: An Afterword, *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 46:4, (2023), 886-894.

সমষ্টিগত প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করে— লবণের সামাজিক সেই রূপান্তরের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করাই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের মৌলিক উদ্দেশ্য। দেশীয় লবণের 'অপর' রূপে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের উপস্থিতিই ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে বহুমুখী তাৎপর্য ও প্রতিস্পর্ধী প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছিল, যার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, লবণ যেন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বিদেশি ব্রিটিশ লবণ যদি শুদ্ধতা, শুভ্রতা, স্বাস্থ্যসম্মত গুণমান ইত্যাদির নিরিখে সাম্রাজ্যিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে দেশীয় লবণের ঔপনিবেশীকরণ ঘটিয়ে থাকে, তার বিপরীতে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও নৈতিক মূল্যবোধে জারিত দেশীয় লবণ কিভাবে প্রতিস্পর্ধী অর্থ ও প্রতিক্রিয়ায় বিদেশি লবণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে নাকচ করেছিল এবং ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত তথা স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠেছিল— সামাজিক ইতিহাসের চৌহদ্দিতেই তা স্পষ্ট হয়। ১৮৩০-এর দশক থেকে স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত লবণকে কেন্দ্র করে 'অপরীকরণের রাজনীতি' ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতেই স্পষ্ট হয়। সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবশ্য বস্তুর 'সামাজিক জীবন' শুধু অতীত নয়, বর্তমান, ভবিষ্যতের দিশায়ও সম্প্রসারিত। ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে লবণকে কেন্দ্র করে যে অর্থ, তাৎপর্য, প্রতিক্রিয়াসমূহ পরিলক্ষিত হয় সময়ের সাথে সাথে তা কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল, আবার কোনো ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় থেকেছে; এবং তার রেশ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চরিত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতা থেকেই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে, বস্তুর 'সামাজিক জীবন'কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করে, অতীতের প্রেক্ষিতে লবণের 'সামাজিক ইতিহাস' অনুসন্ধান করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে হলে শুরুতেই অবশ্য লবণকে কেন্দ্র করে এযাবৎ অ্যাকাডেমিক ইতিহাসচর্চা কোন অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে তার পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

।। ১ ।।

লবণেতিহাস চর্চার ইতিহাস: বঙ্গীয় প্রেক্ষিত

ভারতীয় প্রেক্ষিতে লবণেতিহাস চর্চার কাঠামোটি রাষ্ট্রীয়-অর্থনীতি কেন্দ্রিক, মূলত ব্রিটিশ 'সল্ট মনোপলি'-কে উপজীব্য করেই রচিত। এই ইতিহাসচর্চার এক-পিঠে রয়েছে কোম্পানির শাসনকাল থেকে ব্রিটিশ রাজের পর্ব জুড়ে 'সল্ট মনোপলি'-কে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যের অনৈতিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক শোষণের আখ্যান, তার অন্য-পিঠে রয়েছে 'সল্ট মনোপলি'-র বিরোধিতা করে গান্ধীয় সত্যাগ্রহের নৈতিক

রাজনীতির আহ্বান, লবণ যেখানে স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। বাংলায় লবণ সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চা কি এই প্রেক্ষিতে কোনো স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরে, না কি গতানুগতিক 'সল্ট মনোপলি'-কে উপজীব্য করেই এগোয়— পরবর্তী অংশে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

লবণ সত্যাগ্রহ থেকে স্বাধীনতার পর্বে

গান্ধীর আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে 'সল্ট মনোপলি' নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনায় স্বভাবতই এক জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩০-এর দশক জুড়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে লবণ শিল্প, লবণ কর ও লবণের একচেটিয়া কারবারের বিশ্লেষণ বাংলায় গবেষকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রভূত সংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গবেষক পরিমল রায় যেমন *ক্যালকাটা রিভিয়্যু* পত্রিকার (১৯২৯-৩০) কোম্পানির শাসনকালে লবণ করের ইতিহাস নিয়ে পাঁচ পর্বের দীর্ঘ ধারাবাহিক গবেষণা-প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কোম্পানি শাসনের সূচনা থেকে ১৮৩০ দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলা এবং ভারতের অন্যত্র লবণ করের ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় তিনি 'বোর্ড অফ রেভেনিউ' রেকর্ডস এবং 'পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটি' রিপোর্ট ব্যবহার করেছিলেন।[12] ১৯৩১-এর জুলাইতে *ক্যালকাটা রিভিয়্যু*-তেই বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত উনিশ শতকের বাংলায় লবণ শিল্পের সমৃদ্ধির বিবরণ প্রকাশিত হয়। বাংলায় লবণ উৎপাদনের স্থানীয় পদ্ধতি ও তার গুণগত এবং পরিমাণগত বিবরণ, কর্মনিযুক্তির পরিসংখ্যান ও কর্মরত মলঙ্গিদের অবস্থা, বাংলায় লবণ উৎপাদনের খরচ ও জাহাজে কলকাতায় আগত মাদ্রাজ ও লিভারপুল লবণের মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যসহ আলোচনা তিনি পেশ করেছিলেন।[13] ১৯৩১-এর আগস্টে হেমেন্দ্র কুমার ঘোষ *মডার্ন রিভিয়্যু*-তে 'Salt in Bengal' শিরোনামে সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখেছিলেন।[14] লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ভেরা অ্যানস্টের তত্ত্বাবধানে তরুণ বাঙালি গবেষক বি. ঘোষ তাঁর বিষয় হিসেবে ১৭৫৬ থেকে

---

[12] Parimal Ray, "History of Taxation of Salt under the Rule of the East India Company," *Calcutta Review*, Vol. 33, (Nov. & Dec. 1929), 175-94; Vol. 34 (Jan., Feb., March 1930), 35-43, 215-24, 347-54; Vol. 35 (April, May, June 1930), 17-21, 193-200, 321-25; Vol. 36 (July, Aug., Sept. 1930), 29-34, 184-87, 340-44; Vol. 37 (Oct., Nov. & Dec. 1930), 64-67, 265-79.

[13] Binaybhusan Dasgupta, "A Picture of the Salt Industry in Bengal during the Days of the Prosperity in the Nineteenth Century," *Calcutta Review*, Vol. 40 (July 1931), 13-27.

[14] Hemendra Prasad Ghose, "Salt in Bengal," *Modern Review*, Vol. 50 (Aug. 1931), 139-42.

১৯৩২ পর্যন্ত ভারতীয় লবণ শিল্প, বাণিজ্য ও করভারকে বেছে নিয়ে ১৯৩২-৩৩ সালে গবেষণা করেছিলেন।[15] ১৯৩৭ সালে নর্দার্ন ইন্ডিয়ান সল্ট রেঞ্জের সুপারিন্টেডেন্ট সুগন চাঁদ আগরওয়াল *The Salt Industry in India* গ্রন্থে প্রাক-মুঘল পর্ব থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি পর্যন্ত বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে লবণ শিল্পের পর্যালোচনা করেছিলেন। তবে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা 'Salt and the Struggle for Freedom' শীর্ষক অধ্যায়টি তৎকালীন (ব্রিটিশ শাসনাধীন) রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫৬) এই অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন; তার পাশাপাশি ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতের লবণ শিল্পের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও তিনি সংযোজন করেছিলেন।[16] ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে বাংলায় লবণ শিল্পের ইতিহাস নিয়ে *মডার্ন রিভিয়্যুতে* প্রবন্ধ লিখেছিলেন জিতেন্দ্র কুমার নাগ।[17] কোম্পানি পর্বের সল্ট এজেন্সি ও ১৯৪০-এর দশকের লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করে শ্রী নাগ ১৯৪৫-এর মার্চে *মডার্ন রিভিয়্যু*-তে আরেকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লবণ সত্যাগ্রহের সংগঠন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কাল পর্যন্ত বাংলার প্রেক্ষিতে লবণকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক-ইতিহাস রচনার সমৃদ্ধ ধারাই পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বিশ শতক

স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে ভারতে সরকারের আর্থিক বদান্যতায় ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের (১৯১৮-তে প্রতিষ্ঠিত) পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত জাতিরাষ্ট্র কিভাবে ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছিল তার ইতিবৃত্ত রচনার উপাত্ত হিসেবে কমিশন রিজিওন্যাল রেকর্ডস সার্ভে কমিটি গঠন করে বেসরকারি নথিপত্র এবং জেলা প্রশাসনিক নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণে জোর দিয়েছিল। ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিওন্যাল রেকর্ডস সার্ভে কমিটির সম্পাদক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ স্বয়ং এমনই এক প্রকল্পে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড অফিস থেকে হিজলি ও তমলুকের সল্ট এজেন্টদের সরকারি নথিপত্র উদ্ধার করেছিলেন এবং তার মধ্য থেকে বেছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রায় দুশো দলিলের সংকলন রূপে *Midnapore*

[15] B. Ghosh, "The Indian Salt Industry, Trade, and Taxation, 1756-1932," London, 1932-33. Under V. Anstey, cited in Margaret Case, *South Asian History: A Guide to Periodicals, Dissertation and Newspaper* (Princeton: Princeton University Press, 1968) 423.

[16] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry in India* (Delhi: Govt. of India Press, 1956, 2nd Edition).

[17] Jitendra Kumar Nag, "History of Bengal's Salt Industry," *Modern Review*, Vol. 66 (Sept. 1939), 300-03.

Salt Papers (১৯৫৪) প্রকাশ করেছিলেন।[18] আধুনিক ইতিহাসের অবহেলিত উপাদানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে বলে কমিটির প্রস্তাবনায় লেখা হয়েছিল।[19] নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহর সহযোগী ছিলেন তাঁর দুই ছাত্র-গবেষক তড়িৎকুমার মুখার্জি ও অরুণ কুমার দাশগুপ্ত। গ্রন্থের শুরুতে লিখিত দীর্ঘ ভূমিকাতে তিনি লবণ উৎপাদন পদ্ধতি ও তার পরিমাণ, উৎপাদন ও বিক্রয় মূল্যের পরিসংখ্যান, উৎপাদক মলঙ্গি শ্রমিক, মধ্যস্বত্বভোগী ঠিকাদার, ব্যবসায়ীদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছিলেন। সংক্ষিপ্ত সময়পর্বের (১৭৮১-১৮০৭) এই সংকলন থেকে আঞ্চলিক লবণ শিল্পের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়, এবং কোম্পানির শোষণের পরিণাম উভয় দিক সম্পর্কেই জানা যায়। নিকটস্থ মরাঠা-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে লবণের চোরাচালানে মলঙ্গিদের জড়িত থাকা ও বেগার শ্রমিক হিসেবে আজুরা মলঙ্গিরা কিভাবে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গেও তিনি আলোকপাত করেছিলেন। ঔপনিবেশিক বাংলায় আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে লবণ শিল্প অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহর -র *Midnapore Salt Papers* এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রণজিত গুহ *ইতিহাস* পত্রিকায় এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে 'মেদিনীপুরের লবণশিল্প' (১৯৫৪) শিরোনামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই সময়ের গবেষক গুহ জানিয়েছিলেন যে, 'দেশীয় অর্থনীতি ও সমাজই যে জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক উপাদান'– *Midnapore Salt Papers*-এ তারই নিদর্শ ফুটে ওঠে। ১৯৫০ দশকের প্রথমার্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থাকাকালীন রণজিত গুহ যে মার্ক্সীয় তত্ত্বভাবনার আলোয় ইতিহাসকে দেখছিলেন তা আজুরা মলঙ্গিদের শোষণ প্রসঙ্গে উক্তিতে স্পষ্ট: 'মার্ক্স বলেছিলেন যে মধ্যযুগে দানিউব অঞ্চলে বেগারি থেকেই ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব হয়েছিল, মনে হয় আজুরা মলঙ্গিদের ক্ষেত্রেও তা সত্য"।[20] সরল যুক্তি বিন্যাসের এই ধাঁচা থেকে বেরিয়ে কয়েক দশক পরেই অবশ্য যিনি নিম্নবর্গের ইতিহাসচিন্তার পথিকৃৎ হয়ে উঠবেন, সেই রণজিত গুহ-র ঐতিহাসিক মননের বিবর্তনকে চিহ্নিত করার প্রেক্ষিতে 'মেদিনীপুরের লবণশিল্প' শীর্ষক পর্যালোচনা আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

---

[18] N.K. Sinha et. al. [edited], *Midnapore Salt Papers: Hijili and Tamluk (1781-1807)* (West Bengal Regional Records Survey Committee: Dasgupta, 1954).

[19] Report of the Regional Records Survey Committee for West Bengal, 1952-53, উদ্ধৃত হয়েছে, উদয়ন মিত্র, *জানা অজানা মহাফেজখানা* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯), ১১৭.

[20] 'মেদিনীপুরের লবণশিল্প', পরিচয় (১৯৫৪), সংকলিত হয়েছে *রণজিত গুহ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ ২০১৯) ৩-১৪।

১৯৬০-এর দশকে এইচ. আর. সি. রাইট 'সল্ট মনোপলি'-র সংস্কারে লর্ড কর্ণওয়ালিশের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য তথা অ্যাডাম স্মিথের 'পলিটিক্যাল ইকনমির' বেখাপ্পা প্রভাব ('imperfectly digested') লক্ষ্য করেছিলেন। অবৈধ লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা রুখতে এবং আজুরা মলঙ্গিদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে কর্ণওয়ালিশ যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা 'সল্ট মনোপলি'-কে আরো সুদৃঢ় করে তুলেছিল বলে রাইট মনে করেন।[21] ১৯৭০-এর দশকে লেখ্যাগারিক ভাস্কর ঘোষ এবং সনৎ কুমার ঘোষের সম্পাদনায় দুই খণ্ডে হিজলী (১৯৭১) এবং তমলুকের (১৯৭৪) সল্ট এজেন্সির লবণ-নথির আরো বিশদ সংকলন প্রকাশিত হয়।[22] ১৯৭৮-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরাজুদ্দিন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-কে কেন্দ্র করে আর্থিক ও প্রশাসনিক নীতির পরিবর্তন, উৎপাদন ও ব্যবসার পরিমাণ, মলঙ্গিদের শোষণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলেন।[23] ১৯৭৯-তে বলাই বারুই কোম্পানির শাসনপর্বের প্রথমার্ধে বাংলার লবণ শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রী বারুইয়ের *The Salt Industry of Bengal: The Relations of Production in the Industry and Trade in Salt 1757-1800* (১৯৭৯) শীর্ষক গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অরুণ দাশগুপ্ত, যিনি আড়াই দশক আগে নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহর সহযোগী হয়ে *Midnapore Salt Papers* সম্পাদনা করেছিলেন।[24] অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি-প্রকরণ মেনেই কোম্পানির রাজস্ব নথি ও সংসদীয় প্রতিবেদন ঘেঁটে শ্রী বারুই অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার লবণ উৎপাদন, বন্টন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক তুলে ধরে দেখিয়েছেন কোম্পানির একাধিপত্য কিভাবে দেশীয় লবণ শিল্প ও বাণিজ্যে নানাবিধ পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। পলাশি-পরবর্তী পর্বে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে নানাবিধ পুরোনো ও নতুন 'মিথষ্ক্রিয়া' (interaction) কিভাবে লবণের উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণে (উৎপাদন কৌশল নয়) ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সংগঠনের চরিত্রে বদল এনেছিল। পুরোনো জমিদার, প্রধান মলঙ্গি ও লবণ

---

[21] H. R. C. Wright, 'Reforms in the Bengal Salt Monopoly, 1786-95,' *Studies in Romanticism*, Vol. 1, No. 3 (Spring, 1962), 129-153.

[22] Bhaskar Ghose & Sanat K. Bose edited, *Midnapore Correspondence of the Salt Districts Hidgellee Salt Divisions: Letter Received, 1786-1801* (Govt. of West Bengal: West Bengal District Records, 1971); Bhaskar Ghose & Sanat K. Bose edited, *Midnapore Correspondence of the Salt Districts Tamlook Salt Divisions: Letter Received, 1785-1796* (Govt. of West Bengal: West Bengal District Records, 1974).

[23] A. M. Serajuddin, The Salt Monopoly of the East India Company's Government in Bengal, *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 21, No. 3 (Oct., 1978), 304-322.

[24] Balai Chandra Barui, *The Salt Industry of Bengal: The Relations of Production in the Industry and Trade in Salt 1757-1800*, Ph.D. Thesis, (University of Calcutta, 1979).

উৎপাদনে অর্থলগ্নিকারী বণিকদের (Production Merchant) সরিয়ে প্রথমে কোম্পানির কর্মচারী, পরে সল্ট এজেন্টদের আবির্ভাব এবং ‘পিয়ন’, ‘চাপরাশি’, ‘পেশকার’ প্রমুখ কর্মচারীর উপস্থিতি এক নতুন প্রশাসনিক বিন্যাসকে তুলে ধরে। তার পাশাপাশি পুরোনো জমিদারেরা কিভাবে মলঙ্গিদের সাথে যোগসাজশে অবৈধ লবণ উৎপাদন ও চোরা-কারবারের এক সমান্তরাল ব্যবস্থা চালু রেখে ‘সল্ট মনোপলিকে’ সংকটে ফেলে দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণা আলোকপাত করে।[25]

একুশ শতক

উনিশ শতকে বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পের অবক্ষয়কে অর্থনীতিবিদ ইন্দ্রজিৎ রায় ‘অবশিল্পায়নের’ এক অধ্যায় রূপে বিশ্লেষণ করেছেন। কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্যের বিলোপ ও তার পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও বৈষম্যমূলক শুল্ক ব্যবস্থা আরোপকেই তিনি মুখ্যত দায়ী করেছেন। মুক্ত বাণিজ্যিক নীতির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চেশায়ার লবণ ও লিভারপুলের জাহাজি পরিবহণ মালিকদের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্রমাগত তাগাদা ও চাপ সৃষ্টির ফলশ্রুতিতে যে বৈষম্যমূলক রাজস্বনীতি প্রণীত হয়েছিল তা বাংলার দেশীয় লবণ শিল্পকে ক্রমিক বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছিল।[26] অবশ্য দেশীয় লবণ শিল্প ও উৎপাদক মলঙ্গিদের বিলুপ্তির ইতিহাস শুধু আর্থ-রাজনৈতিক মাত্রাতেই নয়, কাজের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত প্রভাবের নিরিখে পর্যালোচনা করা উচিত বলে সায়াকো কাণ্ডা তাঁর গবেষণায় দাবি করেছেন।[27] তাঁর মতে, লবণ-জল ফুটিয়ে পাঙ্গা লবণ উৎপাদন করতে মলঙ্গিরা যে জালপাই জমি থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতেন, তার জোগান ক্রমাগত নদীপ্রবাহের দিক পরিবর্তনে ও আবাদি জমিতে রূপান্তরের কারণে কমতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একদিকে যেমন জালপাই জমি থেকে জ্বালানির পরিমাণ কমছিল তেমনই অন্যদিকে আঞ্চলিক বাজারে চাহিদা থাকায় খড়, ঘুঁটের মতো জৈব জ্বালানির দামও বেড়েছিল; অর্থনৈতিক চাহিদার দরুন কয়লার দামও বেশি ছিল, জোগানেও অপ্রতুল ছিল। ঝড়, বন্যা, ম্যালেরিয়া, বন্য পশুর আক্রমণ প্রভৃতি কারণে লবণ উৎপাদনে এমনিতেই যথেষ্ট প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতেন উৎপাদকেরা। এই পরিস্থিতিতে জ্বালানি সংকটের

---

[25] Ibid.

[26] Indrajit Ray, ‘Imperial Policy and the Decline of the Bengal Salt Industry under Colonial Rule: An Episode in the “De-industrialisation” Process’, *Indian Economic and Social History Review*, 38, no. 2, 2001, pp. 181–205.

[27] Sayako Kanda, “Environmental Changes, the Emergence of a Fuel Market, and the Working Conditions of Salt Makers in Bengal, c. 1780–1845,” *International Review of Social History*, Volume 55, No. S18: December (2010): 123 – 151.

দরুণ লবণ উৎপাদনের খরচ বাড়লে দেশীয় লবণ বিদেশি লিভারপুল লবণের কাছে তার বাজার হারাতে শুরু করেছিল বলেই সায়াকো মনে করেন।[28] অতি সম্প্রতি লবণ শিল্পের পরিবেশগত মাত্রাটিকে আরো গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গীয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব লবণ জেলাগুলিতে রমরমিয়ে চলা অবৈধ লবণ কারবার প্রতিহত করতে ও সামগ্রিক ভাবে লবণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই কোম্পানির অপারগতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নদী, মোহনা, জলাভূমি ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল বেষ্টিত বাংলার প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য কোম্পানির উদ্যোগ ও অবৈধ কার্যকলাপের মধ্যে এক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে, যার নিরিখে লবণ শিল্পের অবয়ব নির্ধারিত হয়। নদীপ্রবাহে নতুন জেগে ওঠা চরের মালিকানার দাবিকে কেন্দ্র করে কোম্পানি ও স্থানীয় প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীদের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যা কোম্পানির প্রাকৃতিক ভূচিত্রের চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ধারণায় জটিলতা তৈরি করে। অনুরূপে, জঙ্গলাকীর্ণ লবণ-ভূমিও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে; দেশীয় ধারণায় অরণ্য যদি মানুষের যৌথ প্রাকৃতিক অধিকারের পরিসর বলে প্রতিভাত হয়, তাহলে কোম্পানির ধারণায় এই প্রাকৃতিক পরিসর শুধুই অর্থনৈতিক সম্পদের চাবিকাঠি বলে গণ্য হয়েছিল।[29]

উল্লিখিত ইতিহাসচর্চার ধারা থেকে থেকে স্পষ্ট হয় যে, স্বাধীনতার পর থেকে গবেষকরা মূলত বাংলায় কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি' ও ব্রিটিশ রাজের সূচনায় দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তির ওপরেই মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজের পর্বে 'সল্ট মনোপলি'র কোন পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয় না (এই প্রসঙ্গে মাইলস টেলর মন্তব্য করেছেন, 'salt manufacture under the Raj awaits its historian').[30] অর্থনীতিকেন্দ্রিক এই বিশ্লেষণে কোম্পানির মনোপলির বিবর্তন, লবণ উৎপাদকদের শোষণ, উৎপাদনের পরিবেশ, লবণের অবৈধ কারবার, ভারতের বাজারে বিদেশি লবণের প্রবেশ ও আধিপত্য, সাম্রাজ্যের বৈষম্যমূলক নীতি ইত্যাদির ওপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। পরিবেশগত প্রভাবের পর্যালোচনাও লবণ-অর্থনীতির লাভ-ক্ষতির খতিয়ানে গুরুত্ব আরোপ করে। এই একরৈখিক ইতিহাস বিশ্লেষণে দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তিতে

---

[28] Ibid.

[29] Arijita Manna, "Physical Environment, Customary Practices, and the English East India Company Regime: A Narrative of Salt Smuggling in Late 18th-Century Lower Deltaic Bengal" in Tilottama Mukherjee and Nupur Dasgupta edited, *Religion, Landscape and Material Culture in Pre-modern South Asia* (Routledge, 2023), 200-222.

[30] Miles Taylor, Empress: Queen Victoria and India (New Haven: Yale University Press, 2018) 325.

উৎপাদকদের পরিণতির কথা জানা যায় না, তাদের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ তো আরো দূরের বিষয়। বিদেশি লবণ সম্পর্কে দেশীয় জনসমাজের ধারণা কি ছিল, বা বিদেশাগত লবণ কিভাবে দেশীয় জনরুচিতে গৃহীত হল সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হয় না। লবণের মতো বাজারি পণ্যে ভেজালের সমস্যা, ক্রেতা-ভোক্তার সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থান লবণের চাহিদাতে তথা অর্থনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলে কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গও অনালোচিত থেকে যায়। সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়গুলির অনুসন্ধান করা যায় এবং বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

বাংলায় লবণ সত্যাগ্রহের ইতিহাসচর্চা

১৯৩০-এ লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধী যেমন দেশবাসীকে স্বরাজের পথ দেখিয়েছিলেন, তেমনই তাঁর সময় থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত লবণ ইতিহাস রচয়িতাদেরও পথ দেখিয়ে চলেছেন। কিন্তু লবণ সত্যাগ্রহের ইতিহাসচর্চায় লবণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের অভিমত কি? বাংলায় লবণ সত্যাগ্রহের ইতিহাসচর্চাতেই বা লবণ কিভাবে বিশ্লেষিত হয়?

জুডিথ ব্রাউন আইন অমান্যের বিষয় হিসেবে লবণ কর বেছে নেওয়াকে গান্ধীর চমৎকার উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচায়ক (‘a superbly ingenious choice’) বলে অভিমত জানিয়েছেন।[31] ক্রিস বেইলি মনে করেন যে, গান্ধীর অতুলনীয় প্রতিভার কারণেই কোনো একক বিষয় ‘বিপুল বিশ্বাস, আকাঙ্খা এবং জনপ্রিয় প্রতীকে’ পরিণত হত, এবং সে কারণেই চরকা, খাদি, লবণ থেকে শুরু করে অসংখ্য প্রতীক ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।[32] টমাস ওয়েবার লবণ সত্যাগ্রহের ইতিহাসচর্চায় লবণ সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে গান্ধী, তাঁর অনুগামী সত্যাগ্রহী এবং পদযাত্রার যাত্রাপথের বিশদ বিবরণেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[33] ডেনিস ডাল্টনের গবেষণায়ও লবণ উপলক্ষ মাত্র, গান্ধীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাঁর অহিংসার শক্তি কতটা কার্যকর হয়েছিল তিনি তা বিশ্লেষণ করেছেন।[34] বাংলায় লবণ সত্যাগ্রহের ইতিহাসচর্চায়ও এই

---

[31] Judith M. Brown, *Gandhi and Civil Disobedience, The Mahatma in Indian Politics: 1928-34* (London: Cambridge University Press, 1977), 92-4.

[32] C. A. Bayly, “The Origins of swadeshi (home industry): cloth and Indian society, 1700-1930”, in Arjun Appadurai edited, *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspectives* (UK: Cambridge University Press, 1986), 312.

[33] Thomas Weber, *On the salt march: The Historiography of Mahatma Gandhi's March to Dandi* (New Delhi: Rupa, 2009).

[34] Dennis Dalton, *Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action* (New York: Columbia University Press, 2012).

দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। লবণ আইন অমান্যের বিশ্লেষণে লবণ নয়, বরং বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস, বাঙালি কংগ্রেস নেতৃত্ব, গান্ধীবাদী নেতৃত্ব এবং গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান, বিপ্লবী সংগঠন ইত্যাদিতে গুরুত্ব আরোপিত হয়।

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর গবেষণায় সর্বভারতীয় নেতৃত্বে গান্ধীর উত্থানের পরবর্তী দুই দশকে বাংলার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের সূত্রেই লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের আলোচনা করেছেন। বাংলায় লবণ সত্যাগ্রহকে সফল করে তুলতে বিপ্লবী সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ায় কিভাবে হিংসা ও অহিংসার সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং লবণ সত্যাগ্রহীদের প্রতিরোধী কার্যকলাপে কার্যত অহিংস সত্যাগ্রহীর আর হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবীর মধ্যে পার্থক্য করা যে পুলিশের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল — সেই প্রসঙ্গে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন।[35] শ্রীলতা চ্যাটার্জি তাঁর *Congress Politics in Bengal 1919–1939* শীর্ষক গবেষণা-গ্রন্থে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির অভিমুখ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি এবং বাংলার বিচিত্র সামাজিক গোষ্ঠীর রাজনীতি কিভাবে একে অন্যকে প্রভাবিত করেছিল ও অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল (বিশেষত গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদের পর্বে) তা পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই মিথস্ক্রিয়া কংগ্রেসকে এক নড়বড়ে কাঠামোর প্রতিষ্ঠান থেকে সংগঠিত রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছিল এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলে যেতে সক্ষম করে তুলেছিল। লবণ আইন অমান্যের পর্বে জাতীয়তাবাদী-মনস্ক স্থানীয় স্তরের ব্যক্তিবর্গ, গ্রামীণ গঠনমূলক কর্মীরা, বিপ্লবীরা – যারা স্বাধীনভাবে কাজ করতেন ও কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে ছিলেন – কিভাবে একযোগে কংগ্রেস সংগঠনে সামিল হয়ে আন্দোলনকে সংগঠিত ও সাময়িকভাবে সফল করে তুলেছিলেন, মুখত সেই দিকেই এই গবেষণা আলোকপাত করেছে।[36] আইন অমান্য আন্দোলনে প্রতিবাদের রাজনীতি কিভাবে প্রায়শই জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের গতানুগতিক বিন্যাসের বাইরে চলে যায় তনিকা সরকারের গবেষণায় সেই দিকটি উঠে এসেছে। লবণ আইন অমান্যের বিশ্লেষণে লবণের অপরিহার্যতা ও বহুতর প্রতীকী তাৎপর্যের অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখ করার পর তাঁর আলোচনার মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে প্রতিবাদের রাজনীতি। শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী, নারী, ভদ্রলোক এমনকি

---

[35] See chapter 3 ‘Erosion of Non-violence’, in Gitasree Bandyopadhyay, *Constraints in Bengal Politics, 1921–1941, Gandhian Leadership* (Calcutta: Sarat Book House, 1984), 110-158 [150].

[36] Srilata Chatterjee, *Congress Politics in Bengal 1919-1939* (London: Anthem Press, 2002).

দাঙ্গাকারীদের ভূমিকার পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সকলেই প্রতিবাদের রাজনীতিতে বিভিন্ন মাত্রায় জড়িত ছিল।[37]

লবণ সত্যাগ্রহের ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে গান্ধী থাকেন, জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা পর্যালোচিত হয়; তার পাশাপাশি লবণ আইন অমান্যের আহ্বান, সংঘটন ও পরিণামকে ঘিরেও বিতর্ক-বিশ্লেষণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আন্দোলনের বিষয়বস্তু লবণ, যা মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য উপাদান (গান্ধীর কথায় 'the greatest necessity of life'), তা কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণা ও আখ্যানে প্রায় উপেক্ষিত বা প্রান্তে পর্যবসিত হয়। অথচ গান্ধীর আদর্শ 'স্বরাজ' যদি দেশবাসীর কাছে বহুতর অর্থে প্রতীয়মান হয়, তাহলে স্বরাজের অন্যতম প্রতীক লবণও বহু অর্থ তুলে ধরতে পারে। লবণ কিভাবে গান্ধীয় নৈতিক-রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল এবং দেশবাসীর কাছে কি অর্থে প্রতীয়মান হয়েছিল— বর্তমান অভিসন্দর্ভে তা গুরুত্ব সহ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক 'সল্ট মনোপলি'-র চরিত্র পর্যালোচনা করলে লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীর নৈতিক রাজনীতির তাৎপর্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

।।২ ।।

ঔপনিবেশিক 'সল্ট মনোপলি'

'মনোপলি' (Monopoly) শব্দটির গ্রীক উৎস 'Mono' (Single) ও 'Polein' (to sell) কোনো পণ্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকে নির্দেশিত করে।[38] অষ্টাদশ শতকের লেখক স্যামুয়েল জনসন 'মনোপলি' বলতে কোনো-কিছু বিক্রির ক্ষেত্রে একচেটিয়া বিশেষাধিকারকেই ('exclusive privilege of selling anything') বুঝিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যিক প্রেক্ষিত থেকেই 'মনোপলি'-র সাথে শাসকীয় শোষণ ও নিপীড়ন যে প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যায় যখন শব্দটির প্রয়োগগত দৃষ্টান্তরূপে জনসন 'one of the most oppressive monopolies imaginable' বাক্যাংশ তুলে ধরেন।[39] দীর্ঘকাল ধরে গ্রেট ব্রিটেন সহ ইয়োরোপের প্রায় সর্বত্র লবণের ওপর ধার্য কর-ই যে কোষাগারের অন্যতম উৎস হয়ে এসেছে অ্যাডাম স্মিথ

---

[37] Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934, The Politics of Protest* (Delhi: Oxford University Press, 1987), 80.

[38] Robert K. Barnhart edited, *The Barnhart Dictionary of Etymology* (USA: H.W. Wilson, 1988) 674.

[39] Samuel Johnson, *A Dictionary of the English Language* (London: W. Strahan, 1755) Page no. not mentioned.

তার উল্লেখ করেছিলেন। *'The Wealth of Nations'*-এ তিনি আরো লিখেছিলেন যে, "The quantity [of salt] annually consumed by any individual is so small, and may be purchased so gradually, that nobody, it seems to have been thought, could feel very sensibly even a pretty heavy tax upon it."[40] করভার প্রসূত এই 'সল্ট মনোপলি'-র সাথে আমজনতার শোষণ ও নিপীড়ন যে প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল তার নজির শুধু ভারতেই নয়, অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্স থেকে উনিশ শতকে রাশিয়া, কলম্বিয়া সহ বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়।[41] এই বৈশ্বিক চরিত্রের প্রেক্ষিতে, বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে লবণের একচেটিয়া আধিপত্য বা লবণের একাধিপত্যের বদলে 'সল্ট মনোপলি' কথাটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে

আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের সূচনায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় লবণ উৎপাদনের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। এই পর্বে লবণ ছিল কোম্পানি রাজস্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস যা ব্রিটিশ ভারতের গঠনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।[42] প্রাক-পলাশী পর্বের বাংলায়, নবাবের নির্দেশানুযায়ী স্থানীয় জমিদারদের তত্ত্বাবধানে উৎপাদক মলঙ্গীরা নির্দিষ্ট শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে লবণ উৎপাদন করতেন। সেইসময়ে 'ফকর-অল-তেজর' বা 'মালিক-অল-তেজর' অভিধায় ভূষিত কয়েকজন বৃহৎ বণিক লবণ ব্যবসায় আধিপত্য কায়েম করেছিলেন।[43] বলাই বারুই তাঁর গবেষণায় এই অর্থলগ্নিকারি ব্যবসায়ীদের 'Production Merchant' রূপে অভিহিত করেছেন, যাদের প্রদত্ত অর্থ জমিদার হয়ে প্রধান মলঙ্গি (মূলত লবণ অঞ্চলের গ্রামের মোড়ল) হয়ে উৎপাদক মলঙ্গিদের কাছে পৌঁছত।[44] পলাশী-পরবর্তী পর্বে কলকাতা ও

---

[40] Adam Smith, *The Wealth of Nations* [Edited by Edwin Cannan] (New York: The Modern Library, 1937) 825.

[41] 'সল্ট মনোপলি'-র নিপীড়নমূলক চরিত্র প্রসঙ্গে, অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে গ্যাবেলের পর্যালোচনা রয়েছে: Thomas E. Watson, *The Story of France: From the Earliest Times to the Consulate of Napoleon Bonaparte* (New York: Macmillan, 1899) 205; উনিশ শতকের রাশিয়া ও কলম্বিয়াতে নিপীড়নমূলক লবণ করের পর্যালোচনা যথাক্রমে রয়েছে: "Russian salt duties and salt monopoly," in John Mcgregor, *Commercial statistics*, Vol. II, (London: Whittaker, 1850), 803; Joshua M. Rosenthal, *Salt and the Colombian State: Local Society and Regional Monopoly in Boyaca, 1821-1900* (Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2014), 66-67.

[42] P. J. Marshall, Bengal, The British Bridgehead: Eastern India, 1740-1828 (Cambridge University Press, 2006)111.

[43] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 31.

[44] Balai Barui, *The salt Industry of Bengal 1757-1800; A Study in the Interaction of British Monopoly control and Indigenous Enterprise* (Calcutta, K.P. Bagchi, 1985).

পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোম্পানির আধিপত্য স্থাপিত হলে খালাড়ি [লবণ উৎপাদন ক্ষেত্র] থেকে নির্ধারিত ভূমিকর এবং পরিবহণ শুল্ক বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ লবণ রাজস্বের উৎস হয়ে উঠেছিল। ১৭৬২-তে খালাড়ি পিছু ৩০ টাকা এবং প্রতি ১০০ মণ উৎপাদিত লবণে ১০ টাকা বাড়তি কর আদায় করার হত।[45] চব্বিশ পরগণায় জমিদারদের সরিয়ে ইংরেজরা ঠিকাদারদের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন ও কারবার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলে জমিদার ও প্রোডাকশন মার্চেন্টরা যেমন ক্ষুব্ধ হয়, তেমনই এই ব্যবস্থা কোম্পানির কাছে আশানুরূপ হয় নি।

এই প্রাথমিক অসফল প্রচেষ্টার পর, ১৭৬৫-তে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি আদায়ের অধিকার পায় এবং ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির কর্মচারীরা 'Society of Trade' গঠন করে লবণের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করে। কিন্তু উইলিয়াম বোল্ট, আলেকজান্ডার ডাওয়ের মতো সমালোচকেরা ক্লাইভের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দুর্নীতি ও সামগ্রিকভাবে বাংলার আর্থিক দুর্গতি প্রসঙ্গে সমালোচনায় সরব হলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও চাপান-উতোর শুরু হয়।[46] তার পরিণামে কোম্পানির 'Court of Directors' প্রেরিত (১৭৬৭-র ২০ নভেম্বর) এক নির্দেশিকায় সোসাইটি অফ ট্রেডকে ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[47] কিন্তু অগ্রিম লবণ-চুক্তির শর্ত পূরণ করে সোসাইটির পুরোপুরি বিলুপ্তি ১৭৬৮-র অক্টোবরের আগে সম্ভব হয় নি।[48] ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যেমন পাঁচশালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন, তেমনই পাঁচ বছরের জন্য লবণ উৎপাদনের দায়িত্ব নিলাম করে ইজারাদারদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ইজারাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত লবণ নির্ধারিত দামে বিক্রি করার পাশাপাশি প্রতি ১০০ মণ লবণ পিছু ৩০ টাকা শুল্ক আদায় করা হত। কিন্তু লবণ উৎপাদক অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানি আধিকারিকদের ব্যাপক দুর্নীতির (যেমন, ঢাকার রিচার্ড বারওয়েলের রীতিমতো কুখ্যাতি ছিল) ফলশ্রুতিতে 'সল্ট মনোপলি'-র এই পঞ্চবার্ষিকী পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাও ১৭৭৭-এর পর পরিত্যক্ত হয়।[49] অন্যদিকে লবণ

---

[45] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 31.

[46] Nicholas B. Dirks, *The Scandal of Empire: India and the Creation of Imperial Britain* (New Delhi: Permanent Black, 2006), 56.

[47] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 31.

[48] Anonymous, *Monograph on Common Salt* (Calcutta: Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, 1930), 15.

[49] Ibid., 16-17, see also, A. M. Serajuddin, The Salt Monopoly of the East India Company's Government in Bengal, *Journal of the Economic and Social History of the Orient,* Vol. 21, No. 3 (Oct., 1978), 304-322.

উৎপাদক অঞ্চলের অধিকার কেড়ে নিয়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মাসোহারা দেওয়া হলেও তাদের ক্ষোভ দূরীভূত হয়নি। পরবর্তী দুই-তিন বছর বার্ষিক নিলাম ডেকে লবণ উৎপাদনের ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

১৭৮০ সালে চব্বিশ পরগণায় লবণ-উৎপাদনের ইজারা কেউ না নেওয়ায়, হেস্টিংস সরকারের তরফে একজন সল্ট এজেন্টকে নিযুক্ত করে, মলঙ্গিদের অগ্রিম অর্থ (দাদন) দিয়ে লবণ উৎপাদন করার ব্যবস্থা বলবৎ করেন। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য এই দ্রুত, সাময়িকভাবে গৃহীত পরিকল্পনাই 'Agency System'-এর ভিত তৈরি করেছিল। এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত এই 'এজেন্সি সিস্টেম' বলবৎ ছিল, যখন বিদেশি প্রতিযোগিতার মুখে দেশীয় লবণ শিল্পের অবক্ষয় ঘটে এবং এই ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে।[50] আমলা-নির্ভর এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ছয়টি সল্ট এজেন্সি গড়ে উঠেছিল— মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক, চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন, পূর্ববঙ্গের রায়মঙ্গল (যশোর), ভুলুয়া ও চট্টগ্রামে। চিরাচরিত দেশীয় শ্রমনির্ভর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের খরচ বিভিন্ন অঞ্চলে মণ পিছু আট থেকে চোদ্দ আনার মধ্যেই থাকত, আর বিক্রয়মূল্য ছিল ২ টাকা প্রতি মণ। বাংলার দেশীয় লবণ-রাজস্বের উৎসকে সুরক্ষিত করতেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদেশি লবণের আমদানিকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[51] 'এজেন্সি সিস্টেম'-এর প্রথম দিকে বড় ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করে যাবতীয় লবণ কোম্পানির গোলা থেকে কিনে নিজেদের গুদামজাত করে রাখতেন এবং কৃত্রিমভাবে বাজারে খুচরো নুনের দাম চড়া রেখে তা থেকে তারা প্রভূত ফায়দা লুটতেন। লবণ ব্যবসায়ীদের এই সাব-মনোপলি ভাঙার জন্য এবং লাভের অঙ্ক সরকারের ভাঁড়ারে আনতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ তিন মাস অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ নিলামে তুলে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারী ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কর্ণওয়ালিশের এই ব্যবস্থায় সরকার বাড়তি লাভের মুখ দেখলেও সাব-মনোপলিতে কোনো ছেদ ঘটেনি। এজেন্সি ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হলে, লবণ বাণিজ্য থেকে কোম্পানির প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ এতটাই বাড়ে যে তা ভূমি রাজস্বের পরেই সরকারের কোষাগারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস (প্রায় ১০ শতাংশ) হয়ে ওঠে। সাধে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর স্মৃতিকথায় বুক চিতিয়ে লবণ রাজস্ব নীতির সাফল্যকে এক বিদেশি রাজ্যের রক্তহীন বিজয়ের সাথে তুলনা করেছিলেন।[52] অষ্টাদশ শতকের বাংলায় সল্ট মনোপলি যে কোম্পানির আমলাদের অন্যতম দুর্নীতির কারণ হয়ে উঠেছিল তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ক্লাইভ ও

---

[50] A. M. Serajuddin, Ibid., 306.

[51] Bengal Revenue Consultations, I, 15 December, 1780 cited in Ibid., 307.

[52] W. Hastings, *Memoirs relative to the State of India* (London, 1786) 183-84, also cited in Ibid. 308.

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে স্পষ্ট হয়। উক্ত বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য উপনিবেশ সম্পর্কে তৎকালীন ব্রিটিশ ধারণাকে পরিবর্তিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল এবং উপনিবেশকে এক 'Civilizing Mission' হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল।[53] কোম্পানি শাসনকে সরিয়ে সাম্রাজ্য নিজ কর্তৃত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলায় সূচনা-পর্বের 'সল্ট মনোপলি' সহ নানাবিধ বিষয়ে বেলাগাম দুর্নীতির উৎপত্তিকে মুছে ফেলতে এবং ভারতে ব্রিটিশ উপস্থিতিকে বৈধ, যুক্তিসঙ্গত করে তুলতে তৎপর হয়েছিল। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে, সাম্রাজ্য যদি একদিকে স্বৈরাচারী শাসনের নিদর্শ রূপে লবণ সহ নানান পণ্যে মনোপলি কায়েম করে থাকে, তাহলে অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কে উপনিবেশকে সংযুক্ত করে পরিবর্তনের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৭-তে প্রথম চড়া হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করে (প্রতি ১০০ মণে ৩০০ সিক্কা রুপি) বেসরকারিভাবে বিদেশি লবণ বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়। এই সময়ে বাংলায় উৎপাদিত ও বিক্রীত লবণের পরিমাণ ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার মণের কাছাকাছি।[54] তার এক দশক পরেই কোম্পানির সল্ট মনোপলির সমালোচকরা আমদানি শুল্কের হার কমিয়ে ব্রিটিশ লবণের মুক্ত বাণিজ্যের [Free Trade] দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। মূলত বাংলার দেশীয় লবণের খারাপ গুণমান, চড়া দাম ও সরবরাহের অভাব ইত্যাদি অভিযোগ তুলে ধরে ও তার বিপরীতে ব্রিটিশ লবণের উৎকৃষ্টতা, কম দাম ও প্রভূত উৎপাদনের যুক্তি পেশ করে চেশায়ার-লিভারপুলের বণিকগোষ্ঠী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চাপ সৃষ্টি করেছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-র সমালোচনা করে লবণের মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে সরব হয়ে সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। 'মনোপলি' বনাম মুক্ত বাণিজ্যের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব কিভাবে উপনিবেশে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং উপনিবেশের প্রতিনিধি রামমোহনের বৌদ্ধিক মননে প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল তা লবণ সাক্ষ্যের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সূত্রে অনুধাবন করা যায়। বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে সেই প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

[53] See 'Tradition', and 'Empire' in Nicholas B. Dirks, *The Scandal of Empire*, 285-311,313-336.

[54] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 32. 260; Pramathanath Banerjea, *A History of Indian Taxation* (London: Macmillan1930).

ব্রিটিশ ভারতে লবণের যোগানের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য হাউস অফ কমনস নিয়োজিত সিলেক্ট কমিটির কিছু পরামর্শ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। মুক্ত বাণিজ্যের স্বার্থে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ধাপে ধাপে কমিয়ে, শেষপর্যন্ত দেশীয় লবণের জন্য প্রদত্ত শুল্কের হারেই বিদেশি লবণ আমদানির পথ প্রশস্ত হয়। যেমন, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যেমন মণ পিছু চার আনা কমানো হয়; ১৮৪৭-এ আরো চার আনা কমানো হয়; ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আবারো চার আনা কমালে আমদানি শুল্কের হার প্রতি মণ পিছু ২ টাকা ৮ আনাতে নেমে দাঁড়ায়।[55] ১৮৩৫ থেকে ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমদানিকৃত লবণের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিদেশি লবণের আমদানির বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশীয় লবণ উৎপাদন কমেছিল; ১৮৪৮-এ চব্বিশ পরগণা এবং ১৮৫২-তে চট্টগ্রামে লবণ উৎপাদন যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৮৫২ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত তিন বছর আবার বিদেশি লবণের আমদানিতে পড়তির ছবি দেখা গিয়েছিল। তাই ঘাটতি মেটাতে আবারো ১৮৫৩-তে চট্টগ্রামে এবং ১৮৫৫-তে চব্বিশ পরগণায় লবণ উৎপাদন শুরু হয়েছিল।[56] বিদেশি লবণের আমদানিতে হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথেই যে দেশীয় লবণ উৎপাদনের বিষয়টি সুতোয় ঝুলছিল তা এই পর্বে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৫৪ সালে সরকার জর্জ প্লাওডেনকে কমিশনার নিযুক্ত করে এক ‘সল্ট এনকোয়ারি কমিটি’ গঠন করে। লক্ষ্য ছিল, ভারতে লবণ উৎপাদন ও বিক্রয় যাতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে এবং উৎপাদিত লবণের ওপর শুল্ক আরোপ করেই যাতে সরকারের কোষাগারে অর্থাগম হয় তার পথ বাতলানো ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।[57] প্লাওডেন তাঁর রিপোর্টে (১৮৫৫- ’৫৬ সালে) উপকূলীয় অঞ্চলে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে লবণ উৎপাদনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। বাংলায় সেই সময়ের লবণ শুল্কের হার প্রতি মণ পিছু দুই টাকা আট আনা-কে বেশ চড়া এবং তা কমিয়ে প্রথমে দুই টাকা এবং পরে এক টাকা আট আনায় নামিয়ে আনা উচিত বলেও জানিয়েছিলেন।[58] কিন্তু মহাবিদ্রোহের পরে, প্লাওডেনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে লবণ শুল্ক বাড়িয়ে প্রতি মণ পিছু তিন টাকা ও পরে তিন টাকা চার আনা করা

---

55 Pramathanath Banerjea, ibid., 260-261.

56 Ibid.262.

57 Ibid. S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 32.

58 Plowden’s Report, 183-84, Cited in A. M. Serajuddin, The Salt Monopoly, 314.

হয়। স্থানীয় লবণ শিল্প ক্রমশ বিদেশি লবণের কাছে বাজার হারাতে থাকে এবং এই অসম প্রতিযোগিতা ও পক্ষপাতমূলক নীতির ফলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এজেন্সি সিস্টেম বিলুপ্ত হয়।

ব্রিটিশ রাজের সূচনাপর্বে 'সল্ট মনোপলি' প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমত, লবণের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর রাষ্ট্র কর ধার্য করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অবৈধভাবে তার উৎপাদন, কারবার ও ব্যবহারের প্রবণতা যে বেড়ে যায় তা স্বয়ং অ্যাডাম স্মিথ জানিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেনেই লবণের চোরাচালানের জন্য প্রতি বছর শত শত মানুষ কঠোর শাস্তি ভোগ করতেন এবং অনেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতেন। মানুষের জীবনে লবণের মতো অপরিহার্য দ্রব্যের ওপর রাষ্ট্রের কর আরোপ স্মিথ কোনোভাবে সমর্থন করেননি, আর তাই 'মনোপলি'-র কঠোরতম সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্রূপের সাথে জানিয়েছিলেন, "Those who consider the blood of the people as nothing in comparison with the revenue of the prince, may perhaps approve of this method of levying taxes."[59] দ্বিতীয়ত, মুক্ত বাণিজ্যের শর্ত চূড়ান্ত লঙ্ঘন করেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতে দেশীয় লবণ উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অন্যদিকে আমদানিকৃত লবণে ধার্য করই ব্রিটিশ রাজের প্রাথমিক পর্বে রাজস্বের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে সব্যসাচী ভট্টাচার্যর অভিমত ছিল যে, ব্রিটিশ রাজের পর্বে লবণ শুল্ক ছিল একমাত্র অপ্রত্যক্ষ কর যা ক্রমশ শোষণমূলক চরিত্র ধারণ করে এবং দরিদ্র ভারতীয়র জীবনে এক দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।[60]

ব্রিটিশ রাজের পর্ব: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

ভারতের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব যখন কোম্পনির থেকে ব্রিটিশ রাজ নিজের হাতে তুলে নেয়, তখন বিভিন্ন প্রদেশে লবণ শুল্কের হার বিভিন্ন ছিল। ১৮৫৯ সালে যেমন পাঞ্জাব, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রতি মণ পিছু লবণ শুল্ক ছিল ২ টাকা, আর বাংলায় তা ছিল সর্বোচ্চ ২ টাকা ৮ আনা। অন্যদিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে প্রতি মণ পিছু লবণ শুল্ক ছিল যথাক্রমে ১৪ আনা ও ১২ আনা। মহাবিদ্রোহের কারণে কোষাগারে ঘাটতি মেটাতে সরকার অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করলে বাংলায় তা ৮ আনা বেড়েছিল।[61] দেশজুড়ে লবণ করে

---

[59] Adam Smith, *The Wealth of Nations*, 855.

[60] Sabyasachi Bhattacharya, *The Financial Foundations of the British Raj: Ideas and Interests in the Reconstruction of the Indian Public Finance 1858-1872* (New Delhi: Orient Blackswan, 2005), 255.

[61] Pramathanath Banerjea, *A History of Indian Taxation*, 278-279.

সমতা আনার জন্য মুক্ত বাণিজ্য গোষ্ঠীর যেমন চাপ ছিল, তেমনই প্রাদেশিক ব্রিটিশ আমলারদের কাছেও এই বৈষম্য সমস্যাজনক ছিল। ১৮৬৮-তে মাদ্রাজে প্রতি মণ পিছু লবণ কর ১ টাকা ৮ আনা হলেও বাংলায় তা ছিল ৩ টাকা ৮ আনা। ১৮৬৮ সালে লর্ড লরেন্সের সরকার ভারত সচিবকে লবণ করে সমতা আনার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং সরকারি স্তরে বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা চলতেই থাকে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড লিটন সারা দেশ জুড়ে একই হারে লবণ কর ধার্য করেন এবং লবণ করে সমতা আনার প্রক্রিয়া ১৮৮২-তে লর্ড রিপনের কার্যকালে সম্পূর্ণ হয়।[62] বলাবাহুল্য যে, ১৯৪৭ পর্যন্ত এই 'সল্ট মনোপলি' অব্যাহত ছিল। ১৮৮১-'৮২ তে ব্রিটিশ ভারত জুড়ে লবণ শুল্ক প্রতি মণ পিছু ২ টাকা ৬ আনা নির্ধারিত হয়, আর বাংলায় সমুদ্রপথে আমদানিকৃত হওয়ার জন্য তা ২ টাকা ১৪ আনা করা হয়। ১৮৮৩-'৮৪ তে লবণের ব্যবহার যাতে বাড়ে সরকার সেজন্য প্রতি মণ পিছু করের হার কমিয়ে ২ টাকা ধার্য করে এবং বাংলাতে অতিরিক্ত ৬ আনা আরো কমানো হয়। বলাবাহুল্য পরের আর্থিক বছরের হিসেবে দেখা গেল লবণের ব্যবহার বেড়েছে এবং কোষাগারে বাড়তি অর্থাগম হয়েছে। ১৮৮৫-'৮৬ তে লবণ ব্যবহারে আকস্মিক কমতি দেখা গিয়েছিল, যদিও তা সাময়িক ছিল। ১৮৮৬-'৮৭তে তা আবার বেড়ে আগের অবস্থাতেই পৌঁছে গিয়েছিল।[63] ১৮৮৮-তে সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে ঘাটতি মেটানোর জন্য লবণ কর বাড়িয়ে প্রতি মণ পিছু ২ টাকা ৮ আনা করা হয়। ফিন্যান্স মেম্বার মি. ওয়েস্টল্যাণ্ড এই জন্য যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিলেন, কারণ সেই বছরে লবণ ব্যবহারের পরিমাণ কমে ছিল। ১৮৮৯-'৯০তে দেশের অন্যত্র লবণ ব্যবহারের পরিমাণ বাড়লেও বাংলায় পড়তির ছবিই লক্ষ্য করা যায়।[64] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লবণ করের হ্রাস-বৃদ্ধি যে লবণের চাহিদা, ব্যবহারে প্রভাব ফেলেছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। সরকার সামরিক-প্রশাসনিক সহ যেকোনো খাতে বাড়তি খরচের জন্য বা ঘাটতি মেটাতে লবণ কর বাড়ানোর ওপরেই নির্ভর করত। কিন্তু দরিদ্র মানুষের জীবনে, যারা কোনোমতে নুন-ভাত বা নুন-রুটি খেয়ে জীবনধারণ করতেন, লবণ কর বৃদ্ধির অভিঘাত কি ছিল তার হদিশ অবশ্য আর্থিক পরিসংখ্যান ভিত্তিক ইতিহাস তুলে ধরে না। উপকূলের লবণ উৎপাদকরা যারা লবণ শিল্পের বিলুপ্তিতে কাজ হারিয়েছিলেন তাদেরই বা কি প্রতিক্রিয়া ছিল- সেই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নীরবতা পরিলক্ষিত হয়। লবণের মতো সাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে সরকার করভার চাপানোয় মানুষের মধ্যে কি লবণের

[62] John Strachey, *India* (London: Kegan Paul, 1988)93-94.

[63] Pramathanath Banerjea, *A History of Indian Taxation*, 290-292.

[64] Ibid., 294-296.

অবৈধ উৎপাদন, কারবার ও ব্যবহার বেড়েছিল (ইয়োরোপে যে প্রবণতা অ্যাডাম স্মিথ তুলে ধরেছিলেন)। উল্লিখিত বিষয়গুলি লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনার এই গবেষণা প্রকল্পে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

বিশ শতকের সূচনা থেকে লবণ সত্যাগ্রহ

বিশ শতকের শুরুতে সরকারের আর্থিক অবস্থা উন্নত থাকায় লবণ কর হ্রাসের বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল। ১৯০৩-এ স্যার এডওয়ার্ড লরেন্স লবণ কর হ্রাসের প্রস্তাব করেছিলেন (তিনি অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, লবণ করে জনতার খুব সমস্যা হয় না, এবং মাথাপিছু এই কর অত্যন্ত নগণ্য)। সেই বছরে লবণ কর কমে মণ পিছু ২ টাকা ৮ আনা থেকে ২ টাকায় হয়েছিল। তার ফলে লবণের চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৫-এ স্বদেশি আন্দোলনের বছরে লবণ কর আরো আট আনা কমিয়ে দেড় টাকা হয় এবং তার জন্য সরকার ১ কোটি টাকারও বেশি রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করে। ১৯০৭ সালে লবণ কর আবারো কমিয়ে মণ পিছু ১ টাকা করা হয়।[65] করভার কমলেও নৈতিকতার প্রশ্নে 'সল্ট মনোপলি' ক্রমশ ভারতীয়দের কাছে সমালোচনা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের পর্বেই যেমন ব্রিটিশ লবণ সহ বিদেশি পণ্য বয়কটের আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৯০৫-৬ সালে বাংলার মোট চাহিদায় ব্রিটিশ লবণের অনুপাত যেখানে ৫৯ শতাংশ ছিল তা ১৯০৮-৯ সালে কমে ২৮ শতাংশে নেমে এসেছিল এবং কিছুটা বাজার পরে পুনরুদ্ধার করলেও ১৯১১-১২ সালে মাত্র ৩৭ শতাংশ ছিল।[66] ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৯০৫) এবং রাসবিহারী ঘোষ (১৯০৭) উভয়েই তাদের সমালোচনায় দরিদ্র মানুষের কাছে লবণ কর যে অসহনীয় বোঝা এবং লবণ করের সম্পূর্ণ বিলোপ ছাড়া তার কোনো সমাধান নেই বলে দাবি করেছিলেন।[67] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে ১৯১৬ সালে লবণ শুল্ক বাড়িয়ে প্রতি মণ ১ টাকা ৪ আনা করা হয়। যুদ্ধ অথবা চূড়ান্ত আর্থিক সংকটের জন্য সরকার লবণ যে কর সংরক্ষিত (financial reserve) করে রাখত তা এই কর বৃদ্ধির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ফিন্যান্স মেম্বার জানিয়েছিলেন। ১৯২২-'২৩ সালে সরকারের বিপুল আর্থিক ঘাটতি মেটাতে ম্যালকম হেইলী লবণ কর বাড়িয়ে মণ পিছু ২ টাকা ৮ আনা করার প্রস্তাব

[65] J. D. Rees, The Real India (London: Methuen, 1908)111; Also, ibid., 297-298.

[66] Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908* (New Delhi: People's Publishing House, 1973), 141.

[67] Proceedings of the Indian Legislative Council 1905 & 1907, cited in Pramathanath Banerjea, *A History of Indian Taxation*, 298-299.

দিয়েছিলেন। কিন্তু লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে এন. এম. যোশি, শেষাগিরি আয়ার সহ ভারতীয় প্রতিনিধিরা তীব্র প্রতিবাদ করেন। সরকার জোর করে এই বিল পাশ করানোর চেষ্টা করলে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি তাদের আসন থেকে প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। চাপের মুখে সরকার শেষপর্যন্ত মণ পিছু ১ টাকা ৪ আনার পুরোনো লবণ-রাজস্বের হারে ফিরে যায় [৩০০-৩০৬]।[68] লবণ শুল্ক অব্যাহত রাখার বিষয়টি ১৯২৬ সালে সরকার ‘Taxation Enquiry Committee’-র বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে কমিটির পেশ করা রিপোর্টে লবণ কর বিলোপ না হলেও ভারতকে লবণ উৎপাদনে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সরকারকে সুপারিশ করেছিল।[69] গান্ধীর ডান্ডি অভিমুখে নির্গত হওয়ার আগেই লবণের বিষয়টি অর্থনৈতিকভাবে যে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তা এই পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয়। কিন্তু গান্ধীর আহ্বানে দেশজুড়ে লবণ আইন অমান্যকে কেন্দ্র করে তীব্র, স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এই বৈপরীত্যের বাস্তবতা যথাযথ অনুধাবন করতে হলে অর্থনীতিকেন্দ্রিকতার সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করা উচিত। লবণ কিভাবে ব্যক্তি গান্ধীর মননে ও কর্মসূচিতে স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠেছিল এবং দেশবাসীই বা কেন গান্ধীর লবণ আইন অমান্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তা এই গবেষণার অন্যতম অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক পর্বে লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনার পটভূমি রূপে আমজনতার জীবনে লবণ বস্তুগত ব্যবহারের পাশাপাশি অন্য কি অর্থ বা তাৎপর্য বহন করত তা বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ।

।। ৩ ।।

ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজজীবনে লবণ

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে শুধু অত্যাবশ্যকীয় আহার্য উপাদান রূপেই নয়, বিশ্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ-সংস্কৃতিতে লবণ বহুমুখী প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। জন্ম-মৃত্যু, দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ, দৈববিচার, এমনকি অশুভ প্রকোপ দূর করার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও লবণের প্রয়োগ চোখে পড়ার মতো।[70] ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেও লবণ সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে

[68] Pramathanath Banerjea, ibid., 300-306.

[69] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 35.

[70] Ernest Jones, ‘The symbolic significance of salt in folklore and superstition’, in Ernest Jones, *Essays in Applied Psychoanalysis*, vol. 2 (London: Hogarth Press, 1951).

ঔপনিবেশিক পর্বে ইয়োরোপীয় বিবরণে লবণ কখনো ক্ষমতার দ্যোতক রূপে বর্ণিত হয়েছে, কখনো বা কুসংস্কারের নিদর্শ বলে গণ্য করে হিন্দু সমাজের হতশ্রী দশাকে তুলে ধরা হয়েছে।[71] ভারতীয় সমাজজীবনে লবণের গুরুত্ব বিশ্লেষণে ইয়োরোপীয়দের এই প্রয়াস অবশ্য পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই নির্ধারিত হয়। সিনক্লেয়ার স্টিভেনসনের গবেষণায় যেমন লবণকে কেন্দ্র করে ভারতীয় আচার-রীতি কুসংস্কার রূপে গণ্য হয়েছিল এবং ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক বলে বর্ণিত হয়েছিল। তবে তাঁর কাছে সভ্যতার অগ্রগতি ইয়োরোপীয় নিরিখে, বিশেষত খ্রীষ্টধর্মের মানদণ্ডে নির্ধারিত হয়েছিল। হিন্দুধর্ম ভারতীয়দের আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ এবং তার বিকল্প হিসেবে তিনি খ্রীষ্টধর্মের যে বিবেচনা করেছিলেন তার সেই পক্ষপাত গ্রন্থের (এ. এ. ম্যাকডোনেল লিখিত) মুখবন্ধেও স্পষ্ট। তাছাড়া তিনি নিজেই খ্রীষ্টধর্মীয় আইরিশ মিশনের সদস্য হয়ে ভারতে এসেছিলেন।[72] ঔপনিবেশিক ভারতের বহুস্তরীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে জাত-ধর্ম-বর্ণ সহ বিবিধ মাত্রার অনুষঙ্গে লবণ কিভাবে বিচিত্র প্রতীকী অর্থে, তাৎপর্যে প্রতিভাত হয় তা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

হিন্দু ধারণায় লবণ সকল বস্তুর শ্রেষ্ঠ। সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর সার বা 'অংশ' লবণে রয়েছে। তাই লবণকে অত্যন্ত মূল্যবান গণ্য করে গুজরাটে নববর্ষের প্রত্যূষেই সৌভাগ্য কামনায় লবণ কেনার রীতি ('Sabras') বহুপ্রচলিত।[73] লবণ 'দশ মহাদান'-এর অন্যতম, অর্থাৎ দশটি বস্তুর মধ্যে একটি যা মোক্ষ লাভের জন্য দান করা হয়। তাই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের হয়ে তার পরিবার বা নিকটাত্মীয়রা যে লবণ দান করতেন — গুজরাটে সেই রীতিও পরিলক্ষিত।[74] লিঙ্গায়তরা তাদের থালায় লবণের দানা রাখে না কারণ এটি একটি লিঙ্গের আকার ধারণ করে, এবং গুঁড়ো করা যায় না। কর্ণাটকে সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানে প্রথমে লবণ পরিবেশন করা উচিত কারণ শেষে পরিবেশন করলে তা অশুভ। গুজরাটে বিয়ের জন্য করা কেনাকাটার প্রথম জিনিস অবশ্যই লবণ হতে হবে। আবার দাক্ষিণাত্যে বিয়ের জন্য কেনাকাটায় মিষ্টি-তেল এর সাথে লবণকে সবশেষে কেনার রীতি ছিল।[75]

---

[71] See, 'The Power of Salt' in J. Abbott, *The Keys of Power;* Sinclair Stevenson, *The Rites of the Twice-born* (Oxford University Press, 1920).

[72] See 'Foreword' by A.A. Macdonell in Sinclair Stevenson, ibid, x-xi.

[73] Sinclair Stevenson, *The Rites*, 140, 200.

[74] Ibid., 140.

[75] J. Abbott, *The Keys of Power.*232.

ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, লবণ অশুভ আত্মা এবং কুনজরকে দূরে রাখে। বাংলার রাউটিয়া সম্প্রদায় কোনো অসুস্থ ব্যক্তির চারপাশে লবণ ও সরষের বীজ ছড়িয়ে অশুভ দৃষ্টিকে দূরে রাখে।[76] ভূত চতুর্দ্দশীর দিনে ভূত-প্রেত আসার সংস্কার বশত হিন্দু মহিলারা বাড়ির চৌকাঠ বা চৌরাস্তা লবণ দিয়ে দাগিয়ে দিতেন। উত্তর ভারতে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যে পবিত্র নিমগাছের কাঠের আগুনে যদি লবণ ও সরষে পোড়ানো হয় তাহলে সেই উৎকট গন্ধে অপদেবতা পালিয়ে যাবে।[77] কোল উপজাতির লোকেরা বিশ্বাস করে যে লবণ অপদেবতার বিরুদ্ধে কার্যকরী; মুখ্যত সেই কারণেই মৃতদেহ দাহ করার স্থানে তারা লবণ ছিটিয়ে দিত।[78] গুজরাতে ধর্মীয় ব্যক্তিদের মৃতদেহ বসিয়ে রাখা অবস্থায় লবণ দিয়ে সমাধিস্থ করা হত। কোনো কুষ্ঠরোগীর বা বসন্তে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে দাহ করা হত না, বরং শুইয়ে লবণ সহ সমাধিস্থ করার প্রথাও এখানে ছিল।[79] ‘লামানি’ সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে, বর-কনে দক্ষিণ দিকে রাখা গোবরের স্তূপের সামনে নীরবে গিয়ে মাথা নত করলে পুরোহিত সেই সময় তাদের মাথায় নুন ছড়িয়ে দিতেন অশুভ প্রকোপ যাতে দূরে থাকে। লিঙ্গায়তদের মধ্যে শিশুর জন্মের পর মায়ের খাটের চারটি পায়ায় লবণের পুটুলি বাঁধার প্রথা ছিল যাতে ভূতপ্রেত শিশুটির ক্ষতি করতে না পারে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে রাতের বেলা শ্মশানে গেলে নিজের সাথে নুন রাখা, অথবা দূরযাত্রায় শিশু সাথে থাকলে রাতে তার বালিশের নিচে নুন রেখে দেওয়া হত অশুভ প্রকোপ থেকে সুরক্ষার জন্য। রাতে যাত্রা শুরু করলে ভ্রমণকারীরা নিজেদের পাগড়ির ঝুঁটিতে নুন বেঁধে রাখতেন বলে জানা যায়। অশুভ আত্মার প্রকোপে ‘বালগ্রহ’ নামক অসুখে শিশুরা আক্রান্ত হলে তাদের প্রতিষেধক রূপে গলায় নুন আর ভেষজ ভরে একটি পুঁটলি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।[80]

লবণ যেহেতু রাজসিক, রজোগুণকে প্রবল করে তাই হিন্দুরা সময় বিশেষে তা স্পর্শ করতেন না। দীক্ষা-গ্রহণের অনুষ্ঠান, শোকপালনের পর্ব সহ বিভিন্ন সময়ে যখন দেহ-মনের আচারগত শুদ্ধতা কাম্য, তখন লবণ নিষিদ্ধ ছিল। গুজরাতিরা উপবাসের সময় সাধারণ লবণ গ্রহণ করতেন না।[81] তিন দিনের উপনয়ন

---

[76] William Crooke, Charms and Amulets (Indian) in Vol. III, James Hastings (ed.) *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (New York: Charles Scribner’s Sons, 1911), 444.

[77] Ibid., 442.

[78] See, ‘Death and Its Attendant Ceremonies’ in Walter G. Griffiths, *The Kol Tribe of Central India* (Calcutta: The Asiatic Society, 1946), 153, 155.

[79] Sinclair Stevenson, *The Rites.* 153, 200.

[80] J. Abbott, *The Keys of Power*, 233.

[81] Sinclair Stevenson, *The Rites.* 259, 289.

অনুষ্ঠানে, কঠোর নিয়ম মেনে চলা ব্রাহ্মণ সন্তানকে দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যায় লবণরহিত আহার্য গ্রহণ করতে হত। বিয়ের পর বিবাহিত নবদম্পতির তিন রাত্রি আলাদা ঘরে শয়ন করার পাশাপাশি লবণ রহিত আহার গ্রহণ করার রেওয়াজ ছিল।[82] কোল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী, বাসগৃহে কারোর মৃত্যু মৃত্যু হলে অশৌচের সময় পরিবারের সদস্যদের আহার্যে লবণ গ্রহণ করা উচিত নয়। মুখ্য অন্ত্যেষ্টিকারীর এক বছর পর্যন্ত লবণ খাওয়া উচিত নয়।[83] দেবী কালীর আরাধনার দিনগুলিতে কোল সম্প্রদায়ের মহিলারা পবিত্রতার চিহ্ন রূপে লবণ ছুঁয়ে দেখতেন না।[84]

ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজজীবনে লবণ একইসাথে জাত-পাত ভিত্তিক পরিচিতির ধারক ও বাহক। হারবার্ট রিজলের নৃতাত্ত্বিক বিবরণ থেকে লবণ উৎপাদক বিভিন্ন জাত ও উপজাতির বিবরণ মেলে; যদিও রিজলে বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদে বিশ্বাস করতেন এবং ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে জাতি বা 'Race' রূপে বিশ্লেষণ করেছিলেন।[85] বিহারের আদি জনজাতি বিন্দদের অনার্য গোষ্ঠী রূপে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে নুন তৈরির পেশাগত গোষ্ঠী রূপে নুনিয়াদের পৃথকভাবে নথিভুক্ত করেছিলেন। নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় রিজলে পূর্ববঙ্গের নদী-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিন্দদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বসতি লক্ষ্য করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে বিন্দদের তিনটি উপগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম ছিল নুন-বিন্দ যারা লবণ উৎপাদনের কাজ হারানোর পরে কবর খোঁড়ার কাজে নিযুক্ত হলে বিন্দদের মধ্যে সবচাইতে নিম্নতর গোষ্ঠী রূপে সামাজিকভাবে অবনমনের শিকার হয়েছিল।[86] কটকে চুলিয়ারা আদতে লবণ-জল ফোটানোর কাজ করতেন, আর চুলিয়া-মলঙ্গিরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে চুক্তি করে লবণ উৎপাদনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতেন। কটকে খাড়িয়ারা তাদের নাপিতের কাজ ছেড়ে লবণ উৎপাদনের পেশায় যোগ দিয়েছিলেন।[87] শুধু লবণের উৎপাদন নয়, লবণের ব্যবহার যে জাত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর পরিচিতির সাথে জড়িয়ে ছিল তা রিজলের বর্ণনাতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ভারতে শৈব সাধকদের মধ্যে আলুনা গোষ্ঠী ছিল, যারা আহারে লবণ গ্রহণ করতেন না। রাজবংশীদের মধ্যে মৃত্যুর একত্রিশ দিনের মাথায়

[82] Ibid., 38, 97-98.

[83] Walter G. Griffiths, *The Kol Tribe*, 122, 186.

[84] Ibid., 162.

[85] Thomas R. Trautmann, *Aryans and British India* (New Delhi Vistaar, 1997), 203.

[86] H.H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal* (Calcutta, 1891), 131,133.

[87] Ibid.,207, 93.

শ্রাদ্ধ করার রীতি ছিল এবং শোকপালনের পর্বে নুন গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। 'কামি'দের (কামার) মধ্যেও অনুরূপে এক মাস শোকপালনের সময় লবণ-হীন থাকতে হত।[88]

লবণ শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, সামাজিক মর্যাদা ও আচরণকেও প্রভাবিত করে। ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে লবণ-শপথ স্বাভাবিক বলেই গণ্য হত। যখন কোনো ক্রেতা পণ্যের ন্যায্য দাম দিয়েছে বলে দাবি করলেও বিক্রেতা অস্বীকার করত, তখন ক্রেতা লবণ ছুঁয়ে শপথ নিত। কোরাভা, ভিল, ঘট্টিভাদ্দর, ডোং-দাশারি এবং বেস্তারদের মতো আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও এই লবণ শপথ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতরা উভয়েই অপরিচিত অতিথিকে লবণ দিতেন, কারণ বদ অভিসন্ধি থাকলে সেই অতিথি নুন গ্রহণে অস্বীকার করবে এমন ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। 'নিমক হালাল' মানে 'কারোর নুনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা'; 'নিমক-খাভের' হলো যে নুন খায়, বিশ্বাসভাজন; 'নিমক হারাম' বোঝায় সেই ব্যক্তিকে যে নুন খেয়েও অবিশ্বাসের কাজ করে। বলাবাহুল্য যে, এই শব্দগুলিও ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বহু প্রচলিত ছিল।[89] ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনে লবণকে কেন্দ্র করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত থেকে এমনই বহুতর অর্থ, তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ লবণ কিভাবে সমষ্টিগত কল্পনায় লবণের প্রতীক হয়ে উঠেছিল তা বুঝতে হলে ভারতীয়দের প্রাত্যহিক জীবনে লবণ যে বহুতর অর্থে প্রতীয়মান ছিল তা অনুধাবন করা জরুরি।

।। ৪ ।।

খাদ্যপণ্য, রন্ধন ও গার্হস্থ্য-র ইতিহাস

ক্যাপিটাল-এ মার্কস জানিয়েছিলেন যে, পণ্য হলো বিনিময়ের জন্য উৎপাদিত দ্রব্য। যখন কোনো বস্তুর উৎপাদন বিনিময়ের মাধ্যমে ও বিনিময়ের জন্য সংগঠিত হয়, তখনই সেই বস্তু পণ্যের রূপ নেয়। বিনিময়ের মাধ্যমেই যাবতীয় পণ্য মূল্য প্রাপ্ত হয়। এই প্রেক্ষিত থেকে কোনো পণ্যকে বোঝার মূল চাবিকাঠি হলো শ্রম, শুধুমাত্র সেই পণ্যের ভোগ ও বিস্তার নয়। মার্কসের মতে, পণ্য যেহেতু বিনিময় সম্পর্কের অংশ, সেইজন্য পণ্য সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনায় তার উৎপাদনকে ঘিরে সামাজিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা উচিত।[90] দীর্ঘসময় ধরে পণ্যকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে মুখ্যত শ্রম এবং উৎপাদনের মতো

---

[88] Ibid., 16, 499, 395.

[89] J. Abbott, *The Keys of Power*, 237.

[90] K. Marx, *Capital: Vol. I. A Critical Analysis of Capitalist Production* (Moscow: Progress Publishers, 1971).

বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়ার চল ছিল।[91] ১৯৮০-এর দশকে পণ্যের সমাজবৈজ্ঞানিক চর্চায় পণ্যের ভোগের প্রক্রিয়া তথা পণ্যের ব্যবহার প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ উঠে আসে। মানুষ যেভাবে সামাজিক সত্তা হিসেবে নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, ঠিক তেমনই মানুষ পণ্য ভোগ করে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও পুনরুৎপাদনের জন্য, যা পণ্যকে তাদের ব্যবহারিক মূল্যমান প্রদান করে। পণ্য উৎপাদন বা ভোগের মতো প্রক্রিয়াগুলিকে প্রায়শই এমনভাবে পরীক্ষা করা হয় যেন সেগুলিকে স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ ও সমাধান করা যায়।[92] ১৯৮৬-তে অর্জুন আপ্পাদুরাইয়ের *The Social Life of Things* গ্রন্থটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যার যুক্তি এই গবেষণার অন্যতম উপজীব্য। আপ্পাদুরাইয়ের মতে, "Consumption is eminently social, relational and active rather than private, atomic, or passive."[93] ইগর কপটিয়ফের যুক্তিতেও পণ্যের সাংস্কৃতিক জীবনীর মধ্যেই নিজস্ব সামাজিক জীবন মূর্ত হয়, যা পণ্যের উৎপাদনের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে তার ব্যবহারের বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[94]

খাদ্যপণ্য

সামগ্রিকভাবে পণ্য সংক্রান্ত ধারণায় এই পরিবর্তনের পাশাপাশি বিগত কয়েক দশকে খাদ্যপণ্য নিয়ে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গবেষণা পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে, চিনি বা শর্করার সামাজিক ইতিহাসের কথা বলা যেতে পারে। ইয়োরোপের ক্যারিবিয়ান উপনিবেশে 'ক্রীতদাস' (slave) পণ্য রূপে উৎপাদিত চিনি কিভাবে বিরল বিলাসদ্রব্য থেকে আধুনিক জীবনের আবশ্যক ভোজ্য দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠলো এবং তা কিভাবে পুঁজিবাদ ও শিল্পের ইতিহাসের পরিবর্তনকে তুলে ধরে সেই প্রসঙ্গে পথিকৃৎ, নৃতাত্ত্বিক-ইতিহাসবিদ সিডনি মিন্টজের ধ্রুপদী *Sweetness and Power* (১৯৮৫) গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে।[95] মিন্টজ আরো জানিয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণির চিনিযুক্ত চা পানের অভ্যাস ক্যারিবিয়ান দাস প্রথার সংযুক্ত ছিল, যেখানে চিনির উৎপাদন হতো। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের চিনি উৎপাদক ক্রীতদাসেরা বা ব্রিটিশ শ্রমিকেরা অবশ্য

---

[91] D. Miller, Consumption and Commodities, *Annual review of Anthropology* Vol. 24, 1995,141-161.

[92] C. Lury, *Consumer Culture* (New Jersey: Rutgers University Press, 1996) 79.

[93] Arjun Appadurai edited, *The Social life of Things*, 31.

[94] Igor Kopytoff, "*The Cultural Biography of Things*".

[95] Sidney Mintz, *Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History* (New York: Viking-Penguin. 1985).

এই যোগসূত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।[96] স্টিভেন টোপিক একইভাবে কফি সম্পর্কে লিখেছেন যে, “গরীব দেশের বলিষ্ঠ কাঁধ ও ঘাম চীনের রুচিসম্মত ও ধনী দেশগুলোর পরিশীলিত স্বাদের জন্য উৎপাদন করছে”।[97] সিডনি মিন্টজের গবেষণার সূত্র ধরে ভারতে লবণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কয়েকটি স্বতন্ত্র মাত্রা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সাম্রাজ্যের চাহিদা মেটাতে ক্যারিবিয়ান উপনিবেশে চিনির মতো পণ্য চূড়ান্ত শ্রমিক শোষণের মধ্য দিয়ে উৎপাদিত হত। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যে উৎপাদিত লবণ ভারতীয় উপনিবেশে গিয়েছিল এবং শ্রমিকের লবণ উৎপাদনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ক্যারিবিয়ান চিনি উৎপাদক এবং ব্রিটিশ শ্রমিকের উৎপাদন ও ভোগের যোগসূত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কিন্তু ভারতের লবণ বাজার দখল করার জন্য ব্রিটিশ লবণ শ্রমিকেরা বণিকদের পাশে দাঁড়িয়ে মুক্ত বাণিজ্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ব্রিটিশ বিনিয়োগে উৎপাদিত চিনি শুদ্ধ ব্রিটিশ পণ্য রূপে গণ্য হয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মনোপলিতে ভারতে উৎপাদিত লবণ ‘অশুদ্ধ’ দাবি করে সাম্রাজ্যের মুক্ত বাণিজ্য গোষ্ঠী ব্রিটিশ লবণের শুদ্ধতা দাবি করেছিল; একইসাথে ভারতীয় উপনিবেশে পাল্টা ‘অশুদ্ধির’ অভিযোগে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। খাদ্যোপকরণের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে মিন্টজের গবেষণা যে পথ দেখিয়েছে সেই প্রেক্ষিত থেকে লবণের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। বিশ্ব-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানুষের ভোজ্য ও ভোগ্য বিবিধ আহার্য উপাদান বা উপকরণ নিয়ে গবেষণা-গ্রন্থ পরিলক্ষিত হলেও রন্ধনে, স্বাদের অন্যতম নির্ধারক উপকরণ রূপে লবণের গুরুত্ব সহকারে চর্চা কোনো অজ্ঞাত কারণে উপেক্ষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Reaktion Books এর বিখ্যাত Edible Series এর উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বিশ্ব-ইতিহাসের (Global History) প্রেক্ষিতে মানুষের আহার্য রন্ধন উপকরণ যথা তেল-মশলা, শাকসব্জী, শস্য সহ প্রায় সবকিছুর ওপরে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু এই সিরিজে এখনো পর্যন্ত লবণের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। অথচ রসায়নবিদ পিয়ের লাজলো বা সাংবাদিক মার্ক কুর্ল্যানস্কির লবণ সম্পর্কিত পর্যালোচনা থেকে লবণকে বিশ্ব-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি অনুভূত হয়।[98] রন্ধনের অন্যতম উপকরণ রূপে লবণের ভূমিকা পৃথক পর্যালোচনার দাবি রাখে।

---

[96] Ibid.

[97] Steven C. Topik, “Coffee” In Steven C. Topik, and Allen Wells, eds. *The Second Conquest of Latin America: Coffee, Henequen, and Oil during the Export Boom, 1850–1930* (Austin: University of Texas Press, 1998), 37.

[98] Pierre Laszlo, *Salt: Grain of Life*, Translated by Mary Beth Mader (New York: Columbia University Press,2001); Mark Kurlansky, *Salt: A World History* (UK: Vintage, 2003).

রন্ধন ও রসনা

বিশ শতকে খাদ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিকগুলিকে কেন্দ্র করে অ্যাকাডেমিক বিদ্যাচর্চার অন্যতম ক্ষেত্র রূপে রন্ধন-ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে রন্ধন-ইতিহাসের গবেষকরা মূলত রন্ধন-প্রণালী (recipe) এবং রান্নার বই (cook-book) বিশ্লেষণ করতেন। রন্ধন-প্রণালী এবং রান্নার বইয়ের পাশাপাশি পরবর্তীকালের গবেষকেরা খাদ্যের উৎপাদন, বন্টন এবং ব্যবহারের ধরণ অন্তর্ভুক্ত করে রন্ধন-ইতিহাসচর্চার পরিধিকে আরো প্রসারিত করেছেন। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতি সহ অন্যান্য বিষয়ের তাত্ত্বিক ধারণায় সমন্বিত হয়ে রন্ধন-ইতিহাস বর্তমানে এক আন্তর্বিষয়ক জ্ঞানচর্চায় পরিণত হয়েছে, যেখানে খাদ্যর পরিচিতি, অর্থনীতি এবং ক্ষমতা বিন্যাসকে বিবিধ মাত্রায় অনুধাবন ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত। রন্ধন-ইতিহাসের এই সাম্প্রতিক চর্চায়ও লবণের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কোনো পৃথক আলোচনা চোখে পড়ে না, আর লবণ-বিহীন আহারের প্রসঙ্গ তো ধর্তব্যেই আনা হয় না। ঔপনিবেশিক বঙ্গীয় প্রেক্ষিতে রচিত রন্ধনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও উপকরণ রূপে লবণ ভিন্ন স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরতে পারে।

সম্প্রতি রন্ধনশৈলীর ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির নির্মাণকে বোঝার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক গবেষণার যুক্তি হল, উনিশ শতক থেকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ফলশ্রুতিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত বিচিত্র নতুন রন্ধন অভিজ্ঞতাকে নিজস্ব আঙ্গিকে ‘দেশীয়করণ’ করেছিল এবং আত্মীকরণের এই প্রক্রিয়ায় সামাজিকভাবে রান্না এক ঐতিহ্যবাহী নারীসুলভ কর্ম রূপে এবং রান্নাঘর একটি পবিত্র স্থান হিসাবে কল্পিত হয়েছিল। রন্ধনের এই নান্দনিক রুচিবোধে - যার নানান পরতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চবর্ণীয় ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ জড়িত - ‘বাঙালিয়ানা’ অক্ষুণ্ণ রেখেই মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনে আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়।[99] বলাবাহুল্য যে, নুন-ভাবনার নিরিখে (যা রান্না তথা রসনা তৃপ্তির অন্যতম উপকরণ) এই ইতিহাসচর্চার কিছু মাত্রাকে পুনর্বিবেচনা করা যায়। প্রথমত, রন্ধনশৈলীকে কেন্দ্র করে বাঙালি মধ্যবিত্তের নান্দনিক বোধ খাদ্যসামগ্রী তথা জীবনযাত্রার নিরিখে ‘পর্যাপ্ত’ থেকে ‘প্রাচুর্য’ ধারণাকে তুলে ধরে। এই অফুরন্ত ভাবনায় প্রান্তিক বা প্রায় অদৃশ্য থাকে সেই দরিদ্র মানুষ যার নুন আনতে পান্তা ফুরোয় বা যারা বিনা নুনে ভাত খেয়ে দিন গুজরান করে। সামান্য নুনের নিরিখেই দৈন্যপীড়িত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে

[99] Utsa Ray, *Culinary Culture and in Colonial India, A Cosmopolitan Platter and the Middle Class*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

যে 'অপর্যাপ্ত' থেকে 'অনটনের' চূড়ান্ত বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় তা কিন্তু রন্ধনশৈলীর বাঙালিয়ানার মধ্যেই এক নান্দনিক প্রবঞ্চনাকে তুলে ধরে। দ্বিতীয়ত, শ্রেণি বৈষম্যে প্রতিভাত এই প্রবঞ্চনার মূল কারণ কিন্তু রন্ধনশৈলীর কেতাদুরস্ত ইতিহাসচর্চার মধ্যেই নিহিত, যেখানে Appetite বা আহারে রুচির বিষয়টি মুখ্য, কিন্তু Hunger বা বুভুক্ষার মৌলিক বিষয়টি নগণ্য বা অনুপস্থিত থাকে। দার্শনিক প্রবর অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর সংবেদী 'ভাতকাপড়ের ভাবনা'-য় স্পষ্টতই জানাচ্ছেন, 'Appetite আর Hunger এর প্রভেদ করতে পারলেই তবেই বাঁচবার জন্য খাওয়ার অতিরিক্ত রসাস্বাদনের জন্য ভোজন সম্ভব হয়'।[100] ক্ষুধার গ্রাসে দুমুঠো ভাতের সাথে নুনের অপরিসীম গুরুত্ব এখানেই, ন্যূনতম পৌষ্টিক চাহিদা মেটাতে এবং স্বাদ জোগাতে। গ্রাম বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ, যথা- 'নুন ছাড়া ভাত মাটি' বা 'দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে তিনগুণ', ইত্যদির মধ্যে এই বাস্তবতা ফুটে ওঠে।[101] তৃতীয়ত, নুন-ভাবনার নিরিখে বাঙালি মধ্যবিত্তর গার্হ্যস্থ্যের নান্দনিক নির্মাণের মাত্রাগুলিকেও পুনর্বিচার করা যায়। পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা তথা গার্হ্যস্থ্যের নান্দনিক ভাবনায় রন্ধন উপকরণ রূপে লবণ স্বতন্ত্র পর্যালোচনার দাবি রাখে।

বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনে লবণ

ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালির গার্হস্থ্য-ভাবনায় রান্নাকে গৃহকর্মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গণ্য করা হয়েছিল, কারণ তাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি ও রসনার পরিতৃপ্তিদায়ক খাবার প্রস্তুত হয়। বাঙালি গার্হস্থ্যর নান্দনিক ধারণায় রান্নাঘর এক পবিত্র পরিসর রূপে নির্মিত হয়েছিল, এবং রান্নাস্থল ও রান্নার উপকরণ, সরঞ্জাম সবকিছুই যেন যজ্ঞস্থল ও যজ্ঞের উপাদানের মতোই পূত, পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক ছিল।[102] হিন্দু বাঙালির গার্হস্থ্য পরিসরে আহার একইসাথে ধর্মীয় ও মানসিক তাৎপর্যে প্রতিভাত হয় এবং নারীর 'গৃহলক্ষ্মী' হয়ে ওঠার আবশ্যক দিক বলে গণ্য করা হয়েছিল। আহার্য উপাদান রূপে লবণের যথাযথ ব্যবহার 'গৃহলক্ষ্মী'-র গুণের অন্যতম নির্ধারক হয়ে উঠেছিল। 'অতি লবণ' স্বাদের আহার্য রজোগুণ সম্পন্ন এবং তাতে 'দুঃখ ও মনোবিকার সঞ্চার হয়', 'শারীরিক নানা প্রকার ব্যাধিও জন্মিয়া থাকে'; তাই আহারেও শাস্ত্র মেনে চলা

[100] অরিন্দম চক্রবর্তী, *ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস* (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৩), ৪১।

[101] সত্যরঞ্জন সেন, *প্রবাদ-রত্নাকর* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, ১৯৫৭), ৪৭৮, ৫৬২।

[102] Utsa Ray, *Culinary Culture*, 119.

‘গৃহলক্ষ্মী’-র অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য হয়েছিল।[103] বিদেশি পরিশোধিত লবণ অশুচিকর, তাই বৈধব্যের দশায় যথাযথ ব্রহ্মচর্য পালনে বিধবাকে সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করতে হত।[104] রান্নায় নুনের আধিক্য বা কমতি (আলুনি) সুস্বাস্থ্য ও রসনার পরিতৃপ্তিকে যেমন মাটি করতে পারে তেমনি তা গার্হস্থ্য অশান্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তরকারিতে নুন বেশি হলে যে রান্না মাটি হয়, বিশেষত খেতে বসার সময় তা বোঝা গেলে গৃহিণী যে ‘অনেক সময় অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন’ দীনেশচন্দ্র সেন তা ‘গৃহশ্রী’-তে তুলে ধরেছেন।[105] আর সেনের নিজের গৃহশ্রী তথা গৃহ-শান্তি যে রান্নায় লবণের আধিক্যের কারণে প্রায় গৃহ-যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল তা পরিহাসের মোড়কে তিনি পেশ করেছেন। তবে এই ক্ষেত্রে গৃহলক্ষ্মী নয়, গৃহ-ভৃত্য ওড়িয়া পাচক নিজের স্বাদজনিত লবণ-প্রীতি চরিতার্থ করতে সব ওজর আপত্তি উড়িয়ে, এমনকি শেষে বাড়ির মহিলাদের কড়া নজরদারি এড়িয়ে রান্নায় ধারাবাহিক ভাবে নুন দিত। ‘লবণসম্বন্ধে কার্পণ্য করিতে’ অস্বীকার করায় ওড়িয়া পাচককে যে সেন-গৃহে ‘কতরূপ-ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা এবং জরিমানা’ সহ্য করতে হয়েছিল তা দীনেশচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন। শেষে রান্নাঘর লবণ শূন্য করে আহারের সময় ব্যঞ্জনে লবণ মাখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বাড়ির অন্য চাকর-বাকরেরা এতটাই ‘বিদ্রোহী হইল যে’ ‘নমকহারাম’ শব্দের জুতসই ব্যঞ্জনাতে তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিশেষে, লবণের প্রতি বিশ্বস্ত তথা নমক হালাল ওড়িয়া পাচকটিকে, যে ‘অনেক অত্যাচার সহিয়াছিল’, তাকে বিতাড়িত করেই মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক দীনেশচন্দ্রর গৃহশ্রী ফিরেছিল।[106] স্বদেশি পর্বে তো দেশীয় না বিদেশি নুন খাবে তাই নিয়ে গার্হস্থ্য অশান্তির নজির খুব কম নেই। হাওড়ার শ্যামপুরে এক স্বদেশি যুবককে তার দাদা বিদেশি নুন খেতে জোরাজুরি করায় সে আত্মহত্যা করেছিল বলেই ১৯০৭-এর ৫ ডিসেম্বর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।[107] বাঙালি হিন্দু পরিবারের পাশাপাশি বাঙালি মুসলিম পরিবারেও রান্নায় নুনের তারতম্যের জন্য গার্হস্থ্য অশান্তির ঘটনা অহরহ ঘটত। সোনিয়া নিশাত আমিনের গবেষণা থেকে জানা যায় যে রান্নায় নুনের আধিক্য বা কমতির কারণে মুসলিম পরিবারে গার্হস্থ্য হিংসা ও

[103] গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরি, *গৃহলক্ষ্মী* দ্বিতীয় ভাগ (কলিকাতা, ১৩১১) ৯৯-১০০।

[104] Sister Nivedita, *The Web of Indian Life* (London, William Heinemann, 1906) 54; also cited in Tanika Sarkar, *Hindu wife, Hindu Nation*: *Community, Religion and Cultural Nationalism* (New Delhi: Permanent Black, 2003), 42.

[105] দীনেশচন্দ্র সেন, *গৃহশ্রী* (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৩০, নবম সংস্করণ), ৯৪-৯৫।

[106] তদেব, ৯৬।

[107] *Sri Sri Vishnupriya-o-Ananda bazar Patrika* December 5, 1907 (RNP (B) for week ending 14 December, 1907).

বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাও প্রায়শই পরিলক্ষিত হত। ১৯১৯-এ আল-ইসলাম পত্রিকা যেমন সখেদে জানিয়েছিল যে, "তরকারিতে বড্ড বেশি বা কম নুনের" জন্য মুসলিম পরিবারে স্বামীর স্ত্রী-কে প্রহার করা বা তালাক দেওয়ার ঘটনা সাধারণ চল হয়ে উঠেছে।[108] লবণ এক সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় উপাদান যার অভাব বা আধিক্যের মধ্য দিয়ে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন ও রন্ধন শৈলীর ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনা করা যায়। বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে অবশ্য বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন ও রন্ধন শৈলীর মাত্রা মূল বিবেচ্য নয়, কিন্তু তার রেশ নানা অনুষঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ঔপনিবেশিক পর্বে 'মনোপলি'-র প্রতিরোধ থেকে স্বরাজের প্রতীক রূপে লবণের রূপান্তরের অধ্যয়ন বিবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক মাত্রাতেই স্পষ্ট হয়।

।। ৫ ।।

গবেষণা-পদ্ধতি ও উপাদান

নুনের সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান কি হবে? বিশেষত, লেখ্যাগারের ট্রেড-রেভেনিউ রেকর্ডস থেকে অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখা যেখানে তুলনামূলকভাবে সহজ। গবেষণা-কর্মের শুরুতেই এই বিষয়টি উঠলে স্বভাবতই তা গবেষকের যাবতীয় উদ্যমে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে বিষয়টি যে খুব ভুল কিছু নয়, গবেষণা শুরু করার পরে তা বিলক্ষণ বোঝা যায়। কারণ, নুনের ইতিহাস তো মূলত আর্থিক-পরিসংখ্যান নির্ভর, রাষ্ট্রীয়-অর্থনীতি কেন্দ্রিক। হালফিলে পরিবেশগত প্রভাব বা শারীর বৃত্তীয় মাত্রায় লবণের ইতিহাস বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হলেও তা অর্থনৈতিক ইতিহাসের তাত্ত্বিক বেষ্টনীকেই মজবুত করেছে। তাই গবেষণার শুরুতে লেখ্যাগারে শুধুই থরে থরে বাণিজ্য-লবণকরের পরিসংখ্যান ভিত্তিক নথিপত্রে হোঁচট খেতে হয়। একসময় হতোদ্যম হয়ে পড়া আনকোরা গবেষককে টেনে তোলেন তাঁর পথপ্রদর্শক গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক। আগেভাগে ভেবে রাখা কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো নয়, বরং লেখ্যাগারই যে মুখ্যত গবেষণার পথ বাতলে দেবে ও প্রয়োজনে বাঁকবদল ঘটাবে তাতে গবেষককে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ও বিশ্বাস রাখতে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পরামর্শ যেন, ফ্রাঙ্ক অ্যাঙ্কারস্মিটের অমোঘ উক্তিকে সামান্য বদলে, বলা যেতে পারে: "I am recommending researchers [অ্যাঙ্কারস্মিথ লিখেছিলেন, historians] to trust, under such

[108] Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939* (Leiden: E. J. Brill, 1998), 125.

admittedly most unusual circumstances, themselves rather than Theory".[109] বলাবাহুল্য যে, লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনায় লেখ্যাগারই প্রথম থেকে শেষ অবধি ভরসা জোগায়, তবে উপাদান সংগ্রহে লেখ্যাগারিক পরিসরের বাইরেও যেতে হয়। উনিশ শতকে দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তির নথিপত্র যদি লেখ্যাগারে মেলে তাহলে আইন অমান্য আন্দোলন পরবর্তী দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বয়ান বা ব্যক্তিগত জিম্মায় থাকা কোম্পানির কাগজই মূল উপাদান হয়ে ওঠে। লবণের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে গবেষককে তাই দিল্লীর জনপথ স্থিত ন্যশনাল আর্কাইভ থেকে দাদনপাত্রবাড়ের মেঠোপথ ধরে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির পরিত্যক্ত কারখানার সামনে যেতে হয়। সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে পৌঁছলে বোঝা যায় নুন-মাটির ইতিহাস অন্যরকমের। কোম্পানি আমলে মাঝে মাঝে ঝড়-বৃষ্টি, বন্যার জলে খালাড়ি ডুবতো, তারপরেই উৎপাদক মলঙ্গিরা আবার নতুন করে সব সাজিয়ে তুলতো (বাংলার নুন উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক স্তরে 'সাজন' শব্দটিও রয়েছে, অন্য অর্থে)। নুনের সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় লিখতে হলে গবেষককেও প্রতিবারই শূন্য থেকে শুরু করতে হবে, আর ধৈর্য ধরে তিলে তিলে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। অনেকটা মলঙ্গিদের মতোই, যারা স্বেদ-রক্ত ঝরিয়ে শ্বেত লবণ কণিকা ধাপে ধাপে জমিয়ে স্তূপীকৃত করতেন। লবণের সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানে তাই বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসৃত হয়েছে, এবং সেই বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক কাঠামোর সাথে সাযুজ্য রেখে জ্ঞানচর্চার অন্যান্য শাখার তাত্ত্বিক ধারণাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশেষত, লবণের সামাজিক ইতিহাসের নানান মাত্রা- যথা, স্বাদ, গুণমানগত শুদ্ধতা, শুভ্রতায় প্রতিভাত পরিচ্ছন্নতা, ধর্মীয় শুচিতা ইত্যাদির পাশাপাশি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের - প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক ধারণাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পণ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধানই যেহেতু এখানে মুখ্য, তাই আন্তর্বিষয়ক পদ্ধতি (Interdisciplinary method) ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ এই গবেষণায় উপযোগী হয়েছে।

এই সন্দর্ভের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ও তার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অনুসন্ধানের উত্তর দিতে গিয়ে যে আর্কাইভটি গড়ে উঠেছে তা নানা দিশায় সম্প্রসারিত। লবণ কিভাবে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হয়ে উঠল তা বুঝতে গিয়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত রেভেনিউ রেকর্ডস ও পার্লামেন্টারি পেপারস-এর পাশাপাশি অষ্টাদশ থেকে বিশ শতকের ভারতীয় ও ব্রিটিশ সহ আন্তর্জাতিক লেখকদের গ্রন্থ,

[109] Frank Ankersmit, *Sublime Historical Experience* (Stanford: Stanford University Press, 2005) 283.

সংবাদপত্রগুলি প্রভূত তথ্য জুগিয়েছে। করভার জনিত লবণ বঞ্চনাকে ঘিরে সাধারণ ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ, এবং অবৈধ লবণ উৎপাদন করে উপকূলের গ্রামবাসীদের ধারাবাহিক লবণ আইন অমান্য প্রসঙ্গে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি, পুলিশি প্রতিবেদনই মুখ্য উপাদান হয়ে উঠেছে। উনিশ ও বিশ শতকের বহু সংবাদপত্র কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও সরকারি নজরদারির প্রতিবেদন 'রিপোর্ট অন নেটিভ পেপারস ইন বেঙ্গল' (১৮৭৬-১৯১৬) গুরুত্বপূর্ণ আকর হয়ে উঠেছে। স্বদেশি পর্বে লবণকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বহুমাত্রিকতা অনুধাবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে হোম পাবলিক ও হোম পলিটিক্যাল প্রসিডিংস থেকে আহৃত পুলিশ রিপোর্ট ও গোয়েন্দাদের গোপন প্রতিবেদন, বেঙ্গল কোডের মতো আইনি সংকলন। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ কেন্দ্রিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নানান মাত্রা অনুসন্ধানে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউ রেকর্ডস এবং রাজদ্রোহে অভিযুক্ত নিষিদ্ধ বাজেয়াপ্ত পুস্তকের (proscribed literature) পাশাপাশি গান্ধীর কালেক্টেড ওয়ার্কস এবং আশ্রমিক-অনুগামীদের তাঁকে লেখা চিঠি বা পরবর্তীকালের স্মৃতিকথা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। আইন অমান্য আন্দোলন পরবর্তী পর্বে লবণ প্রসঙ্গে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধানে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ডিবেটস-এর সংকলন ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগের বেসরকারি প্রয়াস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির নথিপত্র ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে প্রাতিষ্ঠানিক লেখ্যাগার ও গ্রন্থাগারের পাশাপাশি ই-আর্কাইভ ও ই-লাইব্রেরিগুলির ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে (বিশেষত কোভিড-১৯ অতিমারির সময় পর্ব থেকে)। লবণের সামাজিক ইতিহাস গবেষণায় ব্রিটিশ নিউজপেপার আর্কাইভ, ইন্টারনেট আর্কাইভের পাশাপাশি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস এর যৌথ উদ্যোগে ব্রিটিশ লাইব্রেরীর এনডেঞ্জারড আর্কাইভস প্রোগ্রাম এবং হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির ওপেন অ্যাকসেস রেপোজিটরি বহু দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছে। উনিশ শতকের ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলি ব্রিটিশ লাইব্রেরির 'দি ব্রিটিশ নিউজপেপার আর্কাইভ' থেকে গৃহীত হয়েছে।

।। ৬ ।।

অধ্যায় পরিকল্পনা

ঔপনিবেশিক বাংলায় 'মনোপলি'-র প্রতিরোধ থেকে স্বরাজের দ্যোতনায় লবণ কিভাবে মূর্ত হয়— সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেই রূপান্তরের অনুসন্ধান পাঁচটি অধ্যায়ে ক্রমবিন্যস্ত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

'লবণের আমরা-ওরা: দ্বন্দ্বে ও প্রতিদ্বন্দ্বে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ' শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে মূল আলোচ্য বিষয় হল- ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে দেশীয় লবণের 'অপর' রূপে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের উপস্থিতি কি তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল, এবং তার পরিণামে লবণ কিভাবে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বিদেশি লবণের গুণমানগত শুদ্ধতা, শুভ্রতা ও স্বাস্থ্যমানের নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কিভাবে উপনিবেশে জনরুচির স্বাতন্ত্র্য, দেশজ ঐতিহ্য, জাত-ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতি মাত্রাকে কেন্দ্র করে পাল্টা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল তা এখানে আলোচিত হয়েছে। বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক স্বার্থ ও মতাদর্শগত লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠায় উপনিবেশিত মানুষের আহার্যে ও জীবনে লবণের অপরিহার্যতার বিষয়টি কিভাবে গৌণ, প্রান্তিক হয়ে গিয়েছিল তা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়।

১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির অভিঘাতে দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তিকে অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় 'অবশিল্পায়নের' নিদর্শ রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু বাংলার জনজীবনে অবশিল্পায়নের অভিঘাত কি হয়েছিল, সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে তার বিবিধ মাত্রা **'স্বদেশি পূর্ব লবণ প্রতর্ক: নীতি ও রাজনীতি'** শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। ন্যূনতম নুন বাংলার গ্রামসমাজের স্বয়ম্ভরতায় ও সংস্থানে কি তাৎপর্য বহন করত; করভারের হ্রাসবৃদ্ধিতে নুন বাঙালি মধ্যবিত্তর জীবনে, ভোগের ধারণায় কি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল; জাতপাত ও ধর্মীয় সংস্কার সঞ্জাত মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিদেশি লবণ কি প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছিল; উৎপাদনের অধিকার হারানো মলঙ্গিদের জীবনে নুন কি প্রভাব ফেলেছিল, সর্বোপরি এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়াসমূহ কি কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল— এই অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। লবণকে কেন্দ্র করে বিশ শতকীয় স্বদেশি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও তার সামাজিক চরিত্রকে অনুধাবন করতে এই অধ্যয়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে লবণ বয়কটের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কিভাবে বিদেশি ও স্বদেশির পার্থক্য নির্ণীত হয়েছিল তা তৃতীয় অধ্যায় **'বয়কটের আহ্বান: স্বদেশি সমাজ ও লবণ-রাজনীতি'**-তে আলোচিত হয়েছে। বিদেশি লবণ বয়কটের কর্মসূচি কিভাবে কার্যকর হয়েছিল, সামাজিক বয়কটের রাজনীতির সাথে তা কিভাবে সংযুক্ত হয়েছিল, বিদেশি লবণে অশুচিতার ধারণাই বা কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবনের চেষ্ট করা হয়েছে। বিদেশি লবণ বয়কটের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত দরিদ্র, নিম্নজাতিভুক্ত ও মুসলিমদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সাধারণ মানুষের জীবনে নুনের অপরিহার্যতার দিকটি কি ভদ্রলোকের লবণ-রাজনীতিতে স্বীকৃত হয়েছিল, সর্বোপরি, স্বদেশি সমাজে 'দেশীয়' লবণ বলতে কি বোঝাত এবং তার উৎপাদনে কি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছিল তা এই অধ্যায়ে তলিয়ে দেখা হয়েছে। বিশ শতকে লবণকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এই অধ্যয়নের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়।

১৯৩০-এ লবণ আইন অমান্যের সূত্রেই গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে লবণ কিভাবে স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠল তা চতুর্থ অধ্যায় **'গান্ধী ও লবণ: স্বরাজের দ্যোতনা'** শীর্ষক অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। গান্ধীর রাজনৈতিক চেতনায় নুন কিভাবে জায়গা করে নিয়েছিল, গান্ধী এবং তার অনুগামীদের জীবনে নুন কি তাৎপর্য বহন করত, বিশেষত স্বাদ, সত্যাগ্রহ, ব্রহ্মচর্যে নুন কিভাবে সংযুক্ত বা সমন্বিত হয়েছিল, স্বরাজের প্রতীক রূপে জনতার কল্পনায় ও জল্পনায় লবণ কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সর্বোপরি, সত্যাগ্রহীদের উৎপাদিত লবণ কি সাম্রাজ্যিক 'অশুদ্ধি' তথা গুণমান নির্ণয়ের রাজনীতিকে অতিক্রম করতে পেরেছিল — এই প্রশ্নগুলিকে গভীরে তলিয়ে দেখা হয়েছে।

গান্ধীর পদযাত্রা এবং সত্যাগ্রহ কি ভারতের লবণাক্ত পরিসরকে সংযুক্ত হয়েছিল না কি না কি পূর্ববত, দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। ১৯৩০ কি সংযোগের মূহূর্ত, নাকি বিচ্ছিন্ন সময় মাত্র? বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে **লবণে স্বরাজ? আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে ও পরে বাংলার উপকূল** শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে। লবণ সত্যাগ্রহ বাংলার জনজীবনে কি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল, প্রান্তীয় উপকূলের 'অবৈধ' লবণ উৎপাদকরা কি সত্যাগ্রহ সূত্রে 'বৈধতা' প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সত্যাগ্রহে লবণ কিভাবে উৎপাদিত, বিক্রয় ও ব্যবহৃত হয়েছিল তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। সত্যাগ্রহের ফলশ্রুতিতে সরকারের লবণ নীতিতে কি কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল, ভারতীয়রা কি তাদের লবণ উৎপাদনের অধিকার ফিরে

পেয়েছিলেন, সর্বোপরি উপকূলীয় বাংলায় লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন কি ঘটেছিল সেই প্রসঙ্গসমূহে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। লবণের প্রতীকী ধারণা ও বস্তুগত বাস্তবিক ধারণার মধ্যে বেণীবন্ধন ঘটেছিল না ভিন্ন অভিমুখে গিয়েছিল তা এই আলোচনা সূত্রে অনুধাবন করা যায়।

।। ৭ ।।

বঙ্গীয় পটভূমি ও সময়পর্ব

'মনোপলি'-র প্রতিরোধ থেকে 'স্বরাজের' দ্যোতনায় লবণের রূপান্তরের সামাজিক ইতিহাস বঙ্গীয় পটভূমিতে বহুমাত্রিক ও আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক পর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-র সূচনা আঠারো শতকের বাংলায়। উনিশ শতকে কোম্পানির মনোপলির বিরোধিতা করে লিবেরাল, মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত সাক্ষ্যতে বাংলায় বিদেশি লিভারপুল লবণের বাণিজ্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের সূচনায় দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তি, এবং বিশ শতকে স্বদেশি আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লবণকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বহুস্তরীয় নিদর্শ বাংলায় পরিলক্ষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ 'সল্ট মনোপলি' কিভাবে বাংলার মানুষকে "লুণ্ঠন" করেছিল, উৎপাদনের অধিকার থেকে অনৈতিকভাবে বঞ্চিত করেছিল এবং বাংলার অর্থনীতি ধ্বংস করেছিল সেই প্রসঙ্গে গান্ধী স্বয়ং তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।[110] লবণ আইন অমান্যের পর্বেও তিনি জানিয়েছিলেন, যদি "বাংলা যথার্থ সাড়া দেয়, তবে তা অন্যান্য প্রতিটি প্রদেশকে নিষ্প্রভ করে দিতে পারে", কারণ 'স্বতঃস্ফূর্ত আত্মোৎসর্গের' নিদর্শে এই প্রদেশ 'অদ্বিতীয়'।[111] নিজ ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যেই বাংলা লবণের সামাজিক ইতিহাস গবেষণার অন্যতম পটভূমি হয়ে ওঠে।

এই অধ্যয়নের সূচনা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, যখন লিবেরাল মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক রাজা রামমোহন রায় উপনিবেশের প্রতিনিধি রূপে সিলেক্ট কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যে ভারতে ব্রিটিশ লবণের বাণিজ্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। লবণ বাণিজ্য সহ বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে সেই প্রথম কোনো বাঙালি তথা ভারতীয়র সাক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল। সর্বোপরি, ভারতীয়দের স্বার্থে তথা হিতার্থে

[110] "Salt Tax", Young India, 27 February, 1930, *CWMG*, Vol. 48, 349-351

[111] "A Survey", Young India, 17 April, 1930, *CWMG*, Vol. 49,114-116

ব্রিটিশ লিভারপুল লবণের মুক্ত বাণিজ্যের এই দাবি 'শাসিতের সম্মতি' আদায়ের (যা সাম্রাজ্যিক মতাদর্শগত ধারণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল) অন্যতম দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে অধ্যয়নের সমাপ্তিকাল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশিত হয়েছে। গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ স্বরাজের প্রতীক রূপে গণ্য হয়েছিল এবং এই প্রতীকী আন্দোলনের দাবিগুলি ছিল বাস্তবিক বস্তুগত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে — অর্থাৎ লবণের অবাধ উৎপাদন, কর বিলোপ ও আম-ভারতীয়র জীবনে প্রয়োজনীয় লবণের জোগান, ইত্যাদির নিরিখে। আইন অমান্য আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে উপকূলীয় মানুষের লবণ উৎপাদনের অধিকার, সরকারের লবণ নীতি, দেশীয় লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি প্রসঙ্গে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

লবণের আমরা-ওরা:
দ্বন্দ্বে-প্রতিদ্বন্দ্বে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ, এক বাঙালি ভদ্রলোক ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কমন্স সিলেক্ট কমিটির সামনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সিলেক্ট কমিটি সেই সময় কোম্পানির সনদ নবীকরণের আবেদন বিভিন্ন দিক থেকে খতিয়ে দেখছিল। তিনি কমিটিকে স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন যে, ইংল্যান্ড থেকে বিদেশি লবণ আমদানি হলে ভারতীয়রা খুশি হবেন; কারণ দেশীয় জনতা স্বল্প মূল্যে বিশুদ্ধ লবণ কিনতে পারবে। কিছু ব্রাহ্মণ হয়তো বিদেশি লবণে আপত্তি করবেন, কিন্তু জনতার রুচি ক্রমশ আধুনিক হয়ে ওঠায় লিভারপুল লবণ সাদরে গৃহীত হবে। গরিব লোকেরা, যারা কার্যত বেশি দামে নিম্নমানের ভেজাল দেশীয় লবণ কিনতে বাধ্য হয়, তারা যেমন লাভবান হবে তেমনই দেশীয় লবণ উৎপাদক মলঙ্গিরাও কোম্পানির শোষণ-নিপীড়ন থেকে রেহাই পাবে। মলঙ্গিদের কর্মহীনতা প্রসঙ্গেও তাঁর অভিমত ছিল যে, তারা কৃষিকাজে এবং অন্যান্য পেশায়, যথা- বাগানের মালী, বাড়ির চাকর ও দিনমজুরের কাজে নিযুক্ত হতে পারে। আর কোম্পানির একচেটিয়া লবণ কারবার ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকলে খালাড়িতে [লবণ উৎপাদনের স্থান] লবণ শ্রমিক হিসেবে তাদের একাংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।[1] সিলেক্ট কমিটির সামনে বাঙালি ভদ্রলোকের দেওয়া বয়ান অনুযায়ী, ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া লবণ কারবার যেন ব্যক্তিস্বাধীনতা, জনস্বাস্থ্য, পণ্যের গুণমান এবং মূল্য প্রভৃতির নিরিখে এক ক্ষতিকর শোষণমূলক চরিত্র পরিগ্রহ করেছিল।

উপনিবেশের 'প্রগতিশীল প্রতিনিধি' রূপে এই বাঙালি ভদ্রলোকের বয়ান তৎকালীন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ও সমাজজীবনে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছিল। যদি এই বাঙালি ব্যক্তিত্ব অকালে প্রয়াত না হতেন, তাহলে তিনি হয়তো প্রত্যক্ষ করতেন যে, তাঁর 'সল্ট মনোপলি' সংক্রান্ত মতামত আরো জোরালোভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ও জনজীবনে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে। বাংলার 'ক্ষতিকর ও নিষ্ঠুর' একচেটিয়া লবণ কারবারকে 'চমৎকারভাবে উদঘাটিত' করার জন্য সেই সময়ের ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি তাঁকেই

---

[1] Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly. Appendix No. 140, in *Minutes of Evidence taken before the Select Committee on the Affairs of the East India Company*, Vol. III: Revenue (House of Commons, 1832), 685-686.

কৃতিত্ব দিয়েছিল।[2] এই বৈগ্রহিক বাঙালি ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, প্রথম ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, সমাজ সংস্কারক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, যিনি সচেতনভাবে ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন সক্রিয়ভাবে ও প্রাগ্রসর ভাবনার অনুবর্তী হয়ে যুক্তিবাদী ধর্ম, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মুক্ত বাণিজ্য, সংসদীয় সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা, নারী মুক্তি, কুসংস্কার দূরীকরণ, এবং অমানবিক প্রথার বিলোপ ইত্যাদির যে দাবি জানিয়েছিলেন তা উনিশ শতকীয় ব্রিটেনের সংস্কারক ও মানবতাবাদীদের ভাবনা এবং কর্মকাণ্ডকে প্রতিচ্ছেদ করে; শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যের উভয় প্রান্তেই বহুজন তার শরিক ছিলেন। রামমোহনের আন্তর্জাতিক তারকা-খ্যাতির দর্পণে সেই সময়ের ভিক্টোরীয় ব্রিটেনের নির্মাণ প্রতিফলিত হয়।[3]

ঔপনিবেশিক ভারতে লবণের মতো পণ্যের ইতিহাস রচনায় রামমোহন প্রদত্ত সাক্ষ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্রাজ্যিক নীতি প্রণয়নে সেই প্রথম উপনিবেশের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো বাঙালি তথা ভারতীয়র প্রদত্ত তথ্য ও অভিমত সরাসরি ‘সাক্ষ্য’ রূপে গৃহীত হয়েছিল। উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক চরিত্রটি তলিয়ে দেখলে ভারতের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্য যে আদতে জ্ঞান বা তথ্যের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করার ক্ষমতা হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যায়। ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয়রা বহুবিধ জটিল ও যৌগিক তথ্য সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু ইয়োরোপীয়রা তা বিধিবদ্ধ করায় ও প্রচারের দায়িত্বে থাকায় কার্যত তাদের বয়ানই কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[4] রামমোহনের লবণ সাক্ষ্য, এই প্রেক্ষিত থেকে দেখলে, কিছুটা ব্যতিক্রমী মনে হতে পারে; কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং ইয়োরোপীয় কর্তৃত্বের ধারণাই এতে মান্যতা পেয়েছিল। অর্থাৎ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের বৃহৎ বাজারে ব্রিটিশ লিভারপুল লবণের মুক্ত বাণিজ্যের দাবি তুলে ধরে সাম্রাজ্যিক স্বার্থগোষ্ঠী যখন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তখন রামমোহনের সমর্থন নিঃসন্দেহে সেই দাবিকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল।

রামমোহনের অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত বয়ানও সেই সময় পরিলক্ষিত হয়, যখন সিলেক্ট কমিটিতে প্রদত্ত অন্যান্যদের লবণ সাক্ষ্যতে কোম্পানির ‘সল্ট মনোপলি’ জোরালোভাবে সমর্থিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিক অ্যান্ড্রু র‍্যামসের কথা বলা যায়, যিনি প্রায় ছয় বছর তমলুক ও

---

[2] *Sun* [London] 22 July, 1833; *Morning Post*, 9 January, 1834; *Sun* [London] 29 august, 1846; *Morning Herald*, 17 September, 1846.

[3] See ‘Introduction: the celebrated Rammohun Roy’, in Lynn Zastoupil, *Rammohun Roy and the making of Victorian Britain* (Palgrave Macmillan, 2010),1-8.

[4] Bernard Cohn, *Colonialism and its Forms of Knowledge* (Delhi: Oxford University Press, 1997), 16.

চব্বিশ পরগণার সল্ট এজেন্সিতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩০-এর ২৯ এপ্রিল, সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদানকালে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানান যে, ভারতীয় লবণ গুণগত মানে ব্রিটিশ লবণের চেয়ে 'অনেক উৎকৃষ্ট' ('far superior')। কিভাবে? ভারতীয় লবণ ব্রিটিশ লবণের মতো 'এত তেতো স্বাদের নয়' ('not so bitter') এবং 'খুব মিহি' ('very fine'); কেলাসিত দানার ইংরেজ লবণের মতো নয়! পরিশোধিত না হলেও একবার ফোটানো ভারতীয় লবণ ইংরেজ তথা যেকোনো ইয়োরোপীয় লবণের চেয়ে ভালো। একইসাথে তিনি জানান যে, মলঙ্গি শোষণ-নিপীড়নের বিষয়টি ভিত্তিহীন, লবণ উৎপাদনের পেশায় যোগদান বা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি তাদের স্বেচ্ছাধীন। কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-তে মলঙ্গিদের যেভাবে সহৃদয়তায় দেখা হয় এবং সযত্নে রাখা হয়, তা এই শ্রেণির শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না! অবাধ লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা চালু হলে ভারতীয়রা নিজেদের প্রয়োজনীয় নুন নিজেরাই তৈরি করবেন, আর তাই ব্রিটিশ তথা ইয়োরোপীয়দের কোনো মুক্ত বাণিজ্যের উদ্যোগ সাফল্যের মুখ দেখবে না বলেই র‍্যামসে দাবি করেছিলেন। ভারতীয়দের কাছে লিভারপুল লবণের গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে তিনি আরো জানিয়েছিলেন যে, উঁচু জাতের হিন্দুরা অনাহারে থাকবেন কিন্তু জাহাজে আসা বিদেশি লবণ মুখে তুলবেন না! ইয়োরোপীয়দের উৎপন্ন বা তাদের ছোঁয়া লবণ হিন্দুরা গ্রহণ করেন না।[5] এই বয়ান অনুসারে কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি' যেন ব্যক্তিস্বাধীনতা, জনস্বাস্থ্য, পণ্যের গুণমান ও মূল্যের নিরিখে এক উন্নত ও লাভজনক উদ্যোগে পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকে মুক্ত বাণিজ্যের হাওয়া যখন প্রবল তখন এই মতামত তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু এক শতক পরে র‍্যামসে সাহেব আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন যখন তাঁর লবণ-সাক্ষ্য তুলে ধরেই আইনসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরা বাংলায় দেশীয় লবণ উৎপাদনের দাবিতে সোচ্চার হবেন। যেমন, ১৯৩১ এর ২৬ শে জানুয়ারি, ইউনাইটেড প্রভিন্সের [দক্ষিণ, মুসলিম গ্রামীণ] প্রতিনিধি জিয়াউদ্দিন আহমেদ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে র‍্যামসে সাহেবের লবণ-সাক্ষ্য তুলে ধরে বাংলায় লবণ উৎপাদনের অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার জোরালো দাবি পেশ করেছিলেন।[6]

১৮৩০-এর দশকে লবণকে কেন্দ্র করে আমরা-ওরার এমনই এক জটিল দৃশ্যপট পরিলক্ষিত হয়, যখন বাংলার নিজস্ব দেশীয় লবণকেই বাঙালি রামমোহন সাম্রাজ্যিক দরবারে নেতিবাচক দৃষ্টিতে তুলে

[5] Report from the Select Committee of the House of Lords 1930, House of Commons, 8 July, 1830.

[6] Legislative Assembly Debates, (14 January to 18 February, 1931) Vol. I (Simla: Government of India Press, 1931), 211.

ধরেছিলেন আর বিদেশি ব্রিটিশ লবণকে স্বাগত জানিয়ে প্রায় আপন করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইংরেজ র‍্যামসে সাহেবের কাছে বিদেশ-বিভুঁই ছিল এই বাংলা যেখানে তিনি কর্মসূত্রে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যিক দরবারেই স্বদেশীয় ব্রিটিশ লবণকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছিলেন আর ভারতীয় উপনিবেশে উৎপাদিত লবণের উৎকর্ষতার সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ লবণ যে বাংলায় অশুদ্ধি তথা অশুচিতার ভিন্নতর সামাজিক-ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিরোধের মুখে পড়বে সেই দিকটিও তিনি তুলে ধরেছিলেন। এখানে আরো তাৎপর্যপূর্ণ হল, ভারতীয়দের আহার্যে তথা জীবনে লবণের অপরিসীম গুরুত্ব, যা রামমোহনের কথায় ‘an absolute necessary of life’, র‍্যামসে সাহেবের সাক্ষ্যেও পরোক্ষভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু তাঁদের উভয়ের বয়ান থেকে স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে, বাংলার দেশীয় লবণ মুখ্যত বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক স্বার্থ ও মতাদর্শগত লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল আর উপনিবেশিত মানুষের আহার্যে ও জীবনে লবণের অপরিহার্যতার বিষয়টি গৌণ, প্রান্তিক হয়ে গিয়েছিল। আর সেই সংঘাতের আবহে, সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের অসম সম্পর্কের নিরিখে, বাংলার লবণের গুণমান, মূল্য, তা জনস্বাস্থ্যের নিরিখে যথাযথ কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্ধারিত হয়েছিল।

রামমোহনের লবণ সাক্ষ্য নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও সেই ইতিহাসচর্চার অভিমুখ বৌদ্ধিক মতাদর্শগত বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় রামমোহন ‘আধুনিক ভারতের পিতা’ রূপে অভিহিত এবং তাঁর জীবন ও সামগ্রিক কর্মকান্ডকে জাতীয়তাবাদের উত্থানের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখার প্রবণতাই বিদ্যমান। সিলেক্ট কমিটিতে রামমোহনের সাক্ষ্যের নানান দিক – যেমন, ঔপনিবেশিক শাসনকে স্বাগত জানানো, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন, অবশিল্পায়ন প্রসঙ্গে নীরবতা ইত্যাদি - জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় গুরুত্ব সহ পর্যালোচিত হয় নি। লবণ সাক্ষ্যের বিশ্লেষণের তেমন প্রয়াসও চোখে পড়ে না।[7] অন্যদিকে মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চায় অবশ্য রামমোহনের লবণ সাক্ষ্য প্রসঙ্গে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের ধারা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫০-এর দশকেই যেমন এই সমালোচনার প্রাথমিক প্রয়াস চোখে পড়ে। কোম্পানি সরকার ও তার দেশীয় দালাল বুর্জোয়ারা লাভের লোভে ‘সল্ট মনোপলি’ গড়ে তুলেছিলেন এবং

[7] রামমোহন সম্পর্কিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: Hemchandra Sarkar, *Rammohun Roy: The father of Modern India* (Calcutta; Brahmo Mission Press, 1910; Satis Chandra Chakravarti edited, *The Father of Modern India*, (Calcutta: Rammohun Roy Centenary Committee, 1935); দিলীপ কুমার বিশ্বাস, *রামমোহন সমীক্ষা* (কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৮৩); B. C. Robertson, *Raja Rammohan Ray the Father of Modern India* (Delhi, Oxford University Press, 1995).

‘উভয় শ্রেণিতে সলা-পরামর্শ করে’ এই দেশীয় শিল্প ধ্বংস করে ইংল্যান্ড থেকে লবণ আমদানি করতে থাকেন— এমন সরলীকৃত যুক্তিই এখানে পেশ করা হয়েছিল। আর রামমোহন সিলেক্ট কমিটিতে লবণ শিল্প প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা ‘যে কোনো শ্রমজীবী মানুষকে ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ করে তলার পক্ষে যথেষ্ট’; রামমোহন ‘দেশীয় লবণ শিল্প ধ্বংসের দ্বিধাহীন সুপারিশ’ করেছিলেন এবং বেকার মলঙ্গিদের কর্মনিয়োগ সম্পর্কে ভুল মতামত জানিয়ে তাদের জীবন-জীবিকায় ‘মহাসর্বনাশ’ ডেকে এনেছিলেন। রামমোহনের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণামেই ‘বিরাট সৌভাগ্য উন্মুক্ত হয়ে গেল বিদেশি পুঁজিপতিদের সামনে এবং দেশীয় দালাল ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের সামনেও’।[8] ‘সল্ট মনোপলি’ থেকে মুক্ত বাণিজ্যের এই বিশ্লেষণে ‘শ্রেণি সমঝোতা’ সম্পর্কিত ধারণার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। তার পাশাপাশি ঐতিহাসিকের নৈর্ব্যক্তিকতা পরিহার করে রামমোহনের লবণ সাক্ষ্য প্রসঙ্গে ক্ষোভের সাথে এই সমালোচনায় আরো দাবি করা হয়েছিল যে, ‘এই বক্তব্য কোনো ভারতবাসীর পক্ষে উত্থাপন করা অসম্ভব’।[9]

১৯৭০-এর দশকে শ্রেণিগত ধারণার আরো সুসংবদ্ধ, কার্যকরী বিশ্লেষণের সূত্রে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা রামমোহনের অ্যাকাডেমিক পুনর্মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[10] মার্কসীয় এই পুনর্মূল্যায়নে যুক্তি তুলে ধরা হল যে, ঔপনিবেশিক ভারতে পশ্চিম ইয়োরোপের মতো বুর্জোয়া পুঁজিবাদী আধুনিক রূপান্তর ঘটে নি বরং তার পরিবর্তে ব্যাপক অবশিল্পায়ন, রাজস্ব-শোষণ, কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস, কৃষক বিদ্রোহ দমন এবং নব্য-সামন্তবাদী শ্রেণিবিন্যাস শক্তিশালী হয়েছিল। এহেন পশ্চাদগামী পরিস্থিতিতে রামমোহনের অর্থনৈতিক ভাবনার মধ্যে ব্রিটিশেরই এক ‘দুর্বল ও বিকৃত নকলনবিশী’ ছাড়া, মার্কসবাদী সমালোচনা অনুযায়ী, অন্য কোনো সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় না।[11] ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রেক্ষিতে রামমোহনের লিবেরাল মুক্ত বাণিজ্যের ধারণাও তাই একরকম অদূরদর্শী, অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক বলেই সমালোচিত হয়েছিল।[12] এই যুক্তিক্রমেই রামমোহনের লবণ সাক্ষ্যের পর্যালোচনাও চোখে পড়ে। শিল্পশ্রমিকদের [যেমন- সুতা কাটুনি ও তাঁতি]

---

[8] এবাদত্ হোসেন, *মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন* (কলকাতা : সপ্তর্ষি, ১৯৫৬) ১৫২-১৫৩।

[9] তদেব, ১৫২।

[10] Sumit Sarkar, “Rammohun Roy and the Break with the Past’, Asok Sen, ‘The Bengal Economy and Rammohun Roy’, in Joshi, P. V. (ed.) *Rammohan Roy and the Process of Modernization in India* (Delhi: Vikas, 1975).

[11] Sumit Sarkar, Ibid., 47, 63.

[12] রামমোহনের মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্কিত ধারণাকে অধ্যাপক সরকার নস্যাৎ করেছেন: The utter absurdity of this illusion is very obvious today. Ibid., 62.

কর্মহীনতা প্রসঙ্গে রামমোহন নীরব থাকলেও লবণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে অন্যান্য কাজে নিয়োগের সম্ভাবনা তিনি তুলে ধরেছিলেন তা এখানে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। এই পুনর্মূল্যায়নবাদী মার্কসীয় যুক্তি অনুযায়ী, কোম্পানির মনোপলিতে লবণ শ্রমিকদের দুর্দশার কথা ভেবে এবং বিদেশি লবণ সস্তা হলে ক্রেতাদের খানিক সুরাহা হবে এমন ধারণাকে অগ্রাধিকার দিয়েই রামমোহন লবণ সাক্ষ্য পেশ করেছিলেন।[13]

সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় অবশ্য উনিশ শতকীয় বিশ্বজনীন লিবেরাল মতবাদের বৌদ্ধিক প্রবাহে রামমোহনের ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়াস চোখে পড়ে।[14] শিল্প বিপ্লব প্রসূত এক ধারণা ও নতুন এক নৈতিক চেতনা রূপে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ব্রিটেনে লিবেরাল মতবাদের উত্থান হয় এবং উনিশ শতক জুড়ে লিবেরাল ধারণা ব্রিটিশ সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল।[15] উপনিবেশে এই লিবেরাল মতবাদের ঢেউ কিভাবে এসে পৌঁছেছিল? উনিশ শতকের শুরুতে দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনের ফলে বাংলার আঞ্চলিক অর্থনীতি বিশ্বজুড়ে পণ্যবাণিজ্যের প্রবাহে সংযুক্ত হয়েছিল। বিশ্বজনীন পণ্য সঞ্চালনের পাশাপাশি ভাবনার সঞ্চরণ সূত্রে রামমোহনের মতো অগ্রণী বাঙালি বুদ্ধিজীবী লিবেরাল মতবাদকে আপন করে নিয়েছিলেন।[16] রামমোহনের রাজনৈতিক লিবেরাল মতবাদ অবশ্য শুধু ব্রিটেন নয়, তার পাশাপাশি ইয়োরোপ ও আমেরিকার লিবেরাল তত্ত্ব-মতাদর্শ-আন্দোলনের উপাদান থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে পুষ্ট হয়েছিল। তবে লিবেরাল তত্ত্বে নিহিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির অধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মুক্ত বাণিজ্য, একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের বিরোধিতার ধারণাই রামমোহনের রাজনৈতিক ভাবনা ও কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।[17] এই যুক্তিক্রম অনুসারে কোম্পানির একচেটিয়া লবণ কারবারের বিরোধিতা এবং ব্রিটিশ লবণের মুক্ত বাণিজ্যের যে দাবি রামমোহন সিলেক্ট কমিটিতে পেশ করেছিলেন তার মধ্যে লিবেরাল রাজনৈতিক মতাদর্শের ভাবনা স্পষ্ট।

---

[13] Asok Sen, 'The Bengal Economy', 128.

[14] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্য দেখুন, C. A. Bayly, "Rammohun Roy and the Advent of Constitutional Liberalism in India, 1800-1830", *Modern Intellectual History*, 4:1, 2007, 25-41; Andrew Sartori, *Bengal in Global Concept History: Globalism in the age of Capital* (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 71.

[15] Thomas Metcalf, *Ideologies of the Raj* (New Delhi: Cambridge University Press, 1998), 28.

[16] See chapter three "Bengali Liberalism and British Empire" in Andrew Sartori, *Bengal in Global Concept*, 68-107.

[17] 'আবার রামমোহন' ও 'বাঙালি সংস্কৃতির বিশ্বজনীন ইতিহাস' প্রবন্ধদ্বয়ে এই প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *জনপ্রতিনিধি* (কলকাতা অনুষ্টুপ, ২০১৩), ৫১-৫৩, ৫৭।

অন্যদিকে লিবেরাল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনে বিশ্বাসী সাম্রাজ্যই যে উনিশ শতকে উপনিবেশ জুড়ে চরম স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিল সেই দ্বিমুখী পরিণামের দিকটিও এখানে খেয়াল করা জরুরি। এই বৈপরীত্যের কারণ হিসেবে বলা যায় যে, লিবেরাল মতবাদে 'ব্যক্তি-নাগরিক' স্বীকৃতি পেলেও সাম্রাজ্যিক ধারণাতে উপনিবেশের পশ্চাদপর মানুষ [কিপলিংয়ের ভাষায়, যারা 'half devil and half child' এবং শ্বেতাঙ্গ মানুষের বোঝা] সেই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য ছিল না।[18] বরং তার বদলে উপনিবেশিত প্রজাদের নতুন বাণিজ্যিক বিনিময়ের জগতে ঢুকিয়ে দেওয়া হলে তারা 'হোমো ইকোনমিকাস' বা বাজার চালিত অর্থনীতির মানুষ হয়ে উঠবে।[19] লিবেরাল মতবাদের নিরিখে সাম্রাজ্য যে উপনিবেশে সম্পদ, জনগণ, এবং শৃঙ্খলার মধ্যে একটা নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছিল তা বললে ভুল হবে না। ঐতিহাসিক মহলে অব্যাহত এমনই প্রাণবন্ত বিতর্কের ধারায় রামমোহনের লবণ সাক্ষ্য বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই বিশ্লেষণ-প্রয়াসে ইতিহাসবিদদের কাছে লবণ নয়, রামমোহনের মতাদর্শগত বৌদ্ধিক মননই গুরুত্বে প্রতিভাত হয়।

অথচ উনিশ শতকে সাম্রাজ্যিক উদারনৈতিক বয়ানে বাংলার লবণ গুণমানে 'নিকৃষ্ট', 'ভেজাল' মিশ্রিত, এবং 'কাদাটে' বা 'কালো' রংয়ের জন্য সমালোচিত হয়েছিল। দেশীয় লবণের সমালোচনার এই মানদণ্ডটি নির্ধারিত হয়েছিল ব্রিটিশ লিভারপুল লবণের গুণমাণগত উৎকৃষ্টতা, বিশুদ্ধতা, এবং শ্বেত বর্ণের নিরিখে। পারস্পরিক পার্থক্য নিরূপণ ও সেইসূত্রে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের এই বয়ানে ব্রিটিশ লবণ ও বাংলার লবণ এক দ্বিকোটিক বৈপরীত্যমূলক (Binary Opposite) অবস্থানে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা যায় তেমনই উপনিবেশের ওপর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি স্পষ্ট হয়।[20] উনিশ শতকে মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে লিভারপুল লবণের স্বার্থগোষ্ঠী - ব্রিটিশ বণিক, সাংসদ ও সংবাদপত্র - কিভাবে বাংলার দেশীয় লবণকে উপনিবেশের নিকৃষ্ট 'অপর' পণ্য রূপে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছিল তার প্রাথমিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই এই অধ্যায়ের সূচনা। মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে ব্রিটিশ বণিক ও বণিকসভার কার্যকলাপ, বিশেষত সংসদে তাঁদের চাপ সৃষ্টি করার কৌশল এবং সাংসদদের সাথে বোঝাপড়া

---

[18] Uday Singh Mehta, *Liberalism and Empire: A Study in Nineteenth-Century British Liberal Thought* (Chicago: The University of Chicago Press, 1999).

[19] U. Kalpagam Colonial governmentality and the 'economy', *Economy and Society*, 29: 3, (August, 2000), 418-438 [420].

[20] এমনই সহজাত পার্থক্যে কেন্দ্র/প্রান্ত; ঔপনিবেশিক/ উপনিবেশিত; সভ্য/আদিম, অগ্রসর/পশ্চাদপর প্রভৃতি অবস্থানকে তুলে ধরা যায় যা আদতে এক হিংসাশ্রয়ী ক্রমোচ্চতায় বিন্যস্ত।

তথা লবণ-লবির রাজনৈতিক মাত্রাগুলিকে অনুধাবন করা এই পর্যালোচনার অন্যতম লক্ষ্য। তার পাশাপাশি লবণ-বণিকদের স্বার্থে ব্রিটেনে জনমত গড়ে তুলতে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি কিভাবে এক প্রচার-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তা সম্যকভাবে বোঝার প্রয়াসও এখানে রয়েছে। লবণকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যিক স্বার্থগোষ্ঠী তাদের প্রচারে ব্রিটিশ লবণের নির্ভেজাল বিশুদ্ধতা এবং বাংলার লবণের ভেজাল মিশ্রিত অশুদ্ধতার ধারণাই জোরালোভাবে তুলে ধরেছিল। এই অভিযোগ কিছু মাত্রায় সঠিক হলেও তা একাধিক প্রশ্নকে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেমন, উনিশ শতকে লবণে ভেজাল, অশুদ্ধতার অভিযোগ কি শুধু ভারতেই পরিলক্ষিত হয়? ব্রিটেন বা শিল্পোন্নত ইয়োরোপের বাজারে কি শুধুই শুদ্ধ, নির্ভেজাল নুন পাওয়া যেত? সর্বোপরি লবণের শুদ্ধতা কিভাবে নির্ধারিত হত এবং তার নিয়ামক কে বা কারা ছিল? বর্তমান অধ্যায়ে এই প্রশ্নগুলিকে যথোচিত গুরুত্বে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতীয় নুনে ভেজালের অভিযোগ যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং, তা কিভাবে তৎকালীন ব্রিটেন তথা ইয়োরোপ জুড়ে খাদ্যপণ্যের ভেজালকে ঘিরে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্য উদ্বেগের অংশ হয়ে উঠেছিল তা এই আলোচনায় পরিস্ফূট হয়। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণের তাগিদে কিভাবে লবণের অশুদ্ধি তথা ভেজাল চিহ্নিতকরণের রাজনীতি সাম্রাজ্য কর্তৃক উপনিবেশে প্রযুক্ত হয়েছিল তার বিশ্লেষণও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

উনিশ শতকের উদারনৈতিক মুক্ত বাণিজ্যিক বয়ানে লবণকে বর্ণগত নিরিখে 'অপরিচ্ছন্ন' বলে চিহ্নিত করার সাম্রাজ্যিক প্রচার-প্রয়াসও অব্যাহত ছিল। এক্ষেত্রেও বাংলা তথা ভারতের লবণকে একতরফা ভাবে পরিচ্ছন্ন ব্রিটিশ শুভ্রতার মানদণ্ডে অপরিচ্ছন্ন কৃষ্ণতায় দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। সাদা লবণ বনাম কালো লবণের এই বর্ণবাদী বিভাজনের মধ্য দিয়ে কিভাবে উপনিবেশিত পণ্যের ওপরে সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের ধারণাকে বৈধ ও স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল তা এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। লবণের বর্ণ কেন্দ্রিক এই বয়ান অবশ্য বাংলাতে নিরঙ্কুশ নয়; বরং কিভাবে জনরুচির স্বাতন্ত্র্য, দেশজ ঐতিহ্য, জাত-ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতি মাত্রাকে কেন্দ্র করে পাল্টা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল তার বিশ্লেষণ এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্রিটেন যদি বাংলার লবণকে অশুদ্ধ 'অপর' রূপে তুলে ধরে তাহলে উপনিবেশের অশুদ্ধতার ভিন্নতর ধারণায় – অশুচিতার প্রশ্নে - লিভারপুল লবণের পাল্টা 'অপরীকরণ'ও পরিলক্ষিত হয়। লবণকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের দ্বন্দ্বে ও প্রতিদ্বন্দ্বে জাত-পাত, ধর্মীয় মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে এই সামাজিক প্রতিরোধের বয়ান নির্মিত হয়েছিল। বিদেশি লবণকে কেন্দ্র করে জাত-ধর্মনাশের মহাভীতি কিভাবে

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে গণ-উন্মত্ততার রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং তার মধ্যে কিভাবে লবণের প্রতি বিশ্বস্ততা (নমক হালাল) ও বিশ্বাসভঙ্গের (নমক হারাম) দ্বৈততা প্রতিভাত হয় তা এই অধ্যায়ের অন্যতম প্রতিপাদ্য। লবণ যদি একাধারে সিপাহিদের নির্ভরতা এবং আনুগত্যের প্রতীক হয়ে থাকে, তাহলে বিদেশি শাসক ইচ্ছাকৃতভাবে, বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রতারণামূলক পন্থায় দূষণ ও ধর্মান্তরের মাধ্যমে সেই লবণকেই সম্পূর্ণ দাসত্বের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে— এমন ধারণাই মহাবিদ্রোহের পর্বে বিদ্রোহী সিপাহিদের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল। সাধারণ লবণ সময়বিশেষে কিভাবে শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে প্রেক্ষিতে তা আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিদেশি লবণে অশুদ্ধি তথা অশুচিতার অভিযোগ বাস্তবিক কতটা সত্যি ছিল বা এই অভিযোগের আদত উৎস কি ছিল সেই প্রসঙ্গের পর্যালোচনাতেই এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। লিভারপুল লবণের উৎপাদন ও পরিশোধন পদ্ধতির ঐতিহ্যেই এর উত্তর নিহিত রয়েছে। সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক তাগিদে অবশ্য সেই ঐতিহ্যের বদলে কিভাবে উপনিবেশের সামনে লিভারপুল লবণের এক পরিশোধিত অতীত তুলে ধরা হয়েছিল তা এই পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গুণমানগত শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা নির্ণয়ের এই যুক্তিসমূহ অবশ্য সাম্রাজ্যিক বয়ানের পক্ষপাতকে তুলে ধরে, কারণ এই বয়ানে স্থানীয় স্তরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অনুসারে লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীলতা অস্বীকৃত হয়েছিল। পণ্যের সামাজিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য কিভাবে নিজের সর্বগ্রাসী স্বার্থে উপনিবেশের স্থানীয় পণ্য ও তার উৎপাদককে বিপন্ন করে তুলেছিল একদিকে তা যেমন অনুধাবন করা যায়, তেমনই 'স্থানীয়' জনরুচি, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে উপনিবেশ কিভাবে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ তৈরি করেছিল তার প্রেক্ষিতটিও প্রতীয়মান হয়।

।।১।।

মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে ব্রিটিশ লবণ: সাম্রাজ্যিক স্বার্থ-গোষ্ঠীর ভূমিকা

ব্রিটিশ বণিক ও বণিকসভা

উনিশ শতকের শুরু থেকেই, বিশেষত ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী বছরগুলিতে, ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রাদেশিক শহরগুলির লবণ উৎপাদক বণিক গোষ্ঠী কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-র বিলোপ ও মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে প্রভাব ও তৎপরতা দেখিয়েছিল তা একইসাথে এক গুরুত্বপূর্ণ

পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ব্রিটেনের জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে লণ্ডনের যে চিরাচরিত অপ্রতিহত গুরুত্ব ছিল, তার প্রেক্ষিতে প্রাদেশিক শহরগুলির উত্থান যেন এক পর্বান্তরকে সূচিত করে।[21] উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ভারত ও সুদূর প্রাচ্য সহ বিশ্ব বাজারে বাণিজ্যিক অধিকার সম্প্রসারণ এবং কোম্পানির শাসনাধিকারের পূর্ণ বিলুপ্তির দাবিতে ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, বার্মিংহাম, এক্সেটার, গ্লাসগো ও শেফিল্ডের মতো প্রাদেশিক শহরগুলো নিজেদের 'লবির' মাধ্যমে পার্লামেন্টে চূড়ান্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।[22] লিভারপুল যাতে সাম্রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যিক বন্দর হয়ে ওঠে তার জন্য ১৮১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লিভারপুল ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বন্দর-নগরী লিভারপুলের প্রাথমিক উত্থান থেকে পরবর্তী কালের সমৃদ্ধির জন্য লবণ বাণিজ্যের অবদানই ছিল সর্বাধিক। ব্রিটিশ বণিক জন হোল্টের কথায়, লবণ বাণিজ্য যেন লিভারপুলকে 'মায়ের যত্নে' লালন করেছিল।[23] তবে মনে রাখতে হবে যে, মুক্ত বাণিজ্যের নামে নিজেদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থপূরণকেই এই প্রাদেশিক শহরগুলির বণিকগোষ্ঠী একমাত্র অগ্রাধিকার দিয়েছিল। ভারতের মতো উপনিবেশে মুক্ত বাণিজ্যের অভিঘাত প্রসঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনুদার, সংকীর্ণমনা, যার ছত্রে ছত্রে চূড়ান্ত ঔদাসীন্য ও পক্ষপাতদুষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। ভারতে লবণের মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে প্রাদেশিক বণিক গোষ্ঠী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কিভাবে তৎপরতা দেখিয়েছিল তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে।

উরস্টারশায়ার কাউন্টির ড্রয়েটউইচ শহরের মেয়র সহ পূর্ণ নাগরিকেরা হাউস অব কমন্সে পিটিশন পেশ করে জানিয়েছিলেন যে, লবণ উৎপাদন শহরের প্রধান বাণিজ্য হলেও ব্রিটেনের লবণের বাজার সীমিত হওয়ার জন্য সেখানে লবণ উৎপাদক ও নৌ-পরিবহণকারী শ্রমজীবীরা বেকারত্বে ও কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতেন। যদি ভারতের বিশাল বাজারে ব্রিটিশ লবণ অবাধে ঢুকতে ও বিকোতে পারে তবেই যে তাঁদের

---

[21] A. Webster, "The Strategies and Limits of Gentlemanly Capitalism: The London East India Agency Houses, Provincial Commercial Interests, and the Evolution of British Economic Policy in South and South East Asia 1800–1850," *The Economic History Review* LIX, no. 4 (2006): 743–64.

[22] A. Redford, *Manchester Merchants and Foreign Trade, 1794–1858* (Manchester: Manchester University Press, 1934); D. Eyles, *The Abolition of the East India Company's Monopoly 1833*, Ph.D. dissertation, (University of Edinburgh, 1955), 184–98. Available at https://era.ed.ac.uk/handle/1842/6815 [last accessed on 26.04.2024]; Yukihisa Kumagai, *Breaking into the Monopoly: Provincial Merchants and Manufacturers' Campaigns for Access to the Asian Market, 1790-1833* (London: Brill, 2013).

[23] John Holt and Gregson MSS, Vol 10, 253. Cited in Francis E. Hyde, *Liverpool and the Mersey: An Economic History of A Port 1700-1970* (Newton Abbot: David & Charles, 1971), 27.

দুর্দশা মিটবে তা আবেদনকারীরা হাউস অব কমন্সের উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন।[24] অবশ্য তার পরিণামে ভারতীয় লবণ উৎপাদক ও শ্রমজীবীরা কি দুর্দশায় পড়বেন তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। শুধু ড্রয়েটউইচ কেন, ব্রিটেনের ছোটো-বড় সব শহর থেকেই সেই সময়ে মুক্ত বাণিজ্যের নামে এমন একপেশে আবেদনের জোয়ার দেখা গিয়েছিল। নর্থউইচের বাসিন্দাদের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল যে, চেশায়ারে প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ টন লবণ উৎপাদনের সাথে পাঁচ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান জড়িয়ে ছিল। তাঁদের মতে, ভারতীয় জনতা এবং ব্রিটিশ উৎপাদক উভয়ের পক্ষেই কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার এবং লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপ 'অনৈতিক এবং অনিষ্টকারক'। তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ লবণের সমানাধিকারের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, কারণ এতে [ব্রিটেনের] 'বাণিজ্য এবং দেশের সামগ্রিক বাণিজ্যিক স্বার্থ উপকৃত হবে।'[25] উপনিবেশের লবণ বাণিজ্যে 'সমানাধিকার' চেয়ে চেশায়ারের এমন বিষম আবেদন আবার সমর্থিত হয়েছিল ওয়ারিংটনের বণিক পিটিশনে। কারণ, চেশায়ারের লবণ বাণিজ্যের ওঠা-পড়ার সাথে ওয়ারিংটনের লবণ উৎপাদকদেরও রুজি-রুটি জড়িয়ে ছিল।[26]

ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণি, বিশেষতঃ দরিদ্রদের জীবনে লবণের অভাব নিয়ে চিন্তায় আকুল হয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টারের বণিকগোষ্ঠী, উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীরা! কারণ, দেশীয় লবণ যে 'গুণমানে অশুদ্ধ, সরবরাহের দিক থেকে অনিশ্চিত ও অপর্যাপ্ত, আর দামে সবচেয়ে চড়া'। তাই ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত অংশে বিনামূল্যে বা নামমাত্র শুল্কে লবণ আমদানির অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।[27] গ্লসেস্টারের চেম্বার অব কমার্সও অনুরূপে ভারতীয় লবণের নিম্নমান অথচ বেশি দাম ও সীমিত ব্যবহারের যুক্তি দর্শিয়ে মনোপলি নামক 'দুষ্টের প্রতিকার' চেয়েছিল। ব্রিটেনে মাথাপিছু লবণের বার্ষিক ব্যবহার যেখানে আনুমানিক ২৫ পাউন্ড, সেখানে ভারতে গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ু সত্বেও লবণের ব্যবহার অর্ধেকেরও কম, মাত্র ১২ পাউণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল! তাদের হিসেব অনুযায়ী, ভারতের বাজারে বার্ষিক ৮ লক্ষ পাউণ্ড লবণের অতিরিক্ত চাহিদা থাকলেও ব্রিটিশ রফতানি বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

---

[24] Petition of Wych (Droitwich), Worcester County dated June 14, 1853 in *Fourth Report from the Select Committee on Indian Territories, together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence, and Appendix* (The House of Commons, 30 June, 1853), 254.

[25] The Petition of Northwich, County of Chester dated 17 June, 1853, Ibid., 253.

[26] The Petition of Warrington, in the county of Lancaster dated 3 June, 1853, Ibid., 252.

[27] The Petition of Manchester dated 9 June, 1853, Ibid., 252.

এতে বোঝাই যাচ্ছে যে, ভারতীয়দের লবণ-বঞ্চনার সওয়াল করে তার মধ্যে নিজেদের লাভের অঙ্ক কষতে ব্রিটিশ বণিকেরা রীতিমতো দড় ছিলেন![28]

উনিশ শতকে ব্রিটিশ লবণ বণিকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন উইলিয়াম ফার্নিভাল, হারমান ইউজেন ফকের মতো বিত্তবান ও প্রভাবশালী বণিকেরা। মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চাপ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন।[29] এইচ. ই. ফক যেমন ১৮৪০ থেকে ১৮৮০ দশকের শেষ পর্যন্ত লবণ বাণিজ্যের নীতি নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। ১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পোলিশ অভিবাসী ফক ব্রিটেনে এসেছিলেন ও অচিরেই একাধিক পাঙ্গা লবণ কারখানার পাশাপাশি উইন্সফোর্ডে 'রক সল্ট' খনির মালিকানা অর্জন করে নিজেকে এক সফল ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফক ব্রিটিশ সল্ট চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রূপে, ১৮৬৫-তে চেয়ারম্যান এবং তারপরে ১৮৬৭-তে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ১৮৮৯ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব নির্বাহ করেছিলেন।[30] চূড়ান্ত ব্যবসায়িক মুনাফার লক্ষ্যপূরণে ফক এতটাই আগ্রাসী ও বেপরোয়া মনোভাবাপন্ন ছিলেন যে খোদ ব্রিটেনের লবণ শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার ন্যায্য দাবির তোয়াক্কা করেন নি। যেমন, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে প্রায় সাত হাজার লবণ শ্রমিক ধর্মঘট ডাকলে ফক সেই দাবি অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং উৎপাদন চালু রাখতে অভিবাসী জার্মান শ্রমিকদের কম মজুরিতে নিয়োগ করতে শুরু করেছিলেন। আবার ১৮৭০ দশকের শেষে লবণ বাজারের অনিশ্চয়তা দেখা দিলে এবং অভিবাসী জার্মান শ্রমিকেরা বেতন বৃদ্ধির দাবি করলে ফক ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাদের জায়গায় হাঙ্গারির অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ করেছিলেন।[31] ব্রিটিশ লবণ উৎপাদকদের ন্যূনতম দাবির পরিণতি যদি এরকম হয়ে থাকে, তাহলে ভারতের মতো উপনিবেশ প্রসঙ্গে ফক ও তাঁর অনুগামী বণিকদের দৃষ্টিভঙ্গী কি হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ফকের নেতৃত্বেই দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ১৮৪৫-৪৬ সালে ব্রিটিশ রফতানি ব্যবসায়ীরা কলকাতার চুক্তিবদ্ধ গুদামগুলিতে কোনোরকম আগাম শুল্ক ছাড়া লবণ স্তূপীকৃত করতে

---

[28] The Petition of the Chamber of Commerce of Gloucester. 30 June, 1853, Ibid., 254-255.

[29] W. H. Chaloner, "William Furnival, H. E. Falk and the Salt Chamber of Commerce, 1815-1889: Some Chapters in the Economic History of Cheshire", *Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire*, Vol. 112, (1960) 123-45.

[30] Ibid., 136.

[31] Stanisław Hajkowski, *The Cultural Transition and the Attitudes of Polish Immigrant Families Towards Divorce and Parental Authority in the United States, 1931-1940* (Ph.D. Diss., The Catholic University of America: 2010), 27.

পেরেছিলেন।[32] পার্লামেন্টে মুক্ত বাণিজ্যের দাবি তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাংসদদের সাথে লবণ বণিকদের গাঁটছড়া সেই সময় বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে ফকের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সল্ট চেম্বার চেশায়ার সাংসদদের মাধ্যমে এমনই চাপ তৈরি করেছিল যে, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার বাংলায় 'স্টেট মনোপলি'-তে দেশীয় লবণ উৎপাদনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে এবং তার পরিবর্তে বিদেশি লবণের ওপর অধিক আমদানি শুল্ক ধার্য করে রাজস্ব আদায়ে সম্মত হয়।[33] উপনিবেশিত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপর্যস্ত করে, এই একপেশে বৈষম্যমূলক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই, প্রায় অর্ধশতক ধরে কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-র বিরুদ্ধে চেশায়ার-লিভারপুলের লবণ বণিক গোষ্ঠী তাদের সংগঠিত প্রচার ও প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছিল। আর বণিক গোষ্ঠীর সেই প্রয়াসে তৎকালীন ব্রিটিশ সাংসদ এবং সংবাদমাধ্যমের জোরালো সমর্থন ও সহায়তা ছিল।

সংসদীয় রাজনীতি ও সাংসদ-লবি

উনিশ শতকে ভারতীয় লবণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যিক রাজনীতির অন্যতম কুশীলব ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ সাংসদেরা যাঁরা চেশায়ার-লিভাপুলের লবণ বাণিজ্যের স্বার্থে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সওয়াল করেছিলেন ও কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-র বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৩০-এর দশকে চেশায়ারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জর্জ উইলব্রাহামের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। হুইগ সদস্য উইলব্রাহাম ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে চেশায়ারের এবং ১৮৩২-১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চেশায়ার সাউথের নির্বাচিত সাংসদ ছিলেন। ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চেশায়ারের হাই শেরিফ হিসেবেও নিযুক্ত হয়েছিলেন।[34] ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া লবণ বাণিজ্যেকে তিনি 'বৃহত্তর আর্থিক শোষণের একটি পদ্ধতি' [a system of greater fiscal oppression] বলেই মনে করতেন। 'সল্ট মনোপলি'-র বিলুপ্তি দাবি করে উইলব্রাহাম নিজের সংসদীয় জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছিলেন; বিষয়টি হাউস অফ কমন্সে একাধিবার তুলে ধরেছিলেন, যদিও তাঁর সেই প্রয়াস খুব কার্যকরী হয় নি।[35]

---

[32] W. H. Chaloner, "William Furnival, H. E. Falk" 135.

[33] Ibid., 135-136.

[34] সাংসদ জর্জ উইলব্রাহামের প্রসঙ্গ রয়েছে : https://www.historyofparliamentonline.org/volume/1820-1832/member/wilbraham-george-1779-1852 [last accessed on 26 April 2024]

[35] George Wilbraham, *Thoughts on the Salt Monopoly in India* (London: James Ridgway, Feb. 1847), 3.

১৮৩৩ সালের ১২ জুলাই, উইলব্রাহাম ভারতে লবণের একচেটিয়া অধিকার ও ব্রিটিশ বাণিজ্যে তার প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন হাউস অফ কমন্স-এ পেশ করেছিলেন। তার দশ দিন পরেই তিনি ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া লবণের উৎপাদন ও বিক্রির বিরুদ্ধে একটি আইনি ধারা প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। হাউসের সামনে তিনি দাবি করেছিলেন যে, ভারতে 'অত্যধিক খরচে' এবং 'অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে' লবণ উৎপাদিত হত। চূড়ান্ত ক্ষতিকর একচেটিয়া কারবারের জন্যই ভারতে লবণের দাম কমপক্ষে তিন থেকে চার গুণ বেড়ে যেত।[36] উইলব্রাহামও চেশায়ার-লিভারপুলের বণিককুলের মতোই এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ জানতেন— কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-র বিলোপ ও চেশায়ার লবণকে অবাধে লিভারপুল থেকে কলকাতায় পাঠানো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন যে, মনোপলি বিলুপ্ত হলে যেমন ভারতীয়দের দারুণ সুবিধে হবে তেমনই যে সমৃদ্ধ ও বৃহৎ [লবণ উৎপাদক বণিক] গোষ্ঠীর তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন তারাও তাতে যারপরনাই লাভবান হবেন। 'গুণমানে বিশ্বের সেরা' লিভারপুল লবণ বাংলায় দেশীয় লবণের তুলনায় অনেক কম দামে বিক্রি হতে পারে। আবার ভারতে আসার পথে লিভারপুলের জাহাজী পরিবহণের স্বার্থে চেশায়ার লবণ যথার্থ 'ব্যালাস্ট' হিসেবে কাজ করতে পারে। চেশায়ার-লিভারপুলের বাণিজ্যিক স্বার্থপূরণের তাগিদে উইলব্রাহাম অবশ্য ভারতে দেশীয় লবণ উৎপাদনের সাথে জড়িত অগণিত মানুষের ভবিষ্যত কি হবে তা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। বরং ব্রিটিশ লবণের মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে 'ভারতের প্রতি দীর্ঘকালের উদাসীনতা' কাটিয়ে উঠতে সংসদকে ও সমমনস্ক সাংসদদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[37]

নিজের সংসদীয় জীবনে উইলব্রাহাম চেশায়ার লবণ ও লিভারপুলের জাহাজী পরিবহণ স্বার্থে যে রাজনৈতিক লবি করতেন তাতে লিভারপুলের উইলিয়াম ইওয়ার্ট, মিডলসেক্সের জোসেফ হিউম, শেফিল্ডের জেমস সিল্ক বাকিংহামের মতো সাংসদদের যোগ ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই যখন 'Report of the Committee on the East India Charter Bill' হাউস অফ কমন্সের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন উইলব্রাহাম কোম্পানির লবণ নীতির সংশোধন চেয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং তার লবি গ্রুপের দৃঢ় সমর্থন পান। উইলব্রাহামের প্রস্তাবকে সমর্থন করে জেমস বাকিংহাম তাঁর বক্তৃতায় কোম্পানির 'সল্ট

---

36 See East India Company's Charter , HC Deb 22 July 1833, vol 19, cc1069-75 Available at http://hansard.millbanksystems.com/commons/1833/jul/22/east-india-companys-charter#S3V0019P0_18330722_HOC_37 [Accessed on 17 January 2021]

37 Ibid.

মনোপলি'-কে তীব্র আক্রমণ করেন। শেফিল্ডের এই বাগ্মী সাংসদ 'মুক্ত বাণিজ্যের ধর্মযোদ্ধা' (ক্রুশেডার) রূপে অভিহিত হতেন।[38]

বাকিংহ্যাম তাঁর বক্তব্যে 'সল্ট মনোপলি' কিভাবে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য উভয় পরিসরেই ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, একচেটিয়া লবণ কারবারই ভারতে কোম্পানির শোষণের প্রাচীন দৃষ্টান্ত যেখানে কোম্পানির কর্মচারীরা 'ব্যক্তিগত উপরি পাওনার' লোভে যোগ দিতেন। নিজেদের পদের ক্ষমতা অপব্যবহার করে, অসাধু যোগসাজশের মাধ্যমে লবণের দাম কখনো কখনো 'প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ১,০০০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি' আদায় করতেন! কোম্পানির মনোপলিতে লবণের চড়া দাম প্রসঙ্গে বাকিংহ্যাম ও তাঁর সমর্থকদের এমন পরিসংখ্যানকে স্বভাবতই কোম্পানির আমলারা অবাস্তব বলে প্রত্যাখান করতেন। ভারতীয়দের খাদ্যাভাসে লবণের অপরিহার্যতার দিকটি তুলে ধরে বাকিংহ্যাম জানিয়েছিলেন যে, লবণের অভাব বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি নিজের ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলেন। লোহিত সাগর থেকে বোম্বাইয়ের যাত্রাপথে কোনো একসময় বাকিংহ্যাম স্বয়ং ষোল জন নাবিকের মৃত্যু ঘটতে দেখেছিলেন এবং বোম্বাইয়ের চিকিৎসকেরা লবণের অভাবকেই তার জন্য দায়ী করেছিলেন![39] তাঁর বক্তব্যের শেষভাগে তিনি ভারতে দেশীয় লবণের খারাপ গুণমান, ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনের এবং বিপদসঙ্কুল কাজের পরিবেশ, মলঙ্গিদের [লবণ শ্রমিক] দুর্দশা, অবৈধ লবণ কারবার ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি তুলে ধরে 'সল্ট মনোপলির' দ্রুত বিলোপের দাবি জানিয়েছিলেন।[40]

সাংসদ জীবনের পূর্বে পেশাগতভাবে বাকিংহ্যাম ছিলেন এক রাজনৈতিক সাংবাদিক যিনি ভারতে কয়েক বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ১৮১৮-তে কলকাতায় আসার পরে তিনি ইংরেজি সাময়িকপত্র *ক্যালকাটা জার্নাল*-এর সম্পাদক হন এবং সেইসূত্রে রামমোহনের সাথে তাঁর পরিচিতি ও সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।[41] তাছাড়া উভয়েই লিবেরাল মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক হওয়ায় তাঁদের সখ্যতা আরো গভীর হয়েছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে [সনদ আইনে] ভারতে মুক্ত বাণিজ্য নীতি ঘোষিত হলে পরের বছরই রামমোহন কোলকাতায়

---

[38] G.F.R. Barker, 'Buckingham, James Silk (1786–1855),' in Rev. Felix Driver (ed.), *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford University Press, 2004, Available at http://www.oxforddnb.com/view/article/3855?docPos [Accessed on 17 January 2021]

[39] East India Company's Charter, HC Deb 22 July 1833 Ibid.

[40] Ibid.

[41] See chapter 7 'Free Trade and A Reformed Parliament' in Lynn Zastoupil, *Rammohun Roy*, 99.

সংগঠন গড়ে তুলে তার নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন।[42] মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক বাকিংহ্যাম তাঁর জ্বালাময়ী কলামে কোম্পানি প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি একচেটিয়া আধিপত্য বিলোপের দাবি করেছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে তিনি কোম্পানির রোষানলে পড়ে ব্রিটেনে ফেরত যেতে বাধ্য হন। ব্রিটেনে ফিরে বাকিংহ্যাম তাঁর রাজনৈতিক সাংবাদিকতা অব্যাহত রেখে *ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড অ্যান্ড কলোনিয়াল রিভিয়্যু* (১৮২৪-২৯) এবং *এথেনিয়াম* (১৮২৮) পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন এবং মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থনে আরো উগ্র, উত্তুঙ্গ প্রচার চালিয়েছিলেন। ১৮২৭-এ তাঁর লেখা 'The East India Company's Monopoly' অন্তত ১৫০টি ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।[43] ১৮২৯-এ 'মুক্ত বাণিজ্যের ধর্মযোদ্ধা' বাকিংহ্যাম লিভারপুল থেকে, যেখানে 'মুক্ত বাণিজ্যের হাওয়া' প্রবল ছিল, এক ঝোড়ো প্রচারাভিযান শুরু করেছিলেন; তারপর তিনি একে একে পৌঁছে গিয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহ্যাম, ব্রিস্টল, লিডস, হুয়িটবি, হাল, কার্লাইল, গ্লাসগো, এডিনবার্গের মতো শহরে। বাকিংহ্যাম কতদূর সফল হয়েছিলেন? *লিভারপুল মার্কারি* পত্রিকা তাঁকে কৃতিত্ব দিয়েছিল 'ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার সাথে' জঘন্য মনোপলিকে তার প্রকৃত চরিত্রে তুলে ধরার জন্য।[44] ব্রিটেনের প্রাদেশিক শহরগুলির মধ্যবিত্ত জনতার কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। বলাবাহুল্য, সেই জনপ্রিয়তায় ভর করে সাংবাদিক বাকিংহ্যাম পরবর্তীকালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রূপে ব্রিটেনের সংসদে পৌঁছেছিলেন। বাকিংহ্যামের জীবন ও কর্মকাণ্ড একদিকে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা ও অদম্য চরিত্রকে তুলে ধরে, তেমনই অন্যদিকে বণিক স্বার্থপূরণে তৎকালীন সংবাদপত্রের পরিবর্তিত ভূমিকায় আলোকপাত করে, যখন অর্থনৈতিক স্বার্থে মুখ্যত রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল।

সংবাদপত্র ও প্রচার-যুদ্ধ

উনিশ শতকের শুরু থেকেই ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতে কুশাসনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক অধিকার কুক্ষিগত করার অভিযোগ তুলে খড়্গহস্ত হয়েছিল। ১৮২০-র দশক থেকে মুক্ত বাণিজ্যের দাবি জোরালো হয়ে উঠলে সংবাদপত্রের পাতায় কোম্পানির কুশাসনের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে 'সল্ট মনোপলি' ধারাবাহিকভাবে তীব্র নিন্দা ও বিদ্রূপে বিদ্ধ হতে থাকে। *ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড*-এর এক প্রতিবেদন থেকে যেমন জানা যায় যে, কোম্পানির মনোপলিতে দেশীয় লোকেদের ওপর নির্মম

---

[42] এবাদত্ হোসেন, *মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন* , ১৫২-১৫৩।

[43] Zastoupil, *Rammohun Roy*, 113

[44] Liverpool Mercury, January 9, 1829, in Ibid.

নিষ্ঠুরতা চালিয়ে লবণ উৎপাদনে বাধ্য করা হত। ভারতের হতদরিদ্র দুর্ভাগা লোকেরা সামান্য নুন দিয়ে কোনোমতে তাদের পাতের ভাত মুখে তোলেন অথচ জীবনের জন্য সেই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে চলেছিলেন। একচেটিয়া ব্যবস্থার কারণে লবণের দাম উৎপাদন-মূল্যের চেয়ে প্রায় ৩৫০ শতাংশ বেশি ছিল, আর তার দরুন লবণ পাচারের ঘটনা আকছার ঘটতে থাকায় দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।[45] ভারতে বিশেষতঃ বাংলায় কোম্পানির একচেটিয়া লবণ কারবারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক প্রচারের মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলতে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। *লিভারপুল মার্কারি* যেমন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আগস্ট লিভারপুল সহ অন্যান্য বন্দর-নগরীর বণিকদের তথা মুক্ত বাণিজ্যের বন্ধুদের "জেগে উঠতে এবং সক্রিয় হতে" আহ্বান জানিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার পুনর্নবীকরণ রুখতে পত্রিকাটি বিশদ কর্মসূচি প্রকাশ করেছিল, যথা- বণিক এবং উৎপাদনকারীদের সম্মিলিতভাবে সভা করতে হবে; সরকার ও জনসাধারণের কাছে বাস্তব তথ্য তুলে ধরতে হবে; আর সংবাদপত্রগুলি কঠোর পরিশ্রমে নিরলসভাবে প্রশ্ন তুলে ধরে সেই আলোচনা ব্রিটেনের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে। তাহলেই ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রতিটি 'স্বাধীন মন' দেশের ঘৃণ্যতম কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার সম্পর্কে সচেতনভাবে ভাবতে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে।[46] *ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, শুধু লিভারপুলই নয়, ১৮২০-র দশকের শেষ থেকেই কোম্পানির মনোপলির বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম লিডস, গ্লাসগো সহ ব্রিটেনের অন্যান্য বৃহৎ বাণিজ্য নগরীতে মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে জনমত জোরালো হয়েছিল।[47]

আধুনিক ব্রিটিশ গণপরিসরের কাঠামোগত রূপান্তরে সংবাদপত্র কিভাবে এক শক্তিশালী নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।[48] অষ্টাদশ শতকের ব্রিটেনে সংবাদপত্র ছিল 'খবর প্রকাশের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র', কিন্তু উনিশ শতকে সংবাদপত্র 'জনমতের বাহক' ও দিকনির্দেশক হিসাবে

---

45 The East India Company's Monopoly, *The Oriental Herald*, 14: 45, (September 1827).

46 ১৮২৭-এর ২৩ আগস্ট প্রকাশিত *লিভারপুল মার্কারির* আবেদন, উদ্ধৃত করেছিল *The Oriental Herald*, Ibid.

47 *The Oriental Herald*, Ibid.

48 গণপরিসর বলতে সাধারণত সামাজিক জীবনের সেই পরিসরকে বোঝায় যেখানে ব্যক্তিমানুষেরা অবাধ মতবিনিময় এবং সামাজিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য একত্রিত হতে পারেন, এবং সেই আলাপ-আলোচনার সূত্রে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারেন। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত গণপরিসরেই সমাজের চাহিদা বা প্রয়োজনগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিসমষ্টি 'পাবলিক' হিসেবে রাষ্ট্রের সাথে মতবিনিময়ে লিপ্ত হয়। দেখুন 'The Model Case of British Development' and 'The Transformation of the Public Sphere's Political Functions' শীর্ষক আলোচনা, Jürgen Habermas, (translated by Thomas Burger) *The Structural Transformation of The Public Sphere: an Enquiry into A Category of Bourgeois Society*, (Massachusetts: MIT Press, First MIT Paperback edition, 1991), 57-66, 180-222

আত্মপ্রকাশ করে এবং ‘দলীয় রাজনীতির অস্ত্রভাণ্ডারে অন্যতম উপকরণ’ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সংবাদের সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে যাওয়ার জন্য উনিশ শতকে ব্রিটেনের সংবাদপত্র এবং জার্নালগুলি ধীরে ধীরে যেন ‘ধনবান-অভিজাতদের খেলনাঘোড়া’ হয়ে উঠেছিল।[49] সেই প্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের প্রকাশকের ভূমিকাও ‘সংবাদ ব্যবসায়ী থেকে জনমতের কারবারিতে’ পরিণত হয়েছিল। প্রকাশক ও সম্পাদকের সম্পর্ক শুধুমাত্র নিয়োগকর্তা আর কর্মচারীর সম্পর্ক ছিল না, শেষোক্তজন ব্যবসার লভ্যাংশে হিস্যাদার হয়ে উঠেছিলেন।[50] ব্রিটিশ তথা ইয়োরোপীয় প্রেক্ষিতে প্রকাশক ও সম্পাদকের এই পরিবর্তিত ভূমিকার পর্যালোচনা ভারতে ইয়োরোপীয় উদ্যোগে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে *ক্যালকাটা জার্নাল* পত্রিকার প্রকাশক জন পামার ও সম্পাদক জেমস বাকিংহ্যামের ভূমিকা তুলে ধরা যায়। উনিশ শতকে কলকাতার সেরা ইয়োরোপীয় বিত্তবান বণিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পামার যাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানিগুলি ব্যাঙ্কিং, বিনিয়োগ, জাহাজি পরিবহণ, ভূসম্পত্তি সহ বিভিন্ন আর্থিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িয়ে ছিল। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা এজেন্সি হাউসের সুবাদে ভারতীয় বণিক ও বিনিয়োগকারীদের সাথে পামারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মূলত মুক্ত বাণিজ্যের দাবিকে ও বণিকদের ব্যক্তি স্বার্থকে একমাত্র প্রাধান্য দেওয়ার প্রচারমঞ্চ হিসেবে পামার *ক্যালকাটা জার্নাল* পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বাকিংহ্যামকে তার সম্পাদক নিযুক্ত করেন।[51] *ক্যালকাটা জার্নালের* সম্পাদক বাকিংহ্যাম কিভাবে মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাংসদ হয়েছিলেন তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

ভারতে লবণের মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে সংবাদপত্রের প্রচারের পাশাপাশি মুদ্রিত প্রচারপত্র (লিফলেট) ও প্রচারপুস্তিকা (প্যামফ্লেট) বিতরণ, জনসাধারণের মধ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ও গণআবেদনপত্র (পিটিশন) জমা দেওয়া ইত্যাদির প্রচলন জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। ১৮৪৭ সালে চেশায়ারের [প্রাক্তন] সাংসদ উইলব্রাহাম নিজেই ‘Thoughts on the Salt Monopoly’ শিরোনামে একটি প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ ও বিলি করেন। তার পাশাপাশি লবণ ব্যবসায় কোম্পানির একাধিপত্য স্থানীয় স্তরে কি অনিষ্ট ঘটিয়েছে, সর্বোপরি আর্থিক অপচয় ও ব্রিটিশ বাণিজ্যে তার বিষময় প্রভাব সম্পর্কে নর্থউইচের সল্ট চেম্বার অফ কমার্স ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘*প্রেস ভার্সাস*

49 Ibid., 182.

50 Ibid.,183.

51 See the first chapter ‘The World of John Palmer’ in Anthony Webster, *The Richest East Indian Merchant: The Life and Business of John Palmer of Calcutta, 1767-1836* (U.K.: The Boydell Press, 2007), 1- 22 [14].

সল্ট মনোপলি শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল।[52] জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিতরিত এই শেষোক্ত পুস্তিকাতে মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থনে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে জ্বালাময়ী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তা এখানে সংকলিত হয়েছিল। বাংলায় ভেজাল মিশ্রিত দেশীয় লবণ ব্যবহারে উপনিবেশিত উপভোক্তারা কিভাবে স্বাস্থ্য ও আর্থিক নিরিখে প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন এবং সর্বোপরি তা যে কোম্পানি শাসনের এক নৈতিক অবনমনের সূচক সেই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ বণিক, সাংসদ ও সংবাদপত্রগুলি একযোগে ধারাবাহিকভাবে সোচ্চার হয়েছিল।

।।২।।

লবণের 'ভেজাল' বিতর্ক: অশুদ্ধি নির্ধারণের সাম্রাজ্যিক রাজনীতি

রামমোহন তাঁর সাক্ষ্যে দেশীয় লবণের ভেজাল প্রসঙ্গে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। সিলেক্ট কমিটি শুরুতেই তাঁর কাছে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে খুচরো লবণের দাম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। রামমোহন জবাবে জানিয়েছিলেন যে, কলকাতায় দেশীয় ভেজাল নুন এক টাকায় সাত থেকে আট সের [২ শিলিংয়ে প্রায় ১৫ পাউন্ড] বিক্রি হত।[53] তাঁর সাক্ষ্যতে রামমোহন যেন প্রকারান্তরে জানাতে চেয়েছিলেন যে, কোম্পানির মনোপলিতে উৎপাদিত নুন মাত্রেই ভেজাল এবং ভারতের বাজারে দেশীয় শুদ্ধ নুন বলে প্রায় কিছুই ছিল না। যদি শুদ্ধ নুন বলে কিছু থেকেও থাকে চড়া দামের জন্য তা কেনা সাধারণ গরিব লোকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 'জীবনের জন্য লবণ চূড়ান্ত অপরিহার্য' অথচ গরিব মানুষকে খারাপ গুণমানের লবণই ব্যবহার করতে হত বলে তিনি জানিয়েছিলেন। বাজারে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছোনোর আগে কিভাবে দেশীয় লবণে যথেচ্ছ ভেজাল মেশানো হত তার উত্তর দিয়েই রামমোহনের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। কোম্পানির মনোপলিতে উৎপন্ন দেশীয় লবণের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক অংশে ভেজাল হিসেবে মাটি মেশানো হত বলে তিনি জানিয়েছিলেন। সচ্ছল লোকেরা প্রায় দ্বিগুণ খরচ করে দেশীয় ভেজাল লবণ একাধিকবার পরিশোধিত করতে অথবা বিশুদ্ধ [নির্ভেজাল] লবণ কিনে ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু গরিবদের সেই সামর্থ্য ছিল না।[54]

---

[52] Stewart & Murray, (ed.), *A Pamphlet on the Press versus the Salt Monopoly* (London: Old Bailey,1846).

[53] Answers of Rammohun Roy, 685-686.

[54] Ibid.

ভারতে দেশীয় লবণের খারাপ গুণমান সম্পর্কে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি তাদের সমালোচনার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে উপনিবেশের প্রতিনিধিত্বকারী রামমোহনের অভিমতকেই তুলে ধরেছিল।

ভারতে বিশেষতঃ বাংলায় দেশীয় নুনের গুণমান প্রসঙ্গে 'খ্যাতনামী' [Distinguished] রামমোহনের অভিমত উদ্ধৃত করেছিল *মর্নিং হেরাল্ড*। ব্রিটিশ পত্রিকাটি তীব্র বিদ্রুপের সাথে লিখেছিল যে, ভারতীয়রা ভেজাল মেশানোর শিল্প যেভাবে বুঝতেন তা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যেত না! নুন তৈরির সময় মলঙ্গীরা ভেজাল মিশিয়ে সরকারের হাতে তুলে দিত। সরকারের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা তা কেনার পর আর একপ্রস্থ ভেজাল মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করত। চুক্তিবদ্ধ মলঙ্গীরা লবণে ছাই মিশিয়ে তাদের নির্দিষ্ট উৎপাদনের অংশ পূরণ করত, আর ব্যবসায়ীরা সেই লবণেই আবার মাটি মিশিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটে নিত।[55] *ইন্ডিয়ান নিউজ* ভারতীয় লবণে অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ, এমনকি অর্ধেকাংশে কাদা মাটি মেশানোর অভিযোগ তুলেছিল। পত্রিকাটি জানিয়েছিল যে, কোম্পানির আধিকারিকদের একাংশ ভোজ্য নুনে ভেজাল মেশানোর কারবারে জড়িত ছিলেন। আর এই ভেজাল নুনই ভারতে সমস্ত শ্রেণির মানুষ কিনতে বাধ্য হত। সচ্ছল, সম্ভ্রান্তরা অবশ্য এই নুন ব্যবহারের আগে পরিশোধিত করে নিতেন, কিন্তু গরীব লোকেদের সে সামর্থ্য ছিল না। এই 'বমন উদ্রেককারী' মিশ্রণও দেশের সর্বত্র অপ্রতুল ছিল, বিশেষতঃ প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেখানে গরীব মানুষ সজ্জি পোড়া ছাই আর শোরা নিষ্কাশনের পর যে তলানি পড়ে থাকত তার সাথে সামান্য রান্নার নুন মিশিয়ে মুখে তুলতে বাধ্য হত।[56] ঔপনিবেশিক বাংলায় নিম্নশ্রেণির মানুষ নুনের অভাব মেটাতে লবণাক্ত উপাদান রয়েছে এমন উদ্ভিজ্জ ছাই যে ব্যবহার করতেন তার বিবরণ চিকিৎসক জেমস রেনাল্ড মার্টিনও দিয়েছিলেন।[57] নুনের অভাব মেটাতে বিকল্প পদ্ধতির আরেক উদাহরণ পাওয়া যায় ঔপনিবেশিক আসামে। দুর্গমতা হেতু সেখানে লবণ আমদানি না হওয়ার জন্য আসামের স্থানীয় বাসিন্দারা কলাগাছের বাস্না (খোল) পুড়িয়ে 'টিপনি' নামে একরকম ক্ষার ব্যবহার করতেন।[58] ব্রিটিশ পত্রিকা *মাইনিং জার্নাল*-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় লবণ উৎপাদক থেকে বিভিন্ন ['সাব-মনোপলিস্ট'] হাতে ভেজাল মিশ্রিত হতে হতে যখন বাজারে পৌঁছত তখন তাতে অপমিশ্রণের হার ৪৭ শতাংশ পেরিয়ে যেত। এই ভেজাল মেশানো অশুদ্ধ নুন আসলে 'অসুখ, যন্ত্রণা, মৃত্যুর' পরোয়ানা বহন করত,

---

[55] The Morning Herald [no date], compiled in Stewart & Murray, *Press versus*, 34-38.

[56] The Indian News [no date] compiled in Ibid., 19.

[57] James Ranald Martin, *Notes on the Medical Topography of Calcutta* (Calcutta; Bengal Military Orphan Press, 1837), 55.

[58] 'লবণ', *মহাজন বন্ধু*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩১০): ১৬।

যা কোনোভাবে অতিরঞ্জিত নয় বলে পত্রিকাটি দাবি করেছিল।[59] উনিশ শতকে ভারতীয় নুনে ভেজালের অভিযোগ তুলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের এই তীব্র সমালোচনা অবশ্য কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া ছিল না। বরং তা প্রাথমিকভাবে ব্রিটেন তথা ইয়োরোপ জুড়ে খাদ্যপণ্যের ভেজালকে ঘিরে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্য উদ্বেগের অংশ হয়ে উঠেছিল এবং তার রেশ ধরেই উপনিবেশের পণ্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যিক রাজনীতির মাত্রাকে চিহ্নিত করা যায়।

শিল্প বিপ্লবের পরিণামে উনিশ শতকে ভোগ্যপণ্যের সাথে সাথে 'উৎপাদিত' খাদ্য ও খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা দ্রুত বেড়েছিল। এই বর্ধিত চাহিদার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীরা পানীয় ও খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটতে থাকেন। তার পরিণামে খাদ্যপণ্যের গুণমানগত শুদ্ধতা তথা খাঁটি নির্ভেজাল খাদ্যের জন্য জনজীবনে বিপুল চাহিদা তৈরি হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে আধুনিক রসায়নের উত্থান খাদ্যে ভেজালের মিশ্রণ এবং ভেজাল মেশানোর পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে ক্রমশ সচেতন করে তুলেছিল।[60] উনিশ শতকে ব্রিটেন তথা ইয়োরোপে বৈজ্ঞানিকভাবে লবণের শুদ্ধতা নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় মুখ্যত রসায়নবিদ ও চিকিৎসকরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখানে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, শুদ্ধতার বিষয়টি আপেক্ষিক, ইতিহাসে এক নমনীয় ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। লবণের উৎস যে জল, তার শুদ্ধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রেই উনিশ শতক জুড়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নানান বিতর্ক অব্যাহত ছিল। বিজ্ঞানীরা জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত বলে প্রমাণ করার এক শতাব্দী পরেও 'শুদ্ধ জল' কি তা বৈজ্ঞানিক মহলে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছিল। উনিশ শতকের আগে জলের 'শুদ্ধতা' বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য— দেখতে স্বচ্ছ, গন্ধহীন ও স্বাদু জল বোঝানো হত। ভিক্টোরীয় ব্রিটেনে ভেজাল বা 'অশুদ্ধতা' বিষয়ক বিজ্ঞানের উত্থানে সেই 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' মানদণ্ডটি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং রসায়নবিদ, স্বাস্থ্যবিদ ও ব্যাকটেরিওলজিস্টদের নিয়ে গঠিত একটি নতুন বিশেষজ্ঞ তন্ত্রের সূচনা হয়। বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় নানান বিশ্লেষণ ও ফলাফল উঠে এলেও 'শুদ্ধ জল' প্রসঙ্গে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো তো দূর, বরং বৈজ্ঞানিক বিতর্কে যেন তার অসঙ্গতি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[61] উনিশ শতকের ব্রিটেনে যদি 'শুদ্ধ জল' অধরাই থাকে, তাহলে 'শুদ্ধ লবণ' কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

---

[59] *The Mining Journal* in Stewart & Murray, *Press versus,* 49.

[60] দেখুন Food Adulteration শীর্ষক আলোচনা, John Burnett, *Plenty and want: A Social History of food in England from 1815 to the Present Day* (Routledge[e-book], 2013, 3rd Edition,), 86-10.

[61] Christopher Hamlin, *A Science of Impurity: Water Analysis in Nineteenth Century Britain* (Bristol:

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সারে ইনস্টিটিউটের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ফ্রেডেরিক অ্যাকাম তাঁর "A Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons" গ্রন্থে তৎকালীন ব্রিটেনে প্রায় সমস্ত খাদ্য এবং পানীয়তে কমবেশি ভেজাল মিশ্রিত ছিল বলেই অভিযোগ করেছিলেন।[62] ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এক অজ্ঞাতনামা লেখক নিজেকে ভেজাল সংক্রান্ত "প্রতারণা এবং দুষ্কর্মের শত্রু" পরিচয়ে "Deadly Adulteration and Slow Poisoning Unmasked; or Disease and Death in the Pot and Bottle" শিরোনামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। লবণের গুণমানে হেরফের ঘটাতে তৎকালীন ব্রিটেনে ভেজাল মেশানোর চল সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন যে, "Salt is frequently adulterated with sulphate of lime, for the purpose of making it weigh heavier, appear lighter, and less liable to become moist". তাঁর বিবরণ থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, মূলত অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশাতেই [adulterant] লবণের ব্যাপক ব্যবহারের চল ছিল।[63] পরবর্তী দুই দশকে জন মিশেল, জেমস জনস্টন, ডক্টর আর্থার হিল হাসাল সহ অন্যান্যদের গবেষণাতেও খাদ্য ও পানীয়তে ভেজাল হিসেবে লবণ ব্যবহারের অগণিত দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।[64]

উনিশ শতকের ব্রিটেনে খাদ্যসামগ্রীর গুণমানগত শুদ্ধতার দাবি জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে এবং তার প্রভাব অচিরেই ইয়োরোপ তথা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০-এর দশক থেকে ফ্রান্সেই যেমন ভোজ্য নুনে ভেজাল মেশানোকে কেন্দ্র করে জনস্বাস্থ্য উদ্বেগ তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১৮২৯ থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রণীত জনস্বাস্থ্য আইনে যার প্রতিফলন স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়।[65] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লবণ ব্যবসায়ীদের থেকে মিউনিসিপ্যাল হেলথ কাউন্সিল প্রায় তিন হাজার নমুনা সংগ্রহ করে দেখেছিল যে তাদের ১০ শতাংশেরও বেশি (৩০৯টি) ভেজাল মিশ্রিত ও শারীরিক ভাবে ক্ষতিকর ছিল। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৩২-এর ২০শে জুলাই এক পুলিশি অর্ডিন্যান্স জারি করে নুনে

Hilger, 1990).

[62] Frederick Accum, *A Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons* (London: Longman 1820).

[63] Anonymous Author, *Deadly Adulteration and Slow Poisoning Unmasked; or Disease and Death in the Pot and Bottle* (London: Sherwood, 1830) [e-book available https://www.gutenberg.org/, last accessed on 7 March, 2024] লবণে ভেজাল মেশানোর প্রক্রিয়ার উল্লেখ ১৮৩০-এর সংস্করণ নয়, পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত হয়েছিল।

[64] John Mitchell, *A Treatise on the Falsification of Food* (London: Hippolyte Bailliere, 1848); James F. Johnston, *Chemistry of Common Life* (New York: D. Appleton, 1853); Arthur Hill Hassall, *Food and its Adulterations* (London: Longman, 1855).

[65] Ann La Berge, *Mission and Method: The Early Nineteenth-Century French Public Health Movement*, (UK: Cambridge University Press, 1992), 119.

ভেজাল মেশানোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[66] এক বছর পরেই অবশ্য এই অর্ডিন্যান্সের সীমাবদ্ধতা - যথা, স্বাস্থ্য নিরীক্ষকদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতি ও যথাযথ নজরদারির অভাব - তুলে ধরে ফরাসি রসায়নবিদ আলফঁসে শেভালিয়ার [Jean-Baptiste-Alphonse Chevallier] সরব হয়েছিলেন। অধিকাংশ স্বাস্থ্য নিরীক্ষক নুনের যেসব নমুনাকে শুদ্ধ বলতেন সেগুলি আদতে, শেভালিয়ারের মতে, ভেজাল মিশ্রিতই ছিল। অর্ডিন্যান্সের বাস্তব প্রয়োগে এমন গাফিলতির দরুন পরিস্থিতি দিন দিন আরো খারাপ হয়েছিল। ১৮৪০-এ সংগৃহীত নুনের ৪৮৭৮ নমুনার মধ্যে ২,৫৬১টি ভেজাল মিশ্রিত বলে পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল! এই হতশ্রী অবস্থা দেখে শেভালিয়ার একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞকে লবণ পরীক্ষক (Salt Examiner) পদে নিযুক্ত করার দাবি করেছিলেন।[67] উনিশ শতকের ইয়োরোপে এমনই বিতর্কের আবহে ভারতীয় নুনের গুণমান নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছিল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চেশায়ারের নির্বাচিত সাংসদ জর্জ উইলব্রাহাম স্বয়ং ভারতীয় লবণের গুণগত মান নির্ধারণে চূড়ান্ত তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ভারত থেকে লবণের নমুনা সংগ্রহ করে তা রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠিয়েছিলেন খ্যাতনামা রসায়নবিদ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের কাছে।[68] ভারতের করকচ নুনের নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল মাদ্রাজ থেকে, আর পাঙ্গা নুনের নমুনা সংগ্রহ হয়েছিল বাংলার চব্বিশ পরগণা থেকে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই 'রয়্যাল ইনস্টিটিউশন' থেকে প্রেরিত রিপোর্টে ফ্যারাডে জানিয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ লবণের বিবিধ নমুনায় অশুদ্ধি ছিল ন্যূনতম। ভারতীয় নমুনার মধ্যে মাদ্রাজের করকচ লবণ বিশুদ্ধ ছিল। তাতে অদ্রবীভূত পদার্থ তথা অপমিশ্রণের হার মাত্র ৪ শতাংশ, যার মধ্যে দানা আকারে সিলিকা, বালু কণা ও সামান্য 'সালফেট অফ লাইম' ছিল। তার বিপরীতে, কলকাতা থেকে আসা [২৪ পরগণা থেকে সংগৃহীত] লবণে অপমিশ্রণ ছিল চূড়ান্ত, প্রায় ১৮.৫ শতাংশ। অত্যন্ত ময়লা ও দূষিত অবস্থার সেই লবণে অদ্রবীভূত আঠালো বা কাদা মাটি যেমন ছিল, তেমনই 'সালফেট অফ লাইম'-এর অত্যধিক পরিমাণে উপস্থিত ছিল বলেই ফ্যারাডে জানিয়েছিলেন [সারণি-১.১ দ্রষ্টব্য]।[69] ফ্যারাডের বিশ্লেষণে অবশ্য এই বাস্তবতা তুলে ধরার সুযোগ ছিল না যে,

---

[66] Ibid., 256.

[67] Ibid, 257.

[68] Wilbraham, *Thoughts on*, 19.

[69] Ibid

স্থানীয় উৎপাদন পদ্ধতিতে লবণে কাদাটে উপাদান মিশে যাওয়ার সমস্যা শুধু বাংলাতেই নয়, ব্রিটেন সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই তখন কম-বেশি পরিলক্ষিত হত।

১৮০৮-এ ড. হেনরি হল্যান্ড ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানের উৎপাদিত লবণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের পাশাপাশি মৃত্তিকাযুক্ত লবণের উপস্থিতি শতাংশের হিসেবে তুলে ধরেছিলেন [সারণি-১.২ দ্রষ্টব্য]।[70] শুধু উনিশ শতকের শুরুতে নয়, শেষপর্বেও ব্রিটেনের লবণ উৎপাদনে এই সমস্যা বহাল ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে মি. ডিকিনসন নামের এক সরকারি খনি পর্যবেক্ষক জানিয়েছিলেন যে, জল-নিকাশির সমস্যা হলে লবণ-জলের উপরিভাগে কিছুটা কাদাটে লবণ থাকার সম্ভাবনা থাকত। তাছাড়া শিলা-লবণের খনিতে যদি বিস্ফোরক পাউডার ব্যবহার করা হত তাহলে তা জমে গিয়ে অথবা কাদাটে লবণ-জল ব্যবহার করা হলেও উৎপাদিত লবণে কাদাটে উপাদান থাকত বলেই তিনি জানিয়েছিলেন।[71] ভারতীয় লবণের গুণমান নিয়ে মুক্ত বাণিজ্য গোষ্ঠীর সমালোচনার পাল্টা জবাব দিতে কোম্পানির তৎপরতাও চোখে পড়ে। দেশীয় লবণ ভোক্তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর না ক্ষতিকর এই বিতর্কের নিরসনে ভারতে রসায়নবিদ অধ্যাপক মেয়ারের রিপোর্ট কোম্পানি পেশ করেছিল। অধ্যাপক মেয়ার বেল্লারি, কুডাপ্পা এবং কুর্ণুল থেকে সংগ্রহ করা করকচ লবণের দশটি নমুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তোষজনক রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষার ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছিল যে ঐ অঞ্চলের মাটির লবণে কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ বা ভেজাল ছিল না [সারণি-১.৩ দ্রষ্টব্য]।[72] তবে করকচের পাশাপাশি কোম্পানির তরফে পাঙ্গা লবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণের কোনো প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল কি না তা জানা যায় না।

কোম্পানির মনোপলিতে উৎপাদিত নুনে ভেজাল মেশানোর বিষয়টি যে একেবারেই অমূলক ছিল তা নয়। বরং বাজারে নুনের চাহিদার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অসৎ ব্যবসায়ীরা লবণে ভেজাল মেশাতেন। বাংলায় উৎকৃষ্ট পাঙ্গা নুনের পাশাপাশি নিকৃষ্ট মানের অন্যান্য পাঙ্গা নুন, যেমন- খাড়ি নুন, ফুল খাড়ি নুন, পাকোয়া নুন ইত্যাদি উৎপাদিত হত। উৎকৃষ্ট নুনের সাথে সেই নিকৃষ্ট মানের নুনগুলি ভেজাল হিসেবে মিশিয়ে বাজারে বিক্রি হত। ভেজাল নুনের কারবার রুখতে কোম্পানি ১৮১৯-এ আইন [Regulation X] প্রণয়ন করে,

---

[70] হল্যাণ্ডের মতামত ও পরিসংখ্যানের উল্লেখ রয়েছে, J. J. Manley, *Salt and other Condiments* (London: International Health Exhibition, 1884), 49.

[71] Ibid, 49.

[72] PART II- Madras, On the Supply of Salt for the Presidency of Madras, in Report of the Commissioner appointed to enquire into Salt in British India (London: Harrison, 1856), 101.

যেখানে অপরাধীদের আর্থিক জরিমানা ও দেওয়ানি জেলে ছয় মাস কারাবাসের শাস্তির নিদান ছিল।[73] অবশ্য আইন প্রণয়ন করে ভারতে, ইয়োরোপের মতোই, ভেজাল নুনের কারবারে বিশেষ লাগাম টানা যায় নি। বাস্তবিক ভেজাল সমস্যা থাকলেও, উনিশ শতকে কোম্পানির মনোপলি বনাম মুক্ত বাণিজ্যিক স্বার্থের মধ্যে সংঘাতের আবহেই ভারতের দেশীয় লবণের গুণমান তথা ভেজালের বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছিল, এবং সাম্রাজ্যের আধিপত্যমূলক অবস্থানই সেখানে অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। কারণ, দেশীয় লবণের গুণমান উন্নত করতে অথবা ভেজাল রোখার সদিচ্ছা থাকলে মুক্ত বাণিজ্য গোষ্ঠীর তরফে ইয়োরোপের মতোই ভারতেও লবণ পরীক্ষক নিয়োগ, আরো কঠোর আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় নজরদারি বাড়ানো, সর্বোপরি উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ ইত্যাদি পদক্ষেপের দাবি উঠে আসতো। তার পরিবর্তে সরাসরি 'সল্ট মনোপলি'-র বিলুপ্তির দাবিতে মুক্ত বাণিজ্য গোষ্ঠী যে সক্রিয়তা দেখিয়েছিল তার পেছনে ভারতের বৃহৎ বাজার দখলের অভিসন্ধি মুখ্য হয়ে উঠেছিল।

সাম্রাজ্যিক বয়ানে উপনিবেশের দেশীয় নুন 'ভেজাল' তথা 'অস্বাস্থ্যকর' বলে গণ্য হলেও এক চমকপ্রদ উলটপুরাণ দেখি ভারতেই উৎপাদিত চায়ের ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্যকর 'ব্রিটিশ' পানীয় চা-য়ে ভেজালের মিশ্রণ উনিশ শতকের ব্রিটেনে সামাজিক ও নৈতিক উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। চীন থেকে ব্রিটেনে আমদানিকৃত চা-কে 'বিদেশি', আর তাই 'ভেজাল' মিশ্রিত এবং 'অপরিষ্কার' হিসাবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ একইভাবে আমদানিকৃত ভারতের আসামে উৎপাদিত চা 'ব্রিটিশ' এবং 'স্বাস্থ্যকর' পানীয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল![74] ইংরেজ পুঁজি বিনিয়োগের সুবাদেই ইংরেজ অধিকৃত বহুদূরবর্তী ভারতীয় উপনিবেশের উৎপাদিত চা এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘরোয়া আপন পানীয় হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ পণ্যে ভেজালের বিষয়টি শুধু বহিরাগত-বৈদেশিক নয়, বরং সেই অভিযোগ তুলে ব্রিটেনের অভ্যন্তরে ভেজালের রমরমা কারবার চেপে যাওয়া হয়েছিল; জুডিথ ওয়ালশের কথায়, "[…] the identification of adulteration as a foreign interference with a British product deftly ignored the evidence of domestic adulteration."[75] ব্রিটিশ অর্থনৈতিক

[73] "Rules for Preventing the Adulteration of Salt," in *The Regulations and Laws Enacted by the Governor General in Council*, Vol. VII, (Calcutta: Baptist Missionary Press, 1828).

[74] Judith L. Fisher, "Tea and Food Adulteration, 1834-75." BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-Century History. Ed. Dino Franco Felluga, Available at: https://branchcollective.org/?ps_articles=judith-l-fisher-tea-and-food-adulteration-1834-75 [accessed on 04.03.2024]

[75] Ibid.

স্বার্থপূরণের তাগিদেই প্রতিযোগী পণ্যের বাজারি চাহিদাকে হ্রাস তথা নির্মূল করতেই তার অশুদ্ধি তথা ভেজাল বিশ্লেষণের রাজনীতি যে সাম্রাজ্য কর্তৃক উপনিবেশে প্রযুক্ত হয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া আধুনিক কালেও পণ্যের চূড়ান্ত গুণমান, এমনকি সাধারণভাবে পণ্যের গুণমান নির্ধারণের বিষয়টি নিয়েই বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের উভয় মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এই বিতর্কে প্রায়শই মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, 'গুণমানের কোন সর্বজনীন ধারণা নেই' এবং 'জ্ঞানাত্মক [cognitive] মূল্যায়নে গুণমানকে বিভিন্নভাবে দেখা হয়' ।[76] আর তাই গুণমান নির্ধারণের বিষয়টি 'চূড়ান্ত নিরপেক্ষ' নয়, বরং এটি 'আপেক্ষিক ধারণা'; কে পরিমাপ করছেন তার ওপর নির্ভর করে এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। 'উৎপাদকদের দৃষ্টিতে' যেমন গুণমান থাকে, তেমনই 'ভোক্তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতেও' গুণমান অবশ্যই থাকে।[77] এই দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় যখন উনিশ শতকে বর্ণবিচারের নিরিখে দেশীয়র তুলনায় বিদেশি লবণের গুণমানগত শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার সাম্রাজ্যিক বয়ান নির্মিত হয়েছিল।

।।৩।।

সাদা লবণ বনাম কালো লবণ: সাম্রাজ্য ও উপনিবেশে পণ্য বিতর্ক

উনিশ শতকে আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি লবণের শুদ্ধতা নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি হয়ে উঠেছিল লবণের রং বা বর্ণ। দেশীয় লবণের অশুদ্ধি তার কালচে, কাদাটে বর্ণতেই প্রতিভাত হত বলে 'সল্ট মনোপলি'-র সমালোচকেরা দাবি করেছিলেন। কোম্পানির মনোপলিতে উৎপন্ন দেশীয় লবণে ভেজাল হিসেবে যথেচ্ছ মাটি মেশানোর জন্য তা মাটির মতোই দেখতে হত বলে রামমোহন সিলেক্ট কমিটিকে জানিয়েছিলেন। দেশীয় বিত্তবানেরা অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে সেই কাদাটে লবণ একাধিকবার পরিশোধিত করে নিয়ে ব্যবহার করতেন, কিন্তু আমজনতার সামর্থ্যে তা কুলোতো না।[78] রামমোহনের অনুরূপ যুক্তি তৎকালীন ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলিতেও প্রচারিত হয়েছিল। *দি টাইমস পত্রিকা* যেমন লিখেছিল যে, দেশীয় লবণ ছিল

---

[76] Stefano Ponte and Peter Gibbon, “Quality standards, conventions and the governance of global value chains”, *Economy and Society*, 34:1, (2005) 1-31.

[77] P. Bowbrick, *The economics of quality, grades and brands* (New York: Routledge, 1992), 2-11.

[78] Answers of Rammohun Roy, 685-686.

"কালো, দুর্গন্ধযুক্ত এবং কাদাটে"; যতক্ষণ পর্যন্ত জলে দ্রবীভূত না হচ্ছে ও পুনরায় ফুটিয়ে পরিশোধিত না করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা "ব্যবহারের অনুপযুক্ত"।[79]

দেশীয় লবণের কালচে, কাদাটে বর্ণ যদি তার অশুদ্ধির চিহ্ন হয়ে ওঠে তাহলে তার বিপরীতে পরিশোধিত ব্রিটিশ লবণের শুদ্ধতা তার উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে বা শুভ্রতায় (whiteness) প্রতিভাত হয় বলেই 'সল্ট মনোপলি'-র সমালোচকেরা দাবি করেছিলেন। রাজস্ব বিভাগের সচিব ফ্রান্সিস উইলিয়াম প্রাইডক্স সিলেক্ট কমিটিকে অহমিকার সাথে জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয় জনতা যে ধরণের দেশীয় ভেজাল লবণে অভ্যস্ত তার সমতুল্য হয়ে উঠতে শুদ্ধ সাদা ব্রিটিশ লবণের যথেষ্ট গুণমানগত অবনমন ঘটাতে হবে! বরফ-সাদা ব্রিটিশ লবণ এতটাই শুদ্ধ ছিল যে তাতে যথেচ্ছ পরিমাণে ভেজাল মেশালে তবেই তা সেই 'কুখ্যাত' দেশীয় লবণের মতো হয়ে ওঠে, যা কিনা বাংলা ও কটকে [কোম্পানির] সরকারি তত্ত্বাবধানে বিক্রি হত।[80] লন্ডন স্থিত ইন্ডিয়া অফিসের উচ্চ-আধিকারিক প্রাইডক্সের বয়ানে ব্রিটিশ লবণের শুভ্রতা যেমন শুদ্ধতা, স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতাকে নির্দেশিত করে, তেমনই তা শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ জাত্যাভিমানকে হ্লাদিত করে। ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসের আধিকারিক টি. এল. পিকক অবশ্য জানিয়েছিলেন যে, মাদ্রাজের লবণ কালো দেখতে হয় মাটির কারণে, আর বাংলার লবণ সঠিকভাবে পরিশোধিত হয় না বলে ধূসর বর্ণের হয়।[81] জন ক্রফোর্ডের লবণ-সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে চার্লস টমলিনসন অবশ্য জানিয়েছিলেন যে, বাংলার লবণ খোলা বাজারে এতটাই ঘিনঘিনে দেখতে হয়, যার সাথে একমাত্র ফরাসি টেবিলে লবণের নামে ব্যবহৃত দ্রব্যের তুলনা মেলে! তা দেখতে লবণের সাথে মরিচ মেশালে যে রং হয় অনেকটা তার মতো। টমলিনসনের বয়ানে ইয়োরোপের অন্দরের জাত্যাভিমানী রেষারেষির রেশও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[82]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে 'মনোপলি' বনাম 'মুক্ত বাণিজ্যের' দ্বৈরথে একদিকে যদি ব্রিটিশ লবণের শ্বেত বর্ণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যিক পণ্যের শুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে বৈধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়ে থাকে তাহলে তার অন্যপীঠে ভারতীয় লবণের কালচে বর্ণের মাধ্যমে উপনিবেশিত পণ্যের অশুদ্ধতা ও নিকৃষ্টতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণের তাগিদে ব্রিটিশ লবণের শুদ্ধ শুভ্রতার প্রেক্ষিতে উপনিবেশিত

---

[79] The Times, 25 September, 1846 in *The Press Versus*

[80] *Fourth Report from the Select Committee on Indian Territories*, The House of Commons, 1853, 201.

[81] Charles Tomlinson, *The Natural History of Common Salt: Its' Manufacture, Appearance, Uses, and Dangers, in Various Parts of the World* (London: The Committee of General Literature and Education, 1850), 314.

[82] Ibid., 303.

লবণের অশুদ্ধ কৃষ্ণতা (blackness) যেভাবে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সহ বিবিধ মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে ‘পণ্য বর্ণবাদ’-এর (Commodity Racism) আভাস পরিলক্ষিত হয়।[83] খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের শুভ্রতা নিয়ে ইয়োরোপীয় মোহ অবশ্য বেশ পুরোনো। ইয়োরোপে যেমন মধ্যকালীন পর্ব থেকেই সাদা রুটি সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। আর রুটির কালো রং সামাজিক ধাপে অবনমনের চিহ্ন ছিল। উচ্চবিত্তরা কালো ও বাদামি রুটি এড়িয়ে চলতেন; এমনকি তাঁরা দাবি করতেন যে, তাঁদের পেটে সেই রুটি হজম হত না! অন্যদিকে, নিম্নশ্রেণির মানুষ সাদা বা আরো সাদা রুটি খাওয়ার আকাঙ্খা করতেন যা উনিশ শতকে ফ্রান্সের দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলেও পরিলক্ষিত হয়েছিল। এভাবেই রুটির রং ইয়োরোপীয় প্রেক্ষিতে সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল।[84]

উনিশ শতকের ইয়োরোপে খাদ্যদ্রব্যের শুভ্রতা তার উৎপাদনগত শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে সমার্থক হয়ে উঠেছিল। পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিকতার ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এই ‘পণ্য বর্ণবাদের’ উত্থান ঘটেছিল যখন পণ্যকেন্দ্রিক লাভজনক বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক বজায় রাখা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত ধারণাকে সুস্পষ্ট ও তর্কাতীতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। এই জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিবিধ বৈপরীত্যমূলক দ্বিত্ব যথা- শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, পরিচ্ছন্ন ও ময়লা, পবিত্র ও দূষিত, স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে পার্থক্যকে আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।[85] উৎপাদন পদ্ধতি, গুণমান, বর্ণ ইত্যদির নিরিখে বিশ্বের সর্বত্র লবণের বৈচিত্র্যপূর্ণ-স্থানীয় (Pluri-local) পরিচিতি ছিল, ভারতীয় লবণও স্বভাবতই তার ব্যতিক্রম ছিল না। উনিশ শতকের সাম্রাজ্যিক বয়ানে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ-স্থানীয় পরিচিতি অস্বীকার করে ভারতীয় লবণকে একতরফা ভাবে ব্রিটিশ শুদ্ধ শুভ্রতার প্রেক্ষিতে অশুদ্ধ কৃষ্ণতায় দাগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ও প্রচার চলেছিল। লবণ কেন্দ্রিক এই পণ্য-বর্ণবাদী বয়ানের মধ্যে উপনিবেশের ওপর সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের ধারণাকে বৈধ ও স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করার রাজনীতিই পরিলক্ষিত হয়। যদিও সেই লবণ কেন্দ্রিক ‘পণ্য বর্ণবাদী’ বয়ান সর্বত্র

---

[83] অ্যান ম্যাকক্লিন্টক সাম্রাজ্যিক শুদ্ধতার ধারণা কিভাবে পণ্যের উৎপাদন,ভোগ, ব্যবহারে সাদা-কালোর বর্ণ বিভাজনকে প্রকট করে তা বোঝাতে ‘পণ্য বর্ণবাদ’ (Commodity Racism) ব্যবহার করেছেন। Anne McClintock, *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest* (New York: Routledge, 1995).

[84] Stephen Mennell, *All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present*, (University of Illinois Press, 1985), 303.

[85] See ‘Soft-Soaping Empire: Commodity Racism and Imperail advertising” in McClintock, *Imperial Leather*, 207-231.

নিরঙ্কুশ নয়, বরং স্থানীয় লবণ উৎপাদন পদ্ধতি, জনরুচির স্বাতন্ত্র্য, দেশজ মূল্যবোধ প্রভৃতি মাত্রাকে কেন্দ্র করে উপনিবেশিত বাংলা তথা ভারতে এবং বিশ্বের অন্যত্রও পাল্টা প্রতিরোধী বয়ানের সম্মুখীন হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলায় স্থানীয় জল-মাটি-জ্বালানির বিশিষ্টতা এবং জনরুচির বিবিধতা অনুযায়ী যে লবণ উৎপাদিত হত তার গুণমানগত ও বর্ণগত বৈচিত্র্য ছিল। তমলুকের সল্ট এজেন্ট হেনরি হ্যামিল্টন নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিভাবে স্থানীয় শ্রমনিবিড় পদ্ধতিতে মাটির চরিত্র অনুযায়ী নুনের রং বিশুদ্ধ সাদা বা অন্য রংয়ের হয়ে উঠতো। লবণ-জল ফুটিয়ে উৎপাদিত লবণ খুঁটিঘরে শক্ত মেঝের ওপর স্তূপাকারে জমে থাকতো, মলঙ্গিদের স্থানীয় ভাষায় যাকে *মহারস কুন্ডি* বলা হত। *মহারস কুন্ডি*-র নিচের কয়েক ইঞ্চি স্তর মাটির সংস্পর্শে থাকার জন্য তা ধীরে ধীরে ক্ষরিত হত; সেই লবণাক্ত অবশেষ মিলেমিশে নীচের লবণ কমবেশি বিবর্ণ বা ঘোলাটে রূপ নিত। অন্যদিকে *মহারস কুন্ডি*-র উপরিতলের স্তূপীকৃত জমাট লবণ সাধারণত বিশুদ্ধ সাদাই হত। কিন্তু ‘চত্বর’ জমি বা মাটির চরিত্র অনুযায়ী, যা মূলত ছিল এঁটেল মাটি, কখনো সেই নুনের রং সাদাটে-বাদামী বা সাদা-লালচে আভার হয়ে উঠত। এই কারণে তমলুকের কিছু খালাড়িতে অত্যন্ত সাদামাঠা লবণ উৎপাদন হত বলেই হ্যামিল্টন জানিয়েছিলেন।[86] হ্যামিল্টনের পাশাপাশি উনিশ শতকীয় ব্রিটিশ লেখকদের বিবরণেও ভূ-বৈচিত্র্য অনুযায়ী লবণের রংয়ের বিবিধতা স্বীকৃত হয়েছিল। জে. জে. ম্যানলে যেমন লিখেছিলেন যে, ভারতে শিলা-লবণের রং সাদা থেকে ইঁট-লাল বা মাংস-র মতো লাল রংয়ের দেখতে হত।[87] অন্যদিকে ব্রিটেনের এসেক্স কাউন্টির ম্যালডনে যে কেলাসিত লবণ উৎপাদিত হত তা সাদার বদলে গোলাপি রংয়ের হত। জনরুচির চাহিদার্থে ‘টেবিল সল্ট’-কে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে তাতে বাহারি গোলাপি রং যোগ করা হত বলেই ম্যানলের বিবরণ থেকে জানা যায়।[88]

মাটির চরিত্রের পাশাপাশি স্থানীয় উৎপাদন ও পরিশোধন পদ্ধতিতে রদবদল করেও দেশীয় নুনের গুনগত মান ও শুভ্রতা বৃদ্ধি করা হত। চট্টগ্রামেই যেমন, মলঙ্গিরা দুই ধরণের লবণ উৎপাদন করত। ভুলুয়া, টিপ্পেরা ও কর্ণফুলি নদীর উত্তরে তৈরি হত জাত (Jat) লবণ। আর কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণে চট্টগ্রাম জেলায় তৈরি হত তেলিন্নিয়া (Telinneah) লবণ। একসময় পরিচ্ছন্ন এবং সাদা তেলিন্নিয়া লবণ জাত লবণের তুলনায়

---

[86] H. C. Hamilton, *Notes on the Manufacture of Salt in the Tumlook Agency*, Appendix B, dated September 23, 1852, Appendix to Salt Report,1854, 453.

[87] Manley, *Salt and other Condiment*, 27

[88] Ibid, 72-73.

অনেক উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হত। কোম্পানির আধিকারিক প্লাওডেন জানিয়েছিলেন যে, তেলিন্নিয়া লবণ যখন প্রথম উৎপাদিত হয়েছিল তখন তা পরিচ্ছন্নতা এবং শুভ্রতার নিরিখে বাংলায় আমদানি হওয়া সেরা পরিশোধিত লিভারপুল লবণের সমতুল্য ছিল। পরে জাত লবণের উৎপাদনে আরও বেশি যত্ন নেওয়া হলে তেলিন্নিয়া লবণের আগেকার প্রাধান্য স্বভাবতই খর্ব হয়েছিল। জ্বাল দেওয়ার সময় লবণ জলের ভাসমান গাদ ছেঁকে ফেলার পরিশোধন পদ্ধতি উন্নত করায় জাত লবণের পরিচ্ছন্নতা এবং শুভ্রতা বেড়েছিল।[89]

লবণের শুভ্রতা যে শুদ্ধতার একমাত্র মাপকাঠি নয়, বরং লবণের বর্ণ কোনো দেশের স্থানীয় ভৌগলিক ও পরিবেশগত মাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, এই দাবি পৃথিবীর অন্যত্রও শোনা গিয়েছিল। আমেরিকার প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যামুয়েল মিশেল, ১৮০৩-এর ২২ অক্টোবর, ডা. চার্লস ক্যাল্ডওয়েলকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, লিভারপুলের সাদা লবণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও দেখতে খুবই চিত্তাকর্ষক! মিহি গুঁড়ো আকার, মোহনীয় শুভ্রতা এবং আনুষঙ্গিক বাহ্যিক গুণাবলিতে লিভারপুল লবণ ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে, তাদের প্রলোভন উদ্রেক করে এবং যে কারণে বাজারে দ্রুত বিকোয়। মিচেল কটাক্ষের সুরে জানিয়েছিলেন যে, বাজারে নিজেদের পণ্যকে কিভাবে আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করতে হয় সে বিষয়ে লিভারপুলের লবণ উৎপাদনকারীরা রীতিমতো দক্ষ ছিলেন।[90] অন্যদিকে কানাডার অন্টারিও এগ্রিকালচারাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক সি.সি. জেমস যেমন বিদেশি লিভারপুল লবণ ও স্থানীয় কানাডার লবণের মধ্যে তুলনামূলক রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণে লিভারপুল লবণের নমুনায় সামান্য নীলচে আভা দেখা গিয়েছিল, যেখানে কানাডিয়ান লবণের দুটি নমুনায় হালকা লালচে ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। অধ্যাপক জেমসের মনে হয়েছিল যে লবণ দ্রবণের কাছে বা তার মধ্যে প্রাণীজ খোলসের উপস্থিতির জন্যই লবণে লালচে আভা দেখা গিয়েছিল। অন্যথায়, এই লাল রঙ লোহার জন্য ও হতে পারে বলে জেমস তাঁর বিশ্লেষণে তুলে ধরেছিলেন।[91] তুলনামূলক রাসায়নিক বিশ্লেষণে লিভারপুল লবণের শুভ্রতার দাবি খণ্ডন করলেও অধ্যাপক জেমস অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, আদর্শ

---

[89] G. Plowden, *Notes on the Manufacture, Storage, Sale, and Delivery of Salt in Chittagong Agency*, Appendix C, No. 2 in Appendix to Salt Report,1854, 478-479.

[90] Samuel L. Mitchill & Edward Miller, *The Medical Repository, and Review of American Publications on Medicine, Surgery, and the Auxiliary Branches of Science*, 1804, 243

[91] Report of the Professor of Chemistry, *Twelfth Annual Report of the Ontario Agricultural College and Experimental Farm*, 1886 Sessional Papers No. 6 Part III *in First Session of the Sixth Legislature of the Province of Ontario,* Vol. XIX, Part II, Toronto: Warwick, 1887, 101

লবণের সম্পূর্ণ সাদা হওয়া উচিত।[92] উনিশ শতকে শুধু লবণ নয়, বিবিধ পণ্যের শুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে শুভ্রতাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে হাতিয়ার করা হয়েছিল। উপনিবেশে বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ এবং পণ্য বর্ণবাদ কীভাবে মিলিত হয়েছিল এবং একে অপরকে ধারণ করেছিল সাম্প্রতিক গবেষণায় তার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হল-ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় প্রতিষেধক হিসেবে কুইনাইনের বর্ণ বিতর্ক। ঔপনিবেশিক ভারতে উনিশ শতকীয় সরকারি নথিতে বিশুদ্ধ কুইনাইনের একমাত্র মান্যতা ছিল 'সাদা পদার্থ' হিসেবে, যা 'সুন্দর, দীর্ঘ সূঁচের' মতো স্ফটিকায়িত, স্বাদে তিক্ত এবং মিষ্টি গন্ধযুক্ত। অন্যদিকে অশুদ্ধ কুইনাইনের রং প্রায়শই বাদামি, হলুদ বলে গণ্য হত। শুধু তাই নয়, ঔপনিবেশিক আমলাদের এমনও সতর্কীকরণ ছিল যে, ভারতীয় আবহাওয়া এবং স্থানীয়দের সংস্পর্শে এলে সাদা কুইনাইনের বিশুদ্ধতা দূষিত হতে পারে।[93] এই প্রেক্ষিত থেকে স্পষ্ট যে, বিশুদ্ধ কুইনাইন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বিশুদ্ধ কুইনাইনের বস্তুগত বিন্যাস এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি শুধু নিবিড় গ্রন্থিতে আবদ্ধ ছিল না, একে অপরকে গঠিত করেছিল।[94]

উনিশ শতকে লবণের বর্ণ বিতর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রসূত ইয়োরোপীয় আধুনিক শুদ্ধতার ধারণা উপনিবেশে পাল্টা প্রতিরোধী বয়ানের সম্মুখীন হয়েছিল। কারণ, ভারতীয় নুনের গুণমান ও বর্ণ উভয়েই একদিকে যেমন স্থানীয় মৃত্তিকা, উৎপাদন ও পরিশোধন পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করত তেমনই অন্যদিকে দেশীয় জনরুচি, ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ীও নির্ধারিত হত। তাই গুণমান ও শুভ্রতা-র নিরিখে বাংলার লবণের তুলনায় লিভারপুল লবণ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করলেও দেশীয় জনরুচিতে তা প্রত্যাখাত হয়েছিল। কোম্পানির আমলা পার্কার সাহেব স্পষ্টতই তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, নুনের গুণমান নিয়ে ভারতীয়রা বিশেষ ভাবতেন না। বরং ধর্মীয় সংস্কারের বশবর্তী হয়ে যে নুন ভারতীয়রা মুখে তুলতে অভ্যস্ত ছিলেন তার বর্ণ ধবধবে সাদা নয়, বরং ঘোলাটে বা কালচে হত। লবণ সাদা হলে তাতে যে লবণের স্বাদ কমে যায় এমন ধারণাতেও ভারতীয়রা বিশ্বাস করতেন। হাতে গোণা কিছু ভারতীয় হয়তো তখন ব্যতিক্রম ছিলেন, যারা পার্কারের মতে, 'ইওরোপীয় অভ্যাস ও ধারণাকে গ্রহণ' করেছিলেন।[95] এখানে লক্ষণীয় যে, কোম্পানির

---

[92] Ibid.

[93] Rohan Deb Roy, *Malarial subjects: Empire, Medicine and Nonhumans in British India, 1820-1909* (UK: Cambridge University Press, 2017), 214.

[94] Ibid., 215.

[95] Minute by H. M. Parker, Esq., Junior Member of the Board of Customs, Salt and Opium. Dated the 2nd of November, 1835. Appendix E. No. 8, 560.

আমলারা ভারতে লবণের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের চেয়ে দেশীয় জনরুচি ও ধর্মীয় সংস্কারের দিকটিকেই তুলে ধরেছিলেন। অন্যভাবে বললে, পণ্যের গুণমান নির্ধারণে সাম্রাজ্যিক শুদ্ধতার যে ধারণা ছিল তার বিপরীতে ভারতীয় শুদ্ধতা তথা শুচিতার ধারণা পেশ করেছিলেন।

।। ৪।।

অশুচিতায় বিদ্ধ বিদেশি লবণ: উপনিবেশের প্রতিরোধী বয়ান

ভারতীয় জনরুচিতে কেন বিদেশি লবণ গৃহীত হয় না তার কারণ জানতে ব্রিটিশদের যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। সিলেক্ট কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যে রামমোহন জানিয়েছিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ লবণের আমদানি হলে কিছু পেশাদার ব্রাহ্মণ তাতে ঘোরতর আপত্তি জানাবেন! তবে সাধারণ মানুষ দেশীয় বা বিদেশি লবণের মধ্যে কোনো বাছ-বিচার না করে অত্যন্ত খুশি হয়েই তা গ্রহণ করবেন। ভারতীয় জনরুচি যে আধুনিক হয়ে উঠছে তার উদাহরণ সিলেক্ট কমিটিতে পেশ করেছিলেন। যেমন, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশীয় লোকেরা ইয়োরোপীয়দের তৈরি সোডা-ওয়াটারের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ব্যবহার করতেন, এমনকি তাদের মধ্যে ইয়োরোপ থেকে আমদানিকৃত মদের ব্যবহারও সেইসময় যথেষ্ট বেড়েছিল।[96] এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, উচ্চবর্গীয় (Elitist) রুচির মানদণ্ডে রামমোহন আমজনতার লবণ ব্যবহারের দিকটি বিচার করেছিলেন। তাঁর অভিহিত এই দেশীয়রা ছিলেন কলকাতা কেন্দ্রিক সচ্ছল, সম্ভ্রান্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষ, নুন আনতে পান্তা ফুরোনো দরিদ্রসাধারণ নয়। রামমোহনের অভিমত সমর্থন করে ব্রিটেনের *মর্নিং হেরাল্ড* পত্রিকা লিখেছিল, যেসকল ভারতীয় নির্বিচারে বিদেশি জল গ্রহণ করেন তারাই বিদেশি নুন খেতে বিদ্রোহ করবেন এমন ভাবনা অমূলক।[97] মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থনে এই 'আধুনিক' জনরুচির যুক্তি উপনিবেশে সত্যিই কতখানি গৃহীত হয়েছিল তা বুঝতে লবণের মূল অপরিহার্য উপাদান জলের উদাহরণ দিয়েই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় গঙ্গার জল পাইপ বা প্রণালীর মাধ্যমে বাড়িতে সরবরাহের ব্রিটিশ সরকারি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দেশীয় হিন্দুরা গঙ্গার কৃত্রিম প্রণালীবাহিত জলের বিরোধিতা

[96] Appendix No. 140, *Minutes of Evidence*, 685-686.

[97] Morning Herald, (No date, 1846) in *The Press Versus*, 37.

করেছিলেন মুখ্যত দুটি কারণে। প্রথমত, হিন্দুদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, এই প্রকল্পে চাঁদপাল ঘাটে জল উত্তোলনকারী ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ তৈলাক্ত করতে [Grease] পশুচর্বি ব্যবহৃত হয় যা হিন্দুদের পবিত্র পশুর দেহজাত! দ্বিতীয়ত, এটি ইউরোপীয় প্রকল্প এবং শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। তাই যারা জাতপাত কঠোরভাবে মেনে চলেন তারা এতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন।[98] তাছাড়া হিন্দুরা স্বজাতিভুক্ত জল বহনকারী ছাড়া নিম্নজাতিভুক্ত এবং ভিন্নসম্প্রদায়ের মানুষের হাত থেকে জল গ্রহণ বা স্পর্শ করতেন না, তা অশুচি বলে গণ্য করতেন বলেই এই প্রকল্পের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার-আধিকারিক সিমস সাহেবের প্রতিবেদনে প্রতিভাত।[99] এই প্রেক্ষিতে কিভাবে নতুন যন্ত্রপাতিতে পশুর চর্বি ও চামড়ার ব্যবহার এড়ানো যায়; সর্বোপরি, এই কাজের তত্ত্বাবধানে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করে সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা— তা কিন্তু তাঁকেই ভাবতে হয়েছিল।[100] আধুনিক পদ্ধতিতে জল সরবরাহ করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক আধিকারিকদের শুরুতেই অশুচিতা ও জাতপাতের প্রশ্নে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শুচিতা বনাম অশুচিতার এই ধারণা জাতি ব্যবস্থা এবং হিন্দু ধর্মীয় আচারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারতীয় সমাজে জাতি ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়তাকে সূচিত করে ‘ক্রমোচ্চতা, সমকূলে বিবাহ, বংশানুক্রমিক কৌলিক পেশা অবলম্বন, একত্রে পান-ভোজনে নিষেধাজ্ঞা, অস্পৃশ্যতা’— এই পাঁচটি স্বতন্ত্র চিহ্নক।[101] যদিও মনে রাখতে হবে যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি একই অবয়বে উপমহাদেশের সর্বত্র একই সময়ে পরিলক্ষিত হয় না। ১৯৭০-এর দশকে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ লুই দুমোঁ অবশ্য তাঁর “Homo Hierarchicus” গ্রন্থে বিতর্ক উসকে দিয়ে দাবি করেছিলেন যে, শুচিতা-অশুচিতার ধর্মীয় চেতনাই ভারতীয় সমাজকাঠামোর নির্ধারক। এই সমাজ কাঠামোর মৌল বিশিষ্ট্য যে ক্রমোচ্চবিন্যাস [Hierarchy] তার শীর্ষস্থানে ব্রাহ্মণের অবস্থান। ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রিত শুচিতার মানদণ্ডে প্রতিটি জাতির পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়।[102] যদিও ভারতীয় সমাজে জাতপাতের জটিলতার প্রেক্ষিতে দুমোর ধারণা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতেই যেমন

---

[98] F. W. Simms, *Report on the Establishment of Water-Works to Supply the City of Calcutta* (Calcutta: Military Orphan Press, 1853), 51.

[99] Ibid., 25.

[100] Ibid., 26.

[101] Edmund Leech, *Aspects of Caste in South India, Ceylone and South India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).

[102] Louis Donumont, *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications* (Chicago: The University of California Press, 1970).

জাতিগুলির পদমর্যাদা শুচি-অশুচির মানদণ্ডে নয়, বরং রাজপদ থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত।[103] তবে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায়, সামাজিক পরিসরে ধর্মীয় শুচি-অশুচির মানদণ্ডটি ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রিত ছিল। জল ব্যবহারকে কেন্দ্র করে জাতিভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর জলচল ও অজলচল বা জলঅচল অবস্থান ব্রাহ্মণ্য বিধানেই নির্দেশিত হয়েছিল।[104] একইভাবে লবণ-জল থেকে প্রস্তুত লবণের শুচিতা-অশুচিতাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য বিধিনিষেধও বেশ জোরালো ছিল।

উনিশ শতকের বাংলায় নুন নিয়ে জাত ধর্মের বাছ-বিচার যে সমাজে প্রবল ছিল তা স্পষ্ট হয় আনুষ্ঠানিক একত্রভোজনে আলুনি বা বিনা নুনের তরকারি পরিবেশনের রীতিতে। কারণ তরকারিতে নুন দিলে স্পর্শদোষ হত, ব্রাহ্মণেরা পাত ছেড়ে উঠে যেতেন। 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা'-তে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'তখনকার দিনে কলাপাতায় বড় বড় লুচি দিত আর আলুনী কুমড়ার ছক্কা; বড় সুন্দর হইত এবং কলাপাতার এক কোণে একটু নুন দিত'।[105] আবার ঔপনিবেশিক আধুনিক অভিঘাতে বাঙালির লবণ রুচির পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন, 'তারপর হঠাৎ ইংরাজী পড়ার ঠেলায় নুন দেওয়া ছোলার ডাল বাহির হইলেন এবং নুন দেওয়া আলুর দম প্রকাশ পাইলেন এবং আলুনী ঠাণ্ডামূর্তি কুমড়ার ছক্কা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন, তিনি আর ভদ্রলোকের পাতে প্রকাশ পাইতেন না'। একসময় জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপনয়নের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং দেখেছিলেন যে, 'তখন নুন দেওয়া তরকারী খাবার প্রচলন হইয়াছে'।[106]

উনিশ শতকে লবণের শুচিতা-অশুচিতার প্রশ্নে ব্রাহ্মণ্য বিধিনিষেধ প্রবল হয়েছিল বিদেশি লিভারপুল লবণকে কেন্দ্র করে। হিন্দুদের আশঙ্কা ছিল বিদেশি লবণ ব্যবহার করলে তাদের জাত-ধর্ম নষ্ট হবে। এই আশঙ্কা ছিল অনেকটা গঙ্গার জল সরবরাহের আধুনিক প্রকল্পটির মতোই; অর্থাৎ দেশীয় জনতার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সমুদ্রপথে পরিবহণ কালে বিদেশি নুন জাহাজের পাটাতনে ব্যবহৃত পশুচর্বি, পাম্প লেদার, বা যে কোনো পশুচর্ম জাত জিনিস ছুঁয়ে থাকতে পারে![107] হিন্দুদের কাছে বিদেশি নুন অশুদ্ধ গণ্য হওয়ার আর একটি

---

[103] Nicholas Dirks, *The hollow Crown: Ethnohistory of an Indian Kingdom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).

[104] Hitesh Ranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal* (Calcutta: Papyrus, 1981), 38.

[105] মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা* (কলকাতা : মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩), ৭০।

[106] তদেব, পৃ. ৭১।

[107] Minute by H. M. Parker, Junior Member of the Board of Customs, Salt and Opium. Appendix E. No. 8, November 2, 1835, 546.

কারণও ছিল। আমজনতার দৃঢ় সন্দেহ ছিল যে, বিদেশি ব্রিটিশ লবণ পরিশোধন প্রক্রিয়ায় প্রাণীদেহের হাড়ের গুঁড়ো ব্যবহৃত হত! বাংলার গ্রামাঞ্চলেও হিন্দুদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বীরভূমেই যেমন বিলাতি নুন গ্রহণে হিন্দুদের অনীহা ছিল, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে সেই নুন পরিশোধিত হয়ে এদেশে এসেছিল।[108] স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে একটি দেশীয় পত্রিকা লিখেছিলে যে, লিভারপুল থেকে পাঙ্গা লবণ যখন প্রথম ভারতে আমদানি হয়েছিল তখন হিন্দুরা তাতে 'অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত মনে করিয়া ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন'; সেকারণেই হিন্দুরা বিভিন্ন স্থানের 'কর্কচ অর্থাৎ ডেলা লবণ নিজ নিজ গৃহে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতেন'। যদিও সময়ের সাথে সাথে 'সে ভ্রম অপসারিত হইয়াছে' এবং হিন্দুরা সব রকমের লবণ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বলে সাময়িকপত্রটি থেকে জানা যায়।[109]

উনিশ শতক জুড়ে শুধু বাংলাতেই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিদেশি লবণের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ চেশায়ার লবণের বিরুদ্ধে জনমানসে এমনই দৃঢ় সংস্কার ছিল। ১৮৩০-এর মাঝামাঝি সময়ে, বিহারের সারণ জেলাজুড়ে লবণকে কেন্দ্র করে এমনই জাত-ধর্ম নষ্টের অভিযোগ উঠেছিল। চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বাজারগুলিতে বিক্রীত লবণের মধ্যে, হিন্দুদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য, বিভিন্ন প্রাণী ও গবাদি পশুর হাড়ের গুঁড়োর আস্তরণ রয়েছে! সিভিল সার্জন রবার্ট র‍্যাঙ্কিন এই গুজবকে 'হাস্যকর গল্প' ও 'অযৌক্তিক খবর' হিসেবে উড়িয়ে দেন। যদিও এই গুজব হিন্দুদের মধ্যে সঙ্গতভাবে ক্ষোভ তৈরি করেছিল এবং লবণ-ব্যবসায়ীদের বয়কট করার ইন্ধন জুগিয়েছিলে। কারণ, তাদের 'আশঙ্কা ছিল যে' সেই 'লবণ ব্যবহার করলে জাত নষ্ট হবে'।[110] উনিশ শতকে মাদ্রাজে দেশীয় জনতার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, নোংরা লবণ পরিশোধন করে যেমন দেশের সাধারণ খুচরো লবণ তৈরি হয়, তেমনই বিদেশাগত সব বিশুদ্ধ সাদা লবণই রক্ত, হাড় ইত্যাদি দিয়ে পরিশোধিত হয়।[111] ব্রিটিশ সামরিক সার্জন জে. জে. এল. র‍্যাটন মনে করেছিলেন যে, রক্ষণশীল মানসিকতার জন্যই ভারতীয়রা নতুন কিছু, বিশেষতঃ বিদেশির প্রতি সদা সন্দিহান থাকেন। র‍্যাটনের মতে অবশ্য এই সন্দেহ অমূলক ছিল না। ইয়োরোপীয়দের চাহিদা মেটাতে হ্যাম, বেকন, চিজ ইত্যাদি চেশায়ার লবণে সংরক্ষিত

---

[108] Ranjan Kumar Gupta, *The Economic Life of a Bengal District Birbhum 1770-1857* (The University of Burdwan, 1984), 227.

[109] *মহাজন বন্ধু*, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১০, পৃ. ১৪।

[110] Robert Rankine, *Notes on the Medical Topography of the District of Sarun* (Calcutta: G. H. Huttmann, 1839), 20, cited in David Arnold, *Toxic Histories, Poison and Pollution in Modern India* (UK: Cambridge University Press, 2016), 80-81.

[111] J. J. L. Ratton, *A Handbook of Common Salt* (Madras: Higginbotham and Co. 1877), 254-55.

হয়ে আসার জন্য স্থানীয় জনতার মধ্যে আরো তীব্র আশঙ্কা, বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। মাদ্রাজীদের আশঙ্কা ছিল মূলতঃ শূকর নিয়ে, যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে-বিচারে অশুচি, দূষিত প্রাণীরূপে গণ্য হত। খোলাবাজারে বিক্রির জন্য ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে আসা চেশায়ার লবণ যে ইয়র্কশায়ারের হ্যাম ছোঁয় নি তা নিশ্চিত করে বলা কারো পক্ষে সম্ভব কি না— সে বিষয়ে র‍্যাটন নিজেই সন্দিহান ছিলেন![112]

ভারতীয় আমজনতার এই ধর্মীয় সংস্কারজনিত পক্ষপাত যা বিদেশির প্রতি সন্দিহান, বিরূপ মনোভাবাপন্ন তাই যে লবণের মতো পণ্যের চাহিদা তথা বাজার অর্থনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক তা ঔপনিবেশিক আধিকারিকদের বিবরণেও ফুটে ওঠে। ১৮৫০-এর দশকের শেষেও বাংলার বাজারে লিভারপুল লবণের তেমন চাহিদা ছিল না বলে ইংরেজ আধিকারিকেরা জানিয়েছিলেন। লিভারপুল ও অন্যান্য বিদেশি লবণ বিশুদ্ধ, গুণগত মানে দেশীয় লবণের থেকে ভালো হওয়া সত্বেও সরকারি গোলায় পছন্দমাফিক দেশীয় নুন বিক্রির জন্য তোলা হলে কারবারীদের মধ্যে তা কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। এই বিষয়টি সরকারকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছিল। 'বোর্ড অব রেভেনিউ'-র তরফে অ্যাশলে ইডেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এর কারণ হিসেবে বিদেশি লবণ সম্পর্কে হিন্দুদের মধ্যে পূর্ব-সংস্কারকে দায়ী করেছিলেন।[113] বোর্ড অফ কাস্টমসের জুনিয়ার মেম্বার এইচ. এম. পার্কার এর সত্যতা যাচাই করতে নিজের অফিসেই এক পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কলকাতার কয়েকজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের কাছে সরাসরি জানতে চেয়েছিলেন তাঁরা কি লবণ খান, এমনকি তার নমুনা আনতেও বলেছিলেন! ইয়োরোপীয়দের সাথে ডিনার টেবিলে যোগ দিয়েও কেন তাঁরা ব্রিটিশ সাদা লবণ ব্যবহার করেন না তাও জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে হিন্দুরা প্রত্যেকেই একসুরে বলেছিলেন যে, দেশীয় কালচে নুনেই তারা অভ্যস্ত, খামোখা সাদা নুন খাবেন কেন; তাছাড়া নুন সাদা হলে স্বাদও নষ্ট হয়![114] ভারতীয়দের স্বাদ ও রুচির ভিন্নতা যে ইয়োরোপীয়দের পক্ষে সহজে বোঝা সম্ভব ছিল না তা পার্কার স্পষ্টতই নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শুধু দেশীয় কালচে লবণই নয়, জ্যান্ত নয় এমন মাছ, বা নরম টসটসে-পাকা আম কেন হিন্দুরা পছন্দ করেন তা বুঝে উঠতে নিজের অপারগতার কথাও তিনি

---

[112] Ibid.

[113] Ashley Eden to the Secretary to the Government of Bengal, Fort William, 12 February, 1862 No.169, in *Report on the Result of the Administration of the Salt Department During the Year 1860-61* (Calcutta: 1862), 5.

[114] H. M. Parker, Appendix E. No. 8, 546.

জানিয়েছিলেন। লবণ সংস্কার প্রসঙ্গে পার্কার সাহেব আরো জানিয়েছিলেন যে, হিন্দু স্বদেশীয়দের এক বড় অংশই জাহাজে আনা যে কোনো লবণ, এমনকি তা মাদ্রাজের হলেও খেতে অস্বীকার করতেন।[115]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও এই বদ্ধমূল সংস্কারের জন্য বিদেশি লবণ কারবার কিভাবে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিল র‍্যাটন সাহেবের বিবরণে তার এক খতিয়ান মেলে। ১৮৭২-এর আগস্টে মাদ্রাজে এক ইয়োরোপীয় ফার্ম ৩৬১ টন চেশায়ার নুন আমদানি করে; কিন্তু এক বছর পরেও, ১৮৭৩-এর অক্টোবর মাসের মধ্যে দেশীয় বাজারে বিক্রি করতে ব্যর্থ হয়। লোকসান এড়াতে ১৬.৫ টন বিদেশি নুন মুফতে বিলিয়ে দিয়ে বাকিটা 'অপরিচ্ছন্ন দেশীয় নুনের' দামে মণ পিছু ২ টাকাতে বিক্রির চেষ্টা করলেও তা কাজে দেয়নি। শেষে ফার্মটি নিরূপায় হয়ে এই জাহাজি নুন কলকাতায় চালান করে দেয়।[116] ব্রিটিশ রাজের সূচনার সাথে সাথে অবশ্য কলকাতা তথা বাংলায় এই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হয়। ১৮৬০-৬১ নাগাদ দেখা গেল লিভারপুল লবণ বাংলার বিভিন্ন জেলায় অবাধে বিকোচ্ছে। এদের মধ্যে এমন বহু জায়গা ছিল যেখানে বিগত বছরেও লিভারপুল লবণের দেখা মেলে নি অথবা বিক্রি করতে গেলে 'অজ্ঞ গ্রামবাসীরা বরদাস্ত করত না'। সরকারি আমলারা তাতে খানিক আশ্বস্ত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন যে বিদেশি পাঙ্গা লবণের বিরুদ্ধে পুরোনো এই কুসংস্কারের শেকড় উপড়ে ফেলা গেছে।[117] তাদের আশ্বস্ত হওয়ার অন্য এক দিকও ছিল। লবণের অশুচিতাকে কেন্দ্র করে মানুষের 'মহা ভীতি' কিভাবে গণ-উন্মত্ততার রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে তারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

।। ৫।।

আনুগত্য থেকে বিশ্বাসহীনতার আখ্যান : মহাবিদ্রোহে লবণ

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অন্যতম ইতিহাস রচয়িতা জন কে তাঁর বিবরণে তুলে ধরেছিলেন কিভাবে উনিশ শতকের শুরু থেকেই লবণ সহ অন্যান্য খাদ্যপণ্যকে কেন্দ্র করে দেশীয় জনসমাজে জাত-ধর্ম নষ্টের আশঙ্কা তীব্রতর হয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠিত হয়েছিল। যেমন, ১৮০৬ সালে ভেলোর সেনা-বিদ্রোহের আগে সেখানে বাজারজুড়ে ঘুরতে থাকা

[115] Ibid.

[116] Ratton, *A Handbook*, 255.

[117] Ibid., 7.

কয়েকটি “উদ্ভট গল্পের” (preposterous stories) অন্যতম ছিল লবণ অশুদ্ধকরণের গুজব। কোম্পানির অফিসারেরা সমস্ত নতুন লবণ একজায়গায় জড়ো করে দুটি বিশাল স্তূপ তৈরি করে তার একটিতে শূকরের রক্ত এবং অন্যটির উপরে গরুর রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল! তারপর সেই লবণ সারা দেশে বিক্রির জন্য তারা পাঠিয়ে দিয়েছিল যাতে মুসলমান এবং হিন্দুদের ধর্মনাশ ও অপবিত্রকরণ হয় এবং সবাইকে ইংরেজদের মতো একই জাত এবং একই ধর্মে আনা যায়! এই আষাঢ়ে গল্প ছড়িয়ে পড়লে পর কেউ কেউ লবণ খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিল। অনেকে বাড়িতে বেশি দামে লবণ কিনে মজুত রাখতে শুরু করেছিল যখন তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে, সেই লবণ ছিল পুরোনো, বাজারে ফিরিঙ্গীদের ঘৃণ্য ঘটনার আগেই তা দোকানে মজুত ছিল।[118]

মহাবিদ্রোহের প্রাককালে, ১৮৫৭-র মার্চ মাসে, কলকাতার পনের মাইল উত্তরে বারাকপুর সেনানিবাসে, ৪৩ নম্বর বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির মেজর ম্যাথুজ তার সিপাহীদের কাছ থেকে এক বেনামী আবেদনপত্র পেয়েছিলেন। সেই আবেদনপত্রে লবণকে ঘিরে ভারতীয় সেনাদের জাত-ধর্ম নষ্টের আশঙ্কা তথা অবিশ্বাস ফুটে উঠেছিল: “লর্ড সাহেব কোম্পানি থেকে আদেশ পেয়েছেন, যা তিনি সকল কম্যান্ডিং অফিসারকে দিয়েছেন— দেশের ধর্ম ধ্বংস করার জন্য। আমরা এটা জানি, যেহেতু সরকার সব জিনিস কিনে নিচ্ছে। লবণ বিভাগের অফিসারেরা লবণের সাথে হাড় মিশিয়ে দিচ্ছেন।”[119] লবণের অশুচিতা নিয়ে মানুষের ‘মহাভীতি’ [Great Fear] গুজবের মধ্য দিয়ে দ্রুত দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কচ্ছের রণ থেকে রাজস্থানে লবণ নিয়ে যাওয়ার সময় লাল গিরিমাটি বা সিঁদুর বইবার বস্তা ব্যবহৃত হয়েছিল। তার ফলে লবণের রং বদলে গিয়েছিল। মূহূর্তের মধ্যে গুজব ছড়িয়েছিল যে, গরুর রক্তে সেই লবণ অপবিত্র করা হয়েছে।[120] আমেদাবাদ এবং গুজরাট জুড়ে রটে গিয়েছিলে যে, খ্রিষ্টান ধর্মে বলপূর্বক দীক্ষিতকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ রূপে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই উপায়ে মানুষের জাত নষ্ট করছে।[121] কে (Kaye)-র বিবরণ থেকে জানা যায়, এই সন্দেহ কেবল সামরিক শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণ জনগণকেও বিক্ষুব্ধ, অশান্ত করে তুলেছিল। দেশের

---

118 John William Kaye, *A History of the Sepoy War in India, 1857-58*, Vol. I, (London: W.H. Allen & Co., 1864), 248.

119 Ibid

120 Gazetteer of the Bombay Presidency, Volume I, part I, (Bombay: Government Central Press, 1896) 433, also cited in Kim A. Wagner, The Great Fear Of 1857: Rumours, Conspiracies and the making of the Indian Uprising (Oxford: Peter Lang, 2010) 70.

121 Ibid.

সর্বত্র অশান্তি তৈরি করার অভিপ্রায়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীরা, কোম্পানি ও রাণীর আদেশে, হাটে বিক্রি হওয়া নুনের সাথে হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছে।[122]

ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয় সেনাদের কাছে লবণ অশুদ্ধকরণ তথা দূষণের গুজবগুলি যেন নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকতার নির্দেশক হয়ে উঠেছিল। পিতৃপ্রতিম ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যে তার অনুগত সেনা তথা অধীনস্থ প্রজাদের রক্ষা করতে অক্ষম এবং অস্বীকৃত হয়েছিল— এমন বিশ্বাসহীনতার বয়ানই গুজবের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে আরো চমকপ্রদ হল, বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাহিরা ব্রিটিশ সরকারের বয়ানে লবণের [হিন্দিতে নমক] প্রতি বিশ্বাসঘাতক বা 'নমকহারাম' বলে গণ্য হয়েছিল। আর যেসব ভারতীয় সিপাহিরা ব্রিটিশ অনুগত থেকে মহাবিদ্রোহ দমনে সহায়তা করেছিল তারা লবণের প্রতি বিশ্বস্ত তথা 'নমকহালাল' বলে সামরিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। 'নমকহালাল' ধারণাটি আরবীয় সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত যেখানে অতিথি রুটি ও লবণ গ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক সুরক্ষার বন্ধনে আবদ্ধ হতেন।[123]

প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বেই ভারতে রাজনৈতিক আনুগত্যের শপথ জাতিগতভাবে নিরপেক্ষ লবণ ধারণার উপর, বিশেষত রাজনৈতিক উর্ধ্বতনের 'লবণ [নমক] খাওয়ার' ওপর, ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। "লবণ খাওয়া" বা "লবণের প্রতি বিশ্বস্ততা"-র শপথের মধ্য দিয়ে পৃষ্ঠপোষক ও তার অনুগৃহীতরা পারস্পরিক সুরক্ষা ও আনুগত্যের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হতেন। মুঘল রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যেমন সুসংহত "লবণ" মতাদর্শের মধ্য দিয়ে সম্রাট থেকে নিম্নতম সেবক পর্যন্ত, সকলেই পারস্পরিক দায়বদ্ধতায় একসূত্রে বাঁধা পড়েছিলেন। পারসিক-ইসলামীয় মার্গ সংস্কৃতির প্রভাবে "লবণ" শব্দটি এখানে বহুস্তরীয় অর্থে প্রতিভাত, যাতে একযোগে সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি অতিমানবীয় পর্যায়ে সুরক্ষা ও নির্ভরতার ধারণা পরিস্ফূট হয়।[124] মুঘল সামরিক সংস্কৃতিতে লবণ মতাদর্শ শাসকীয় আনুগত্যের সাথে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। ১৬১২-তে বাংলায় বিজয়ী সেনাধক্ষ্য ইসলাম খান বিজিত আফগানদের পদমর্যাদা অনুযায়ী মুঘল সম্রাটের 'লবণ' বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ, মীর্জা নাথনের কথায়, "একজন মুসলমানের কাঁধে নিজের লবণের প্রতি

---

[122] John William Kaye, *A History of the Sepoy War*…P. 568

[123] Leila Shaheen "Manners in the Middle East," Saudi Aramco World, 16:2 (March/ April 1965) available at: https://archive.aramcoworld.com/issue/196502/manners.in.the.middle.east.htm [last accessed on 12.08.2024]

[124] Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760* (University of California Press, 1996), 178.

বিশ্বস্ত থাকার চেয়ে বড় কোনো দায়ভার থাকতে পারে না”।[125] লবণ মতাদর্শ সম্রাটের সঙ্গে সরাসরি এবং সেনাদের নিজেদের মধ্যেও আনুগত্য ও ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করত, বিশেষত পুরো বাহিনী যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হত। রাজপুতদের মতো যোদ্ধাগোষ্ঠী মৃত্যুর সময়েও যার লবণ খেয়ে এসেছেন তার প্রতি আনুগত্যে অবিচল থাকতে 'নমক হালাল' ধারণাকে তুলে ধরতেন।[126]

ভারতের সাথে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক যোগসূত্রের মধ্য দিয়েই প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের রাজনৈতিক লবণের শপথের অর্থ আধুনিক ইংরেজিতে প্রবেশ করে। 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' রচয়িতা রুডিয়ার্ড কিপলিং যেমন হালকা চালে লিখেছিলেন: "I have eaten your bread and salt,/ I have drunk your water and wine;/ The deaths ye died I have watched beside,/ and the lives ye led were mine."[127] সৈনিকদের বেতনকে 'লবণ' বা 'নমক' বলে অভিহিত করার রীতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তন করেছিল, যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও প্রচলিত হয়েছিল।[128] ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে ভারতীয় অফিসার ও সৈন্যদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তুলতে লবণ উপমার নিরন্তর ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মতো। মেজর ক্রফোর্ড চেম্বারলেন ১৮৫৭-র ১৪ জুন মুলতানে বাহিনীর দেশীয় সদস্যদের তিরস্কার করেছিলেন নুনের প্রতি অবিশ্বস্ত তথা 'নমক হারাম' হওয়ার জন্য।[129] তার কিছুদিন আগেই, ১৮৫৭-এর ৯ জুন লাহোরে ৩৫ লাইট ইনফ্যান্ট্রির মেজর ক্রফোর্ড চেম্বারলেন দেশীয় অফিসার এবং সৈন্যদের জমায়েতে তার বক্তব্যে সরকার কিভাবে ভারতীয়দের জাত ও ধর্মীয় শুদ্ধতা রক্ষা করতে তৎপর তা ব্যক্ত করেছিলেন। তার অব্যবহিত পূর্বেই রেজিমেন্টের দুই দেশীয় সেপাইকে 'নমক হারাম' হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে গুলি করে মারা হয়, কারণ তারা রাজদ্রোহমূলক বক্তব্য রেখে সরকারের বিরুদ্ধে সহকর্মীদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। চেম্বারলেন রেজিমেন্টের দেশীয় সদস্যদের মনে করিয়ে দেন যে, দোষী সেপাইয়েরা যেহেতু ব্রাহ্মণ ছিলেন তাই তাদের গুলি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে; ফাঁসি দেওয়া হয় নি, কারণ ফাঁসুড়ে নীচু 'মেথর' জাতভুক্ত। ফাঁসি দিলে অস্পৃশ্য ছোঁয়ায় ব্রাহ্মণ শরীর দূষিত হবে যে! নির্মম হত্যার পেছনেও সরকারের মহত্বের নজির তুলে ধরার

125 Ibid., 179.

126 Kaushik Roy, *Hinduism and the Ethics of Warfare in South Asia: From Antiquity to the Present* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), xvi, 183–84.

127 Departmental Ditties, 1886, Prelude, st.1.

128 Dirk A. Kolff, *Naukar, Rajput and Sepoy: The Ethnohistory of the Military Labour Market in Hindustan, 1450–1850* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 20.

129 Ibid, 125.

এমন ব্রিটিশ প্রহসন শেষ হয়েছিল এক সতর্কবার্তায়। চেম্বারলেন সেপাইদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা প্রত্যেকে তাদের নুনের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকার যে শপথ নিয়েছে তা যেন পালন করে। এই পবিত্র শপথ পালন করলে কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।[130] সৈন্যদের মধ্যে যারা 'নমকহালাল' অর্থাৎ কোম্পানির লবণের প্রতি সত্য ও বিশ্বস্ত থাকবেন তাদের পুরস্কার ও ভালো যত্নের আশ্বাস দিয়েছিলেন স্যার হেনরি ক্রফোর্ড। লখনৌ ক্যান্টনমেন্টে তিনি সুবেদার ও হাবিলদারদের এই জন্য একটি চমৎকার বাঁকানো তরবারি, একজোড়া সুন্দর শাল, একটি জোব্বা, চার টুকরো নকশি কাপড় উপহার দিয়েছিলেন। অন্যদিকে সেপাইদের দিয়েছিলেন একটি সুন্দর তরবারি, পাগড়ি, বস্ত্র খণ্ড এবং নগদ ৩০০ টাকা।[131] লবণ যদি একাধারে সিপাহিদের নির্ভরতা এবং আনুগত্যের প্রতীক হয়ে থাকে, তাহলে বিদেশি শাসক ইচ্ছাকৃতভাবে, বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রতারণামূলক পন্থায় দূষণ ও ধর্মান্তরের মাধ্যমে সেই লবণকেই সম্পূর্ণ দাসত্বের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে— এমন ধারণাই মহাবিদ্রোহের পর্বে বিদ্রোহী সিপাহিদের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল। সাধারণ লবণ সময়বিশেষে কিভাবে শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ভারতীয় প্রেক্ষিতে তা আরো গভীর অধ্যয়নের দাবি রাখে। বিদেশি লবণে অশুদ্ধি তথা অশুচিতার অভিযোগ বাস্তবিক কতটা সত্যি ছিল বা এই অভিযোগের আদত উৎস কি ছিল সেই প্রসঙ্গটিতেও মনোনবেশ করা জরুরি। অধ্যায়ের শেষাংশে তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা রয়েছে।

।। ৬।।

অশুদ্ধি বিতর্কের অলক্ষ্যে: ব্রিটিশ লবণের 'পরিশোধিত' অতীত

অশুদ্ধি মিশ্রিত লিভারপুল লবণ যদি ভারতীয়দের জাত-ধর্ম নষ্টের অভিযোগে অশুচিকর প্রতিপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বের অন্যত্র তা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রভূত ক্ষতিসাধনের অভিযোগে বিপজ্জনক উপাদান রূপে গণ্য হয়েছিল। উনিশ শতকের শুরুতেই ব্রিটেনের ভূতপূর্ব কলোনি আমেরিকায় লিভারপুল লবণকে পচনশীল, দূষণকারী, অস্বাস্থ্যকর, রোগ-ব্যাধি সংক্রামক বলে চিকিৎসকেরা অভিযোগ তুলেছিলেন এবং জনগণকে তা আর ব্যবহার না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন। ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত চিকিৎসক ড. স্যামুয়েল

---

130 Rev. J. Crave Browne, *The Punjab and Delhi in 1857* [Vol. 1] (London: William Blackwood & Sons. 1861), 231.

131 Ibid., 37.

মিশেল লিখিত এক প্রতিবেদনের দীর্ঘ শিরোনামেই এই অভিযোগের সারাৎসার পরিলক্ষিত হয়: On the Spoiling of Beef, Pork and Butter, when packed with Liverpool Salt, and on the Fevers Produced in American Ships and Cities by the corruption of Animal Flesh cured with that kind of Salt.[132] আমেরিকার অন্যতম প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার গরু-শুয়োরের মাংস এবং মাখনে পচনের কারণ হিসেবে তিনি লিভারপুল লবণ মেশানোকেই দায়ী করেছিলেন। আমেরিকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের পক্ষে লিভারপুল লবণ কিভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল সেই প্রসঙ্গে ড. মিশেল লিখেছিলেন যে, নিউ ইয়র্কের বাতাস বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে উঠেছিল। পচনশীল গোমাংসের বিশাল স্তূপ থেকে নির্গত সেই পূতিগন্ধময় বাষ্প শহরের বাসিন্দাদের জন্য রোগব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ষাঁড়, বলদ এবং গরুর পচে যাওয়া দেহাবশেষগুলি মড়ক ছড়িয়ে আশেপাশের এলাকাকে জনশূন্য করে তুলেছিল।[133] মিশেলের মতে, প্রায় জীবাণু-পচিত গরু এবং শুকরের মাংস খাওয়ার ফলে আমাশা, অত্যধিক রক্তস্রাব, স্কার্ভি সহ পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়ের নানান রোগ (Gastrointestinal disorder), পীত জ্বরের প্রকোপ দেখা দেয়। তাঁর দাবি অনুযায়ী কোনো জায়গায় মাংসের টবের ঘিনঘিনে রূপ এবং স্থানীয়দের মধ্যে রক্তস্রাব এবং অন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব থেকে সেখানে ব্রিটিশ লবণ কতটা বিক্রি হয়েছে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে![134] আর তাই আমেরিকানদের লিভারপুল লবণ কেনা ও ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে, এবং তার স্বাস্থ্যকর বিকল্প রূপে বিস্কে উপসাগর, পর্তুগাল, আইল অফ মে, বা বাহামার মতো জায়গা থেকে আমদানিকৃত লবণ ব্যবহারের জন্য মিশেল সুপারিশ করেছিলেন।[135]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ফ্লোরিডার জনৈক উইলিয়ম ডেনিস যুক্তরাষ্ট্রের সকল মাংস প্রক্রিয়াকারী কর্মী এবং গৃহকর্মীদের সচেতনার্থে জানিয়েছিলেন যে, ব্যারেলে মাংস জারানোর [সংরক্ষণের] জন্য লিভারপুলের পাঙ্গা (boiled) লবণ একেবারেই অনুপযুক্ত, এবং বেকন, হ্যাম ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণের জন্য তা একেবারেই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য নয়। তাঁর মতে, বিগত সত্তর বছরেরও [১৭৮০ দশক থেকে] বেশি সময় ধরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ প্রমাণে নিশ্চিত হয়েছিল যে মাংস, মাখন এবং অন্যান্য পণ্যে লিভারপুলের লবণ ব্যবহার

---

[132] ড. মিশেলের প্রতিবেদন রয়েছে, Samuel Mitchill & Edward Miller, *The Medical* Repository,1804, 241-247.

[133] Ibid., 243.

[134] Ibid., 244.

[135] Ibid., 245.

করলে সেসব পচন সংক্রামক (septic) হয়ে ওঠে।[136] ডেনিস তাঁর লেখার শেষে পরিসংখ্যান সহ আমেরিকার নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, ম্যাসাচুসেটস, ওহিয়ো, কেনটাকি, ইলিনয়েসের মতো বৃহৎ লবণ উৎপাদক অঞ্চল সহ অন্যান্য স্থানের লবণ উৎপাদনের পরিসংখ্যান তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, আমেরিকায় প্রভূত লবণ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে যা কাজে লাগালে বিপুল কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।[137] উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পণ্যগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে ও পুঁজির দাপটে বিশ্ববাজারে নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাইলে তার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিবিধ মাত্রায় পাল্টা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ পরিলক্ষিত হয়। লিভারপুল লবণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয় নি। শিল্প বিপ্লব পরবর্তী পর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববাজারে লিভারপুল লবণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল যা একদিকে স্থানীয় লবণ উৎপাদন পদ্ধতি ও জনরুচির বৈচিত্র্যকে যেমন অগ্রাহ্য করেছিল তেমনই স্থানীয় লবণ উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের জীবন ও জীবিকাকে সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ লবণের বিরুদ্ধে উদ্ভূত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বৈশ্বিক প্রবাহে ব্রিটিশ আধিপত্য মুক্ত আমেরিকা ও অধীনস্থ ভারত কোথাও যেন এক অদৃশ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধে অশুদ্ধির অভিযোগে উইলিয়ম ডেনিসের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৭-তে, ভারতে যখন মহাবিদ্রোহ উত্তুঙ্গ পর্যায়ে এবং লবণের অশুচিতার অভিযোগ দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

লবণকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বের আখ্যান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি অশুদ্ধি তথা অশুচিতার বিষয়টি যথাযথভাবে খতিয়ে না দেখা হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশ লিভারপুল লবণের পরিশোধনে প্রাণীদেহজাত হাড়-অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি ব্যবহারের যে অভিযোগ ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তার কি কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল? নাকি তা শাসক ও শাসিতের মধ্যে মানসিক-সাংস্কৃতিক ব্যবধানের দরুন এক অলীক কল্পনাপ্রসূত বয়ান? এর যথাযথ উত্তর নিহিত রয়েছে লিভারপুল লবণ উৎপাদনের অতীত ইতিহাসে। সপ্তদশ শতকে প্রকৃতিবাদী [naturalist] জন রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিভাবে নিউক্যাসল, প্রেস্টন, স্কটল্যান্ডের লবণ ক্ষেত্র এবং কাম্বারল্যান্ডের হোয়াইটহ্যাভেনের মতো বিভিন্ন স্থানে একইরকম ফোটানো ও বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়ায় সামুদ্রিক লবণের উৎপাদন হত। স্থানীয় পদ্ধতিতে এই নুন তৈরির বিশেষত্বই ছিল ষাঁড়ের রক্ত

---

[136] "Salt- Its Uses and Manufacture - Salt Meats" in *De Bow's review* Vol. XXIII, New Orleans & Washington City, July-December, (1857), 150.

[137] Ibid., 162-163.

ব্যবহার যার বিশদ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[138] পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিনি জানাচ্ছেন যে গহ্বরে জমে থাকা সমুদ্রের লবণাক্ত জল প্রায় সওয়া দু ঘণ্টা ফোটানোর পরে তা বাষ্পীভূত হয়ে লবণে পরিণত হয়। তারপর লবণাক্ত জল মোটামুটি গরম হলেই কড়াইতে জলের অনুপাতে কড়া বিয়ার গোত্রের মদ, ষাঁড়ের রক্ত এবং ডিমের সাদা অংশ মেশানো হয়। মিশ্রণের অনুপাত ছিল: প্রতি পাত্র লবণের জন্য ডিমের এক খোলভর্তি রক্ত, একটা ডিমের সাদা অংশ ও এক পাঁইট মদ [৩৭৫ মিলিলিটার] যা মিশিয়ে প্রায় ২৪ গ্যালন পরিমাপের বড় কড়াইতে ঢালা হয়। ডিমের সাদা অংশ এবং রক্ত কড়াইতে ফোটার সময় উপরে উঠে আসা ফেনা তুলে নিলে লবণাক্ত জল পরিষ্কার হয়। তা নইলে ফেনা মিশে গিয়ে লবণের স্বাদ নষ্ট করে দেয়। রক্ত যত পুরানো, তত ভালো, যদি অন্যান্য সব উপাদান ও পদ্ধতি যথাযথ থাকে। লবণ-জল যদি টগবগ করে ফুটতে থাকে, তখন আর রক্ত ব্যবহার করা হয় না।[139]

শুধু জন রে নয়, অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণেও ব্রিটিশ লবণ পরিশোধনে রক্ত ব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে ড. ডব্লিউ. জ্যাকসন ন্যাম্পটউইচে লবণ তৈরির প্রক্রিয়াতে দেখেছিলেন যে প্রায় ২০ গ্যালন লবণ-জলে দুই কোয়ার্ট (হাফ গ্যালন) বাছুর, গরুর বা ভেড়ার রক্ত মেশানো হত লালচে রঙ আনার জন্য। লবণাক্ত জলে এই মিশ্রণটি অল্প পরিমাণে যোগ করে ফোটানোর পর যে আস্তরণ দেখা যেত, যা সাবধানে ছেঁকে নিতে হত।[140] ব্রিটিশ লবণ উৎপাদনের চিরাচরিত পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ পরিশোধনে, রক্ত সহ বিবিধ উপাদান মেশানোর বিষয়টি সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে স্বাভাবিক বলেই গণ্য হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ জনরুচিতে তা সহজাতভাবে গৃহীত হয়েছিল। তবে মনে রাখতে হবে যে লবণের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ জনরুচি একমাত্রিক নয়, তার তারতম্যও ছিল। লবণ উৎপাদনে রক্ত ব্যবহার, এমনকি না ব্যবহারের বিষয়টিও এই নিরিখে নির্ধারিত হত। যেমন, উরস্টারশায়ার কাউন্টির ড্রয়েটউইচে লবণ উৎপাদন সম্পর্কে ড. টমাস র‍্যাস্টেল লিখেছিলেন যে প্রাথমিক ফুটন্ত অবস্থায়, লবণ-জল পরিশোধনের জন্য, শুধু ডিমের সাদা অংশই

---

[138] J. Ray, *A Complete Collection of English Proverbs* (London: J. Hughs, 1737, 3rd Ed.), 150.

[139] Ibid., 147.

[140] ড. জ্যাকসনের বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে, Henry Holland, *General View of the Agriculture of Cheshire* (London: Richard Phillips, 1808), 57.

ব্যবহৃত হত। এই পদ্ধতিতে ড্রয়েটউইচের লবণ যতটা সম্ভব অন্যান্য লবণের মতোই দেখতে সাদা হয়; রক্ত দিয়ে পরিশুদ্ধ করা লবণের মতো এতে কোনো খারাপ গন্ধও থাকে না।[141]

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে শিল্প বিপ্লবের পরিণামে পণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বন্টন ও ভোগের ধারণায় আমূল পরিবর্তন আসে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই চেশায়ারে লবণ উৎপাদনের চিরাচরিত পদ্ধতিতে রক্ত সহ প্রাণীদেহ জাত বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার কতটা যুক্তিপূর্ণ, বিশেষতঃ মানব শরীরে তার সম্ভাব্য পরিণাম কি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে সেকালের খ্যাতনামা চিকিৎসক ড. হেনরি হল্যান্ডের (যিনি এডিনবার্গের রয়্যাল মেডিক্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন এবং রোগের বীজাণু সম্পর্কিত ধারণায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবদান রেখেছিলেন) পর্যবেক্ষণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ছাত্রাবস্থায় যুবক হেনরি চেশায়ারে লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শনে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'ভ্রান্ত ধারণার' বশবর্তী হয়ে এবং 'সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে কোনও সঠিক ধারণা ছাড়াই' লবণ-জলে বিভিন্ন উপাদান মেশানো হয়।[142] মূলতঃ অপমিশ্রণ দূর করতে এবং লবণকে কেলাসিত করা যাতে সহজ হয় তার জন্য ব্যবহৃত এই উপাদানগুলি ছিল: অ্যাসিড, প্রাণীদেহ নির্গত জেলি ও গ্লুটেন, উদ্ভিজ্জ আঠা, নতুন অথবা বাসি মদ, আটা, রজন, মাখন এবং ফটকিরি। চেশায়ার সহ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় লবণ-জল পরিশ্রুত করতে এবং তা থেকে মাটির তলানি দূর করতে প্রাণী দেহের জেলি এবং গ্লুটেন দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত বলেই হল্যান্ড জানিয়েছিলেন। কিভাবে এগুলির ব্যবহার হত? হল্যণ্ডের বিবরণ অনুযায়ী: গরুর বা বাছুরের পা ফুটিয়ে পাওয়া যেত জেলি। একবার ব্যবহারের পরে তা ফেলে দেওয়া হত না, বরং লবণে জারিত করে এবং শুকনো করে সংরক্ষণ করা হত, পরে যাতে আবারো ব্যবহার করা যায়! লবণপ্রস্তুতকারী 'ওয়ালার' শ্রমিকেরা লবণ-জলকে আরো ভালোভাবে পরিশোধিত করার জন্য এই জেলি ও গ্লুটেন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন।[143]

লবণ-জল পরিশ্রুত করতে ডিমের সাদা অংশ, আঠা, বাছুর বা গরুর পা ব্যবহারের পাশাপাশি সমান তালে রক্ত যে ব্যবহার হয়ে চলেছিল এবং সেই ঐতিহ্য যে বহুকালের তা হল্যান্ডের বিবরণে উঠে এসেছিল।[144]

---

[141] Thomas Rastell, "Account of the Salt Springs and Salt making at Droitwich in Worcestershire", originally published in 1674 N. 142, p.1059 and reprinted in the *Philosophical Transactions* of the Royal Society of London, Abridged Volume II, (London: C. and R. Baldwin, 1809).

[142] Henry Holland, *General View*, 56.

[143] Ibid., 58.

[144] Ibid., 57.

তবে অতীতের তুলনায় ব্রিটেনে লবণ উৎপাদনে রক্তের ব্যবহার যে অত্যন্ত সীমিত হয়ে এসেছিল তা এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শুরুতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, চেশায়ারের কয়েকটি কারখানাতেই লবণ পরিশ্রুত করতে মাঝে মাঝে রক্ত ব্যবহৃত হয়; বিশেষতঃ তাজা রক্তের ব্যবহার তখনো কার্যকরী বলে গণ্য হত। তবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাটকা রক্ত সংগ্রহ এবং তার পচন রোধ করা সমস্যাজনক হওয়ায় রক্তের ব্যাপক ব্যবহার আর তখন সম্ভবপর ছিল না বলেই তিনি জানিয়েছিলেন। ডারহামের বার্টলে ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে সার্বিকভাবে লবণ-জল পরিশ্রুত করতে নির্দিষ্টভাবে শুধু রক্তের ব্যবহার অব্যাহত ছিল।[145] ১৮৮৪-তে জে. জে. ম্যানলের লেখাতেও এই পদ্ধতির সমর্থন মেলে। ম্যানলে জানিয়েছিলেন যে, উনিশ শতকের আগে ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের লবণ ব্রিটেনে তৈরি হত এবং তাতে ক্ষতিকর নয় এমন বাহ্যিক উপাদানও মেশানো হত। লবণ-জলের পরিশোধনে ও লবণকে কেলাসিত করতে মুখ্যত ডিমের সাদা অংশ, বাছুর ও গরুর পা, [বিয়ার গোত্রের] মদ, ময়দা, রজন, মাখন, ফটকিরি ইত্যাদি ব্যবহার করা হত।[146]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের বিরুদ্ধে দেশীয় জনসমাজের আপত্তি, বিশেষত এর অশুচিতা সম্পর্কিত ধারণা যে একেবারেই অমূলক ছিল না তা উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাণীদেহ জাত রক্ত, অস্থি-মজ্জা ইত্যাদির ব্যবহারে ব্রিটিশ লবণ পরিশোধনের এই অতীত লিবেরাল মুক্ত বাণিজ্যের যুক্তিতে তো নয়ই, এমনকি 'সল্ট মনোপলি' রক্ষার্থে কোম্পানি আধিকারিকদের পাল্টা যুক্তিতেও কখনোই উত্থাপিত হয় নি। অথচ কোম্পানি আমলারা তাদের প্রতিবেদনে দেশীয় লবণ উৎপাদন অব্যাহত রাখার অন্যতম কারণ যে বিদেশি লবণের অশুচিতা সম্বন্ধে ভারতীয়দের বদ্ধমূল ধারণা তা তুলে ধরেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, ভারতীয় বাজার দখলের অভিপ্রায়ে চেশায়ার-লিভারপুলের বাণিজ্যিক স্বার্থগোষ্ঠী ব্রিটিশ লবণ পরিশোধনের অতীত বেমালুম চেপে যাতে পারে, কিন্তু কোম্পানির অভিজ্ঞ আমলারা কেন সেই অতীত প্রসঙ্গে নিরুত্তর রইলেন? এর কারণ বোধহয় সাম্রাজ্যিক মতাদর্শের মধ্যেই নিহিত। আপন আধিপত্যের ধারণাকে বৈধ করে তুলতে সাম্রাজ্যিক মতাদর্শ উপনিবেশকে এক 'অপর' রূপে নির্মাণ করে। 'অপর' উপনিবেশ থেকে সাম্রাজ্য নিজের পার্থক্য চিহ্নিত করে বৈপরীত্যমূলক দ্বিত্বের সমাহারে।

---

145 Ibid.

146 J. J. Manley, *Salt and Other Condiment*, 43.

সাম্রাজ্যের শ্বেতাঙ্গ, সভ্য, যুক্তিবাদী, প্রাগ্রসর মানদণ্ডে উপনিবেশ অশ্বেতাঙ্গ, বর্বর, অযৌক্তিক, পশ্চাদপদ রূপে প্রতিভাত হয়। লিবেরাল মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থকদের পাশাপাশি কোম্পানি আমলা-আধিকারিকেরাও এই ভাবনায় কম-বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি ভারতীয়দের অতীত বিস্মরণের কারণ এই মানদণ্ডে বিচার করেই সেই বিস্মৃত অতীতের পুনরুদ্ধারে শ্বেতাঙ্গ, সভ্য, যুক্তিবাদী, প্রাগ্রসর ব্রিটিশেরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং ভারতীয় ভাবনায় যা ঘৃণ্য, অশুচি, সেই প্রাণীজ রক্ত-অস্থি-মজ্জার ব্যবহারে ব্রিটিশ লবণ উৎপাদনের অতীত স্বীকারের অর্থ সাম্রাজ্যের সাম্প্রতিক অতীতে বর্বরতা, অযৌক্তিকতা, পশ্চাদপদতাকেই পক্ষান্তরে স্বীকার করে নেওয়া। এর পাশাপাশি মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত শিল্পায়নের প্রভাবে বিভিন্ন পণ্যের মতোই ব্রিটেনে লবণের উৎপাদনে আধুনিক ভাবনা এসেছিল। শারীরিক-রাসায়নিক সহ নানান ‘আধুনিক’ মাপকাঠিতে লবণ পরিশোধনের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি, যাতে প্রাণী দেহজাত রক্ত-অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি ব্যবহৃত হত, তা সময়ের সাথে সাথে পরিত্যক্ত হয়েছিল। একদিকে সাম্রাজ্যিক শ্রেষ্ঠত্বের বোধ, অন্যদিকে শিল্প-প্রযুক্তি সঞ্জাত আধুনিক মূল্যবোধ,— উভয়ের দাপট ব্রিটিশ লবণ পরিশোধনের অতীতকে বিস্মরণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল বা অন্যভাবে বললে, উপনিবেশের সামনে ব্রিটেন নিজের এক ‘পরিশোধিত’ অতীত তুলে ধরেছিল।

সারণি-১.১

Professor Michael Farraday's Report

Royal Institution 7th July, 1836

(A thousand parts of the salts here given have been found, by analysis, to contain the following proportion of mechanical or chemical impurities)

	Impurities	**Pure Muriate of Soda**
Leamington	12	988
Cheshire fishing salt	13¼	986¾
Cheshire common	16¾	983½
Cheshire rock salt	16½	983¼
Scotch Sunday salt	28	971
St. Ubes salar evaporation	40	945
Scotch common	64½	945½
Madras salt solar evaporation	40	960
Bengal monopoly salt	185	815

George Wilbraham, *Thoughts on the Salt Monopoly in India* (London: James Ridgway, Feb. 1847), 3.

সারণি.১.২

An analysis given by Dr. Holland in 1808

The percentage of chloride of Sodium and of earthy salts varied in the following proportions in one pint (.57 Litre or 1/8 Gallon)

	Oz. dr.*	Percentage of salt	Percentage of earthy salt
Winsford Brine	6 1	25.312	2.500
Leftwich	4 15	21.250	.625
Northwich	6 1	25.312	1.562
Witton	5 7	23.125	1.562
Anderton	6 6	26.566	1.875
Wheelock	6 0	25.000	.625
Middlewich	6 2	25.625	.625

*Oz. was Fluid Ounce and dr. was fluid dram in British Imperial System.

J. J. Manley, *Salt and other Condiments* (London: International Health Exhibition, 1884), 49.

সারণি-১.৩

The results of analysis of ten specimens of earth Salt from Bellary, Cuddapah, and Kurnool, completed by Professor Mayer.

Moisture	7
Sand and dirt	5
Chloride of Sodium	81
Bases and Acids	7
	100

PART II- Madras, On the Supply of Salt for the Presidency of Madras, in *Report of the Commissioner appointed to enquire into Salt in British India* (London: Harrison, 1856), 101.

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বদেশি পূর্ব লবণ প্রতর্ক:

নীতি ও রাজনীতি

১৮৮৫-তে এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির লর্ড রেক্টর (প্রাক্তন ভারত সচিব) স্ট্যাফোর্ড হেনরি নর্থকোট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য "India Before and After the Mutiny" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে পাঠরত এক ভারতীয় বাঙালি ছাত্র সাত অধ্যায়ে বিভক্ত এক দীর্ঘ প্রবন্ধ জমা দিয়েছিলেন। বাঙালি ছাত্রটি এই প্রবন্ধে ব্রিটিশ রাজের পক্ষপাতমূলক লবণ নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং 'রাজা ও নবাবদের দেশ নয়, ক্ষুধার্ত মানুষের দেশ' ভারতে দরিদ্রদের জীবনে লবণের অপরিহার্যতা তুলে ধরেছিলেন। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তির ঘটনাকে 'কলঙ্ক' ('disgrace') এবং 'লজ্জাজনক' ('scandal') অধ্যায় বলে তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন। জর্জ উইলব্রাহামদের মতো ব্রিটিশ সাংসদের ভূমিকার নিন্দা করেছিলেন এবং তাদের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে ছিল ভারতে 'চেশায়ার লবণের জন্য নতুন বাজার ধরা'— বাঙালি ছাত্রটি তা বেশ চাঁছাছোলাভাবেই তুলে ধরেছিলেন। দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তিতে মানুষের রুজি-রুটির সংস্থান হারানো, করভার প্রসূত দরিদ্রদের লবণ বঞ্চনা, সর্বোপরি উপকূলে নুন-মাটির আস্তরণ চেঁছে ব্যবহার করলেও পুলিশ প্রশাসনের চূড়ান্ত নিপীড়নের কথা তুলে ধরে মহাবিদ্রোহ পরবর্তী ভারতের দুর্দশা ও শোষণের যুক্তিক্রম তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছিল। ব্রিটিশ চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকারের কানে চেশায়ারের কর্মীদের আওয়াজ পৌঁছে যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে,দারিদ্র্যপীড়িত লক্ষ লক্ষ ভারতীয়র আর্তনাদ ব্রিটিশ উপকূলে পৌঁছায় না বলেই তিনি তাঁর লেখায় ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন।[1]

বলাবাহুল্য যে, শাণিত যুক্তিতে ও সঙ্গত তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ এই গবেষণামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধটি সাম্রাজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিচারে পুরস্কৃত হয় নি। তবে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার অন্যতম পরীক্ষক অধ্যাপক উইলিয়াম

[1] P.C. Ray, *India Before and After the Mutiny* (published in 1886) (Government of India: Publication Divisions, 2012).

ম্যুইর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সভায় প্রকাশ্যে প্রবন্ধটির প্রশংসা করেছিলেন। ব্রিটিশ লিবেরাল রাজনীতিবিদ ও সাংসদ জন ব্রাইট প্রবন্ধটি পড়ে ভারতীয় ছাত্রের রাজনৈতিক জ্ঞান ও শানিত যুক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাঙালি ছাত্রটিকে তিনি এক সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া লিখে পাঠান, যা তাঁর অনুমতিক্রমে “Letter of John Bright to an Indian Student” শিরোনামে *লন্ডন টাইমসে* প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে রাতারাতি বেশ খ্যাত হয়ে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রটি অবশ্য ১৮৮৭-তে রসায়নে ডিএসসি ডিগ্রী পেয়ে দেশে ফিরে আসেন।[2] এই বাঙালি ছাত্র ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পরবর্তীকালে যিনি আধুনিক রসায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি ‘A History of Hindu Chemistry’ (১৯০২) রচনা করেছিলেন। স্বদেশি উদ্যোগপতি রূপে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস (১৮৯৩) প্রতিষ্ঠা সহ বিবিধ উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তারই পাশাপাশি দেশের মানুষের মধ্যে স্বরাজের আদর্শ প্রচার এবং খাদি, চরকার প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন; এবং ১৯৩০-র দশকে, গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের ফলশ্রুতিতে বাংলায় লবণ শিল্পের পুনরুত্থানে ‘বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি’ গড়ে তোলার অন্যতম প্রেরণা ও উদ্যোক্তা হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় লিখিত প্রবন্ধে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির সমালোচনা থেকে জীবন সায়াহ্নে দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগের প্রয়াসের মধ্য দিয়েও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ও কর্মকাণ্ডের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করা যায়। লবণকে কেন্দ্র করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর ভাবনা ও কর্মসূচি যে নির্দিষ্ট অভিমুখ নিয়েছিল তার প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজজীবন ও অর্থনীতিতে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির অভিঘাতকে কেন্দ্র করে।

লবণের মতো আবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বন্টন ও বিক্রয়ে একচেটিয়া ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক সূচনা কিভাবে বাংলায় হয়েছিল তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে [ভূমিকা ও প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। ঔপনিবেশিক বাংলার লবণ ইতিহাসের পর্যালোচনায়ও তাই কোম্পানি আমলে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণই চোখে পড়ে। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির ঐতিহাসিক অধ্যয়নেও ‘অবশিল্পায়নের’ অধ্যায়ে জোর দেওয়া হয়। আর্থ-রাজনৈতিক এই যুক্তিবিন্যাসে গুরুত্ব পায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চেশায়ার ও লিভারপুলের বণিক ‘লবির’ ভূমিকা; ১৮৬০-এর দশকে বৈষম্যমূলক রাজস্বনীতির প্রণয়ন (যা পক্ষান্তরে লবণের ‘মুক্ত বাণিজ্যকে’ স্বীকৃতি দেয়); এবং সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতমূলক নীতির পরিণামে

---

[2] See Foreword and Preface, Ibid.

বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পের ক্রমিক বিলুপ্তি।[3] কিন্তু এই অবশিল্পায়নের সামাজিক অভিঘাত কি ছিল? জীবিকা হারানো লবণ উৎপাদকদের পরিণতি কি হল? জীবনের জন্য আবশ্যক লবণের দাম বৃদ্ধি পেলে আমজনতার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে তার কি কোনো প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়? সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির পর্যালোচনায় প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নগুলি অবশ্য অনালোচিত থেকে গেছে।

ইতিহাসচর্চার এই প্রেক্ষিত ও প্রশ্নসমূহকে উপজীব্য করে আলোচ্য অধ্যায়ে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির অভিঘাতে বঙ্গীয় জনজীবনের বহুমুখী প্রতিক্রিয়াকে প্রতর্কের আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে এই লবণ কেন্দ্রিক প্রতর্কে আমজনতার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদে বহুস্তরের ও বহুস্বরের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়; শুধু লবণ করভার ও দেশীয় উৎপাদকদের কর্মহীনতার অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে যা সুস্পষ্ট হয় না। লেখ্যাগারিক ও সাহিত্যিক নথির সমাহারে তাই শুরুতেই তুলে ধরা হয়েছে বাংলার গ্রামজীবনে স্বয়ম্ভরতা ও সংস্থানে 'ন্যূনতম' নুনের নিদারুণ বাস্তবতাকে। ক্ষুধাতুর মানুষের ভাতের পাতে সামান্য নুন কতখানি গুরুত্বের দাবি রাখে তা এই প্রতর্কে স্পষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অবশ্য এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছিল কারণ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লবণ কর ছিল রাজস্বের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ব্রিটিশ রাজের পর্বে লবণ কর ছিল একমাত্র অপ্রত্যক্ষ কর যা ক্রমশ শোষণমূলক চরিত্র ধারণ করেছিল এবং দরিদ্র ভারতীয়র জীবনে এক দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[4] দুর্ভিক্ষের দিনে সামান্য নুনের অভাবে দরিদ্র মানুষের জীবন কিভাবে বিপন্ন হয়েছিল এবং এই প্রসঙ্গে আপাত-নির্বিকার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নীতিগত দ্বিচারিতা কিভাবে প্রশাসনিক ত্রাণ প্রদানের মধ্য দিয়েই পরিলক্ষিত হয়- তা এই প্রতর্কের অন্যতম দিক।

অতি সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দাবি করা হয়েছে যে, ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় আমজনতার জীবনে অন্যান্য [খাদ্যদ্রব্যের] বঞ্চনা ও অসাম্যের নিরিখে লবণ করের প্রভাব ছিল নগণ্য! ১৯৩০-এ গান্ধীর আহ্বানে সংগঠিত লবণ সত্যাগ্রহের গণআন্দোলনের পূর্বে দু-একটি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' ব্যতীত লবণ

---

[3] Indrajit Ray, "Imperial Policy and the Decline of the Bengal Salt Industry under Colonial Rule: An Episode in the "De-industrialisation" Process," *Indian Economic and Social History Review* 38, no. 2 (2001), 181–205.

[4] Sabyasachi Bhattacharya, *The Financial Foundations of the British Raj: Ideas and Interests in the Reconstruction of the Indian Public Finance 1858-1872* (New Delhi: Orient Blackswan, 2005), 255.

করের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের তেমন কোনো চিহ্নই নেই।[5] সত্যিই কি ব্রিটিশ রাজের পর্বে, বিশেষতঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ভারতীয়রা অকুণ্ঠচিত্তে ['Ungrudging Indian' কথাটি পর্যালোচনায় প্রায়শই ব্যবহৃত] লবণ করভার মেনে নিয়েছিল? বিদেশি গবেষকের এমত দাবির প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই ভাবিয়ে তোলে। প্রথমত, ঔপনিবেশিক পর্ব জুড়ে গরিব মানুষের মূল আহার্য যদি নুন-ভাত বা নুন-রুটি হয়ে থাকে তাহলে বঞ্চনার নিরিখে লবণ করের প্রভাব কিভাবে নগণ্য হতে পারে? দ্বিতীয়ত, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের নানান মাত্রা থাকে। বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরেও প্রতিরোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'-র তত্ত্ব মেনে নিলে বিদেশি লিভারপুল লবণের ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে কি? তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিক পর্ব জুড়ে বাংলার উপকূল একই সাথে 'বৈধ' ও 'অবৈধ' লবণ উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তির ফলে 'বৈধ' লবণ শ্রমিকেরা জীবিকাচ্যুত হয়ে 'অবৈধ' উৎপাদনে লিপ্ত হয়েছিল কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আগে জরুরি।

এই বিতর্কের আবহে অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে তুলে ধরা হয়েছে শুধু সাধারণ মানুষের জীবনেই নয়, ভদ্রলোকের জীবনেও লবণ করের প্রভাব খুব 'নগণ্য' ছিল না। বরং ভদ্রলোকের লবণ ভাবনায় নানান পরত পরিলক্ষিত হয়। কালাপানি পার হয়ে আসা 'অপর' বিদেশি লবণ কিভাবে ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে রক্ষণশীল ভারতীয় রুচিতে গৃহীত হয়েছিল তা এক জটিল প্রশ্ন। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে লিভারপুল লবণের শুদ্ধতাকে কেন্দ্র করে জনসমাজের উদ্বেগ ও বিতর্কের মধ্যে কিভাবে 'অপরীকরণের' রাজনৈতিক প্রয়াস দেখা যায় তা এই প্রতর্কের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। 'ভেজাল' বা 'অপমিশ্রণ' এবং 'অপবিত্রকরণ' উভয় অভিযোগে বিদ্ধ লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধে এই সামাজিক প্রতিরোধের ভিতটি ছিল মুখ্যত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক। পরিশেষে উপকূলীয় অঞ্চলে আমজনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পরম্পরায় কিভাবে বিশ শতকীয় স্বদেশি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কিছু পূর্ব-লক্ষণ প্রতীয়মান হয় তা এই প্রতর্কে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। লবণের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে কেন্দ্র করে পরিলক্ষিত এই নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রবাহ স্পষ্টতই ভারতীয় জনজীবনে পণ্যের জটিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিককে তুলে ধরে।

---

[5] Miles Taylor, "The Ungrudging Indian: The Political Economy of Salt in India, c. 1878–1947," *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 46:4, (2023),791-805.

।।১।।

ন্যূনতম নুনের বাস্তবতা: গ্রামীণ স্বয়ম্ভরতায় ও সংস্থানে

ঔপনিবেশিক বাংলায় সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার সংগ্রামে নুনের বিষয়টি কিভাবে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিল তা আলোচ্য অংশে লেখ্যাগারিক ও সাহিত্যিক উপাদানের নিরিখে বিশ্লেষিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের বৈষম্যমূলক লবণনীতি একদিকে যেমন অসংখ্য মানুষের রুজি-রুটি কেড়ে নিয়ে তাদের গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল তেমনই শরীরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই উপাদানের ওপর করভার চাপিয়ে সাধারণ ছা-পোষা লোকের জীবনকে জেরবার করে তুলেছিল। অবাস্তব প্রত্যাশা বোঝাতে সেকালে চালু প্রবাদ ছিল 'নাই ভাত নুন দিয়ে খাবো'![6] সরকারের একচেটিয়া লবণ নীতিতে বোধহয় সাধারণের পক্ষে তা বলারও জো ছিল না। নুনের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চড়া দামের জন্য সরকারি নীতির ধারাবাহিক সমালোচনা জারি রেখেছিল যেসব সংবাদপত্র, তার অন্যতম কাঙ্গাল হরিনাথের *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*। ১৮৭৮-এর ১৯শে জুন সংখ্যায় এই পত্রিকা বিদ্রূপ করে লেখে যে, বাজারে নুনের চড়া দাম সাধারণ মানুষের কাছে 'কাটাঘায়ে নুন ছেটানোর মতো'; অথচ সরকার যদি পূর্বেকার নুনের উৎপাদনের ধারা বজায় রাখতো, তাহলে এদেশীয় লোককে বিদেশি নুনের ওপর নির্ভর করতে হত না।[7]

গ্রামবাংলার বহুপ্রচলিত কথা, ক্ষিদে থাকলে নুন দিয়েও ভাত খাওয়া যায়।[8] অথচ গরিব সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে নুনের প্রয়োজনীয়তা ও দামের প্রতি শুধু সরকারই যে উদাসীন ছিল তা নয়, একশ্রেণির শহুরে, সচ্ছল মানুষও এই ভাবনার শরিক ছিলেন যে লবণ কর বর্ধিত হলে গ্রামের মানুষের খুবকিছু সমস্যা হয় না বা এর ব্যবহারেও হেরফের হয় না। আর শহুরে শ্রেণির এই ঔদাসীন্য যে 'মস্ত ভুল', তা *সঞ্জীবনী* দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছিল।[9] পত্রিকার প্রতিবেদকের মতে, একমাত্র মফঃস্বল বা গ্রামীণ জীবনের

---

[6] Rev. W. Morton, *দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ, A collection of Proverbs, Bengali & Sanskrit with their Translation and Application in English* (Calcutta: The Baptist Mission Press, 1832) 43.

[7] *Grambarta Prakashika*, 19 June, 1878— RNP (B) for week ending 22 June, 1878. Internet Archive (https://archive.org) [hereafter IA]

[8] সত্যরঞ্জন সেন, *প্রবাদ-রত্নাকর* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, ১৯৫৭), ৪৫৬।

[9] *Sanjivani* 4 January, 1890— RNP (B) for week ending 11 January, 1897. IA

অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন লোকেরাই জানেন যে লবণ কর বাড়লে গরিবের কি দুর্দশা হয়। জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই লবণ, যা সামান্য পরিমাণে পাতে থাকলেই গরিব মানুষের ভাত মুখে ওঠে, ক্ষিদের জ্বালা মেটে। তাই চড়া দাম সত্ত্বেও গরিবকে নিরূপায় হয়েই লবণ কিনতে হয়। সুতরাং বাজারি চাহিদায় লবণ ব্যবহারে কমতি না হওয়ার অর্থ এই নয় যে লবণ করের বৃদ্ধিতে গরিবের দুর্দশা বাড়ে নি! তার পাশাপাশি বিগত নয় মাসের সরকারি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে *সঞ্জীবনী* অবশ্য দাবি করেছিল যে বাংলায় লবণের ব্যবহারের কমতির জন্য লবণ করের বৃদ্ধি-ই দায়ী।[10] তাই বোধহয় চালু কথা ছিল, 'কাঙালের দুনো ব্যয় পান্তা ভাতে লবণ ক্ষয়'।[11]

দরিদ্র জীবনে ন্যূনতম নুনের এই বাস্তবতা সেকালের অগ্রণী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছিল। লবণ কর প্রসঙ্গে স্বদেশবাসীর সচেতনতায় এক প্রবন্ধে লেখা হয়: 'যাহা জীবনধারণোপকরণের একটা অংশ অথবা জীবনধারণের সহিত এবং স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষণের সহিত যে সামগ্রীর অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ, তাহার উপর শুল্ক বসিয়া সে দ্রব্য দুর্মূল্য বা মহার্ঘ হইলে মনুষ্য মাত্রেরই মর্মান্তিক বাজে; বিশেষত এই দরিদ্র দেশের দুঃখী লোকেদের হৃদয়ে তাহা অধিকতর দারুণভাবে অনুভূত হয়।'[12] শিক্ষিত, সচ্ছল মানুষদের তাদের শ্রেণিগত ঔদাসীন্য কাটিয়ে দরিদ্র জীবনের বাস্তবতা বুঝতে লেখক আবেদন করেছিলেন: "[...] লবণের সের ছয় পয়সা মাত্র। তুমি আমি হয়তো মনে করিতে পারি লবণ খুব শস্তা। কিন্তু শতকরা অন্তত ৭০ জন লোকের মধ্যে এ দেশে এখন লবণ শস্তা নয়; মহা মহার্ঘ।"[13] লেখকের মতে, প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে লবণ সস্তা ও সহজলভ্য থাকায় সাধারণ মানুষ নিজের, এমনকি গবাদি পশুর প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশ রাজের লবণ-করের প্রকোপে গরিব আমজনতার দুর্দশা ও অসন্তোষ চরমে ওঠে। দরিদ্র মানুষের পরিস্থিত এমনই যে "ছয় পয়সা সেরের লবণ কিনিয়া খাইতেও তাহাদের কষ্ট হয়। গবাদিকে লবণ খাওয়ানোর তো কথাই নাই; নিজেদের অন্ন জুটিল অনেক সময়েই তাহাতে লবণ জুটে না। বিনা লবণে ভাত খায় ও আপন আপন অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করে। ইহা কি

---

10 Ibid.

11 সত্যরঞ্জন সেন, *প্রবাদ-রত্নাকর*, ২২৯।

12 ১৮৯৪ এ ভাইসরয় লর্ড এলগিন(দ্বিতীয়)-এর সময়ে প্রণীত কটন ডিউটিস অ্যাক্ট এর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "আবদারের আইন" নামক প্রবন্ধটি লেখেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর বৈদ্যুতিন সংস্করণ দেখুন, পরিশিষ্ট -আবদারের আইন- ৩ *রবীন্দ্র রচনাবলী* (nltr.org) (https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15973 [accessed on 21.12.2023].

13 তদেব।

খুব একটা সন্তোষের কারণ?”[14] ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতিতে সাধারণ দরিদ্র মানুষের বঞ্চনা ও দুর্দশা প্রসঙ্গে এই দ্ব্যর্থহীন সমালোচনাই করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘আবদারের আইন’ প্রবন্ধে। গরিবের জীবনে সামান্য নুনের এই গুরুত্ব, যা রবীন্দ্রনাথ সংবেদী ভাবনায় অনুধাবন করেছিলেন, তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরের দিকে তাঁকে প্রণোদিত করেছিল স্বদেশি নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবকদের কঠোর সমালোচনায়, যারা জবরদস্তি গরিব মানুষকে ‘বিদেশি লবণ’ বয়কটে বাধ্য করেছিলেন।

নিম্ন বঙ্গের সাধারণ মানুষের খাদ্যসংস্থানে সামান্য নুন কতখানি গুরুত্ব রাখত তার দৃষ্টান্ত মেলে *উলুবেড়িয়া দর্পণে* ২৯ নভেম্বর, ১৮৯৩-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে, যেখানে গ্রামের মানুষের মধ্যে চা-পানের দৃষ্টান্তকে তুলে ধরে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রীয়ারসন সাহেব হাওড়াবাসীর আর্থিক সচ্ছলতার যে দাবি করেছিলেন তার অসারতাকে খণ্ডন করা হয়। এই প্রশাসনিক দাবিকে বিদ্রূপ করে পত্রিকাটি লেখে যে জেলাজুড়ে যেখানে সাধারণ মানুষের পাতে ভাতের সাথে প্রয়োজনমতো নুনই জোটে না, আর প্রতি গ্রামেই অন্তত তিন-চারটে পরিবার পাওয়া যাবে যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অর্থাৎ কোনোমতে একবেলার আহার জোটাতেই দিন চলে যায়, সেখানে চা-তে খরচ করার মতো বাহুল্য গ্রামবাসী কিভাবে দেখাবে![15] গ্রামীণ বাস্তবতায় সত্যিই এ যেন ‘পান্তা ভাতে নুন জোটে না, গরম ভাতে ঘিয়ের গল্প’![16] ব্রিটিশ রাজে এদেশীয় গরিব কৃষক, শ্রমিকের পান্তা ভাতে নুন না জোটার কারণ যে লবণ করভার তার তথ্য পরিসংখ্যান পেশ করেছিলেন হাওড়ার অভয় চরণ দাস।[17] স্ত্রী-সন্তান সহ পাঁচ সদস্যের পরিবারে কৃষকের আয়, সরকারি হিসাবেই, বার্ষিক ৬০টাকা। আর মাথাপিছু সাড়ে নয় পাউণ্ড নুনের হিসেবে কৃষককে বার্ষিক ২৪ সের নুন কিনতে হত ৩ টাকায়, যার আসল দাম মাত্র ৯ আনা! অর্থাৎ লবণ শুল্ক বাবদ গরিব কৃষককে তার বার্ষিক আয়ের প্রায় চার শতাংশ, ২টাকা ৭ আনা গচ্চা দিতে হত। আরো দুর্ভাগা ছিল শ্রমিকেরা, যাদের বার্ষিক আয় মাত্র ৩৫ টাকা। তাদের বার্ষিক আয়ের সাড়ে সাত শতাংশ লবণ শুল্ক বাবদ চলে যেত সরকারের ভাঁড়ারে। ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব শোষণে দুর্দশাগ্রস্ত গরিব রায়তদের কাছে তাই লবণ করের বাড়তি বোঝা যেন, অভয় চরণের মতে, ‘মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা’।[18]

---

[14] তদেব।

[15] *Uluberia Darpan*, 29 November, 1893— RNP (B) for week ending 23 December, 1897. IA.

[16] সেন, *প্রবাদ-রত্নাকর*, ৪৫৬।

[17] Abhay Charan Das, *The Indian Ryot, Land Tax, Permanent Settlement and the Famine* (Howrah: Howrah Press, 1881), 363.

[18] Ibid.

দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামজীবনে দুর্ভিক্ষ-অনটন দেখা দিলে তাই সামান্য নুনের অভাবেই খেটে খাওয়া মানুষদের জীবনে সঙ্কট আরো তীব্রতর হয়ে উঠত। এমনকি সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিতে মহার্ঘ্য হয়ে ওঠা সামান্য নুনের অভাব প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে দুর্ভিক্ষের দিনে অনাহারজনিত মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠত।[19] এমনই বিবরণ মেলে *সহচর* পত্রিকায় ৩০ আগস্ট, ১৮৯৩-এর প্রতিবেদনে, যেখানে মেদিনীপুরের উপকূলীয় রামনগর থানায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বর্ণিত হয়েছে। গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দিলে পুরুষেরা পরিবার ছেড়ে কাজের খোঁজে অন্যত্র পাড়ি দেয়, তাদের অনাহার ক্লিষ্ট স্ত্রী-সন্তানেরা দোরে দোরে ভিক্ষা করতে থাকে। একমুঠো ভাত জোটা দুষ্কর এমত পরিস্থিতিতে কচু, শাক-পাতা সেদ্ধ খেয়ে মানুষের চেহারা কঙ্কালসার, অনেকে মারাও যায়। কিন্তু এই খাবারেও একটু নুন জোটে না; অথচ ঘরের বাইরে পা ফেললে মাটি থেকে নুন অনায়াসেই তৈরি করা যায়। কারণ? সদাশয় সরকার বাহাদুরের আইনের দরুন তাতে নিষেধাজ্ঞা![20]

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণে নয়, মনুষ্য সৃষ্ট বলেই সমাজবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। অজন্মার পরিবর্তে বঞ্চনার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে মজুতদারি-কালোবাজারি-রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের মধ্যে। দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যের স্বত্বাধিকার (Entitlement) থেকে সাধারণ মানুষের বিপুল বঞ্চনার এই যুক্তি অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।[21] সম্প্রতি এই যুক্তি ব্যবহার করেই দাবি তোলা হয়েছে যে চাল এবং গমের মতো খাদ্যসামগ্রীর ঘাটতিকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক ভারতে যেরকম দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, নুনকে কেন্দ্র করে তা কখনোই দেখা যায়নি। তাই অন্যান্য খাদ্যপণ্যের বঞ্চনা ও অসাম্যের নিরিখে ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয়দের জীবনে নুনের প্রভাব নগণ্য।[22] ভারতীয়দের খাদ্যাভাসে নুনের তাৎপর্য একটু তলিয়ে দেখলে আশা করি এই সিদ্ধান্ত পরিমার্জিত হবে। মানুষের ক্ষিদে মেটাতে ভাত বা রুটি যে পরিমাণে প্রয়োজন সেই তুলনায় নুনের প্রয়োজন নগণ্য, কিন্ত অপরিহার্য। কারণ গরিব শুধু নুন দিয়ে ভাত বা রুটি খেতে বাধ্য হয়, যেহেতু অন্য তরি-তরকারি মেলে না। তাই যেকোনো দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে যখন চাল-গমের

---

[19] লবণের অভাব সরাসরি অনাহারজনিত মৃত্যুর সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু পর্যাপ্ত নুনের অভাব ঔপনিবেশিক পর্বে দরিদ্র ভারতীয়দের নানান শারীরিক সমস্যা, রোগ ব্যাধির কারণ হতে পারে- এই বিষয়টি আরো বিশদ গবেষণার দাবি রাখে। Roy Moxham, "Salt Starvation in British India: Consequences of High Salt Taxation in Bengal Presidency, 1765 to 1878," *Economic & Political Weekly*, 36:25, (2001), 2270–74.

[20] *Sahachar*, 30 August, 1893— RNP (B) for week ending 9 September, 1893. IA.

[21] Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Clarendon Press, 1981). অমর্ত্য সেনের গবেষণা আরো উদ্ধৃত হয়েছে Taylor, "The Ungrudging Indian", 792.

[22] Taylor, ibid.

দাম আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে, তখন সেই অনুষঙ্গে নুনও মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি যেন দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় [যা কার্পণ্যের অন্য অনুষঙ্গে রচিত], 'পান্ত আন্তে লবণ ফুরায়, লবণ আন্তে পান্ত'।[23] তাছাড়া 'রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক' প্রেক্ষিত থেকে গবেষকরা নুনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রায়শই সামাজিক প্রেক্ষাপটে তেমন গুরুত্ব দেন না। বৃহত্তর সামাজিক ক্যানভাসে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দুর্ভিক্ষের সময় সামান্য নুন সমেত দুমুঠো ভাতের জন্য গ্রামের মানুষের কাতর আর্তি শুধু লেখ্যাগারিক নথিতেই বিধৃত নেই; ঔপনিবেশিক বাংলার এই মর্মন্তুদ সমাজ বাস্তবতা পরবর্তী কালের কথাসাহিত্যেও বর্ণিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অশনি সংকেত* উপন্যাসটি যা ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার গ্রামীণ পটভূমিকে উপজীব্য করে রচিত, এই প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আখ্যানের শুরুতেই দেখা যায় দুর্ভিক্ষের আঁচ পেয়ে ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণকে মজুতদার ব্যবসায়ী ইয়াকুব সাবধান করে দিয়েছিল প্রয়োজনীয় চাল আর নুনটুকু মজুত করে রাখতে, কারণ 'ও দুটো জিনিস যদি ঘরে থাকে, তা হলে কষ্টস্রেষ্ট করে আধপেটা খেয়েও চলবে [বানান রীতি অপরিবর্তিত]!'[24] গঙ্গাচরণের ব্রাহ্মণী অনঙ্গ-বৌ অবশ্য শুরুতে এসব 'গাঁজাখুরি কথা' বলে উড়িয়ে দিয়েছিল: 'চাল পাওয়া যাবে না, নুন পাওয়া যাবে না, তবে দুনিয়া পৃথিমে লোকে বাঁচতে পারে ককখনো? কি খাবে এখন?' কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয় যখন খোদ অনঙ্গর দোরেই অর্ধউলঙ্গ জীর্ণশীর্ণ স্ত্রীলোকেরা তাদের উলঙ্গ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সামান্য ভাতের ফ্যান ভিক্ষা করে। অভাবের তাড়নায় লোকে কচু, মেটে আলু, জংলি শাক খেতে শুরু করে, পরে গুগলি, শামুক, ঝিনুক খেতে থাকে, কিন্তু তাতেও সামান্য নুনটুকু গরীবের কপালে জোটে না। কেলে পাড়ায় রয়ে জেলের বৌ অনঙ্গকে কাতর আর্তিতে জানিয়েছিল- 'কার দোরে যাবো, কে দেবে মোরে এই যুজ্যের [যুদ্ধের] বাজারে। যুজ্যের আক্রা [চড়া দাম] ভাত কার কাছে গিয়ে চাইবো মা? তাই বলি এখনো কেউ ওঠে নি, গাঙের ধারে বড় বড় কচুর ডাঁটা হয়েচে তুলে আনি গে। তাই কি তেল নুন আছে মা? শুধু সেদ্ধ।'[25] এমনই পরিস্থিতিতে কাপালীদের ছোট বউ ছুটকি ক্ষিদের

[23] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *পুনর্জন্ম* (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২১), ৩০।

[24] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অশনি সংকেত* (কলিকাতা, ১৯৬১), ২৮।

[25] তদেব, ৪৯।

জ্বালা মেটাতে কয়েকমুঠো চালের জন্য দুর্বৃত্ত এক পরপুরুষের (যদুপোড়ার) কাছে শরীর বিকিয়ে দেয়। সেই চাল ফুটিয়ে খাবার জন্য অনঙ্গের কাছে একটু নুন চাইতে এসেছিল ।[26]

অন্নের সাথে অন্য কিছু নয়, সামান্য নুনটুকুই খেটে খাওয়া গরিব মানুষের জীবনে একান্ত অপরিহার্য। নুনের এই অপরিহার্যতা অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় নয়, এর চূড়ান্ত গুরুত্বে বোঝা যায় অনুপস্থিতিতে, অভাবে। আর তাই দুর্ভিক্ষের 'অশনি সংকেত' বোঝাতে খাদ্যসংকটের যে বিবরণ কাহিনিতে আছে সেখানে শুধু ভাত নয়, তার সাথে নুনের অমিলকে বিভূতিভূষণকে ব্যবহার করতে হয় সেই সংকটের তীব্র বাস্তবতা বোঝাতে। বাংলা সাহিত্যের বিবিধ কাহনের বিন্যাসে সামান্য নুন এভাবে আলগোছে জুড়ে থাকে, চরিত্রের চিত্রণ ও ঘটনার পরম্পরাকে নির্দিষ্ট অভিমুখ তথা পরিণতি দিয়ে পাঠের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে; ঠিক যেভাবে পাতে যৎসামান্য নুন ভাতের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে লবণ-বঞ্চনার ছবিগুলি - যা অবশ্যই স্থানিক, সীমিত পরিসরে আবদ্ধ - লেখ্যাগারিক ও সাহিত্যিক সহ বিবিধ নথিপত্রে ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে। এই ছবিগুলি একত্রে জুড়লেই স্পষ্ট হয় যে, ঔপনিবেশিক ভূমিরাজস্ব নীতি যদিবা গ্রামীণ মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সংস্থান - ভাতের সাথে সামান্য নুন - অবশিষ্ট রেখেছিল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে চূড়ান্ত মুনাফা সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায়, তাহলে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতি নুন-ভাতের সেই ন্যূনতম সংস্থানটুকুর ও অবশেষ রাখে নি।

।। ২ ।।

নুন-ভাতের ত্রাণ: প্রশাসনিক পরিত্রাণের পন্থা?

অভাবী জীবনে দুমুঠো ভাত ও সামান্য নুনের এই সম্পর্ক বহু শতাব্দীর। সপ্তদশ শতকে পাদ্রি সেবাস্তিয়ান মানরিক বঙ্গদেশে এসে দেখেছিলেন যে, সাধারণ গরিব মানুষ নুন আর শাক দিয়ে (পান্তা)ভাত খেয়েই জীবনধারণ করে।[27] স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০ এর দশকে নদিয়া জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে লোকসংস্কৃতি গবেষক সুধীর চক্রবর্তীও চাক্ষুষ করেছিলেন যে 'বেশির ভাগ লোক শুধু নুন-ভাত

---

[26] তদেব, ৭৩।

[27] Sirajul Islam and Aklam Hussain, eds., *History of Bangladesh, 1704-1971* Vol. 1, Political history (Bangladesh: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), 716.

খেয়ে থাকে'।[28] গ্রামীণ লোকসমাজের পরম্পরাগত 'নুন ছাড়া ভাত মাটি' বা 'দয়া করে দেয় নুন ভাত মারে তিনগুণ' প্রভৃতি প্রবাদ থেকেও বস্তুগতভাবে নুন ও ভাতের এই অচ্ছেদ্য পারস্পরিকতা বোঝা যায়।[29] প্রচলিত নুন-ভাত শব্দবন্ধে নুনের আগেভাগে উপস্থিতিও যেন বুঝিয়ে দেয় ন্যূনতম হলেও এর অপরিসীম গুরুত্বের বাস্তবতাকে। অথচ গ্রামীণ অস্তিত্বে ন্যূনতম নুনের এই অপরিসীম গুরুত্বকে ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি-প্রণেতারা চূড়ান্ত অবহেলা, অবজ্ঞা করেছিলেন। কারণ, সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক স্বার্থই লবণ নীতি প্রণয়নে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার পেয়েছিল যা পরিণামে সর্বগ্রাসী হয়ে দরিদ্র মানুষের মুখের গ্রাস ও কাজের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তাদের জীবনকে সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে আবার মন্বন্তর বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সংকটাপন্ন মানুষের জীবন বাঁচাতে এই ন্যূনতম নুনের গুরুত্ব কতখানি সেই সচেতনতা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ত্রাণ প্রদানেই পরিলক্ষিত হয়! বিপর্যস্ত মানুষের জীবন রক্ষার্থে সামান্য নুনই শুধু ভাতের পাতে তুলে দিয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসন নিশ্চিন্ত হত যে দুর্ভিক্ষ এবং অনাহারজনিত মৃত্যুর আশঙ্কা দূর হয়েছে, কারণ বেঁচে থাকার পর্যাপ্ত রসদ জোগানো গিয়েছে! ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের এই দুমুখো লবণ নীতি সেকালের বাংলা সাময়িকপত্রগুলির প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়।

১৮৯৭ এর ৮ই আগস্ট *বাঁকুড়া দর্পণে* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে দুর্ভিক্ষের দরুন গঙ্গাজলঘাঁটির অন্নসত্র থেকে কয়েক মুঠো ভাতের সাথে শুধু নুনই দেওয়া হচ্ছে, এবং তাতেই দূরদূরান্তর থেকে গ্রামীণ মানুষের ঢল নেমেছে। কাঠ বেচে এখানে গরিব মানুষ যে দু-পয়সা রোজগার করে তাতে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও নুন-ভাতের সাথে বড়জোর শাক-পাতা সেদ্ধ, শামুক পাতে জোটে।[30] বিষ্ণুপুরে সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে গঙ্গাজলঘাঁটির পাশাপাশি শালতোড়া ও মেজিয়াতে প্রশাসনকে ত্রাণ শিবির খুলতে হয়। সেই দুর্দিনে দেখা গেলো জাত-ধর্মের আচার-ভেদ সরিয়ে সামান্য নুন সমেত দুমুঠো ভাতের জন্য ব্রাহ্মণেরাও বুভুক্ষু জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়েছে। যে ব্রাহ্মণ্য আচার ও মূল্যবোধে (বিদেশি) নুন ধর্মনাশের কারণ হয়, অব্রাহ্মণের হাতে অন্নগ্রহণে অন্তরায় হয়, সামান্য সেই নুন-ভাতই সংকটের দিনে সামাজিক ক্রমোচ্চতার অনুশাসনকে বিধ্বস্ত করে, বিশৃঙ্খল জনতার ভিড়ে মিশিয়ে দেয়, বিপন্নতার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। দুর্ভিক্ষ যেমন জীবনে বৃহত্তর সংকট আনে, তেমনই কি সমাজে এক আদিকালের সাম্য - অন্ততঃ সীমিত সময়ের জন্য

---

28 সুধীর চক্রবর্তী, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১০), ৩৮।

29 সত্যরঞ্জন সেন, *প্রবাদ-রত্নাকর*, ৪৭৮, ৫৬২।

30 *Bankura Darpan*, 8 August, 1897— RNP (B) for week ending 28 August, 1897. IA

- প্রতিষ্ঠা করে? রক্ষণশীলতার শেকড় চারিয়ে যাওয়া সমাজ অবশ্য এতে বিপন্ন বোধ করে। যেমন, *বাঁকুড়া দর্পণ* তার ১৬ই আগস্ট, ১৮৯৭-এর প্রতিবেদনে ব্রাহ্মণ সহ অন্যান্য উচ্চ-বর্ণীয়দের শুদ্ধতা রক্ষার্থে পাশাপাশি দুটো অন্নসত্র খুলে নুন-ভাত দেওয়ার প্রস্তাব প্রশাসনের কাছে পেশ করেছিল।[31] ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যেখানে মানুষের জীবন রক্ষাতেই দায়সারা মনোভাব নিয়েছে, সেখানে জাত-ধর্ম রক্ষায় পৃথক অন্নসত্র খোলার এমন অসার দাবি পূরণ করতে সরকারের বয়েই গেছে। সরকারি ঔদাসীন্যের প্রকৃত বাস্তবতা অবশ্য *বাঁকুড়া দর্পণের* প্রতিবেদক শীঘ্রই মরমে উপলব্ধি করেছিলেন, যা প্রকাশিত ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭-এর প্রতিবেদনে। রায়পুরের অন্নসত্র থেকে আর্ত মানুষকে চার সপ্তাহের জন্য নুন-ভাত দেওয়ার পর তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়; এরপর তারা কি খেয়ে বেঁচে থাকবে সে বিষয়ে প্রশাসন নির্বিকার। চাহিদার তুলনায় নগণ্য সংখ্যক টিকিটের মাধ্যমে বিতরিত এই নুন-ভাতের জন্য বহুক্রোশ পথ উজিয়ে বহু মানুষ আসে ও আশাহত হয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে তারা ফিরে যায়।[32]

সামান্য নুন সহ কয়েকমুঠো ভাতের অভাবে ক্ষুধার্ত মানুষের হতাশায় নুয়ে পড়ার এই দৃশ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। কারণ সাধারণ মানুষের ধারণায় রাষ্ট্র ছিল নৈতিক অভিভাবকের মতো, 'মা-বাপ সরকার'।[33] অর্থাৎ রাষ্ট্র শুধু কঠোর দন্ডদাতাই নয়, সংকট বা বিপর্যয়ের দিনে পরিত্রাতাও বটে। বিপদ-আপদে নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, নিরন্নকে ন্যূনতম নুন-ভাত, নিঃসহায়কে আর্থিক সহায়তা জোগাবে যে 'মা-বাপ সরকার'। নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষায়, যাবতীয় শোষণ-অবদমন সত্ত্বেও, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতীয়দের কাছে এক পিতৃসুলভ, কর্তৃত্ববাদী অভিভাবকের ভূমিকায় আপন শাসনদণ্ডকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। সরকারের লবণ নীতিও জনমানসে এই মা-বাপ সুলভ অভিভাবকত্বের নিরিখে পর্যালোচিত হয়েছিল। যেমন, কলকাতার *সুলভ সমাচার* এবং নদিয়ার *কুশদহ* পত্রিকা একসুরে জানায় যে, লবণের ওপর শুল্ক কমিয়েছিলেন গরীবের 'মা-বাপ' লর্ড রিপন, কিন্তু তার সেই মহান কীর্তি এখন (লর্ড ডাফরিনের সময়)

---

31 *Bankura Darpan*, 16 August, 1897— RNP (B) for week ending 21 August, 1897. IA

32 *Bankura Darpan*, 8 September, 1897 RNP (B) for week ending 18 September, 1897.IA.

33 See the chapter 'We thought the Government was our Maa-Baap!': State intervention and Indian responses to Plague control measures, 1896-1920' in Mridula Ramanna, *Health Care in Bombay Presidency* (Delhi, Primus Books, 2012), 10-38.

পরিত্যক্ত হয়েছে।[34] তিব্বত যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সরকার সে সময় লবণ শুল্ক বাড়িয়েছিল, যার সমালোচনায় *সঞ্জীবনী* লিখেছিল যে প্রত্যেক ভারতীয়র চোখে লর্ড ডাফরিন একজন চূড়ান্ত ব্যর্থ প্রশাসক।[35]

সাধারণ সময়ে নুনের ওপর কর বৃদ্ধি যদি মানুষকে ক্ষুব্ধ করে থাকে এবং প্রশাসকের ব্যর্থতাকে প্রতিপন্ন করে থাকে তাহলে বিপর্যয় বা নিদারুণ সংকটের দিনে সেই ক্ষোভের সমষ্টিগত বহি:প্রকাশ সুতীব্র হয়ে উঠত। তেমন সময়ে পরিত্রাতার ভূমিকায় রাষ্ট্রের গাফিলতি বা ব্যর্থতায় বিক্ষুব্ধ মানুষ নুন সমেত ভাতের ত্রাণকেই প্রত্যাখান করার মাধ্যমেই 'মা-বাপ সরকারের' নৈতিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতেন। নুন-ভাত প্রত্যাখানের এমনই প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল ১৮৯০-এর নভেম্বর মাসের শুরুতে, যখন নদিয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমা প্লাবিত হলে গ্রামীণ মানুষ প্রবল দুর্দশার সম্মুখীন হয়। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা জানিয়েছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট কার্ত্তিক চন্দ্র দাস স্বয়ং ত্রাণ বন্টনে এসে মানুষের দুর্দশা দেখে নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি। এতদসত্ত্বেও বাণভাসি গ্রামের মানুষ কার্তিকবাবুর মাধ্যমে সরকারের দেওয়া নুন সমেত ভাত প্রত্যাখান করেছিলেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত সহানুভূতি সত্ত্বেও ঘর তৈরি করার জন্য বাণভাসি মানুষের আর্থিক সহায়তার দাবিকে প্রশাসন উপেক্ষা করেছিল।[36] জীবন বিপন্ন হলেও মানুষ সেদিন ঔপনিবেশিক সরকারের নুন নেয়নি, কারণ এ সরকার গুণ গাওয়ার মতো নয়!

দুমুঠো ভাতে সামান্য নুন- জীবনধারণের ন্যূনতম এই সংস্থানটুকুর নিশ্চয়তাও প্রজাদের সেদিন দিতে পারে নি মহান সাম্রাজ্যের ধ্বজাধারী ব্রিটিশ সরকার! রাষ্ট্রীয় অপারগতার এমন অজস্র দৃষ্টান্ত ঔপনিবেশিক পর্ব জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, যা একসাথে জুড়লে স্পষ্ট হয়, কিভাবে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ উপনিবেশ জুড়ে রাষ্ট্রিক সম্প্রসারণের সাথে সাথে ক্ষুধার ভূগোলকে সম্প্রসারিত করেছিল এবং অগণিত মানুষকে অনাহারের মধ্যেই ঠেলে দিয়েছিল। মহাফেজখানার বিবর্ণ নথিতে বিধৃত ন্যূনতম নুনের এই নিদারুণ বাস্তবতা যেন আজো অস্ফুটে বলে, 'দু'মুঠো লাল ভাতের স্বাদে চোখের জলের নুন এখনো মাখা আছে'।[37]

---

[34] *Sulabh Samachar,* and *Kushdaha* 10 February, 1888— RNP (B) for week ending 18 February, 1888. IA.

[35] *Sanjivani*, 11 February, 1888— RNP (B) for week ending 18 February, 1888. IA.

[36] *Somprakash*, 3 November, 1890— RNP (B) for week ending 8 November, 1890. IA

[37] লেখ্যাগারের নথিতে নুন-ভাতের বাস্তবতা প্রসঙ্গে অরুণ মিত্রের 'চিতা' কবিতাটি এই পংক্তিই গবেষকের মনে এসেছিল। সংকলিত হয়েছে বিষ্ণু দে সম্পাদিত *একালের কবিতা* (কলিকাতা: সম্বোধি পাবলিকেশনস, ১৯৬১), ১৫১।

।।৩।।

দুর্দিনে ও দৈনন্দিনে লবণ: ভদ্রলোক ভাবনার লাবণ্য

শুধু দুর্গত আমজনতা নয়, ব্রিটিশ রাজের বৈষম্যমূলক নীতিতে ভাতের পাতে সামান্য নুনের মহার্ঘ্য, দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠার আর্থ-সামাজিক অভিঘাত যদি উনিশ শতকীয় বাঙালি ভদ্রলোক অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্লেষিত হয় তাহলে তা আরো বিবিধ মাত্রায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ভদ্রলোক শব্দটি শহুরে, প্রচলন সম্ভবত উনিশ শতকের কলকাতায় সমাজসংস্কার ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। তবে 'ভদ্রলোক কে?' – 'একটি সামাজিক শ্রেণি', 'পদমর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠী', না কি 'নিছক একটি বর্গ'– প্রশ্নটি জটিল, বিতর্কিত ও অমীমাংসিত।[38] সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক চর্চায় 'ভদ্রলোক' ধারণা যদিও উচ্চবর্ণীয় হিন্দু, কায়িক শ্রমবিমুখ, সুবিধাভোগী, উচ্চবর্গীয় গোষ্ঠীভুক্ত বলে সমালোচিত হয়েছে (যা পুরোপুরি সঙ্গত নয়), তবু উপনিবেশিত পর্বে সাধারণ জীবনে নুনের গুরুত্ব সম্যকরূপে বুঝতে এই সংযোজন জরুরি।[39] এর কারণ, ভদ্রলোক যে প্রকরের অন্তর্ভুক্ত সেই 'উচ্চবর্গীয় ও প্রাধান্যকারী গোষ্ঠীগুলিরও একটি নিম্নবর্গীয় অতীত' থাকার সম্ভাবনাকে সমাজবিজ্ঞানের পরসরে তুলে ধরা হয়েছে।[40] লবণের মতো পণ্যের বহুস্তরীয় সামাজিক ইতিহাস রচনায় তাই অন্যতম আকর হয়ে ওঠে বঙ্গীয় মনীষার বৈগ্রহিক ব্যক্তিত্বদের জীবন-বৃত্তান্ত, যাতে 'ভদ্রলোক'-এর 'নিম্নবর্গীয় অতীতের' সন্ধান মেলে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের দেহাবসানের পর স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যরা বরানগর মঠে গভীর অধ্যাত্মসাধনায়, শারীরিক কৃচ্ছসাধনে দিনাতিপাত করেছিলেন। চূড়ান্ত সেই দৈন্যের দিনগুলিতে শুধুই লবণ জুটেছে ভাতের সাথে, কোনোদিন তাও জোটেনি; যদিও আধ্যাত্মিক পথ সন্ধানে তাঁদের প্রাণ-মন লাবণ্যে পূর্ণ ছিল বলেই স্বামীজি স্মৃতিচারণে তুলে ধরেছিলেন: "এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই।

---

[38] যদিও জন ব্রুমফিল্ড ভদ্রলোককে "পদমর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠী'(Status Group) ও রণজিৎ গুহ কোনো শ্রেণি নয়, 'নিছক একটি বর্গ' (A mere category not a class) হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, কিন্তু উনিশ শতকের বাংলায় অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক গতিশীলতাকে বোঝার জন্য সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় 'ভদ্রলোক'-কে একটি সামাজিক শ্রেণি হিসেবে বিশ্লেষণের পক্ষপাতী ছিলেন। S.N. Mukherjee, *Calcutta: Myths and History* (Calcutta: Subarnarekha, 1977), 24.

[39] See the Introductory first part on 'Bengal and Bhadralok' in J.H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal* (Berkeley: University of California Press, 1968), 1-20.

[40] দীপেশ চক্রবর্তীর মতে, যদি উচ্চবর্গ জীবনের কোনো পর্যায়ে গৌণ, নিম্নস্থ জীবনধারায় অংশগ্রহণ করে থাকেন তাহলে তা উচ্চবর্গের নিম্নবর্গীয় অতীত বলে গণ্য হতে পারে ['Elite and dominant groups can also have subaltern pasts to the extent that they participate in subordinated life-worlds']. Dipesh Chakrabarty, "Minority Histories, Subaltern Pasts," *Post Colonial Studies*, 1:1, (1998), 15-29 [18].

ভিক্ষা করে চাল আনা হল তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি! আহা, সে-সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি!”[41] সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে সামান্য নুন যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এখানে স্বীকৃত হলেও এই বাস্তবতা শেষতঃ এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। সন্ন্যাস জীবনের সূচনাপর্বে স্বামীজি ও তার গুরুভাইদের জীবনে অভাবজনিত কারণে বিনা নুন বা সামান্য নুন সহ আহার্য কার্যত হয়ে উঠেছিল আত্মসংযমের নামান্তর। অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের জীবনবৃত্তান্তে যিনি অবশ্য স্বেচ্ছায় নিয়মিত নুন-ভাতের আহার্য গ্রহণ করতেন। তাঁর কাছে এহেন লঘুপাক আহার্য সন্ন্যাস জীবনে আবশ্যক কারণ তা ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়ক হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনাকে ফলপ্রসূ করে তোলে।[42]

স্বাস্থ্য ও স্বাদকে বঞ্চিত করে এই স্বেচ্ছাধীন শারীরিক আত্মনিগ্রহের অনুশীলন ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক বহুস্বীকৃত পন্থা। বলাবাহুল্য, আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে সুখপ্রাপ্তির এই প্রবণতা জটিল মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থিতে সংযুক্ত। ধর্মীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষকেরা হয়তো এর মধ্যে মর্ষকামী (Masochistic) ব্যক্তিত্বের পরিলক্ষণ খুঁজে পাবেন।[43] কেননা নুন বিহীন আহারের অভিজ্ঞতা যখন গুরুপত্নী সারদাদেবী নীরবে সয়েছিলেন, তা জেনে এই শিষ্যদেরই হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়েছিল। রামকৃষ্ণের তিরোধানের পরবর্তী কয়েক বছর সারদাদেবী কামারপুকুরে চূড়ান্ত দারিদ্র্যে কাটিয়েছিলেন; তখন অনেক দিনই তরিতরকারি তো দূর, বিনা নুনে ভাত খেয়েছিলেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) পরে আক্ষেপ করেছিলেন, “আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মা’র নুনটুকুও জোটেনি।”[44]

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং একাধারে যেমন লবণ উপমার অসাধারণ প্রয়োগে ভক্তদের আধ্যাত্মিক লোকশিক্ষা দিয়েছেন, তেমনই এর সাধারণ প্রয়োগে লোকজীবনের বাস্তবতাকেও তুলে ধরেছিলেন। *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ*

---

[41] ১৯০২ -এ বেলুড় মঠে স্বামীজির সাথে এই কথোপকথন শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিপিবদ্ধ করেছিলেন *স্বামী শিষ্য সংবাদ* গ্রন্থে; সংকলিত হয়েছে, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, নবম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৭), ২৩৯।

[42] স্বামী বেদানন্দ, *শ্রী শ্রী যুগাচার্য্য জীবন চরিত, সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবন চরিত* (কলিকাতা: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ১৯৭৮), ২৬।

[43] Stuart L. Charmé, “Religion and the theory of masochism”, *Journal of Religion and Health*, 22: 3, (1983), 221-233.

[44] ১৮৮৭-র আগস্টে বৃন্দাবন থেকে কোলকাতায় ফেরার পর দীর্ঘসময় কামারপুকুরে ছিলেন শ্রী মা সারদা। তথ্যসূত্র: Swami Gambhirananda, *History of the Ramakrishna Math and Mission* (Calcutta: Advaita Ashrama, 1957), 60.

কথামৃতর লেখক শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে (শ্রীম) শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে একদা বলেছিলেন যে শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত, দেখা যায় না; যেমন 'জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না'।[45] অথবা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অসীম ব্যাপ্তি বুঝিয়েছিলেন নুনের পুতুলের সমুদ্রের গভীরতা মাপতে যাওয়া ও সেখানেই মিলিয়ে যাওয়ার বহুমাত্রিক আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে।[46] শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন জীবনের এক সংকটময় পর্বে। যুবক নরেন্দ্রনাথ সেদিন শুধুই আধ্যাত্মিক পথের খোঁজে উদভ্রান্ত ছিলেন না, পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পর মামলা-মোকদ্দমা সহ নানান পার্থিব সমস্যায় জর্জরিত হয়ে কিভাবে পরিবারের অন্ন যোগাবেন তা ভেবেও দিশেহারা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণই স্বয়ং একাধিকবার নরেন্দ্রনাথের সর্বস্বান্ত অবস্থায় ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন যে নরেন্দ্রর 'কলাপোড়া খাবার নুন নাই'[47] অথবা 'ভাত নুন দে খাবার পয়সা জোটে না'।[48]

বস্তুগতভাবে সামান্য নুনের অপ্রাপ্তি সাধারণ জীবনে যে সংকট তৈরি করেছিল তার আঁচ, আধ্যাত্মিক চেতনার নিরিখে উপেক্ষিত হলেও, এই অসামান্য ব্যক্তিত্বদের জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছুঁয়েছিল। তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের নানান অনুষঙ্গে বিধৃত নুনের এই কথাকণিকার (Anecdotes) মধ্যে তৎকালীন ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতারই প্রতিফলন ঘটেছে। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের সূচনাতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। দ্বৈত শাসনাধীন বাংলায় কোম্পানির আমলারা ব্যক্তিগত মুনাফার লোভে লবণ কারবারে ঢুকে পড়ায় লবণের দাম চড়তে থাকে। এমত পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণের মতোই আরেক দিব্য সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের কাছে সঙ্গীতে অনুযোগ জানিয়েছিলেন, 'নুন মেলে না আমার শাকে'।[49]

সাধারণভাবে বাঙালি ভদ্রলোকের ভাবনায় ভাতের পাতে সামান্য নুন অথবা বিনা নুন ছিল চূড়ান্ত দারিদ্র্যের প্রতীক। দৈন্য পীড়িত জীবনসংগ্রামের দিনগুলিতে শুধুই নুন-ভাত খাওয়ার এই স্মৃতি এতটাই কাঠিন্যে জারিত যে পরবর্তীকালে আর্থিক সচ্ছলতার দিনেও খ্যাতনামী মানুষেরা তা বিস্মৃত হন নি। যেমন,

---

[45] শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত*, চতুর্থ ভাগ, একবিংশ খণ্ড, (কলিকাতা: প্রভাস চন্দ্র গুপ্ত [প্রকাশক], দ্বিতীয় কথামৃত সংস্করণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ), ২১৪।

[46] তদেব, প্রথম ভাগ, পঞ্চম খণ্ড,(ষষ্ঠ কথামৃত সংস্করণ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), ৮৭।

[47] তদেব, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড, (কলিকাতা: অনিল গুপ্ত [প্রকাশক], একাদশ কথামৃত সংস্করণ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), ১১৪।

[48] তদেব, চতুর্থ ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, (কলিকাতা: প্রভাস চন্দ্র গুপ্ত [প্রকাশক], দ্বিতীয় কথামৃত সংস্করণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ), ২৬৯।

[49] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *সাধক কবি রামপ্রসাদ* (কলকাতা: ভট্টাচার্য্য সনস্ লিমিটেড, ১৯৫৪), ৩৪৩।

ব্যক্তিজীবনে খাদ্যরসিক হিসেবে সুবিদিত হলেও বিদ্যাসাগর মাঝে-সাঝেই স্বেচ্ছায় নুন-ভাত খেতেন 'আহার বিষয়ে সংযম বজায় রাখার জন্য'। এর কারণ তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনে বহুদিন নুন-ভাত খাওয়ার সেই অনপনেয় দারিদ্র্যের স্মৃতি। জীবনে কখনো সেই দারিদ্র্য যদি ফিরে আসে তাহলে আবারও তা যাতে অনায়াসে বরণ করে নিতে পারেন![50] বলাবাহুল্য, অকাতর দানশীলতা ও বহুমুখী সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার দরুন বিদ্যাসাগর প্রায়শই অর্থসংকটের সম্মুখীনও হতেন। এই প্রেক্ষিতে নুন ভাত হয়ে উঠেছিল বিদাসাগরের আপন আদর্শে অবিচল থাকা এবং তার পরিণামে পুনরায় দারিদ্র্য বরণে প্রস্তুতিকল্পের প্রতীক। অনুরূপে, বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন, আর স্বেচ্ছায় সপ্তাহে একদিন নুন-ভাত খেতেন। বাড়িতে রান্নার অন্যান্য পদ ছেড়ে তাঁর শুধু নুনভাত খাওয়ায় স্ত্রী রমাদেবী কষ্ট পেলে বিভূতিভূষণ বুঝিয়েছিলেন, "কল্যাণী, দারিদ্রময় বাল্যই আমাকে সাহিত্যের প্রেরণা দিয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছাকাছি রেখেছে, আমি ওদের মানুষ। এই খাবার আমার অহংকে স্থির রাখে, মৃদু রাখে, আমার উৎসকে স্মরণে রাখতে সাহায্য করে।"[51]

বিদ্যাসাগর বা বিভূতিভূষণ কৃত সামান্য নুন সহ ভাতের এই স্বেচ্ছাধীন পরিমিত আহারকে এক্ষেত্রে বাঙালি ভদ্রলোকের সাংস্কৃতিক পুঁজির (Cultural Capital) এক ব্যতিক্রমী বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি রূপে গণ্য করা উচিত।[52] কারণ, সাংস্কৃতিক পুঁজির দৌলতেই বাঙালির সামাজিক জীবনে ভদ্রলোক ধারণাটি একটি 'Aspirational Category' হয়ে ওঠে; যেখানে ভদ্রলোক বলতে বোঝায় স্বল্পসংখ্যক সেই মানুষদের যাদের জীবনে মূল সাধনা ছিল সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।[53] প্রকট ভোগের (Conspicuous Consumption) ধারণা নির্ভর সচ্ছল জীবনধারা থেকে সযত্ন দূরত্ব তৈরি করে এখানে সংস্কারক বিদ্যাসাগর বা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ স্বেচ্ছায় যে নুন-ভাত গ্রহণ করতেন তাতে দারিদ্র্য-

---

50 কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *বঙ্গের রত্নমালা* (কলিকাতা: ১৩১৭), ১২৯।

51 তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণের সংসার* (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১১), ৬৯।

52 সাংস্কৃতিক পুঁজি বলতে বোর্দু এখানে সেই প্রতীক, চিন্তাধারা, রুচি এবং পছন্দকে বুঝিয়েছেন যা সামাজিক কর্মকাণ্ডে কৌশলগতভাবে সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। একজন ব্যক্তির সাংস্কৃতিক পুঁজি তার 'habitus' (অর্থাৎ, অন্তর্নিহিত প্রবণতা ও কাজ করা, চিন্তা করা বা অনুভব করার প্রবৃত্তি) এবং 'field' (অর্থাৎ, সামাজিক অবস্থান) এর সাথে জড়িত, যা একটি সামাজিক সম্পর্কের কাঠামো হিসাবে গঠিত। Pierre Bourdieu, 'The Forms of Capital' in J. G. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), 241-258.

53 'ভদ্রলোক প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে দীপেশ চক্রবর্তী এমনই অভিমত জানিয়েছেন। দীপেশ চক্রবর্তী, *মনোরথের ঠিকানা,* (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৮), ৫৮।

পীড়িত প্রান্তিক মানুষের প্রাত্যহিক ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর’ জীবনসংগ্রামকে প্রাপ্য মর্যাদায়, গভীর মানবিকতার বোধে আত্মস্থ করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।[54] সাধারণ মানুষের সাথে আত্মিকভাবে দূরত্ব কমানোর এই ব্যতিক্রমী মানবিক প্রয়াসেই ‘ভদ্রলোক’ ভাবনার লাবণ্য ফুটে ওঠে।

।। ৪।।

অপমিশ্রণ থেকে অপবিত্রকরণ: লিভারপুল লবণের অপরীকরণ

ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির বিরুদ্ধে জনজীবনের বিভিন্ন স্তরে যে সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে তা একদিকে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্বেগ, অন্যদিকে জাত-ধর্মনাশের আশঙ্কায় এক সংক্রামক রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলায় এই বিতর্ক উপনিবেশে পণ্য-রাজনীতির জটিল সামাজিক, নৈতিক প্রেক্ষিতে আলোকপাত করে দেখায় কিভাবে বিদেশি লিভারপুল লবণ দেশীয় জনসমাজে অপমিশ্রণ ও অপবিত্রকরণের অভিযোগ বিদ্ধ হয়ে এক অপরীকরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল।[55] কালাপানি পার হয়ে আসা বিদেশীয়, বিজাতীয় লিভারপুল লবণকে ‘অপর’ রূপে চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক প্রতিরোধের যে আখ্যান তৈরি হয়েছিল তার আধার ছিল মূলত দেশীয় সমাজজীবনে হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য ও জাতি-বর্ণগত রক্ষণশীল মূল্যবোধ।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্বেগের কেন্দ্রে ছিল বাজারে ভেজাল নুনের কারবার ও দেশীয় নুনের সাথে লিভারপুল লবণ মেশানোর অভিযোগ। বাজারে নুনের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীতে ভেজালের অভিযোগ আসলে পণ্যের বিশুদ্ধ গুণমান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি করে; ভোক্তার দুই ধরনের উদ্বেগকে তুলে

---

[54] ‘Conspicuous Consumption’ বলতে বোঝানো হয়েছে ভোগ্যপণ্য ও বিলাসবহুল জীবনের জন্য প্রভূত ব্যয় করে উচ্চকোটির মানুষ যখন জনসমক্ষে তার আর্থিক প্রতিপত্তি ও উচ্চমার্গীয় রুচির নিদর্শ তুলে ধরে। Thorstein Veblen, *Theory of the Leisure Class, An Economic Study in the Evolution of Institutions* (New York: Penguin Classic Edition, 1994).

[55] সাম্রাজ্যিক প্রতর্কে কিভাবে এর ‘অপর’ নির্মিত হয় সেই পদ্ধতির বিশ্লেষণে ‘othering’ আখ্যাটির প্রণয়ন করেছিলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক। Gayatri Chakravorty Spivak, “The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives, *History and Theory*,” 24:3, (Oct., 1985), 247-272. উত্তর-ঔপনিবেশিক চর্চায় ‘othering’ ও ‘otherization’ এর তাত্ত্বিক প্রয়োগ বহুল হলেও উপনিবেশ কিভাবে সাম্রাজ্যকে ‘অপর’ হিসেবে দেখে, প্রতিরোধের বয়ানে ‘অপর’ নির্মাণ করে সেই প্রেক্ষিতে থেকে অপরীকরণ আখ্যাটি এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

ধরে: প্রতারণা আর শারীরিক ক্ষতি তথা বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা।[56] ১৮৭৫-এর ১৫-ই মে *হিন্দু হিতৈষিণী* যেমন অভিযোগ করেছিল যে, বাজারে বিক্রি হওয়া লবণ থেকে দুধ, ঘি, ময়দা, চিনি, চাল, তেল, মাছ ইত্যাদিতে ভেজাল মিশ্রিত থাকায় ভোক্তাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে।[57] ঔপনিবেশিক ভারতে ভেজাল সংক্রান্ত প্রতর্ক মূলত কে বা কারা এর ভুক্তভোগী এবং সেই ভোক্তাদের সামাজিক অবস্থানের নিরিখে এক স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। উল্লিখিত প্রেক্ষিতে অনুযায়ী পর্যালোচনা করলে, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে খাবারে ভেজাল নিয়ে তর্ক-বিতর্কে মুখ্যত স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি, জাত ও শ্রেণিগত পার্থক্য এবং সাংস্কৃতিক সত্তা নির্মাণের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছিল। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং সাম্রাজ্যিক অস্মিতার সাথে সম্পর্কিত ছিল।[58] অবশ্য, খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল রুখতে নানাবিধ কঠোর আইন প্রণয়ন করেও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এই প্রবণতায় রাশ টানতে পারে নি। বাজারে যথেচ্ছ ভেজালের কারবার চালু ছিল এবং যাবতীয় সরকারি পদক্ষেপ প্রায়শই স্থানীয় রাজনীতির জটিল প্যাঁচে আটকে যেত।[59] যেমন, ১৮৮৪ তে প্রণীত বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট-এ ভেজাল রুখতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ বিধিবদ্ধ হলেও তা যথেষ্ট ছিল না।[60] কলকাতা পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ভেজাল বা ক্ষতিকর খাদ্যদ্রব্য বিক্রি হলেও পৌর-কর্তৃপক্ষ তাতে উদাসীন ছিলেন বলেই *জগৎবাসী* অভিযোগ তুলেছিল। নুনের দাম বাড়ার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে কালচে দানার শোরা (Saltpetre), যা পশুচর্ম পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত, তাকেই করকচ বলে বিক্রি করছিল। এই ভেজাল, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর মিশ্রণ দু পয়সায় বা সেরপ্রতি ২৪ পয়সায় কলকাতায় বিকোচ্ছে, এমনকি মফস্বলেও নুন হিসাবে বিক্রি হতে পারে বলে সাময়িকপত্রটি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল।[61] বাজারে লবণের আর একভাবে বিষাক্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকত। যেমন, খুব খুঁটিয়ে না দেখলে নুনের সাথে সাদা কেলাসিত আর্সেনিককে সহজেই গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকত। আর আর্সেনিকের মতো এই বিষ

---

[56] Michael French and Jim Philips, *Cheated not Poisoned? Food Regulation in the United Kingdom 1875-1938* (Manchester: Manchester University Press, 2000).

[57] *Hindu Hitoishini*, 15 May, 1875— RNP (B) for week ending 22 May, 1875. IA

[58] বিশদ আলোচনা রয়েছে 'Food Adulteration, embodiment and Politics of Anxiety' শীর্ষক অনুচ্ছেদে। Srirupa Prasad, *Cultural Politics of Hygiene in India, 1890–1940: Contagions of Feeling* (Palgrave Macmillan, 2015), 27-33.

[59] Kavita Ray, *History of Public Health: Colonial Bengal, 1921–1947* (Calcutta: K.P. Bagchi and Co., 1998); also cited in Prasad, ibid.

[60] The Bengal Municipal Act, 1884 এর "Of the Regulation of the Sale of Food, Drinks and Drugs" শীর্ষক নির্দেশিকা (Part-VI Sec. 250, 251, 251A.- D.). সংগৃহীত হয়েছে, *The Bengal Code*, Volume III, (Calcutta, 1905, Third Ed.), 429-431.

[61] *Jagatbasi*, 7 May, 1888— RNP (B) for week ending 2 June, 1888.

বাজারে মশলা ও লবণ বিক্রেতাদের অনেকের দোকানেই একই সাথে বিক্রি হত। সুতরাং খাবারে এই মারাত্মক বিষের 'দুর্ঘটনাক্রমে মিশে যাওয়ার ঝুঁকি খুব বেশি' বলেই রাসায়নিক পরীক্ষক এল. এ. ওয়াডেল ১৮৯৯-র এক রিপোর্টে তুলে ধরেছিলেন।[62] অন্যদিকে লিভারপুল লবণ যে ভেজাল ও স্বাস্থ্যহানির কারণ এমন অভিযোগও বাজারি পরিসরে ছিল। উড়িষ্যাতেও *সংস্কারক ও সেবক* পত্রিকা অভিযোগ করেছিল যে ভদ্রক মহকুমায় অসাধু দোকানদারেরা খাবার তৈরি করছে স্থানীয় লবণের সাথে লিভারপুল লবণের ভেজাল মিশিয়ে, যা ক্রেতাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।[63]

বাজারে ভেজাল জিনিসের ছয়লাপ এবং তা রোধে বিজাতীয় সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দেশীয় জনতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ক্রমশ ব্রিটিশদের উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল। যেমন, সরকারপন্থী *ডেইলি নিউজ*-এর প্রতিবেদনে ভেজাল ঘি-র মতো লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধেও দেশীয় জনতা তীব্র বিক্ষোভ-আন্দোলন দেখাতে পারে এমন আশংকা প্রকাশিত হয়, যদিও *প্রজাবন্ধু* পত্রিকা তা ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছিল। প্রতিবেদকের যুক্তি ছিল যে, রক্ষণশীল হিন্দুরা লিভারপুল লবণ ছুঁয়ে দেখেন না, আর যারা দীর্ঘদিন বিদেশি লবণ খেয়ে অভ্যস্ত তারা খামোকা আপত্তি করতে যাবেন কেন![64] লবণের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে ভেজাল তথা অপমিশ্রণ একদিকে যেমন জনস্বাস্থ্যের প্রেক্ষিতে উদ্বেগের বিষয় ছিল, অন্যদিকে জাত-ধর্ম অপবিত্রকরণের অভিযোগেও বিদ্ধ ছিল; কালক্রমে এই শেষোক্ত অভিযোগটি মুখ্যরূপে জনসমাজের অতি-উদ্বেগের কারণ হয়েছিল।

অপমিশ্রণ থেকে অপবিত্রকরণ, এই উদ্বেগের মিশেল পরিলক্ষিত হয় *খুলনা প্রকাশ*-এর নিবন্ধে। এখানে স্বাস্থ্যহানির পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রচলিত হিন্দু আচার-ঐতিহ্যকে কলুষিত করার অভিযোগ উঠেছিল লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধে। যুবসমাজের নির্বিচারে বিদেশি লবণ গ্রহণের প্রবণতা আদতে হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং ধর্মীয় হিন্দু আচারের প্রতি বিরূপতার বহিঃপ্রকাশ বলেই এই সাময়িকপত্রে সমালোচিত হয়েছিল।[65] ১৮৭০-এর দশকের শেষ থেকে লিভারপুল লবণের মতো বিদেশি পণ্যের সমালোচনায় সংবাদপত্রের ক্রমশ অপমিশ্রণ থেকে অপবিত্রতার দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং

---

[62] Annual Report of the Chemical Examiner's Department, Bengal, 1899, 13, cited in David Arnold, *Toxic Histories: Poison and Pollution in Modern India* (UK: Cambridge University press, 2016), 148.

[63] *Sanskaraka & Sevaka*, 8 December, 1886— RNP (B) for week ending 25 December, 1886. IA.

[64] *Praja Bandhu*, 24 December 1886— RNP (B) for week ending 15 January 1886. IA

[65] *Culna Prakash*, 22 December, 1877— RNP (B) for week ending 29 December, 1877. IA.

তৎকালীন বাংলার পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী। ১৮৭০ দশকে ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ক বিল নিয়ে বিতর্কে ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার পরবর্তী সময়ে পাল্টা এক হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী প্রবণতা বঙ্গীয় জনজীবনে প্রবল হয়ে উঠেছিল।[66] এই আগ্রাসী প্রতিক্রিয়ার আঁচে - যার প্রচারে ও প্রসারে 'নতুন বাংলা প্রেস' মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল - বিদেশি নুন হিন্দুদের জাত-ধর্ম নষ্টের অভিযোগে ক্রমশ বিদ্ধ হতে থাকে।[67]

১৮৮০-র দশক থেকে বিদেশি লবণকে কেন্দ্র করে জনতার ধর্মীয় ভাবাবেগকে উসকে দিতে সেকালের দেশীয় পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি চোখে পড়ে। *সুরভি ও পতাকা* পত্রিকা যেমন লিখেছিল যে, বিদেশি লবণের উৎপাদন এবং পরিশোধন পদ্ধতি জানলে কোনো ধর্মপ্রাণ হিন্দু আর তা ছোঁবেন না। কারণ, বিদেশি লবণ পরিশোধনে গরু ও শূকর সহ বিভিন্ন প্রাণীর দেহাস্থি ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা এবিষয়ে সচেতন না থাকায় ম্লেচ্ছরা [বিদেশি ব্রিটিশরা] নির্বিচারে মুনাফা লুটছে এবং হিন্দুদের ধর্মনাশ করছে। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রেক্ষিত তুলে ধরে এই সাময়িকপত্র একদিকে হিন্দু জাগরণের আহ্বান জানিয়েছিল, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সরকারকেও যেন এক প্রচ্ছন্ন সতর্কবার্তা দিতে চেয়েছিল।[68] একই সুরে মফ:স্বল সাপ্তাহিক *মুর্শিদাবাদ পত্রিকা* জানিয়েছিল বিদেশি লবণের ব্যবহার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্ম পালনে সংকট তৈরি করেছে। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে কলুষিত করায়, খ্রিস্টান ব্যতীত সকল ভারতবাসীর স্বার্থে, বিলিতি লবণ নিষিদ্ধ করার নৈতিক আহ্বান জানিয়েছিল এই সাময়িকপত্র।[69] এই প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে ঔপনিবেশিক বাংলায় গ্রাম-মফঃস্বল স্তরেও ধর্মীয় আচার সহ জাতি-বর্ণের প্রেক্ষিতে বিদেশি লবণের বিরুদ্ধে জোরালো জনমত তৈরির প্রচেষ্টা চলেছিল।

---

[66] Amiya P. Sen, *Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905: Some Essays in Interpretations* (Delhi: Oxford University Press, 1993).

[67] হিন্দু জাগরণে কলকাতার ও মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত নতুন বাংলা সংবাদপত্র জগতের ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে Hindu Revivalism at the Crossroads—Reaction and Reappraisal in the New Bengali Press and Literature (c. 1872–1894) শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে, ibid., 81-202.

[68] *Surabhi & Pataka*, 19 August 1886— RNP (B) for week ending 28 August 1886. IA.

[69] *Murshidabad Patrika*, 24 November, 1886— RNP (B) for week ending 4 December 1886. IA.

এডুকেশন গেজেট, *হিন্দি বঙ্গভাষী*-র প্রতিবেদনেও ব্রিটিশ লবণ পরিশোধনে গরু ও শূকরের হাড়-রক্ত ব্যবহার এবং হিন্দু ও মুসলিমের জাত-ধর্ম অপবিত্রকরণের অভিযোগ পরিলক্ষিত হয়।[70] *ইণ্ডিয়ান মিরর* পত্রিকা তো লিভারপুলে লবণ পরিশোধন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে এবং হাড়ের ব্যবহার রোধে একজন হিন্দু ভদ্রলোককে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিল, যা *দৈনিক* পত্রিকা সমর্থন করেছিল। অবশ্য *দৈনিক* সম্পাদক নিশ্চিত ছিলেন যে, উক্ত প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হিন্দু মহাশয়ও লিভারপুলে থাকার কারণে তাঁর ধর্ম হারাবেন, কারণ কারখানায় তার চারপাশের ম্লেচ্ছরা [অহিন্দু বিদেশি ব্রিটিশ] কোনো অবস্থাতেই প্রস্তাবিত শুদ্ধিকরণ যথাযথ করে তুলতে যত্ন নেবে না! সুতরাং ভারতে লিভারপুল লবণের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করাই একমাত্র পথ বলে সম্পাদক সওয়াল করেছিলেন।[71] ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *সারস্বত পত্র* জানিয়েছিল যে নদিয়ার রক্ষণশীল হিন্দুরা বিদেশি লবণ পরিশোধনে হাড়ের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয় জানতে পেরে তার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। পত্রিকাটি প্রশ্ন তুলেছিল, এই ঘৃণ্য অশুচিতার পরেও কি ভারতীয় হিন্দুরা বিদেশি লবণের ব্যবহার চালিয়ে যাবেন?[72]

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাংলায় বিদেশি লবণের সমালোচনায় যে সামাজিক মূল্যবোধ পরিলক্ষিত তা নিঃসন্দেহে জাত-ধর্মের শুদ্ধতাকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধারণায় জারিত ছিল। বাংলায় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রবাহে সংবাদপত্রের অনমনীয় ও আগ্রাসী প্রচারে বঙ্গবাসী পত্রিকা অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এই পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্র চন্দ্রের মতো রক্ষণশীল লেখকেরা তাঁদের পূর্বসূরী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারদের 'সমন্বয়বাদী' (syncretist) ঐতিহ্যের ধারণাকে সমালোচনা করে আরো আক্রমণাত্মক ও অনুদার হিন্দুত্বের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। বঙ্গবাসীর আগ্রাসী প্রচার যে জনজীবনে ভালো সাড়া পেয়েছিল তার সাক্ষ্য

---

[70] *Education Gazette*, 5 November 1886— RNP (B) for week ending 13 November 1886; *Hindi Bangavasi*, 25 May, 1891— RNP (B) for week ending 30 May 1891. IA

[71] *Dainik*, 13 December, 1886— RNP (B) for week ending 18 December 1886. IA.

[72] *Saraswat Patra*, 10 January, 1891— RNP (B) for week ending 17 January 1891. IA.

এর ক্রমবর্ধিত গ্রাহক সংখ্যা যা ১৮৮৯-৯০ সালের মধ্যে ২০ হাজার ছাড়িয়ে যায়।[73] বিদেশি লবণের সমালোচনায় বঙ্গবাসীর প্রতিবেদনেও স্বভাবতই উগ্র হিন্দুত্বের ছোঁয়াচ পরিলক্ষিত হয়।

১৮৮৭-র ২২শে জানুয়ারি *বঙ্গবাসী*-তে লিভারপুল লবণ কিভাবে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মকে কলুষিত করছে তা বিশদে আলোচিত হয়। ড. উর-এর *ডিকশনারি অফ আর্টস*-এ বর্ণিত ব্রিটিশ লবণ উৎপাদনে রক্ত, ডিমের সাদা অংশ, জেলি এবং বাছুরের খুর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে লেখক এর অশুচিতার পক্ষে জোরালো প্রমাণ পেশ করেন। প্রতিবেদকের আক্ষেপ ছিল যে লবণ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর অতীতের বাংলা আজ সেই ইংরেজ লবণের মুখাপেক্ষী যা ভারতের প্রধান ধর্মমতগুলি অপবিত্র বলে গণ্য করে।[74] ১৮৯১-র ৩১শে অক্টোবর *বঙ্গবাসী* লবণ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন তুলে ধরে পাঠকদের সোল্লাসে জানিয়েছিল যে বাংলায় বিদেশি নুনের আমদানি কমেছে আর দেশীয় নুন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে! এই [সাময়িক] পরিবর্তনের কারণ? দেশি নুনের ব্যবহারে জাত-ধর্ম কলুষিত হয় না, ব্রিটিশ লবণে যে আশঙ্কা সবসময় থাকে; এজন্যই ভবিষ্যতে দেশি নুন ব্যবহারের প্রবণতা আরো বহুগুণ বাড়বে বলেই সংবাদদাতা আশা ব্যক্ত করেছিলেন।[75] *অমৃত বাজার পত্রিকা* একটি বিজ্ঞপ্তিতে জনগণকে ইংল্যান্ডে তৈরি লবণ বর্জন করার আহ্বান জানালে তা তুলে ধরে সমর্থন জানিয়েছিল বঙ্গবাসী পত্রিকা। ১৮৯১-এর ২ মে, প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, কলকাতা সহ বিভিন্ন শহর-গ্রামাঞ্চলের অনেক সচ্ছল ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি আজীবন বিদেশি লবণ ব্যবহার না করার শপথ নিয়েছিলেন। *সমাজ-ও-সাহিত্য* এবং *এডুকেশন গেজেট*-এর মতো সংবাদপত্রগুলিও মানুষকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিল বলে *বঙ্গবাসী*-র প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।[76] এখানে লক্ষণীয় যে বিদেশি লবণকে জাত-ধর্মনাশের কারণ তুলে ধরে বঙ্গবাসীর সমালোচনার রীতি কিন্তু *অমৃতবাজার পত্রিকায়* পরিলক্ষিত বা সমর্থিত হয় না। এই প্রেক্ষিতে লিভারপুল লবণ ব্যবহার না করার আহ্বানে জনমতকে সংগঠিত করতে চারটি প্রথম সারির পত্রিকার পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পার্থক্য সত্ত্বেও একে অপরকে সমর্থন বেশ

---

[73] হিন্দু পুনরুজ্জীবনে বঙ্গবাসীর আগ্রাসী প্রচারকার্য, লেখককুল ও গ্রাহকসংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে Their Finest Hour: Hindu Revivalism and Aggressive Propaganda Through the Press and Platform (c. 1880-1905) শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে, Sen, *Hindu Revivalism*, 203-284.

[74] *Bangabasi*, 22 January, 1887— RNP (B) for week ending 29 January 1887. IA.

[75] *Bangabasi*, 31 October, 1891— RNP (B) for week ending 7 November 1891. IA.

[76] *Bangabasi*, 2 May, 1891— RNP (B) for week ending 9 May 1891. IA.

তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশি নেতৃত্ব লিভারপুল লবণ সহ বিদেশি পণ্য বয়কটের যে ডাক দিয়েছিলেন তার মঞ্চটি যে দু'দশক আগে থেকেই বাঁধা হচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

।। ৫ ।।

লবণ কর ও ভারতের দারিদ্র্য: কংগ্রেস রাজনীতি

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাষ্ট্রের একচেটিয়া লবণ নীতির প্রত্যুত্তরে সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক সচেতনতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। প্রথম দুই দশকে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণী থেকেই সুস্পষ্ট হয় যে আপামর দরিদ্র ভারতীয়দের আর্থিক বোঝা লাঘবের দাবিতে নরমপন্থী [Moderate] রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেসব বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন তার অন্যতম ছিল লবণ কর হ্রাসের আবেদন। যেমন, ১৮৮৫-তে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম উদ্বোধনী অধিবেশনেই গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস সদস্য এস. এ. স্বামীনাথ আইয়ার সোচ্চার হয়েছিলেন দেশের দরিদ্র মানুষের ওপর লবণ করের বোঝার বিরুদ্ধে। সরকারি লবণ নীতির সমালোচনা করে আইয়ার জানিয়েছিলেন যে, লবণের ওপর যদি কর বাড়ানো হয় তবে তা 'অন্যায় ও অনৈতিক' হবে; যেখানে ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে রয়েছে করভার কমানোর দিকে, সেখানে লবণের ওপর কর বৃদ্ধি নীতিগত ভাবে 'ভ্রান্ত ও এক পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ'। সরকার কর বাড়ালে কংগ্রেস যাতে তীব্র প্রতিবাদে সামিল হয় তার আগাম আবেদন ও তিনি এখানে রেখেছিলেন।[77] ব্রিটিশ সরকারের লবণ নীতির এমনই তীব্র সমালোচনা পরিলক্ষিত হয় ১৮৮৮, ১৮৯২ এবং ১৯০২-র কংগ্রেস অধিবেশনে, অন্য দৃষ্টান্তগুলি 'অমনিবাস রেজোলিউশন'-এ অর্থাৎ বিবিধ প্রস্তাবের সাথে গৃহীত।[78]

১৮৮৮-তে এলাহাবাদে, কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে, পুণে-র নারায়ণ বিষ্ণু লবণ করের 'দুর্বিষহ বোঝা' সর্বত্র যেভাবে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনে 'ভয়ানক হাহাকার'-এর কারণ হয়ে উঠেছে তার তীব্র নিন্দা করেন এবং বিলাস দ্রব্যের ওপর কর আরোপের মাধ্যমে এই বোঝা কমানোর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

---

[77] Proceedings of the First Indian National Congress held at Bombay in 1885,134-35 cited in https://www.mkgandhi.org/civil_dis/salt_tax.htm [accessed on 20.08.2023]

[78] B. Pattabhi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress (1885-1935)* (Published by the Working Committee of the Congress, 1935), 82. 'অমনিবাস রেজোলিউশন'-এর উল্লেখ রয়েছে: *The Liberal and New Dispensation*, Calcutta, Vol. XII: No. 52, Sunday, (December 31, 1893), 7.

দরিদ্রদের যেহেতু 'কোনও কণ্ঠস্বর নেই', তাই লবণ কর হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কংগ্রেসকে তাদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠার প্রস্তাব রেখেছিলেন।[79] যদিও এই প্রসঙ্গে *ঢাকা প্রকাশ* সখেদে লেখে যে কংগ্রেসের শেষ সভায় [১৮৮৮ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত] লবণের শুল্ক কমানোর বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হলেও, শেষপর্যন্ত কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।[80] ১৮৯০-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে দীনশ ওয়াচা লবণ করের বিষয়ে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেন।[81] কংগ্রেস যদিও শেষ পর্যন্ত লবণ করের সম্পূর্ণ বিলোপ নয়, বরং এর তৎকালীন বর্ধিত হার কমানোর প্রস্তাবই সরকারের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই একই দাবি এরপর অন্ততঃ আরো আটবার কংগ্রেসের অধিবেশনে পুনরাবৃত্ত হয়েছিল।[82] যেমন, ১৮৯২-এর এলাহাবাদ অধিবেশনে লবণ কর হ্রাসের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছিল। এখানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কংগ্রেস তার বৃহত্তর দায়বদ্ধতায়, 'জনগণের স্বার্থে', সরকারের কাছে বারংবার আবেদন চালিয়ে যাবে। কংগ্রেস আশাবাদী ছিল যে, সরকার হয়তো পরিস্থিতির বিচারে শীঘ্র তা মঞ্জুর করবে, কিন্তু অন্যান্য বহু প্রস্তাবের মতো লবণ কর হ্রাসের আবেদনেও সরকার সাড়া দেয় নি।[83] ১৮৯৪ এর ৪ঠা ডিসেম্বর *চারু মিহির*-এর পাতায়ও আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে লবণ কর হ্রাসের বিষয়টি যাতে পর্যাপ্ত সময় ধরে আলোচিত হয় তার আহ্বান জানানো হয়।[84]

নুনের শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনীয়তার দিকটি যথাযথ গুরুত্বে আলোচিত হয়েছিল একমাত্র ১৯০২-এর কংগ্রেস অধিবেশনে। সরকারের অপরিণামদর্শিতায় ভারতীয় জনতা পর্যাপ্ত নুনের অভাবে নানান শারীরিক সমস্যায় ভুগছে বা তাদের মধ্যে রোগ সংক্রমিত হচ্ছে এমনই অভিযোগে সেদিন সরব হয়েছিল কংগ্রেস।[85] তারপর থেকে লবণ কর প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সমালোচনা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপিত হতে থাকে, যেখানে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ধারাবাহিকভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। সরকারী নীতির সমালোচনায় তথ্য ও পরিসংখ্যান

---

[79] Report of the Fourth Indian National Congress held at Allahabad, 1888; 92. cited in https://www.mkgandhi.org/civil_dis/salt_tax.htm [accessed on 20.08.2023]

[80] *Dacca Prakash*, 12 January, 1890— RNP (B) for week ending 18 January, 1890. IA.

[81] Sitaramayya, *The History*, 144.

[82] Ibid, 82, লবণ করের বর্ধিত হার কমানোর দাবিকে 'গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব' রূপে অভিহিত করেছিল: *The Liberal and New Dispensation*, Calcutta, Vol. XII, No. 2, (January 8, 1893), 5.

[83] Report of the Eighth Indian National Congress held at Allahabad, 1892, 72. cited in https://www.mkgandhi.org/civil_dis/salt_tax.htm [accessed on 20.08.2023]

[84] *Charu Mihir*, 4 December, 1894— RNP (B) for week ending 15 December, 1894.

[85] Sitaramayya, *The History*, 82.

পেশ করে তিনি তুলে ধরেছিলেন কিভাবে তিন পাই মূল্যে প্রস্তুত একঝুড়ি লবণ বাজারে পাঁচ আনায় বিক্রি হয়, যা আমজনতার আর্থিক দুর্দশার কারণ।[86] লবণ কর হ্রাসের দাবিতে অব্যাহত এই সমালোচনার মধ্য দিয়েও কংগ্রেস কিভাবে প্রতিষ্ঠা পরবর্তী দুদশকের মধ্যেই ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্বের মুখ্য রাজনৈতিক দাবিদার হয়ে উঠেছিল তার খানিক আঁচ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাজা প্যারিমোহন মুখার্জি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় কংগ্রেসের লবণ কর হ্রাসের দাবির বিরোধিতা করে সংবাদপত্রের সমালোচনা ও বিদ্রূপের পাত্র হন। ১৮৯৮ এর ১২-ই আগস্ট *হিতবাদী* তাঁর উপাধি প্রাপ্তির তীব্র সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলেছিল যে, গরিব মানুষের উপর লবণ কর চাপানোর পদক্ষেপকে সমর্থন করায় তাঁর সুখ্যাতিতে যেভাবে কালি লেগেছে তা কি তাঁর উপাধি আদপে ধুয়ে ফেলতে পারবে? তিনি রাজা হয়েছেন এবং সম্ভবত শীঘ্রই মহারাজাও হবেন, কিন্তু মানুষের আস্থা তিনি সহজে অর্জন করতে পারবেন না।[87]

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫-এর অন্তর্বর্তী সময়পর্বে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক এই প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়ার কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতি যে লিভারপুলের জাহাজি পরিবহণ ব্যবসা এবং ব্রিটিশ রফতানি বাণিজ্যের একচেটিয়া স্বার্থে প্রণীত, পরিচালিত, এবং সর্বোপরি 'অন্যায্য' তা কখনোই কংগ্রেসে উত্থাপিত ও সমালোচিত হয় নি। এই মুখ্য বিষয়টিতে কেন আদি কংগ্রেসী নেতৃত্বে দৃকপাত করেননি তা ভেবে কংগ্রেসের প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস রচয়িতা পট্টভি সীতারামাইয়া নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন।[88] দ্বিতীয়ত, নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা লবণ করের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি কখনোই দাবি করেননি, বরং পরিস্থিতির সাপেক্ষে কর হ্রাসের সীমিত দাবিতেই নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিলেন।[89] ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রজা হিসেবে তাদের ভাবনার প্রতিফলন এখানে পরিলক্ষিত। তৃতীয়ত, দরিদ্র মানুষের ওপর লবণ করের বোঝা নিয়ে কংগ্রেস সরব হলেও দারিদ্র্যের সমাধান রূপে আর্থিক অগ্রগতি ও আধুনিক শিল্পোন্নয়নের দিকেই আদি কংগ্রেসীদের যাবতীয় উদ্যোগ ও উদ্যম কেন্দ্রীভূত ছিল। একথা বললে তাই অত্যুক্তি হবে না যে দারিদ্র্য প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অত্যধিক উদ্বেগের কেন্দ্রে দরিদ্ররা ছিলেন না; বরং বলা

---

[86] Ibid.,148.

[87] *Hitavadi*, 12 August, 1898— RNP (B) for week ending 20 August, 1898.

[88] Sitaramayya, *The History* 82.

[89] পট্টভির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই পর্বে কংগ্রেসের সমালোচনার অন্যতম বিষয় ছিল লবণ করের সাম্প্রতিক হার বৃদ্ধি। আর কংগ্রেসের মূল প্রশ্ন ছিল কেন সাম্রাজ্যের আর্থিক সঞ্চয়ের স্বার্থে শান্তি-সমৃদ্ধির সময়েও এই করবৃদ্ধি হবে যা প্রত্যক্ষভাবে গরীবের বোঝা আরো বাড়ায়। Ibid.

যায় যে আদি কংগ্রেসী নেতৃত্বের কাছে দারিদ্র্য ছিল দেশের 'পশ্চাদপদতা' এবং 'অভাবের' প্রতীক, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে যা শক্তিহীনতা এবং অবমাননার সূচক।[90] এই প্রেক্ষিত থেকে দেখলে সঙ্গতভাবেই মনে হয় যে দেশীয় উৎপাদনের চিরাচরিত শ্রমনিবিড় পদ্ধতি যথেষ্ট আধুনিক নয় বলেই কি লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের দাবি এবং লবণ শ্রমিকদের কর্মহীনতার বিষয়টি কংগ্রেসি নেতৃত্বকে যথেষ্ট আকর্ষিত করতে পারে নি? চতুর্থত, আমজনতার সুরাহার দাবিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাদের মুখপাত্র হয়ে লবণ কর হ্রাসের দাবি করলেও এই প্রতিনিধিত্বের দাবি ছিল সীমাবদ্ধ চরিত্রের, দেশব্যাপী মানুষের আশা-আকাঙ্খার পূর্ণ চিত্রণ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ব্রিটিশ সরকারের লবণ নীতির পরিণামে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দুর্দশা এবং পুলিশী তথা প্রশাসনিক নিপীড়নের কথা কংগ্রেসে অজানা না থাকলেও মোটের ওপর উপেক্ষিতই ছিল। যেমন, ১৮৯০-র ২৯ শে ডিসেম্বর, ষষ্ঠ অধিবেশনে দিনের পঞ্চম প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় বাবু দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সওয়াল করেছিলেন যে, লবণ শুল্ক কমানোর অনুরোধের পরিবর্তে যাতে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ লবণ উৎপাদনের জন্য সরকারের অনুমতি পান, তা সুনিশ্চিত করতেই কংগ্রেস বরং সক্রিয় হোক। আর. ডি. মেহতা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেও বাকি প্রতিনিধিরা তা উপেক্ষা করেছিলেন। *বঙ্গবাসী* এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ১৮৯১-এর ৩ জানুয়ারির প্রতিবেদনে 'হতবুদ্ধি', 'পুতুলের মতো' সেইসব কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ধিক্কার জানায় যারা 'ভাবতে অক্ষম', শুধু 'দরকারে হাত তুলতে এবং উল্লাস করতে' কংগ্রেসে আসেন। কংগ্রেসকে আরো বিদ্রূপে বিদ্ধ করে লেখা হয় যে, 'এরাই যদি ভারতীয় সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন', তাহলে বাবু দেবপ্রসাদের সত্যিকারের ভাল প্রস্তাবটি যে প্রত্যাখ্যাত হবে 'তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই'।[91] এই সমালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে সরাসরি লবণ উৎপাদনের দাবি তুলতেই কংগ্রেস নেতৃত্ব অনিচ্ছুক, অনীহ ছিলেন, গণআন্দোলন তো দূর অস্ত। অথচ সেই সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের জনতা সরকারি লবণ আইন লঙ্ঘন করে 'বেআইনি' লবণ উৎপাদনে জড়িত ছিলেন; লবণ-মাটির কাছাকাছি গেলে যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বার্তা স্পষ্ট হয় তার থেকে উনিশ শতকীয় নরমপন্থী কংগ্রেসী রাজনীতি সযত্ন দূরত্ব তৈরি করেছিল।

---

[90] Sanjay Seth, "Rewriting Histories of Nationalism: The Politics of "Moderate Nationalism" in India, 1870-1905," *The American Historical Review*, 104:1, (Feb., 1999), 95-116.

[91] *Bangabasi*, 3 January, 1891— RNP (B) for week ending 10 January 1887. IA.

উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা মনে রাখা দরকার যে কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃত্ব তাদের ধারাবাহিক সমালোচনার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতিকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের অন্যতম বিচার্য বিষয় রূপে সর্বভারতীয় স্তরে তুলে ধরেছিলেন। সামাজ্যের প্রতি আনুগত্য থেকে তাঁরা হয়তো ব্রিটিশ রাজের লবণ করের পূর্ণ বিলোপের দাবি করেন নি; কিন্তু এই কর যে আমজনতার দুর্বিষহ বোঝার কারণ সেই বাস্তবতা তাদের সমালোচনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সর্বোপরি, লবণকে কেন্দ্র করে নরমপন্থী সমালোচনার বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতা উভয়ের যথাযথ অনুধাবন করে, তৎসহ নিজস্ব সৃজনশীল ভাবনা ও কর্মসূচির মধ্য দিয়েই কয়েক দশক পরে গান্ধী যে সাম্রাজ্যের অপ্রতিম প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

।।৬।।

‘অবৈধ’ উৎপাদক না ‘বৈধ’ প্রতিবাদী? জনপ্রতিরোধের আঙ্গিকে

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির বিরুদ্ধে আমজনতার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিরোধের প্রসঙ্গ এযাবৎ ইতিহাসচর্চায় প্রায় অনাদৃত থেকেছে। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় অবশ্য এই প্রসঙ্গে কিছু ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’-র অবতারণা করে দাবি করা হয়েছে যে, এগুলির অধিকাংশই অত্যুৎসাহী ইনস্পেকটরদের জন্য ঘটেছিল, লবণ কর এখানে কোন বিষয়ই ছিল না।[92] সত্যিই কি তাই? ১৯৩০-এ গান্ধীর আহ্বানে সংগঠিত লবণ সত্যাগ্রহের গণ-আন্দোলনের পূর্বে দু-একটি ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ ব্যতীত লবণ করের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের তেমন কোনো চিহ্নই নেই? ১৮৬০-এর দশকে ঔপনিবেশিক আইনে দেশীয় লবণ শিল্পের ক্রমিক বিলুপ্তিতে উপকূলীয় অঞ্চলগুলি নিরুত্তাপ, নিঃস্তব্ধ ছিল? বংশ পরম্পরাগত নুন উৎপাদনের কাজ ছেড়ে মলঙ্গিদের মতো লবণ শ্রমিকেরা নির্বিকার চিত্তে অন্য পেশায়, অন্যত্র সরে গিয়েছিল? অথচ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আগ্রাসী পদক্ষেপে বিপন্ন প্রান্তিক মানুষ নিজেদের জীবন ও জীবিকা রক্ষার তাগিদে বারংবার প্রতিবাদের পরম্পরায় মুখর হয়েছেন। ১৮৬০ এর দশকেই যেমন, ঔপনিবেশিক সরকার বন সংরক্ষণের নামে উপজাতীয় গোষ্ঠীর বনজ সম্পদ ব্যবহারের নিরবচ্ছিন্ন প্রথাগত অধিকার কেড়ে নিলে

[92] Taylor, “The Ungrudging Indian”, 798.

উপজাতীয় মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অরণ্যজীবন অশান্ত হয়ে উঠেছিল।[93] তাহলে চেশায়ারের লবণ উৎপাদন ও লিভারপুলের জাহাজী পরিবহণ স্বার্থের সংরক্ষণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের অধিকার বিলুপ্ত হলে কেন প্রতিবাদ, প্রতিরোধের পরম্পরাগত চিহ্ন চোখে পড়ে না? এই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত কিছু 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'র দাবি আসলে এক অস্বস্তিকর ঐতিহাসিক নীরবতা জিইয়ে রাখে, ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের থেকে যেন উপকূলীয় অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরে। অথচ ইতিহাসচর্চার মূলস্রোত থেকে যদি উনিশ শতকের শেষার্ধে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে দৃকপাত করা যায়, লবণ উৎপাদনকারীদের পরিণতি কি হল তা যদি জানতে চাওয়া হয়, এবং পুলিশ রিপোর্ট ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে 'আকর' রূপে খুঁটিয়ে পড়া যায় তাহলে বিচ্ছিন্নতার বদলে ধারাবাহিক জনপ্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিহ্ন সমন্বিত এক আখ্যান নির্মিত হতে পারে। এই সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে বাংলার উপকূলে 'অবৈধ' লবণ উৎপাদনের মধ্য দিয়েই বিপন্ন মানুষ কিভাবে ব্রিটিশ সরকারের লবণ নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত কিছু সূত্রনির্দেশ আলোচ্য অংশে রইলো। মনে রাখতে হবে যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দাগিয়ে দেওয়া লবণ উৎপাদনের 'অবৈধ' কার্যকলাপগুলি কয়েক দশক পরে জাতীয়তাবাদী পরিসরে, গান্ধীয় লবণ আইন অমান্যের কর্মসূচিতে 'বৈধতা' প্রাপ্ত হয়েছিল।

ব্রিটিশ রাজের লবণ করের দরুন গরিব সাধারণ মানুষ কিভাবে রাষ্ট্রীয় বঞ্চনা ও পুলিশি নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খেদ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আবদারের আইন' শীর্ষক সমালোচনামূলক প্রবন্ধে লিখেছিলেন: *কেহ কেহ হয়তো লুকাইয়া এক-আধ বিন্দু লবণ তৈয়ারি করিতে যায়; কিন্তু সে পাপের কী প্রচন্ড শাস্তি তাহা প্রতিদিনের পুলিস রিটার্ন ও ফৌজদারি রিপোর্টেই প্রকাশ।* পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি মহাশয় স্বদেশীয় ইতর সাধারণের একটা সন্তোষের কারণ [নজরটান সংযোজিত] ?[94] 'লুকাইয়া এক-আধ বিন্দু লবণ তৈয়ারির' জন্য সাধারণ স্বদেশবাসীর যে 'প্রচন্ড শাস্তি' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সরব হয়েছিলেন তার একটি পরিসংখ্যান ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই শুরু করা যাক; যেহেতু সাম্প্রতিকতম ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় এই বছর থেকেই ১৯৪৭ পর্যন্ত লবণের রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক

---

93 Ramchandra Guha, *The Unquiet woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya* (Delhi: Oxford University Press,1991).

94 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আবদারের আইন", পূর্বোক্ত।

ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে।[95] ১৮৭৮-এর বর্ষব্যাপী বাংলার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে মোট ১২৩১টি সল্ট কেস পুলিশ দায়ের করে ১২০২ জনকে গ্রেফতার করেছিল, জেল-জরিমানার সাজা নিশ্চিত হয়েছিল ১১২২ জনের, আর জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার টাকা [অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট সারণি ২.১ দ্রষ্টব্য]।[96] এই ১১২২ জন গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রায় ১৪৫ মণ লবণের 'অবৈধ' উৎপাদনের জন্য, মাথাপিছু যা ৫ কেজিরও কম! তার মধ্যে আবার ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ১১৫ মণের সামান্য বেশি লবণ। এ কোনো বিচ্ছিন্ন চিত্র নয়, বরং ১৮৭৮-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে হাজারো হাজারো জেল-জরিমানা, পুলিশি নিপীড়নের পরিসংখ্যান, যা স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয় যে আইন করেও উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ তৈরির 'অবৈধ' প্রবণতাকে রোখা যায় নি [পরিশিষ্ট সারণি ২.১ দ্রষ্টব্য]। যা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে লবণ করের দুর্বিষহ বোঝার কারণেই সাধারণ গরিব মানুষ নিজের ও পরিবারের জন্য ভাতের পাতে সামান্য নুনটুকু যোগানোর জন্য বাধ্য হয়েছিল প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে লবণ উৎপাদন করতে। আর ধরা পড়লে, প্রশাসনের সেই রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সরাসরি সংঘাতে যাওয়ার নজিরও রয়েছে। সর্বোপরি, এই 'অবৈধ' কার্যকলাপ শুধু ব্রিটিশ রাজের সময়েই নয়, কোম্পানির সময়ে ও ব্যাপকভাবে ছিল।

সেকালের বাংলা সাময়িকপত্র থেকেও উপকূলীয় অঞ্চলে সাধারণ গরিব মানুষ নিজের প্রয়োজনে সামান্য নুন তৈরি করতে গিয়ে কিভাবে প্রশাসনিক নিপীড়ন ও শাস্তির শিকার হতেন তার বিবরণ রয়েছে। ১৮৯২-র ৩রা জুন *বঙ্গনিবাসী* পত্রিকায় জানানো হয়, কিভাবে জনৈক হতদরিদ্র ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণে লবণ তৈরি করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কঠোর শাস্তি পেয়েছিলেন।[97] সুন্দরবনের মাহিষমারি গ্রামের নীলমণি বৈরাগীর সাথে আরো সাত গরিব গ্রামবাসী অবৈধ নুন উৎপাদনের জন্য এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নিজেদের ঘরোয়া প্রয়োজন মেটাতে তারা নুন তৈরি করেছিলেন বলে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ নুন বিক্রির অভিযোগও সরকারি উকিল প্রমাণ করতে পারেনি। তারপরেও আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এই কঠোর শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচিত হয়। *বঙ্গবাসী* প্রশ্ন তোলে, ব্রিটিশেরা ঠিক কিরকম মুক্ত বাণিজ্যে বিশ্বাস করে, যেখানে লোককে সামান্য

[95] Taylor, "The Ungrudging Indian".

[96] এই অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট ২.১ সারণীতে উপকূলবর্তী জেলা হিসেবে ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, যশোর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালির পরিসংখ্যান প্রদত্ত হয়েছে।

[97] *Banganivasi*, 3 June, 1892— RNP (B) for week ending 11 June, 1895. IA.

পরিমাণে ঘরোয়া নুন তৈরিতে শাস্তি দিতে হয়?[98] ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সামান্য লবণ তৈরির জন্য কেন গরিব মানুষ শাস্তি পাবে সেই প্রশ্ন তুলে *দৈনিক-ও-সমাচার চন্দ্রিকা* সরব হয়েছিল। পত্রিকার মতে, শাস্তি দিতে হলে লবণের অবৈধ কারবারে জড়িত বড় মাপের কারবারিদেরই দেওয়া উচিত।[99] তবে বড় কারবারির বদলে সাধারণ গরিব মানুষকেই জেল-জরিমানা করতে সরকারি আধিকারিকেরা বেশি তৎপর ছিলেন বলেই মনে হয়। যেমন, মেদিনীপুর উপকূলে অবৈধভাবে মাটি চেঁছে নুন তৈরিতে অভিযুক্তদের মোট পনেরো টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আরো বেশি শাস্তি ও জরিমানা চেয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলা খারিজ হলেও *অমৃত বাজার পত্রিকা* উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের তীব্র সমালোচনায় তাঁর ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। সাধারণ মানুষকে শাস্তিদানে আধিকারিকদের এই মনোভাব সরকারের প্রতি জনগণকে আরো বিক্ষুব্ধ করে তুলবে বলেই পত্রিকার অভিমত ছিল।[100]

ন্যূনতম নুনের জন্য আমজনতার নিপীড়ন এবং ঔপনিবেশিক আইনি বৈষম্যের পারস্পরিক তুলনা করে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দুর্দশার এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিল *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা। অসুস্থতার দরুন পথ্য হিসেবে সামান্য নুন তৈরী করতে গিয়ে এক নিঃস্ব মারাঠা মহিলার প্রভূত জরিমানা ধার্য হয় অথচ এক ইওরোপীয় সৈনিক তার পাখা টানিয়ে দেশীয় ভৃত্যকে নির্মম হত্যার পরেও নামমাত্র জরিমানায় ছাড় পেয়ে যায়! এই বৈপরীত্যের ছবি স্পষ্টতই, *সোমপ্রকাশ*-এর মতে, ন্যায়বিচার প্রদানে ইংরেজদের অক্ষমতা তুলে ধরে এবং জনগণের চোখে ব্রিটিশ রাজের সম্মানহানি করে।[101] সরকারের লবণ নীতিকে হাতিয়ার করে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি ঔপনিবেশিক নীতির ত্রুটিগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে, ব্রিটিশ রাজের শাসনের বৈধতা ও ন্যায্যতার দাবিকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ১৮৯৪-তে লর্ড স্ট্যানলে ভারতে লবণ আইনে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে বোম্বাই প্রদেশের পূর্বতন গভর্নর লর্ড রিয়ে জানিয়েছিলেন যে, গার্হস্থ্য প্রয়োজনে নুন তৈরি করলে কারোর শাস্তি হয় না! *হিতবাদী* পত্রিকা বোম্বাই প্রদেশের দুই দুঃস্থ মহিলার উদাহরণ তুলে ধরে এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করেছিল। দেবকি নাম্নী প্রথম জনের শিশুসন্তান খেলাচ্ছলে নুনে জল ফেলে দিয়েছিল। সেই নুন-জল আবার ফুটিয়ে তিন তোলা নুন তৈরি করার দায়ে দেবকীকে নিম্ন আদালত প্রথমে আট দিনের

---

[98] *Bangavasi*, 9 November, 1891— RNP (B) for week ending 14 November, 1891. IA.

[99] *Dainik-O-Samachar Chandrika*, 10 November, 1895— RNP (B) for week ending 16 November, 1895. IA.

[100] *Amrita Bazar Patrika*, 31 July, 1901— RNP (B) for week ending 3 August, 1901. IA.

[101] *Somprakash*, 7 August, 1893— RNP (B) for week ending 12 August, 1893. IA.

সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিল; পরে হাইকোর্টের রায়ে অবশ্য তার শুধু এক আনার জরিমানা হয়েছিল। অন্যদিকে, মালাম্বা নামের আরেক মহিলা বাজারে অবৈধ নুন কেনার দায়ে ১৫ টাকার জরিমানা, অনাদায়ে দশ দিনের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত হন। পরে হাইকোর্টে তা শুধু আট আনা জরিমানায় নেমে আসে। হাইকোর্টে এই দুটি কেসের বিচারপতি ছিলেন বার্ডউড। তিনি স্বয়ং প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, লবণ আইন কি ঘরোয়া প্রয়োজনে লবণ ব্যবহারের আপাত নিরীহ কাজকেও অপরাধে পরিণত করছে?[102]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক সরকারের লবণ নীতি শুধু লবণ শ্রমিককেই নয়, এই কারবারের সাথে জড়িত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকেও গভীর বিপন্নতার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যেমন, মাছ সংরক্ষণের জন্য নুন-মাটির ব্যবহার ও বিক্রি সরকার নিষিদ্ধ করলে কানাড়া উপকূলের দরিদ্র মৎসজীবীরা চূড়ান্ত সংকটে পড়েন। এর প্রতিবাদে অগণিত মৎসজীবী ১৮৯৩-র ১ এপ্রিল কারওয়ারে এক বিশাল জমায়েত করে সরকারের কাছে স্মারকপত্র পেশ করেন।[103] লবণ নীতির বঞ্চনা আরো বিপজ্জনক মোড় নেয় যখন ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত ‘ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট’-এ লবণের উৎপাদন বা কারবারের সাথে জড়িত বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীকে ‘অপরাধী সম্প্রদায়ের’ তকমায় দাগিয়ে দেয়। মাদ্রাজের বৃহত্তর কোরাভা সম্প্রদায় (যার অন্তর্ভুক্ত য়েরুকুলা, কোরাভার এবং কোরাচা গোষ্ঠী), যারা গোটা প্রদেশ জুড়ে বড় আকারে লবণের কারবার চালাত, তারা উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে জীবিকা হারিয়ে বিপন্নতার সম্মুখীন হয়। বিশ শতকের শুরুতে সরকার এই ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীকে ‘অপরাধী সম্প্রদায়’ বলে ঘোষণা করলে তাদের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা থাকে না।[104] রাজস্থানে অনুরূপ তিন ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠী বানজারা, থোরি এবং বোয়ারি ১৮৭১-এর আইনে অপরাধ প্রবণ গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হয়।[105]

১৮৬০-এর দশক থেকে বাংলায় সমুদ্রোপকূলের গ্রামগুলিকে অপরাধের আখড়া হিসেবে চিহ্নিত করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নজরদারিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। কোম্পানি আমলে এই গ্রামগুলিতেই রমরমিয়ে লবণ উৎপাদন চলত কিনা! আইনের এক আঁচড়ে চিরাচরিত লবণ উৎপাদনের গ্রামগুলি রাতারাতি অবৈধ লবণ

---

[102] *Hitavadi,* 18 May, 1894— RNP (B) for week ending 26 May, 1894. IA.

[103] *The Liberal and New Dispensation,* XII: No. XV, (April 16, 1893), 7.

[104] Meena Radhakrishna, *Dishonoured by History? Criminal Tribes and British Colonial Policy* (New Delhi, Orient Longman, 2001), 31-34.

[105] Tanuja Kothiyal, “Salt, Sovereignty and Law in Colonial India: The Case of Rajputana Salt in the Late Nineteenth Century,” South Asia: *Journal of South Asian Studies,* 46:4, (2023), 774-790.

তৈরির আখড়া হিসেবে চিহ্নিত হয়ে চূড়ান্ত পুলিশি শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। লবণ আইনের বিবিধ অনুচ্ছেদেও পুলিশকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার চূড়ান্ত অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের লবণ আইনের ১৬ নং অনুচ্ছেদে রওয়ানা [লাইসেন্স] ব্যতীত পাঁচ সেরের বেশি নুন পাওয়া গেলে তা অবৈধ বলে বাজেয়াপ্ত করা হত; ২৩ ও ২৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দিনে বা রাতে যেকোনো সময়ে সন্দেহজনক জায়গাতে পুলিশের খানাতল্লাশি করার এবং 'অবৈধ' লবণ উৎপাদনকারীকে গ্রেফতার করার সংস্থান ছিল; ২৮নং অনুচ্ছেদে যেকোনো বাধা প্রতিহত করতে পুলিশের কাছে বলপ্রয়োগের রাস্তা খোলা ছিল।[106] ১৮৬৪, ১৮৭৩ ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের লবণ আইনবলে বলীয়ান দারোগাদের কার্যকলাপের [যাকে টেলর 'অত্যুৎসাহ' বলে অভিহিত করেছেন] মূল লক্ষ্য অবশ্য ছিল অবৈধ লবণ উৎপাদন বন্ধ নয়, বরং জরিমানা বা নজরানা আদায় করে পকেট ভারি করা। চট্টগ্রামের সল্ট ইনস্পেক্টর যোগেন্দ্র চন্দ্র খাস্তগীরের এই বিষয়ে রীতিমতো [কু]খ্যাতি ছিল।[107] আসলে চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লবণ আমদানি ছিল ব্যয়বহুল, ফলে সেরপ্রতি দাম সবসময় তিন বা চার আনা চড়া থাকত। গরিব গ্রামবাসীরা তাই নিজেদের প্রয়োজনের লবণ বাড়িতেই তৈরি করতেন। পুলিশের মুখ বন্ধ হত টাকায়। খাস্তগীরের মতো বড়কর্তারা তো রীতিমতো ফুলে ফেঁপে উঠতেন; যদিও সরকারের ভাঁড়ার ফাঁকাই থাকত। এই কারণে *জ্যোতি* পত্রিকা সরকারকে গ্রামবাসীদের কাছে কম দামে লবণ সরবরাহ করার অথবা কর বসিয়ে লবণ উৎপাদনের অনুমতি দেওয়ার পরামর্শ দেয়।[108] টাকার বিনিময়ে অবৈধ নুন উৎপাদনে মদত দেওয়ার একাধিক অভিযোগে নোয়াখালীর সাব-ইনস্পেক্টর ওসমান আলি বিভাগীয় তদন্তের মুখে পড়েছিলেন। নোয়াখালির দায়রা জজ মিঃ পেনেলের রায় তুলে ধরে *সঞ্জীবনী* জানায় অবৈধভাবে লবণ উৎপাদনের অন্ততঃ নয়টি ঘটনায় ওসমান আলি-র যোগসাজশ ছিল; যার দরুন ফেনীর মহকুমা-আধিকারিক ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১১ ধারা মোতাবেক সাব-ইন্সপেক্টর আলির বিচারের নির্দেশ দেন।[109]

'অবৈধ লবণ' উৎপাদনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিবাদ কখনো যেমন হিংসাত্মক হয়ে উঠত তেমনই আবার আইনি পথে মামলা-মোকদ্দমাও দায়ের হত। মেদিনীপুরে কাঁথির

---

106 *The Bengal Code* [Edited Under the Orders of the Government of India], Vol. IV (Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, 1905, Third Edition).

107 *Jyoti*, 18 April, 1901— RNP (B) for week ending 27 April, 1901. National Archives of India [hereafter NAI].

108 Ibid.

109 *Sanjivani*, 18 April, 1901— RNP (B) for week ending 27 April, 1901. NAI.

উপকূলীয় গ্রামে অবৈধ নুনের তল্লাশিতে কয়েকজন কনস্টেবল গেলে এক প্রভাবশালী বাসিন্দার নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা তাদের জোর করে আটকে রাখে। গ্রামের চৌকিদারের কাছে এই খবর পেয়ে হেড- কনস্টেবল ইব্রাহিম হোসেনকে প্রায় একশো জনের বিশাল বাহিনী নিয়ে গিয়ে আটক কনস্টেবলদের মুক্ত করতে হয়েছিল! পরে এই ঘটনার তদন্তে গিয়ে সাব-ইনস্পেক্টর লালা বেণীমাধব কয়েকজন অভিযুক্ত গ্রামবাসীকে গারদে পুরলেও তারা সেখান থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে।[110] বারুইপুরের ইন্দ্রপাল গ্রামে অবৈধ নুন উৎপাদনের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া একদল গ্রামবাসী ক্ষমাপ্রার্থনা করে জানিয়েছিল যে দারিদ্র্যের তাড়নায় তারা এই কাজ করেছে। কিন্তু, পুলিশ তাতে কর্ণপাত না করে শারীরিক হেনস্থা করলে গ্রামবাসীরাও পাল্টা পুলিশের ওপর হামলা করে। *বঙ্গনিবাসী* এই ঘটনা তুলে ধরে আক্ষেপের সাথে জানায় যে লবণ আইনের কড়াকড়ি কিভাবে নিরীহ গরিব লোকেদেরও সামান্য থেকে গুরুতর অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[111] ডায়মন্ড হারবার মহকুমার চাঁদিপুর গ্রামে অবৈধ লবণ তৈরির অভিযোগে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেডেন্ট মধুসূদন চৌধুরী একশত কনস্টেবল ও চৌকিদারদের বিশাল বাহিনী নিয়ে তদন্তে যান। গ্রামবাসীদের বাড়িতে ও জেনানায় পুলিশ সন্ধ্যায় জোর করে ঢুকে পড়লে ক্ষিপ্ত জনতা রুখে দাঁড়ায় ও পুলিশকে ভাগিয়ে দেয়। তাড়া খেয়ে পালানোর পথে পুলিশ মহেন্দ্র মণ্ডল নামের জনৈক নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশি অভিযান যে বেআইনি ছিল আদালতে মহেন্দ্রর উকিল তা প্রমাণ করে দেন: (১) পুলিশি অভিযান হয়েছিল রাতে; (২) বাড়ির তল্লাশির সময় নিয়ম মেনে পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টর এবং কনস্টেবল হাজির ছিল না; (৩) কোনো প্রতিবেশীকেও সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয় নি; (৪) জেনানা থেকে মহিলাদের সরে যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হয় নি; (৫) সর্বোপরি, কোনও এফ.আই.আর. লেখা বা দায়ের হয়নি। বেআইনি অভিযান রুখতে গ্রামবাসীরা যদি পুলিশকে তাড়া করে তাতে অন্তত ভুলে নেই বলে মহেন্দ্রর উকিল দাবি করেছিলেন। সব শুনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু খগেন্দ্রলাল মিত্র মহেন্দ্রকে বেকসুর খালাস করে দেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৮৯৬-র ৪ঠা সেপ্টেম্বর *হিতবাদী* পত্রিকা স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জিকে খোঁচা দিয়ে লেখে, পুলিশ যাতে ভবিষ্যতে আইন মেনে দায়িত্ব পালন করে তা যেন তিনি নিশ্চিত করেন।[112]

---

[110] *Dacca Prakash*, 10 August, 1890— RNP (B) for week ending 16 August, 1890. IA.

[111] *Banganivasi*, 3 June, 1892— RNP (B) for week ending 11 June, 1895. IA.

[112] *Hitavadi*, 4 September, 1896— RNP (B) for week ending 12 September, 1896. IA.

লবণ দারোগাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তীব্র রূপ নিয়েছিল মেদিনীপুরে। লবণ দারোগাদের এজেন্টরা গোপনে গ্রামবাসীদের বাড়িতে দেশি নুন বা নোনা-মাটি রেখে এসে তাদের ওপর জোরজুলুম চালাত। *মেদিনী বান্ধব* পত্রিকা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং দারোগার এজেন্টদের এই বেআইনি কার্যকলাপের সত্যতা উদঘাটনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গোয়েন্দা সংস্থা নিয়োগের অনুরোধ জানায়।[113] কাঁথি মহকুমায় জরিমানার ভয় দেখিয়ে কাঁচা টাকার লোভে পুলিশ এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে দারোগার এক্তিয়ার বহির্ভূত এলাকাতেও গিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রান করতে থাকে। কেউ কেউ কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হলেও এই পুলিশী নিপীড়নের কোনো স্থায়ী সমাধান হয় নি। এই অন্যায়ের প্রশমনে লবণ দারোগাকে তার অধস্তনদের ওপর কড়া নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছিল *নীহার* পত্রিকা।[114] মহিষাদলে অসাধু সল্ট-পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরূপ দাবি জানিয়েছিল *মেদিনী বান্ধব* পত্রিকা। এক্ষেত্রেও অভিযোগ ছিল যে গরিব গ্রামবাসীদের বাড়িতে গোপনে দেশি নুন রেখে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশেরা তাদের আইনি গেরোতে ফাঁসিয়ে দিত।[115] দেহুড়দা গ্রামের বাসিন্দা কৈলাসচন্দ্র রায় *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, মেদিনীপুরে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় '৫০ ঘর প্রজা' সল্ট পুলিশের অত্যাচারে 'হৃতসর্বসস্ব ও হতমান হইয়াছে'। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, একসময় যারা নিমক চৌকির 'দারোগা, জমাদার ও চাপরাসী' ছিলেন তারাই পরে সল্ট পুলিশের ইন্সপেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর ইত্যাদি পদে আসীন হয়ে এই অত্যাচার চালিয়েছিলেন। রাতের অন্ধকারে এই পুলিশ ও গোয়েন্দারা দলবল সহ দেশীয় লবণ ও লবণ তৈরির হাঁড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকতেন। কাকভোরে মহিলারা প্রাতঃকৃত্য সারতে বাইরে গেলে দোর খোলা পেয়ে 'যমসোদর গোয়েন্দা ও কনস্টেবলগণ' ঘরের মধ্যে লবণ ও হাঁড়ি রেখে দিত। তার কিছুক্ষণ পরে ছদ্ম অভিযান চালিয়ে দেশি নুন বাজেয়াপ্ত করে বাড়ির পুরুষদের গ্রেফতার করা হত। এভাবে প্রজাপীড়ন করে পুলিশের শুধু যে 'অর্থলাভ হয় এমন নয়', 'রাজদ্বারেও বিলক্ষণ বাহাদুরী প্রকাশ হয়' বলেই কৈলাসচন্দ্র জানিয়েছিলেন।[116] উপকূলীয় গ্রামে পুলিশী নিপীড়ন গরিবদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নুন থেকেই যে শুধু বঞ্চিত করেছিল তা নয়, তাদের বহুজনকে নুনের ব্যবহার ছেড়ে দিতেও বাধ্য করেছিল বলে *দৈনিক হিতবাদী* দাবি করেছিল। পত্রিকাটির মতে,

---

[113] *Medini Bandhav*,10 February— 1904 (RNP (B) for week ending 20 February, 1904). NAI.

[114] *Nihar,* 23 February, 1904— RNP (B) for week ending 27 February, 1904. NAI.

[115] *Medini Bandhav*, 25 May, 1904— RNP (B) for week ending 4 June, 1904. NAI.

[116] "পল্লীগ্রামে অত্যাচার" [চিঠি], সোমপ্রকাশ, ১৩ বৈশাখ, ১২৭২ সংকলিত হয়েছে, বিনয় ঘোষ[সম্পা.], *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* ৪র্থ খণ্ড (কলিকাতা পাঠভবন, ১৯৬০), ৯৬।

শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের জন্য নুনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে ব্রিটিশ সরকার নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে এবং দেশের পরিস্থিতি চূড়ান্ত শোচনীয়' করে তুলেছে।[117]

অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক জুড়ে লবণ কারবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্যের বিরোধিতা করে মলঙ্গিরা প্রায় সমান্তরাল এক 'অবৈধ' উৎপাদন ব্যবস্থা চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশি শাসন তাদের চোরাচালানকারী বা অপরাধী হিসাবে দাগিয়ে দিলেও মলঙ্গিরা পেশাগত ঐতিহ্যের ধারণায় নিজেদের বৈধ উৎপাদক বলেই ভাবতেন। এই ধরনের ঘটনাগুলি অধিকারের দুটি ভিন্ন ধারণাকে প্রতিফলিত করে: পেশাগত ঐতিহ্যের অধিকার রক্ষা বনাম বিদেশি ব্রিটিশ প্রণীত আধুনিক আইনশৃঙ্খলা। এই দুই ধারণার মুখোমুখি সংঘাতে 'অবৈধ' লবণ উৎপাদনই ছিল সেই মাধ্যম যা মলঙ্গিদের প্রতিরোধের বৈধতাকে ইতিহাসে দৃশ্যমান করে তোলে।[118] ব্রিটিশ রাজের পক্ষপাতমূলক নীতি ও আইন প্রণয়নে দরিদ্র লবণ উৎপাদকদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে ওঠে। কোম্পানি আমলে মলঙ্গি বলতে যে লবণ উৎপাদকদের বোঝাত ১৮৬০ দশকের লবণ আইনে রাতারাতি তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। *সহচর* পত্রিকার কথায়, হঠাৎ করে ইংরেজরা একদিন ধুয়ো তুলেছিল যে ভারতের লবণ উৎপাদন ব্যবস্থা মলঙ্গিদের কার্যত দাসত্বে বাধ্য করেছে এবং তার পরিণামেই লবণ শিল্পের আইনি বিলোপ হয়েছিল। অথচ তার পরিণাম? দেশীয় সমৃদ্ধির উৎস যেমন ধ্বস্ত তেমনই উৎপাদকরা কার্যত অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। দারিদ্র্য মোচন ও হিতসাধনের মানবিক ছদ্মবেশ ধরে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ কিভাবে উপনিবেশের অর্থনীতি ও মানুষকে সংকটাপন্ন করে মলঙ্গিদের ঘটনা তারই প্রতিচ্ছবি বলে পত্রিকাটি দাবি করেছিল।[119] লবণ উৎপাদন যদি অবৈধ হয়, তাহলে উৎপাদকেরা 'অপরাধী' হিসেবে গণ্য হবেন এটাই স্বাভাবিক। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে পুলিশি কেস ও আইনি মোকদ্দমার নথিতে অভিযুক্ত এই 'অবৈধ' উৎপাদকদেরাই ছিলেন পূর্বতন মলঙ্গি শ্রমিক বা তাদের বংশধরেরা। নিজের ও পরিবারের জীবনরক্ষার্থে ন্যূনতম সংস্থান - ভাতের পাতে সামান্য নুন - যোগানোর জন্য এই উপকূলীয় দরিদ্র মানুষেরাই বাধ্য হয়েছিলেন পরম্পরাগত কৌলিক পেশা অবলম্বনে 'অবৈধ' লবণ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র আইন প্রণয়ন করে, দমন-পীড়নের যাবতীয়

[117] *Daily Hitavadi*, 1 June, 1904— (RNP (B) for week ending 4 June, 1904). NAI.

[118] Balai Chandra Barui, "Malangi Unrest in Lower Bengal: 1770-1810," *Revolt Studies*, 1: 2, (December, 1985): 1-21; Meena Bhargava, "Visibility through Resistance: The Malangis and Salt Making in Eighteenth Century Bengal," *Indian Historical Review*, 33:1, (2006): 24–43.

[119] Sahachar, 9 July, 1877— RNP (B) for week ending 21 July, 1876.IA.

কৌশল অবলম্বন করেও এই অবৈধ লবণ উৎপাদনের ধারাবাহিকতাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। ঔপনিবেশিক পর্বে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রদর্শনে ভারতীয় পুলিশ বাহিনী গঠিত হলেও বাস্তবে অপরাধ প্রতিহত করা ও তার তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নগণ্য, সীমাবদ্ধ চরিত্রের ছিল বলেই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দাবি করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলার উপকূলে লবণ পুলিশের ভূমিকাও, এই পর্যালোচনার সূত্রে বলা যেতে পারে যে, 'অপরাধী শনাক্তকরণ ও অপরাধ হ্রাস করার বাহিনী না হয়ে' শুধু 'প্রতীকীভাবে ক্ষমতা ও শৃঙ্খলা প্রদর্শনের একটি বাহিনী' হিসেবেই উপস্থিত ছিল।[120] উপকূলবর্তী গ্রামীণ জনতার ধারাবাহিকভাবে 'অবৈধ' লবণ উৎপাদনে ও হিংসাত্মক ঘটনাতে জড়িয়ে পড়ার মধ্যে পুলিশ তথা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক 'প্রতীকী প্রতিরোধের' বয়ান ফুটে ওঠে। রাষ্ট্রের নজরদারিকে এড়িয়ে সাধারণ মানুষের চোরাগুপ্তা লবণ আইন অমান্য করার এই প্রাথমিক প্রয়াস অবশ্যই সংক্ষিপ্ত পরিসরে, সীমাবদ্ধ চরিত্রের হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দাগিয়ে দেওয়া এই গোপন 'অবৈধ' কার্যক্রমই কয়েক দশক পরে লবণ আইন অমান্যের কর্মসূচিতে 'বৈধতা' পেয়েছিল যখন গান্ধীর আহ্বানে জনগণ তা প্রকাশ্যে সংঘটিত করেছিল।

---

[120] Peter Robb 'The Ordering of Rural India' in David M. Anderson and David Killingray, *Policing the Empire: Government, Authority and Control, 1830–1940* (Manchester, Manchester University Press, 1991), 129.

পরিশিষ্ট ২.১: বাংলার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে 'অবৈধ' লবণ অপরাধের পরিসংখ্যান (১৮৭৬-১৮৮৪)

District	Year	Number of Salt Cases	Number of Persons Arrested	Number of Persons Convicted	Number of Persons Acquitted	Quantity of Salt Attached	Quantity of Salt Released by the Order of Magistrate	Quantity of Salt Confiscated	Total Amount of Fines Levied
						Mds. S. C.	Mds. S. C.	Mds. S. C.	Rs. A. P.
Jessore*	**1876**	15	16	16	…	7 19 0	…	7 19 0	66 11 0
	1877	21	21	19	2	3 18 1½	1 2 12	2 15 5½	35 0 6
	1878	28	31	29	2	26 2 0	5 11 0	21 1 0	240 0 0
	1879	46	45	40	5	10 11 7	3 19 11	6 31 12	204 6 9
	1880	95	100	92	8	331 11 8	301 34 8	29 17 0	223 10 3
	1881	78	78	75	3	4 13 4	0 9 12	4 3 8	188 10 6
	1882	141	140	132	8	20 31 12	5 6 8	15 25 4	272 0 6
	1883	236	236	224	12	39 28 13	14 3 14	25 24 15	516 7 3
	1884	409	397	378	18	39 30 9	29 35 0	9 27 6	756 7 0
Chittagong	**1876**	101	109	99	3	34 11 15	2 3311	31 18 15	557 15 9
	1877	349	458**	440	14	66 36 1	…	66 36 1	2393 7 0
	1878	324	293	260	33	42 10 12½	…	42 10 12½	1196 5 3
	1879	456	454	443	6	250 25 7	7 12 12	243 12 11	1747 3 9
	1880	116	126	124	1	28 16 1	5 6 14	23 9 3	587 7 16
	1881	190	222	211	10	36 25 10	10 8 0	26 17 10	609 10 0
	1882	229	300	289	8	74 12 1	0 20 0	73 32 1	723 13 6
	1883	156	159	45	14	73 25 12	30 37 12	42 28 0	760 4 6
	1884	31	33	29	4	108 36 12	97 39 8	10 37 4	133 18 6
Noakhali	**1876**	210	213	200	6	8 3½ 6	…	8 34 6	694 3 0
	1877	116	137	130	6	25 35 15	5 28 12	20 7 3	430 13 0
	1878	104	107	97	9	11 12 8	0 24 0	10 28 8	670 0 0
	1879	51	89	70	19	2736 24 13	27 26 18	10 23 5	577 5 0
	1880	45	23	32	10	7 314½	2 21 12	4 22 2½	104 0 6
	1881	87	90	72	18	64 37 0	4 16 0	9 31 0	257 5 3
	1882	180	186	151	35	9 323½	5 20 10	4 1 9½	356 4 0
	1883	312	365	309	56	12 24 14	1 30 8	10 34 6	705 0 8
	1884	184	169	155	14	32 38 0	…	32 38 0	557 2 6

District	Year	Number of Salt Cases	Number of Persons Arrested	Number of Persons Convicted	Number of Persons Acquitted	Quantity of Salt Attached	Quantity of Salt Released by the Order of Magistrate	Quantity of Salt Confiscated	Total Amount of Fines Levied
						Mds. S. C.	**Mds. S. C.**	**Mds. S. C.**	**Rs. A. P.**
24 Pergunnahs	**1876**	435	433	391	42	42 6 3½	0 18 6	41 27 23½	1,332 7 0
	1877	608	608	602	06	24 4 15¼	0 38 1	23 6 4¼	1,336 11 9
	1878	691	686	667***	09	61 29 3	23 30 5	37 38 14	2,717 6 0
	1879	608	614	608	06	73 34 14	37 10 14	36 24 0	3,119 1 3
	1880	603	602	580	22	39 31 15	5 36 15	33 35 0	2,088 3 3
	1881	233	233	221	11	44 15 12	18 0 0	26 15 12	824 13 6
	1882	120	120	110	06	7 37 11	0 14 0	7 23 11	214 3 3
	1883	123	123	116	07	2 27 0	…	12 27 0	542 0 9
	1884	107	106	92	14	24 9 2	1 0 0	23 9 2	639 2 0
Midnapore	**1876**	357	359	323	28	10 17 13	4 36 2	5 21 11	2875 1 3
	1877	162	172	161	11	78 26 6	73 33 0	4 38 6	397 3 3
	1878	84	85	79	6	3 25 6	0 13 8	3 11 14	162 9 0
	1879	218	230	202	28	434 36 13	2 24 14	432 11 15	2504 4 9
	1880	124	125	113	111	9 2 11	3 33 12	5 38 15	2305 15 0
	1881	178	179	155	24	14 29 5	0 37 11	13 31 10	1267 0 0
	1882	106	109	80	29	7 6 13½	1 2 11	6 13 8½	969 5 0
	1883	113	111	97	14	4 26 8	0 22 4	4 4 4	310 8 6
	1884	35	35	30	3	1 24 12	0 14 12	1 10 0	145 12 0

Abbreviation: Mds. Maunds, S. Seer, C. Chittak/ Chatak, Rs. Rupees, A. Anna. P. Pai

*Khulna (1883),

** Two Persons Died Under Trial,

*** 10 Persons Pending

তথ্যসূত্র: সারণীতে প্রদত্ত পরিসংখ্যান গৃহীত হয়েছে ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত পুলিশ রিপোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে। *Report on the Police of Lower Provinces of the Bengal Presidency*, Annual Volume from 1876 to 1884 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, Published in the Years from 1877 to 1885).

তৃতীয় অধ্যায়

বয়কটের আহ্বান:

স্বদেশি সমাজ ও লবণ-রাজনীতি

১৯০৫ সাল, ঔপনিবেশিক সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় সারা বাংলা অভূতপূর্ব বিক্ষোভ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উত্তাল। সেই বছরের ১৯-শে জুলাই, লর্ড কার্জনের প্রশাসন মাস তিনেক পরে (১৬ অক্টোবর) বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। তার দিন দুই আগে কলকাতায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৭-ই জুলাইয়ের সেই প্রকাশ্য জনসভায় এক অগ্রগণ্য কংগ্রেস নরমপন্থী (Moderate) নেতা উপস্থিত সকলকে খানিক অবাক করে দিয়ে ব্রিটিশ দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন; কারণ, নরমপন্থী নেতারা সাধারণত সাংবিধানিক পন্থায়, আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখতেন। কিছুদিন পরেই তিনি এক মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে বিদেশি লবণ সহ অন্যান্য দ্রব্য না ছোঁয়ার গণশপথ নিয়েছিলেন। নরমপন্থী নেতারা সাধারণত রাজনীতির সাথে ধর্মকে মেলাতেন না। কিন্তু স্বদেশি শপথের প্রেরণাদাতা, রচয়িতা যে স্বয়ং তিনি, তা পরবর্তীকালে উক্ত রাজনীতিবিদ সগর্বে তাঁর আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছিলেন। পূর্ববঙ্গের মগরার কাছে এক মন্দিরের বারান্দায় দেববিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ‘স্বদেশিবাদ’ তাঁদের মতো প্রত্যেক বাঙালির ধর্মের অংশ; বিদেশি লবণের মতো খাদ্যসামগ্রীতে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করার পাশাপাশি বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার হলে পুরোহিতেরা কোনো অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন না— তাঁর উপস্থিতিতে সেখানে স্থির হয়েছিল।[1]

অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১ খ্রী.) হওয়ার পর, ১৯১৩-এর ১০ জানুয়ারি, *নায়ক* পত্রিকা এই অগ্রগণ্য বাঙালি নেতার বয়কটের রাজনীতির সাথে ধর্মকে সংযুক্ত করার তীব্র কিন্তু যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করেছিল। লবণে গরু ও শুয়োরের হাড়ের গুঁড়ো মিশ্রিত রয়েছে, তা আবিষ্কারের কথা সোল্লাসে জানিয়ে কিভাবে তিনি চূড়ান্ত উদ্দীপনায় স্বদেশি শপথ নিয়েছিলেন, কালীঘাটের নদী তীরে গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন, পাঠককে তা

---

[1] Surendranath Banerjea, *A Nation in Making: Being the Reminiscences of Fifty Years in Public Life* (London: Oxford University Press, 1925), 227.

স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল পত্রিকাটি। *নায়ক* বিদ্রূপের সুরে পাঠককে মনে করতে বলেছিল স্বদেশির সেই দিনগুলির কথা, যখন উক্ত নেতা 'কিভাবে যেন জানতে পেরেছিলেন যে তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ্য পৈতে ধারণ করেছিলেন' এবং তারপর 'তিনি কিভাবে তা জনসমক্ষে প্রদর্শিত করেছিলেন এবং তার ব্রাহ্মণত্বকে প্রকাশ্যে তুলে ধরেছিলেন'।[2] পত্রিকাটির অন্যান্য প্রতিবেদনগুলি পড়লে এই ক্ষোভের মুখ্যত দুটি কারণ স্পষ্ট হয়। প্রথমত, উক্ত নরমপন্থী নেতা এবং তাঁর মতোই অন্যান্য স্বদেশি নেতাদের গৃহীত বয়কট কর্মসূচির কারণে – যেখানে ধর্ম ও রাজনীতির বেখাপ্পা সংমিশ্রণ হয়েছিল - সামাজিক স্তরে মানুষ অসহনীয় পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। পত্রিকাটি সখেদে ও ক্ষোভের সাথে স্বদেশি পর্বে ভয়ানক সামাজিক নির্যাতনের কথা তুলে ধরেছিল, যখন লিভারপুল লবণ সহ বিদেশি দ্রব্য ব্যবহারের জন্য মানুষকে সামাজিকভাবে একঘরে করা হয়েছিল। বাংলার উভয় প্রান্তে তখন অগণিত গরিব মানুষের জীবন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল— 'বাংলার গ্রাম থেকে বুকফাটা কান্নার আওয়াজ' উঠে এসেছিল।[3] দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ পণ্য বয়কটে হিন্দু ও মুসলমানকে স্বদেশি শপথ করানোর পর স্বদেশি নেতাদেরই তা পালন না করা, যার অন্যতম হোতা রূপে পত্রিকাটি উক্ত নরমপন্থী রাজনৈতিক নেতাকে বিদেশি কেলনারের হোটেলের 'উচ্ছিষ্টভোজী' বলে সরাসরি কষাঘাতও করেছিল।[4] তাঁর মতো নেতাদের 'বিদেশি লবণ' সহ অন্যান্য দ্রব্য ছাড়া চলে না; অথচ 'স্বদেশির আহ্বানে এরাই গলার জোরে আগে থাকেন।'[5] কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নরমপন্থী নেতা, বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি কার্জন সরকারের ঘোষিত 'settled fact'-কে 'unsettle' করে দেওয়ার পাল্টা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে এই সমালোচনাই স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পরিলক্ষিত হয়। বিদেশি বয়কটকে কেন্দ্র করে শুধু সুরেন্দ্রনাথ নন, সামগ্রিকভাবে 'বাবু স্বদেশি' নেতৃত্বের সক্রিয়তা, সক্ষমতা এবং স্ববিরোধিতার মধ্যেই যে স্বদেশি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা নিহিত তা লবণের প্রেক্ষিতে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[6] এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো [*প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিয়্যু* সম্পাদক] নগণ্য সংখ্যক ব্যতিক্রমও ছিলেন, যিনি

---

[2] *Nayak*, 10 January, 1913— RNP(B) for the Week Ending 18th January, 1913. NAI.

[3] *Nayak*, 14 June, 1911— RNP(B) for the Week Ending 24th June, 1911. NAI.

[4] Ibid.

[5] *Nayak*, 11 September, 1911— RNP(B) for the Week Ending 16th September, 1911. NAI.

[6] 'Babu-Swadeshi' in *Nayak*, 26 April, 1909— RNP(B) for the Week Ending 1st May, 1909. NAI.

স্বদেশি ও বয়কটের পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন, এবং তারপর স্বদেশির দীক্ষায় বিদেশি নুনের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছিলেন।[7]

মানুষের জীবনে অপরিহার্য লবণকে কেন্দ্র করে বয়কট ও তার পরিপূরক স্বদেশির ধারণা সামাজিক স্তরে কিভাবে গতিশীল হয়েছিল, বাংলার সমাজজীবনে তা কি অর্থ বহন করেছিল এবং কি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল— বর্তমান অধ্যায়ে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। লবণ কেন্দ্রিক স্বদেশি আন্দোলনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা বস্তুর 'সামাজিক জীবন' প্রেক্ষিতে আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক ধারণা অনুযায়ী, বস্তু তার ভৌত অস্তিত্ব ছাড়িয়ে 'সামাজিক জীবনে' সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ বস্তু কোনো নিষ্ক্রিয় উপাদান নয়, বরং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। বস্তুর উপস্থিতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রবাহে নানাবিধ অর্থ, তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে, এমনকি মানুষের চিন্তা এবং আচরণকে প্রভাবিত করে নির্দিষ্ট আকার দিতে পারে।[8] স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বতঃস্ফূর্ততা, সম্প্রসারণ এবং সীমাবদ্ধতার ওপরেই জোর পড়ে। কিন্তু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার অন্যতম প্রয়াস ছিল সামাজিক স্তরে বস্তুকেই কেন্দ্র করে, অর্থাৎ বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও তার স্বদেশি পরিপূরক ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে। স্বদেশি আন্দোলনের সাফল্যও অনেকাংশে নির্ধারিত হয়েছিল বিদেশি দ্রব্য বয়কটে মানুষের সম্মতি অথবা প্রত্যাখানের ওপরেই। বলাবাহুল্য যে, বিদেশি দ্রব্য বয়কটে মানুষ অসম্মত হলে স্বদেশি নেতৃত্ব পাল্টা সেই মানুষকে শাস্তিস্বরূপ 'সামাজিক বয়কট'-এর নিদান দিয়েছিলেন; হুমকি-হিংসা-জবরদস্তি বলপ্রয়োগ করে মানুষের সম্মতি আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের- দরিদ্র, নিম্নবর্ণ, মুসলিম প্রমুখ- পাল্টা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নিদর্শ স্পষ্টতই স্বদেশির মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় 'এলিট' নেতৃত্বের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে।[9] এই প্রেক্ষিত থেকেই লবণকে কেন্দ্র করে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন পুনরালোচনার দাবি রাখে।

---

[7] Ramananda Chatterjee: Journalist-agitator, Character Sketeches, W.T. Stead [ed.] *The Review of Review*, XXXIX, January-June 1909, 19.

[8] Arjun Appadurai edited, *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspectives* (UK: Cambridge University Press, 1986).

[9] 'Swadeshi by Coercion or Consent?' শীর্ষক আলোচনা দেখুন, Ranajit Guha, *Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India* (USA: Harvard University Press, 1997), 120-122.

স্বদেশি আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে চারটি মুখ্য ধারার দিকে গুরুত্ব আরোপিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের মতো নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে প্রথম সরব হয়েছিলেন; অন্যদিকে বিপিন চন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষের মতো চরমপন্থীরা (Extremists) বিদেশি বয়কট সহ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive Resistance) পুরোধা ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহ সাংস্কৃতিক জগতের অনেকে 'আত্মশক্তির' জাগরণ চেয়ে গঠনমূলক স্বদেশির ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন; এবং তরুণদের কেউ কেউ বৈপ্লবিক হিংসার পথ অবলম্বন করেছিলেন। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে এই ধারাগুলি পাশাপাশি বিদ্যমান হলেও প্রথমদিকে চরমপন্থী ও আত্মশক্তির প্রবক্তাদের প্রভাব জোরালো ছিল। আর ১৯০৮-এর পর নরমপন্থী ও বিপ্লবীদের প্রভাব বেশি চোখে পড়ে।[10] ব্রিটিশ লবণ সহ অন্যান্য বিদেশি পণ্য বয়কটের সর্বাত্মক আহ্বান জানিয়েছিলেন চরমপন্থীরা। বিদেশি লবণের মতো পণ্য কেনা যে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার দায়ে সামাজিক বহিষ্কারের শাস্তির পক্ষে অরবিন্দ ঘোষ জোরালো সওয়াল করেছিলেন। চরমপন্থীরা বয়কটের ওপরেই বাংলাকে নিজের ভাগ্য সঁপে দিতে এবং লবণ সহ অন্যান্য বিদেশি পণ্য ধর্মীয়ভাবে পরিহার করার আবেদন রেখেছিলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গ্রহণীয় হলে সামাজিক বয়কটকে তার স্বাভাবিক পরিণতি বলেই চরমপন্থীরা গণ্য করেছিলেন। বিদেশি লবণ ব্যবহারকারীদের সামাজিক বয়কটের সূত্রে কিভাবে স্বদেশি সমাজের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল তা এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সামাজিক ভাবে কার্যকর করতে ধর্মীয় (দণ্ডাজ্ঞার) ধারণাই তুলে ধরা হয়েছিল। মন্দিরে দেবতার সামনে বিদেশি লবণ স্পর্শ না করার গণশপথ গ্রহণ, বিদেশি লবণের ব্যবহার বা কেনা-বেচায় জড়িতদের সামাজিক বয়কটের নিদান এবং ব্রাহ্মণদের ভূমিকা কিভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মীয় সমাজব্যবস্থার ধারণাকে তুলে ধরে তা এই পর্বে আলোচিত হয়েছে।[11] বিদেশি লবণের অশুচিতা তুলে ধরে স্বদেশি পর্বে সামাজিক বয়কটের ধারণাকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছিল। উনিশ শতক জুড়ে বিদেশি লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধে সামাজিক স্তরে প্রতিরোধের নিদর্শও পরিলক্ষিত হয় [প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত]। স্বদেশি আন্দোলনের সময়পর্বে বিদেশি লবণের অশুচিতার ধারণা কি রূপ নিয়েছিল, কিভাবে তার প্রচার ও প্রসার

---

[10] 'Trends in Bengal's Swadeshi Movement' in Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908* (New Delhi: People's Publishing House, 1973), 31-91.

[11] 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের' ওপর অরবিন্দ ঘোষের প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল *বন্দেমাতরম* পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিলের মধ্যে। এখানে সূত্র গৃহীত হয়েছে, Sri Aurobindo, *The Doctrine of Passive Resistance* (Calcutta: Arya Publishing, 1948), 57-58.

হয়েছিল, সর্বোপরি সমাজ-সংস্কৃতিতে তা কি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল তা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে (এবং স্বদেশি-উত্তর পর্বে) শিক্ষিত শ্রেণির সাংস্কৃতিক আবেদনে রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টিও মনোযোগের দাবি করে। শিক্ষিত 'এলিট' শ্রেণি সমাজকে ভৌগোলিক জাতীয়ত্বের পরিবর্তে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমার্থক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।[12] ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে কল্পিত সমাজকে রাজনৈতিক গোষ্ঠী (Imagined Political Communities) নয়, ধর্মীয় গোষ্ঠী রূপেই স্বদেশি নেতৃত্ব কল্পনা করেছিলেন। স্বদেশি সমাজকে প্রায়ই হিন্দু, উচ্চ-বর্ণীয় বিত্তবান ভূম্যধিকারী ও পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ধারণায় তুলে ধরা হত। বিশ শতকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নববর্ষ' ও 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে আদর্শ হিন্দু সমাজের যে ধারণা তুলে ধরেছিলেন তার ভিত্তি স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্যবাদী ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধে নির্ধারিত ছিল। তবে সামাজিক এই মনোভাবের জটিল স্রোতও পরিলক্ষিত হয়; কারণ প্রতিক্রিয়া ও উপলব্ধি সময়ের প্রবাহে অনড়, নিশ্চল থাকে না, বরং পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়।[13] রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই যেমন তাঁর পিতৃতান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী অবস্থানে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; স্বদেশি আন্দোলনের সূচনায় পুরোভাগে থাকলেও আন্দোলনের হিন্দু চরিত্রে তার মোহভঙ্গ হয়। স্বদেশি আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে আন্দোলনের সমালোচনায় 'সদুপায়', 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধ লেখেন। হিন্দু, উচ্চ-বর্ণীয় বিত্তবান ভূম্যধিকারী ও পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যে আধারিত স্বদেশি সমাজকল্পনায় দরিদ্র, নিম্নবর্ণ, মুসলিমদের মানবীয় অস্তিত্ব ও অধিকার যে সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল, সে প্রসঙ্গে তিনি ব্যতিক্রমীভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।

উল্লিখিত প্রেক্ষিত থেকে এই অধ্যায়ের তৃতীয় পর্বে বিদেশি লবণের বয়কটকে কেন্দ্র করে দরিদ্র ও নিম্নবর্ণীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচিত হয়েছে। করভার জনিত অধিক মূল্যের কারণে গরিব মানুষ যে লবণ বঞ্চনার শিকার তা সম্পর্কে ১৮৭০-এর দশক থেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের সমালোচনা এবং সংবাদপত্রগুলির জোরালো প্রচার লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে কিন্তু ভিন্ন ছবিই দেখা যায়। ড. রাসবিহারি ঘোষ কংগ্রেসে বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন যে, হিন্দুদের স্বদেশি আন্দোলনের কারণে মুসলিম ও নিচু

[12] See 'The Many Worlds of Indian History', in Sumit Sarkar, *Writing Social History* (Delhi: Oxford University Press, 1997) 1-49 [21-22].

[13] রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন করেছেন সুমিত সরকার। Ibid. 26-27.

শ্রেণির মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পরিষ্কার লিভারপুল লবণের বদলে অপরিচ্ছন্ন করকচ লবণ যা চামড়া ট্যানিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় তা সাধারণ মানুষকে খেতে বাধ্য করা হচ্ছে।[14] স্বদেশি আন্দোলনকারীরা দরিদ্র মানুষের আহারে লবণের অপরিহার্যতার বিষয়টি অনুধাবন করতে যে ব্যর্থ হয়েছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। একইভাবে নমঃশূদ্রদের মতো নিম্নবর্ণীয় গোষ্ঠী, যারা সামাজিক স্তরে সম্মান ও গতিশীলতার দাবি করেছিল, স্বদেশি কর্মসূচিতে তাদের সেই আশা-আকাঙ্খার কোনো প্রতিফলন হয় নি। দরিদ্র ও নমঃশূদ্রদের মতো নিম্নবর্ণীয় গোষ্ঠীর মানুষের সাথে ভদ্রলোক নেতৃত্বের সামাজিক দূরত্ব স্বদেশি পর্বে কিভাবে বেড়েছিল তা বিদেশি লবণের বয়কটের প্রেক্ষিতে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক যে স্বদেশি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বলে গণ্য হয়েছিল তা বিদেশি লবণের বয়কটকে কেন্দ্র করেও পরিলক্ষিত হয়। জবরদস্তি বিদেশি লবণের বেচা-কেনা ও ব্যবহার বন্ধ করতে গিয়ে স্বদেশি নেতৃত্ব মুসলিমদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিদেশি লবণকে কেন্দ্র করে সংঘাত পূর্ববঙ্গে কোনো কোনো জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার অন্যতম ভিত্তি ছিল আত্মশক্তি ও ‘মানুষ-বাঁধা’, ‘মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ’ গড়ে তোলা।[15] হিন্দু, উচ্চ-বর্ণীয় বিত্তবান ভূম্যধিকারী ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধে আধারিত স্বদেশি সমাজে অবশ্য ‘মানুষ-বাঁধা’ নয়, দরিদ্র, মুসলিম, নমঃশূদ্র মানুষের সাথে বাঁধন যে ছিন্ন হয়েছিল তা লবণকেন্দ্রিক পর্যালোচনার সূত্রে প্রতিভাত হয়।

স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে বিদেশি লিভারপুল লবণ বয়কটের পাশাপাশি তার পরিপূরক রূপে মাদ্রাজের করকচ লবণকে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু স্বদেশি নেতৃত্ব বিদেশি লিভারপুলের পরিপূরক হিসেবে বাংলার বিস্তীর্ণ উপকূলে দেশি লবণ উৎপাদনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অথচ স্বদেশি শিল্পোদ্যোগের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলায় দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সংগঠন। তাহলে দেশি লবণের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম কেন হল? আন্দোলনের কয়েক দশক আগে, ব্রিটিশ রাজের সূচনাপর্বেই দেশীয় লবণ শিল্পের বিলোপের কথা তো স্বদেশি নেতৃত্বের অজানা থাকার কথা নয়! এই বৈপরীত্যের প্রেক্ষিত থেকেই অধ্যায়ের

---

[14] *Mihir-o-Sudhakar*, January 3, 1908— RNP (B) for week ending 11 January, 1908. NAI.

[15] ‘রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ’ প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন অনুরাধা রায়, *ইতিহাসের হরেক গেরো* (কলকাতা অনুষ্টুপ, ২০১৯), ২৬০-২৯০[২৬২]।

শেষাংশে বাংলায় দেশি লবণ উৎপাদনে স্বদেশি নেতৃত্বের নীরবতা, অনীহার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। লবণেতিহাসের প্রেক্ষিতে এই অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বদেশির প্রভাব পরবর্তীকালে গান্ধীর আদর্শে এবং আন্দোলনের কর্মসূচিতে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ১৯৩০-এ তিনি স্বয়ং সমুদ্র উপকূলে লবণ আইন অমান্য করেছিলেন এবং দেশবাসীকেও ঔপনিবেশিক আইন অমান্য করেই লবণ তৈরির আহ্বান জানিয়েছিলেন। লবণের স্বদেশি রূপান্তরের সেই প্রেক্ষিত অনুসন্ধানে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা তাই আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

।। ১ ।।

সামাজিক বয়কট ও ব্রাহ্মণদের ভূমিকা

স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা থেকেই বিদেশি লবণ বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পরেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ডাক দিয়ে আরবিন্দের মতো চরমপন্থীরা বিদেশি লবণের ব্যবহারকে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার শাস্তিস্বরূপ সামাজিক বয়কটের নিদান দিয়েছিলেন।[16] চরমপন্থীদের বিদেশি বয়কটের আহ্বান লিভারপুল লবণের ক্ষেত্রে যে খানিক সাফল্য লাভ করেছিল তা ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় স্পষ্ট। ১৯০৫-৬ সালে বাংলার মোট চাহিদায় ইংরেজি লবণের অনুপাত যেখানে ৫৯ শতাংশ ছিল তা ১৯০৮-৯ সালে কমে ২৮ শতাংশে নেমে এসেছিল এবং পরে কিছুটা পুনরুদ্ধারের পরেও ১৯১১-১২ সালে মাত্র ৩৭ শতাংশ ছিল; এই পর্বে অ-ব্রিটিশ লবণের আমদানির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।[17] বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করতে সামাজিক বয়কট কর্মসূচি কিভাবে কার্যকর করা যেতে পারে তার নানা দিক হিন্দি সাপ্তাহিকী *হিতবার্তা* (১৯০৬-এর ২৮শে জানুয়ারি) তুলে ধরেছিল। যারা বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করবে তাদের সাথে (১) একত্রভোজন তথা পান-আহার বন্ধ, (২) বৈবাহিক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তার পাশাপাশি (৩) ধোপা ও (৪) নাপিত বন্ধ করে, (৫) জিনিসপত্র কেনা-বেচা নিষেধ করে, এমনকি তাদের পরিবারের বাচ্চাদের

[16] Sri Aurobindo, *The Doctrine of Passive Resistance*, 57-58.

[17] ১৯০৯-১০ এবং ১৯১১-১২ সালের ‘Report on the Maritime Trade of Bengal’ এর পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal*, 141.

সাথে অন্য বাচ্চাদের মেলামেশা না করার নিদান দেওয়া হয়েছিল।[18] বিদেশি লবণকে কেন্দ্র করে বাংলার সর্বত্র সামাজিক বয়কটের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

১৯০৬-এর ৬ অক্টোবর মুনশিগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, লোহাগঞ্জের জনৈক জানকীনাথ সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হয়েছিলেন; কারণ বিদেশি নুনের কারবারের সাথে জড়িত এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।[19] ১৯০৯ এর ১২ অক্টোবর, পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে নদিয়ার কারা-র বাসিন্দা নবীন চন্দ্র পাল জানিয়েছিল যে, বিদেশি লবণ বিক্রির জন্য তার বাবাকে মারধর ও দোকান লুঠ করা হয়েছিল। প্রাণহানির আশঙ্কার পাশাপাশি ভদ্রলোকেরা পুরোহিত এবং নাপিত বন্ধ করে তাকে একঘরে করে দেবে এমন সম্ভাবনার কথাও নবীন জানিয়েছিল।[20] ১৯০৬-এর নভেম্বর, টিপ্পেরার কসবা-তে উকিল মহিমচন্দ্র সেনের বাড়িতে মিটিং-য়ে সকল ব্যবসায়ীদের ডাকা হয়েছিল। মিটিংয়ের আহ্বায়কদের নির্দেশিত জায়গায় পয়লা ডিসেম্বরের মধ্যে বাজারের সমস্ত ইংরেজ লবণ জড়ো করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর কোনো ব্যবসায়ীর কাছে তা দেখা গেলে তাকে জাতিচ্যুত করার এবং ধোপা, নাপিত ও পুরোহিত বন্ধ করার কথা ঘোষণা হয়েছিল।[21] চাঁদপুরের জমিদার নিত্যানন্দ রায়ের বাড়িতে মিটিং ডাকা হয় কারণ কিছু ব্যবসায়ী এডেন লবণ সহ অন্যান্য বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করছিল। এই ব্যবসায়ীদের যাতে অন্য ব্যবসায়ীরা বয়কট করে এবং এদের বাড়িতে ধোপা নাপিত বন্ধ থাকে তার জন্য জমিদারকে অনুরোধ করা হয়েছিল।[22] ১৯০৬-এর নভেম্বরে টিপ্পেরার বিজয়কৃষ্ণ পালকে লিভারপুল লবণ বিক্রির জন্য একঘরে করা হয়েছিল। বিদেশি লবণ বিক্রি না করার ও প্রায়শ্চিত্তের প্রতিশ্রুতি দিলে তাকে পুনরায় সজাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[23] ভদ্রাসনের রসিকলাল ও রাধিকা মোহন ৬০০ মণ লবণ আমদানি করলেও, সামাজিক ভাবে একঘরে (বহিষ্কৃত)

---

[18] *Hitavarta*, January 28, 1906— RNP (B) for week ending 3 February, 1906. NAI.

[19] Serial No. [hereafter No.] 9, Dacca, 6 October, 1906, *List of Cases in which Intimidation, Social Ostracism, Etc. have been used in the enforcement of the Boycott Movement in the Eastern Bengal and Assam From June 1906 to December 1909* Home Political-A Proceedings, September 1910, No. 41-50. NAI. [hereafter *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*].

[20] Serial No. 84 [hereafter No.], Nadia, 12 October, 1909, *List of Cases of Intimidation, etc., practised in connection with the boycott*, Home Political-A Proceedings, September 1910, No. 41-50. NAI. [hereafter *List of Cases of Intimidation*]

[21] No. 441, Tippera, 2 November 1906, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[22] No.442, Tippera,17 November 1906, ibid.

[23] No.449, Tippera, 11 May 1907, ibid.

হওয়ার ভয়ে, তারা সেই লবণ অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হন।[24] নোয়াখালির গোপাল আখড়ায় গার্হস্থ্য পরিচারকদের এক মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিদেশি দ্রব্য বা লিভারপুল লবণ ব্যবহারকারীর গৃহে কেউ কাজ করবে না। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[25] কুড়িগ্রামের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হীরালাল সাহাকে লিভারপুল লবণ বিক্রির জন্য বয়কট করা হয় এবং তার দোকানের সামনে স্বদেশি ভলান্টিয়াররা পিকেটিং করে।[26] সামাজিক বহিষ্কারের ভয়ে বোগরা শহরে হিন্দু ব্যবসায়ীদের লিভারপুল লবণ বিক্রি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।[27] ভোলা সল্ট কেসে পুলিশ ইনস্পেক্টর চন্দ্রকুমার রায়ের ভূমিকা বাঙালিরা নিন্দা করেছিল। মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি হিমশিম খেয়েছিলেন কারণ তার পরিবারকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছিল।[28] অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর উমাচরণ সমাদ্দার ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বিলাতি লবণ সহ বিদেশি দ্রব্য কিনলে স্থানীয়রা সামাজিক বয়কটের হুমকি দেন। বিদেশি দ্রব্য ফেলে দেওয়ার পাশাপাশি দেশীয় লবণ ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন।[29] শিলচরে বিদেশি লবণ বহন করতে অস্বীকার করার জন্য গাড়োয়ানের পাঁচ টাকা জরিমানা করা হয়। এই জরিমানার অর্থ জনতা চাঁদা তুলে দিয়ে দিয়েছিল বলেই *বসুমতী* পত্রিকা জানিয়েছিল।[30]

ব্রাহ্মণদের ভূমিকা

স্বদেশি পর্বে ব্রাহ্মণেরা বিদেশি লিভারপুল লবণকে ধর্মনাশের কারণ রূপে তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। শাস্ত্রবিরোধী বিদেশি লবণ ব্যবহারের শাস্তি হিসেবে ব্রাহ্মণেরা সামাজিক বয়কটের যে নিদান দিয়েছিলেন তা যেন ভারতীয় সনাতন সমাজ ব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। অতীতে ধর্মীয় বা আচারগত শুদ্ধতার নীতিসমূহ লঙ্ঘিত হলে লঙ্ঘনকারীকে ব্রাহ্মণ, রাজা অথবা জাতি নিয়ামক পরিষদগুলি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করত।[31] স্বদেশি আন্দোলনে সামাজিক বয়কটের নীতি কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চোখে পড়ে। প্রথমত, এই পর্বে হিন্দু পৌরোহিত্যের পুনরুত্থান হয়েছিল, যা উনিশ

[24] No.306, Faridpur, 25 May 1907, ibid.

[25] No.480, Noakhali, May 1906, ibid.

[26] No.512, Rangpur, May 1906, in ibid.

[27] No. 538, Bogra, 19 May 1906, ibid.

[28] *Howrah Hitaishi*, May 11, 1906— RNP (B) for week ending 19 May, 1906. NAI.

[29] No. 301, Faridpur, May 1906, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[30] *Basumati*, September 22, 1906— RNP (B) for week ending 29 September, 1906. NAI.

[31] এই প্রসঙ্গে রনজিত গুহ'র গবেষণা আলোকপাত করে, Ranajit Guha, *Dominance Without Hegemony*, 114-115.

শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করেছিল। দ্বিতীয়ত, স্বদেশির প্রেক্ষিত থেকেই উনিশ শতকীয় বাংলায় হিন্দু পুনর্জাগরণে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যকে মূল্যায়ন করা যায়। এই পুনর্জাগরণবাদী মতাদর্শের প্রচারে ব্রাহ্মণকে হিন্দু সমাজের পথপ্রদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গুরুত্বে তুলে ধরা হয়েছিল।[32] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী প্রচারে বিদেশি লবণের বিরুদ্ধে জাত-ধর্ম নষ্টের অভিযোগ যে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল [দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদে আলোচিত] এবং তাতে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যকারী ভূমিকাই চোখে পড়ে। তবে উনিশ শতকের শুরু থেকেই যে ব্রাহ্মণদের বিধানে বিদেশি লবণ তার পরিশোধন এবং পরিবহণ পদ্ধতির দরুন চূড়ান্ত অশুচিকর বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল– তা এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিদেশি লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধে উনিশ শতক জুড়ে পরিলক্ষিত ব্রাহ্মণ্য নিষেধাজ্ঞার পরম্পরাই স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে আরো সংহত-শক্তিশালী হয়েছিল।

আন্দোলনের শুরু থেকেই বিদেশি লবণের অশুচিতা ও ব্রাহ্মণদের নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে জোরালো প্রচার পরিলক্ষিত হয়। *বঙ্গবাসী* পত্রিকা যেমন বিদেশি লবণকে হিন্দুদের ধর্মনাশের অন্যতম কারণ বলে মনে করেছিল। পত্রিকাটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছিল যাতে হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে তাঁরা বিদেশি লবণ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন।[33] *ডেইলি হিতবাদী* প্রত্যেক গ্রামে বিদেশি লবণের ব্যবহার রুখতে ব্রাহ্মণদের নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা তার জন্য গ্রামবাসীদের প্রথমে সাবধান করবেন এবং প্রয়োজনে একঘরে করবেন।[34] *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় প্রতিবেদক চন্দ্রমোহন গোস্বামী লিখেছিলেন যে, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, বরিশালের খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা তাঁকে একবাক্যে জানিয়েছিলেন শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদিতে ব্রিটিশ লবণ সহ অন্যান্য বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ।[35] কলকাতায় এক পণ্ডিত সম্মেলনে 'ভাবাস্ত্য' জারি করে হিন্দুদের একসূত্রে বেঁধে রাখার ঘোষণা করা হয়েছিল। হিন্দু অনুষ্ঠানে বিদেশি লবণ সহ অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে ভাটপাড়া, নবদ্বীপ সহ অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতেরা যে সমর্থন করেছিলেন তা *অমৃত বাজার পত্রিকার* প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।[36] ১৯০৫-এর ২০ সেপ্টেম্বর *মেদিনী বান্ধব* জানিয়েছিল যে, ১৬ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদেশি লবণ না ছোঁয়ার শপথ নিয়েছেন এবং তাঁরা অন্যদেরও সেই পথে চলার জন্য

---

[32] Ibid., 118.

[33] *Bangavasi*, September 2, 1905— RNP (B) for week ending 9 September, 1905. NAI.

[34] *Daily Hitavadi*, September 15, 1905— RNP (B) for week ending 23 September, 1905. NAI.

[35] *Sanjivani*, August 10, 1905— RNP (B) for week ending 19 August, 1905. NAI.

[36] *Amrita Bazar Patrika*, September 27, 1905— RNP (B) for week ending 7 October, 1905. NAI.

প্রভাবিত করবেন।[37] কলকাতার এন্টালিতে ব্রাহ্মণেরা তাদের যজমানদের বাড়িতে দেশীয় লবণ ব্যবহার না হলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না, কারণ শাস্ত্রীয় মতে দেশীয় দ্রব্য শুদ্ধ। কলকাতার অন্যান্য অংশেও ব্রাহ্মণেরা সেই উদাহরণ অনুসরণ করবেন বলে *সময়* পত্রিকা আশাবাদী ছিল।[38] ১৯০৬-এর জুন মাসে, ঢাকার স্থানীয় এক মন্দির থেকে ৬০ জন ব্রাহ্মণ পুরোহিত জনতার উদ্দেশ্যে সামাজিক বয়কটের ঘোষণা করেন। তারা জনসমক্ষে শপথ নিয়েছিলেন যে দেশীয় লবণের ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন এবং যারা ব্যবহার করবেন তাদের গৃহে পদার্পণ করবেন না। বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দ চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এই কর্মসূচি সংঘটিত হয়েছিল।[39] তমলুকে এক স্বদেশি মিটিংয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা শপথ নিয়েছিলেন যে, গরু ও শুয়োরের রক্তে দূষিত বিলাতি লবণ সহ অন্যান্য বিদেশি দ্রব্য যারা ব্যবহার করবেন তাদের বাড়িতে তারা পৌরোহিত্য করবেন না।[40] চিরাচরিতভাবে হিন্দু ধর্মীয় উৎসবে ব্রাহ্মণেরা পৌরহিত্যের অধিকারী হলেও স্বদেশি পর্বে তারা এই দণ্ডাজ্ঞার উর্ধ্বে ছিলেন না। সময়বিশেষে বিদেশি লবণের অশুচিতায় নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব কলুষিত করার বা অপবিত্রকরণের অভিযোগে ব্রাহ্মণেরা সামাজিক বহিষ্কারের হুমকি ও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিজের প্রয়োজনে বা অন্যত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিদেশি লবণ ব্যবহার করা, বিদেশি লবণের কারবারিদের সাথে 'সংসর্গের' দায়ে মূলত এই ব্রাহ্মণেরা সামাজিক বহিষ্কারের সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ময়মনসিংয়ের কাটিহেরিয়া গ্রামের বাসিন্দারা স্থানীয় পোস্টমাস্টারের বাড়িতে পংক্তিভোজন বয়কট করেছিল, কারণ সেখানে আমন্ত্রিত এক ব্রাহ্মণ বিলাতি লবণ ব্যবহার করতেন।[41] উল্লিখিত প্রেক্ষিত থেকে, ব্রাহ্মণ নিষেধাজ্ঞায় নির্ধারিত বিদেশি লিভারপুল লবণের অশুচিতার ধারণা স্বদেশি পর্বে কিরূপ নিয়েছিল এবং সমাজজীবনে কি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল তা গুরুত্ব সহ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

---

[37] *Medini Bandhab*, September 20, 1905— RNP (B) for week ending 23 September, 1905. NAI.

[38] *Samaya*, October 4, 1907— RNP (B) for week ending 12 October, 1907. NAI.

[39] No. 6, Dacca, 3 June, 1906, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[40] *Nihar*, October 1, 1907— RNP (B) for week ending 5 October, 1907. NAI.

[41] *Bangavasi*, May 2, 1908— RNP (B) for week ending 9 May, 1908. NAI.

।।২।।

লিভারপুল লবণের অশুচিতা: বয়কটের ভিন্নধর্মী বয়ান

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জোরালো আর্থিক অবরোধ গড়ে তুলতে স্বদেশি নেতৃত্ব ধর্মীয় অশুচিতার অভিযোগকে সামনে রেখে ব্রিটিশ পণ্যের সামাজিক বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বদেশি পর্বে ধর্মীয় অশুচির ধারণায় লিভারপুল লবণ যেন, 'দ্বিগুণ কালিমালিপ্ত' হয়েছিল; একেই বিদেশজাত, তায় আবার লিভারপুল লবণে ভেজাল হিসেবে গরুর হাড়ের গুঁড়ো মেশানো হয়— এমন বদ্ধমূল ধারণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। গোহত্যাকে হিন্দুরা যেহেতু মহাপাপ মনে করে তাই লিভারপুল লবণ দূষণের গুরুতর উৎস রূপে গণ্য হয়েছিল।[42] বিদেশি পণ্যে জাতপাতগত বিধিনিষেধ কিভাবে শক্তিশালী হয়েছিল তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে মূলত ধর্মশাস্ত্রে গ্রন্থিত সনাতন হিন্দুত্বের বিধান, যথা- ধর্ম ও আচার লঙ্ঘনের দণ্ড, প্রাচীন আইন-প্রণেতাদের 'তদরুপায়' ধারণার ভিত্তিতে পাপ ও অশুচিতার নির্ণয়, স্পর্শ বা সংযোগ জনিত 'সংসর্গ'-তে অশুচিকরণ, ইত্যাদি ধারণাতে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।[43] কিন্তু স্বদেশি পর্বে লবণের অশুচিতার ধারণা একমাত্রিক হিন্দুত্বে আধারিত ছিল না, বরং তার বিভিন্ন পরত পরিলক্ষিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা থেকেই বিদেশি লবণে মুখ্যত গরু ও শুয়োর, তৎসহ অন্যান্য প্রাণীর দেহজাত অস্থিচূর্ণ ও রক্ত মিশ্রিত রয়েছে এমন ধারণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অশুচিতার প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে যাতে বিদেশি লবণ বয়কটে সামিল করা যায় সেই প্রয়াস প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয়েছিল। এক্ষেত্রে অর্ধশতক আগে ঘটে যাওয়া মহাবিদ্রোহের সময়ে লবণের অশুচিতাকে কেন্দ্র করে জনমানসে যে আশঙ্কা তথা ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল স্বদেশি পর্বে যেন তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল এবং হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের জন্যই তা বিদেশি বর্জনের এক সুস্পষ্ট আহ্বান রূপে প্রতীয়মান হয়েছিল।[44]

---

[42] Ranajit Guha, *Dominance without Hegemony*, 113.

[43] Ibid.

[44] Kim A. Wagner, *The Great Fear Of 1857: Rumour, Conspiracies and the Making of Indian Uprising* (Oxford: Peter Lang, 2010), xxi-xxii.

বিদেশি লবণের অশুচিতা: প্রচার ও প্রসার

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার আগেই বিভিন্ন জায়গায় প্রচারপত্র ছড়িয়ে জনতাকে অবগত করা হয়েছিল যে, বিদেশি লবণ পরিশোধনে বলদের রক্ত এবং বেড়াল, কুকুর ও শুয়োরের অস্থিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।[45] *ডেইলি হিতবাদী* এক প্রতিবেদনে লিখেছিল যে, বিদেশে লবণ কিভাবে পরিশোধিত হয় তা শুনলে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ে শিহরিত হয়ে উঠবেন। ধর্মীয় দিক থেকে দেশীয় লবণের তুলনায় বিদেশি লবণ যে শুদ্ধ নয় তা হিন্দুমাত্রেই জানেন।[46] বিদেশি লবণের অশুচিতার প্রশ্নে এই পত্রিকাতে ধারাবাহিক সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়। বিদেশি দ্রব্যের অশুদ্ধতা নিয়ে এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে পত্রিকাটি লিখেছিল যে, বিদেশি লবণ পরিশোধনের সময় গরু শুয়োরের দেহাংশ, রক্ত ইত্যাদি মেশানো হয়। এমনকি অনেক সময় তাতে মলমূত্র সহ বিভিন্ন ঘৃণ্য বর্জ্য মিশে থাকে![47] বিফ, হ্যাম, বেকন, পর্ক ইত্যদির ছোঁয়ায় দূষিত জেনেও বাঙালিরা যদি লিভারপুল লবণ ব্যবহার অব্যাহত রাখেন তাহলে দেশের আর কোনো আশা নেই বলে *ডেইলি হিতবাদী* তার সমালোচনায় তুলে ধরেছিল।[48] ১৯০৭-এর ১২ অক্টোবর *হাওড়া হিতৈষী* 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' ও অন্যান্য সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, বিদেশি লবণ কিভাবে গরু ও শুয়োরের চর্বি, মাংস, অস্থি অথবা রক্ততে মিশে দূষিত হয়ে ওঠে।[49] হিন্দু ধর্মবোধ ও বাঙালি স্বাতন্ত্র্যের উগ্র প্রচারক *সন্ধ্যা* আক্ষেপের সাথে জানিয়েছিল যে, গরুর রক্ত মেশানো লবণ হাটে-বাজারে বিক্রির জন্য আনা হলে দেশের মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে ভাবলেশহীন মুখে তা গ্রহণ করে। তার চেয়ে ভয়ানক অভিশাপ আর কি হতে পারে।[50] তবে বিদেশি লবণ বয়কটে এই পত্রিকার উগ্র প্রচার কখনো কখনো শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। স্বদেশির সূচনাপর্বে এই পত্রিকা কুরুচিকরভাবে জানিয়েছিল যে, বিদেশি নুন মানেই মেমসাহেবের বুকের হাড়ের গুঁড়ো। ফিরিঙ্গি কবিদের কবিতায় খুব সুন্দরী মেমসাহেবদের বুক খাঁটি রূপোর মত সাদা বলা হয়েছে। তাই এই বুকের হাড় গুঁড়ো হলেই পুরোপুরি লবণ হয়ে ওঠে বলে পত্রিকাটি প্রতিবেদনে লিখেছিল।[51]

[45] *Amrita Bazar Patrika*, August 19, 1905— RNP (B) for week ending 19 August, 1905. NAI.

[46] *Daily Hitavadi*, March 19, 1906— RNP (B) for week ending 24 March, 1906. NAI.

[47] *Daily Hitavadi*, July 9, 1906— RNP (B) for week ending 14 July, 1906. NAI.

[48] *Daily Hitavadi*, April 21, 1906— RNP (B) for week ending 28 April, 1906. NAI.

[49] *Howrah Hitaishi*, October 12, 1907— RNP (B) for week ending 26 October, 1907. NAI.

[50] *Sandhya*, July 15, 1907— RNP (B) for week ending 20 July, 1907. NAI.

[51] *Sandhya*, October 3, 1905— (RNP (B) for week ending 14 October, 1905). NAI.

বিদেশি লবণের অশুচিতার প্রচার শুধু কলকাতায় নয়, তার পাশাপাশি অন্যান্য শহর-মফস্বলেও তীব্র হয়েছিল। *মালদহ সমাচার* আক্ষেপ করে লিখেছিল যে, লিভারপুল লবণ ব্যবহার করে মানুষ নিজেদের ধর্মনাশ করছে।[52] ঘাটালের বাজারে কোথাও করকচ লবণ অবশিষ্ট নেই এমন গুজব রটলে সেখানে মানুষ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে *ডেইলি হিতবাদী* দেশের শিক্ষিত লোকেদের এগিয়ে আসার জন্য আবেদন করেছিল। বিদেশি নুনে গরু ও শুয়োরের রক্ত-অস্থি মেশানো আছে, কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা তাতে বিশ্বাস করেন না। তাই দেশবাসীকে সচতন করার জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রচারপত্র বিতরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিল পত্রিকাটি।[53] বর্ধমানের বাসিন্দাদের শুধু দেশীয় লবণ ব্যবহারের জন্য আবেদন জানিয়েছিল *বর্ধমান সঞ্জীবনী* পত্রিকা। কারণ বিদেশ থেকে জাহাজে আনার সময় লবণে বিফ, হ্যাম ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়।[54] অন্য এক প্রতিবেদনে এই সাময়িকপত্রটি গরু ও শুয়োরের রক্ত মেশানো বিদেশি লবণ খাওয়ার পাশাপাশি দেবী দুর্গার কাছে তা উৎসর্গ করার জন্য জনতার হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছিল। পাঠকের উদ্দেশ্যে পাপ-পুণ্যের বিচারে প্রশ্ন রেখেছিল যে, অজ্ঞতার বশে এই অপরাধের জন্য এতদিন মা দুর্গা ক্ষমা করেছেন, কিন্তু এখন সব জেনেও সেই ভুল করে গেলে মা কি আর ক্ষমা করবেন?[55] *মেদিনি বান্ধব* হিন্দু ও মুসলিম উভয়কেই মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, বিদেশি লবণ সাদা করা হয় গরু ও শুয়োরের রক্ত-অস্থি ব্যবহার করে। পত্রিকাটি প্রশ্ন তুলেছিল যে, সবকিছু জানার পরেও সস্তার দোহাই দিয়ে এমন অপবিত্র জিনিস কিনে বাঙালিরা কি তাদের জাত-ধর্ম খোয়াতেই থাকবেন?[56] বরিশালে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিস চত্বরে সরকারের অনুমোদনে বিদেশি লবণ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। *হিতবার্তা* অবশ্য মনে করেছিল যে, সরকারের এই প্রয়াস নিষ্ফল হবে। কারণ, গরু ও শুয়োরের মাংস বিদেশি নুনে সংরক্ষিত থাকে, আর তাই হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই তা ব্যবহারে বিরত থাকবেন।[57] যশোরে রটে গিয়েছিল যে, বিদেশি লবণে গরু ও শুয়োরের রক্ত মেশানো রয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সরকার এই প্রসঙ্গে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও *যশোহর* পত্রিকা পাল্টা ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি সরকারকে মনে করিয়ে

---

[52] *Maldaha Samachar*, September 6, 1905— RNP (B) for week ending 16 September, 1905. NAI.

[53] *Daily Hitavadi*, January 13, 1906— RNP (B) for week ending 20 January, 1906. NAI.

[54] *The Burdwan Sanjivani*, September 12, 1905— RNP (B) for week ending 16 September, 1905. NAI.

[55] *Bardhaman Sanjivani*, October 8, 1907— RNP (B) for week ending 26 October, 1907. NAI.

[56] *Medini Bandhab*, September 13, 1905— RNP (B) for week ending 23 September, 1905. NAI.

[57] *Hitavarta*, September 16, 1905— RNP (B) for week ending 22 September, 1905. NAI.

দিয়েছিল।[58] চন্দননগরের হাটখোলায় এক প্রদর্শনীতে বিদেশি লবণ কিভাবে পরিশোধিত হয় তার পদ্ধতি জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। ঘৃণ্য বিদেশি লবণের ব্যবহার যাতে ভারতীয়রা বন্ধ করেন সেই উদ্দেশ্যে এই আয়োজন হয়েছিল বলে *মাতৃভূমি* পত্রিকা জানিয়েছিল।[59]

লবণের ধর্মীয় অশুচিতা সম্পর্কিত প্রচার যে জনমতকে প্রভাবিত করেছিল তা বোঝা যায় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সাধারণ পাঠক ও লেখকদের চিঠি থেকে। *ইন্ডিয়ান মিরর* পত্রিকায় জনৈক রাসবিহারী দাস যেমন দাবি করেছিলেন, সাধারণ হিন্দুরা যে পরিশোধিত বিদেশি নুন ব্যবহার করছেন তা আদতে মৃত গরু, ঘোড়া, শূকর, গাধা ইত্যাদির হাড়ের গুঁড়ো মিশ্রিত হয়ে পৌঁছাচ্ছে।[60] *জাগরণ* পত্রিকায় বাগেরহাটের শ্যামল গোস্বামী জনগণের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে লিখেছিলেন যে, বিদেশি লবণ গরু ও শুয়োরের রক্তে পরিশোধিত হয়, তারপরেও হিন্দু-মুসলমান বিদেশি লবণ ব্যবহার করে ধর্মচ্যুত হয়ে চলেছেন। তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন 'মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের' প্রতি, যারা 'সত্যপরায়ণ এবং ধর্মনিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে খ্যাত' কিন্তু তারা কিভাবে 'গরু-শুয়োরে দূষিত বিদেশি লবণ খেয়ে পবিত্র ইসলামের অবমাননা করছেন?'[61] ১৯১০-এর ২২ জুন, *কল্যাণী* পত্রিকায় শ্যামল গোস্বামী তাঁর লেখাতে বিলাতি লবণের বিপুল আমদানির নিন্দা করে স্বদেশের প্রতি জনগণকে তাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন কিভাবে স্বদেশির শপথ গ্রহণের পরেও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই জেনেশুনে গরু ও শুয়োরের রক্তে পরিশোধিত বিদেশি নুন ব্যবহার করে অধঃপতনের পথে চলেছেন।[62] কলকাতার অবাঙালিদের উদ্দেশ্যে *হিন্দি বঙ্গভাষী* জানিয়েছিল, বিদেশি লবণ ধর্মীয় মতে অশুদ্ধ, নানা অপবিত্র উপাদান মিশ্রিত। তাই ধর্ম রক্ষার্থে বিদেশি লবণ পরিহার প্রয়োজন।[63] দুর্গাপূজার সময়ে এই পত্রিকাটি শুভেচ্ছাবার্তায় লিখেছিল যে, অশুদ্ধ বিলাতি লবণ ঘরে না ঢুকতে দিয়ে সবাই মায়ের পূজা করে স্বদেশিব্রতে দীক্ষিত হয়ে উঠুক।[64] অবাঙালি মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রচারের আঁচ পরিলক্ষিত হয়। *মারোয়াড়ি বন্ধু* পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠির প্রতিপাদ্য ছিল, যেসব মারোয়াড়ি বিদেশি

[58] *Jasohar*, May 9, 1906— RNP (B) for week ending 28 April, 1906. NAI.

[59] *Matribhumi*, November 10, 1908— RNP (B) for week ending 26 December, 1908. NAI.

[60] *Indian Mirror*, 30 August, 1905— RNP (B) for week ending 2 September, 1905. NAI.

[61] *Jagaran*, January 3, 1908 — RNP (B) for week ending 9 January, 1909. NAI.

[62] *Kalyani*, June 22, 1910— RNP (B) for week ending 2 July, 1910. NAI.

[63] *Hindi Bangavasi*, October 7, 1907 — RNP (B) for week ending 12 October, 1907. NAI.

[64] *Hindi Bangavasi*, October 14, 1907— RNP (B) for week ending 19 October, 1907. NAI.

লবণের কারবারে লিপ্ত তারা আদতে তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের স্বর্গ থেকে নরকে নিক্ষিপ্ত করছে। বিদেশি লবণ পরিবহণের সময় তাতে বিভিন্ন পশুর মাংস সংরক্ষিত হয় আর সেই লবণ ব্রাহ্মণকে দান করার অর্থ পূর্বপুরুষের পূত নরক গমনের পথ প্রশস্ত হওয়া![65]

বিদেশি লবণের অশুচিতা প্রসঙ্গে স্বদেশি মুসলিম সমালোচকেরাও সরব ছিলেন। স্বদেশি পর্বে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে মৌলবি গোলাম হোসেন খেদ প্রকাশ করে *ডেইলি হিতবাদী*-তে চিঠি লিখেছিলেন। শুয়োর ও অন্যান্য প্রাণীর হাড় দিয়ে পরিশোধিত লবণ গ্রহণ করে মুসলমানেরা তাদের ধর্ম কি যথাযথ পালন করতে পারছেন, না কি তাঁরা কোরাণের শিক্ষা লঙ্ঘন করছেন— সেই প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন।[66] ময়মনসিংহের শান্তিগঞ্জে মৌলবি আবুল হোসেন চৌধুরী খোদা ও পয়গম্বর মহম্মদের নামে শপথ নিয়েছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা ‘হারাম’ বিলাতি লবণ গ্রহণ করবেন না।[67] আন্দোলনে যোগদানকারী স্বদেশি মুসলিম নেতা-প্রচারকদেরও ধর্মীয় অশুচিতার কারণে বিদেশি লবণের তীব্র সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছিল। খ্যাতনামা স্বদেশি প্রচারক আব্দুল গফুর যেমন তাঁর বক্তৃতায় বিদেশি লবণের অশুচিতা বারবার তুলে ধরার জন্য পুলিশের গোপন রিপোর্টে “কুখ্যাত” হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।[68] ১৯০৭-এর ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিনি চট্টগ্রামের ছয়টি গ্রামে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং প্রতিটি বক্তৃতায় বিদেশি লবণ কিভাবে বিভিন্ন ঘৃণ্য উপাদানের মিশ্রণে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছে অপবিত্র হয়ে উঠেছে তা তুলে ধরেছিলেন। ১৯০৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, পূর্ববঙ্গের ভোলায় অনুষ্ঠিত এক স্বদেশি সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্যই ব্রিটিশ লবণ ক্ষতিকারক। ব্রিটিশ লবণ পরিশোধিত করার জন্য ভারত থেকেই গরুর হাড় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সে কারণেই বিদেশি লবণের মধ্যে প্রায়শই হাড়ের টুকরো পাওয়া যায়। লিভারপুল থেকে জাহাজে লবণ আমদানির সময়ে তার মধ্যে তাজা গরু এবং শুয়োরের মাংস সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়। আর সেই মাংস থেকে রক্ত ক্ষরিত হয়ে তা জমাট বেঁধে ছাইয়ের ছোট ডেলার মতো লবণে মিশে থাকে। সেকারণেই বিদেশি লবণ হিন্দু বা মুসলমান কারোরই ছোঁয়া

[65] *Marwari Bandhu*, October 2, 1907— RNP (B) for week ending 5 October, 1907. NAI.
[66] *Daily Hitavadi*, February 1, 1908— RNP (B) for week ending 8 February, 1908. NAI.
[67] *Hitavadi*, September 21, 1906— RNP (B) for week ending 29 September, 1906. NAI.
[68] Home Public Progs. A, February 1907, File No. 210 (Confidential). NAI.

উচিত নয়। তাদের করকচ এবং সৈন্ধব লবণ খাওয়া উচিত যাতে এই ধরনের ভেজাল থাকে না।[69] তার পাশাপাশি ধর্মীয় আবেগ উসকে দিয়ে গফুর আরো বলেছিলেন যে, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের উচিত তাদের ইসলামীয় ধর্মগুরু [খলিফা] তুরস্কের সুলতানকে সম্মান করা। মক্কা, মদিনা, এডেন এবং জেড্ডার মতো পবিত্র স্থান থেকে আগত করকচ লবণকেও পবিত্র গণ্য করে ব্যবহার করলে সুলতান সন্তুষ্ট হবেন।[70] গোপন পুলিশি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এই সভায় প্রায় ৪০০ জন হিন্দু এবং ১০০ জন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে মুখতার, উকিল, তাদের মুহুরি, খুদে তালুকদার, স্থানীয় স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, স্কুলছাত্র, দোকানদার, খুদে কৃষক এবং কয়েকজন পতিতাও ছিলেন।[71] বিদেশি লবণ গ্রহণের পেছনে মুসলিমদের এক অদ্ভুত আশঙ্কাও যে ছিল তা *বসুমতী* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। মুসলিমদের দৃঢ় ধারণা ছিল তারা যদি বিদেশি লবণের ব্যবহার ছেড়ে দেন তাহলে তারা ধর্মভ্রষ্ট হবেন, কারণ সব বিদেশি লবণই মক্কা থেকে আসে। আর যদি শিলা-লবণ ব্যবহার করেন তাহলে মুসলিম জাতির উর্বরতা [প্রজনন ক্ষমতা] লোপ পাবে! এমনকি হিন্দু বিধবারাও শেষোক্ত কারণে বিদেশি লবণ খাচ্ছেন! দেশের জনতার পাহাড় প্রমাণ অজ্ঞতা নিয়ে পত্রিকাটি খেদ প্রকাশ করেছিল।[72] বিদেশি লবণের বয়কটকে কেন্দ্র করে স্বদেশি পর্বে এমন পরস্পরবিরোধী ধারণাও অব্যাহত ছিল।

স্বদেশি গান-কবিতায় 'অশুচিতা'

স্বদেশি পর্বে জনসংযোগের অন্যতম মাধ্যম রূপে, মানুষের মনের কল্পনাকে উসকে দিতে স্বদেশি গান-কবিতার আবেদন ছিল অদ্বিতীয়। একথা বলা কোনো অত্যুক্তি হবে না যে, দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের সৃজনশীলতার মধ্য দিয়েই স্বদেশি আন্দোলনের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[73] স্বদেশি গান-কবিতার মধ্য দিয়েও বিদেশি লবণের অশুচিতার ধারণা ব্যাপক প্রচারিত হয়েছিল। অশুচি লিভারপুল লবণ বয়কটের আহ্বান জানিয়ে বাঁধা এই গান-কবিতা স্বদেশি সংবাদপত্রর পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। *সন্ধ্যা* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গানের

[69] Extract from Eastern Bengal and Assam Police abstract dated 5th January, 1907, in Home Public Progs. A, February 1907, File No. 265 (Confidential). NAI.

[70] Ibid

[71] Ibid.

[72] *Basumati*, May 23, 1908— RNP (B) for week ending 30 May, 1908. NAI.

[73] গান-কবিতার সূত্রে স্বদেশি আন্দোলন অমরত্বের দাবি রাখে ['greatest claim to immortality'] বলে সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন। Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement*, 289.

বিষয় ছিল কিভাবে অশুদ্ধ প্রাণীর দেহাস্থি দিয়ে লিভারপুল লবণ পরিশোধিত হয়। এই গানের উগ্র বয়ান সরকারের শ্যেন দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।[74] *ডেইলি হিতবাদীর* পাতায় কলিকাতার রাস্তায় জনপ্রিয় দুটি স্বদেশি গান প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি গানের বিষয় ছিল কিভাবে বিদেশি লবণ গরু ও শুয়োরের রক্ত-চর্বিতে অশুচিকর হয়ে উঠছে।[75] সাধারণ ব্যবহারের জন্য যে লবণ প্রয়োজন হয় তা গরুর রক্ত ও পশুর হাড় মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে বলে *হিতবার্তা* এক কবিতায় তুলে ধরেছিল।[76]

কবি, গায়কদের সৃজনশীলতার মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করার যুক্তিও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে; অর্থাৎ স্বদেশি গান-কবিতাকে আন্দোলনের 'অনুষঙ্গ নয়, তার অপরিহার্য অঙ্গ' রূপে গণ্য করা উচিত।[77] এই যুক্তিক্রমে কবি-গায়কদের স্বদেশি আন্দোলনে লবণের অশুচিতা ও বয়কটের আহ্বান কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যেতে পারে। স্বদেশি নেতা ও সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যেমন ব্রিটিশ লবণ ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপের সাথে লিখেছিলেন, "গৌ শূয়রকে লহুসে শোধিত্/ চিনি নিমক্ খাওয়ে/ সফেদি দেখ্ কর্ মন্ লাল্চাতা/ হাতমে মোক্স পাওয়ে।"[78] শুভ্রতার লোভ সংবরণ করে অশুচি লবণ মুখে না তোলার জন্য অবাঙালি বিশেষত হিন্দিভাষীদের উদ্দেশ্যে তিনি এই আবেদন করেছিলেন। সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বদেশ প্রেমের গানে হিন্দু-মুসলিম উভয়কেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ লবণ বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিলেন, যথা- "ওঠরে ওঠরে ওঠরে তোরা হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই/[...] দেও জলে ফেলে বিলাতের নুন/ বৃটিশ বাণিজ্যে কর পদাঘাত, বণিকের ঘরে জমুক ছাই।"[79] ছোটদের জন্য লেখা জনপ্রিয় ছড়াতে বিদেশি নুনকে ধর্মনাশের কারণ এবং সেজন্যই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মতিলাল ঘোষের মতো খ্যাতনামা স্বদেশি নেতৃত্ব যে নিষেধ জারি করেছিলেন তা চমৎকার ফুটে উঠেছে: সুরেন দাদা ব'লে গেছেন, শোন্ রে খোকার মা;/ রান্নাঘরে বিলাতী নুন কখ্খন আন্‌বে না!/ দেখতে শাদা হ'লে কি হয়? বলছেন

---

[74] *Sandhya*, September 21, 1905— RNP (B) for week ending 30 September, 1905. NAI.

[75] *Daily Hitavadi*, October 4, 1907— RNP (B) for week ending 12 October, 1907. NAI.

[76] *Hitavarta*, April 22, 1906— RNP (B) for week ending 28 April, 1906. NAI.

[77] 'কবিদের স্বদেশি আন্দোলন' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে: অনুরাধা রায়, *ইতিহাসের হরেক গেরো* (কলকাতা অনুষ্টুপ, ২০১৯), ২৫-১৮০।

[78] গানটি সংকলিত হয়েছে, যোগেন্দ্রনাথ শর্মা, *স্বদেশ সঙ্গীত* (কলিকাতা, ১লা আশ্বিন ১৩১২, তৃতীয় সংস্করণ), ৬৬-৬৭।

[79] সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান, সংকলিত হয়েছে কমল চৌধুরি সম্পাদিত, *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ* (কলকাতা: ভারবি, ১৯৯৯), ৬৪৮।

হেঁকে মতি/ খেলে হ'বে ধর্মনষ্ট, বদ সে জিনিস অতি [বানান অপরিবর্তিত]।[80] বিদেশি লবণের অশুচিতা তুলে ধরে এমন গান প্রকাশ্যে গেয়েই স্বদেশি সমর্থক-স্বেচ্ছাসেবকেরা জনতাকে বয়কটে প্রণোদিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ১৯০৯-এর ৬ নভেম্বর 'ডেজু' স্টিমারে রঘুনাথ বৈরাগী ও প্যারী মোহিনতা গোলমাল পাকানোর দায়ে পুলিশ ডায়েরিতে অভিযুক্ত হন। কারণ তাঁরা দুজনেই অশুচি লিভারপুল লবণ ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে টিটকিরি দিয়ে গান গেয়েছিলেন। তার পাশাপাশি লোকজনের মধ্যে আরো আশঙ্কা-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল যখন প্যারী দাবি করেছিল যে, এক লবণ গোলায় সে পাঁচ বছর কাজ করেছে এবং সেখানে নিজের চোখে দেখেছে কিভাবে শুয়োরের শুকনো মাংস এবং গরুর হাড় বিদেশি লবণে মেশানো হত।[81] স্বদেশি গান-কবিতার মধ্য দিয়ে অশুচিতার প্রশ্নে বিদেশি লবণ বয়কটের আহ্বান যে আরো বেশি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। এখানে আরো একটি লক্ষণীয় দিক হল, বিদেশি লবণে অশুদ্ধি মেশানোর প্রত্যক্ষদর্শী (প্যারী মোহিনতার মতো) দাবিদারদের সংখ্যা, যা আগে প্রায় বিরল ছিল এবং স্বদেশি পর্বে তার আকস্মিক বাড়বাড়ন্ত দেখা গিয়েছিল। শহর-গ্রাম-মফস্বলের সর্বত্রই এমন প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রভূত সংখ্যায় প্রকাশ্যে এসেছিল।

লবণের অশুচিকরণ: প্রত্যক্ষদর্শী দাবি

বসুমতী সমসাময়িক *নীহার* পত্রিকাকে উদ্ধৃত করে দুটি প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিল। আজনিবাড়ি হাটের প্রথম ঘটনাতে, বিলাতি লবণ বিক্রেতা বাবুরাম মণ্ডল নিজের কেনা লবণের ঝুড়ির মধ্যে এক টুকরো হাড় পেয়েছিল। অন্য ঘটনাটিতে, গরাণিয়া গ্রামের পদ্মলোচন দাস তার লবণ পাত্রে বেশ খানিকটা লবণের মধ্যে শুকনো রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছিলেন। *বসুমতীর* ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই ধরণের ঘটনাই স্বাভাবিক ছিল কারণ লবণ বহনকারী জাহাজগুলোর খালাসিরা যে গরুর মাংস খেত তা জারিয়ে রাখতে তারা জাহাজের মেঝেতে রাখা লবণ স্তূপের মধ্যে গোমাংস গুঁজে দিত।[82] *হাওড়া হিতৈষী*-তে 'বিদেশি লবণে শুয়োরের মাংস' শিরোনামে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। হিঙ্গলগঞ্জ বাজারে উমেশচন্দ্র দে-র দোকানে লবণ স্তূপের একাংশ যখন বিক্রির জন্য সরানো হচ্ছিল, তার মধ্যে প্রায় এক সের ওজনের শুয়োরের মাংসখণ্ড পাওয়া যায়। মাংসখণ্ড দেখতে টকটকে লাল রংয়ের হলেও তার থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। সেই দৃশ্য

---

[80] চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্বদেশ-রেণু* (কলিকাতা, ১৩১২), ২২।

[81] Home-political-A, February, 1909, File No. 32. NAI

[82] *Basumati*, May 18, 1907— RNP (B) for week ending 25 May, 1907. NAI.

দেখে বহু হিন্দু ও মুসলিম যারা বিলাতি লবণ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা আর কখনো বিদেশি লবণ ছোঁবেন না বলে শপথ নিয়েছিলেন। চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমায় হিঙ্গলগঞ্জ পোস্ট অফিস সংলগ্ন শেরাবাটিতে হাওড়া চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির শাখায় কর্মরত রামচরণ সাধুখাঁ চিঠি লিখে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন। যদি এর সত্যতা নিয়ে কারোর সন্দেহ থাকে তাহলে তিনি সরাসরি প্রতিবেদকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বলে *হাওড়া হিতৈষী* জানিয়েছিল।[83] কলিকাতার নেবুতলায় স্বদেশি মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি জানিয়েছিলেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন ভারতে আমদানি করা লিভারপুল লবণে শুয়োরের মাংস সংরক্ষণ করা হয়।[84] বলাবাহুল্য এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের পাল্টা জবাবে সরকারের তরফে তদন্তমূলক বিবৃতি জারি করা হত। জনতাকে আশ্বস্ত করতে যেমন এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিলে যে, লিভারপুল থেকে জাহাজে আসা লবণের মধ্যে মৃত শূকর এবং মৃত গরু দেখা গেছে এমন দাবি পুরোপুরি অসঙ্গতিপূর্ণ ও মিথ্যে; সর্বোপরি যিনি এই দাবি করেছিলেন সেই পান্নালাল রক্ষিত নামে কোনও ব্যক্তি কলকাতার কাস্টমস হাউসের লবণ বিভাগে কাজ করেন না![85] খোদ ব্রিটেনের সল্ট ইউনিয়ন লিমিটেড এই অশুচিতার অভিযোগ যে সর্বৈব মিথ্যে তা জানিয়ে সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ লবণের অন্যতম বৃহৎ সরবরাহকারী টার্নার মরিসন অ্যান্ড কোম্পানি সরকারকে এই বিষয়ে সক্রিয় হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং ভারত সচিবকে ব্রিটিশ লবণের অশুচিতার অভিযোগ খণ্ডন করে সরকারি বিবৃতি জারির পরামর্শ দিয়েছিল।[86] বলাবাহুল্য যে, এই কোম্পানির ব্যবসা স্বদেশি পর্বে গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল; যেমন, বাখরগঞ্জের ঝালকাঠিতে টার্নার, মরিসন অ্যান্ড কোম্পানি লিভারপুল লবণের যে রমরমা কারবার চালাত তা স্বদেশি আন্দোলনের প্রাথমিক বছরগুলিতে একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[87]

মলমূত্র মিশ্রিত বিদেশি লবণ

লিভারপুল লবণের অশুচিতার বয়ান আরো অস্বস্তিকর, বিতৃষ্ণা সঞ্চারে চরমে পৌঁছেছিল যখন প্রত্যক্ষদর্শীরা তাতে মল-মূত্র মিশে থাকার দাবি করেছিলেন! ১৯০৫-এর ২১শে সেপ্টেম্বর, সুলতান নামের

---

[83] *Howrah Hitaishi*, August 24, 1907— RNP (B) for week ending 31 August, 1907. NAI.

[84] *Telegraph*, May 11, 1906— RNP (B) for week ending 19 May, 1906. NAI.

[85] Home Progs., June 1906, File No. 144, Part-C, Finance Dept. Separate Revenue, NAI.

[86] Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement*, 309.

[87] *Sri Sri Vishnupriya-o-Ananda Bazar Patrika*, April 30, 1908— (RNP (B) for week ending 9 May, 1908), NAI.

জাহাজে লবণ স্তূপের ওপর মৌলবি আবুল করিম নিজের ব্যাগ ফেলে চলে গিয়েছিলেন। পরদিন সকালে ব্যাগ আনতে গিয়ে দেখেন কেউ লবণ-স্তূপের ওপর মলত্যাগ করে গেছে এবং সেই মল চুঁইয়ে পুরো লবণ স্তূপে মিশে গেছে! এই গা ঘিনঘিনে দৃশ্য দেখার পর করিম সাহেব জাহাজ থেকে নিমক মহল ঘাটে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। *ডেইলি হিতবাদী* এই ঘটনার সত্যতা প্রতিপাদনে আরো জানিয়েছিল যে, মৌলবি আবুল করিম সম্ভ্রান্ত বংশীয়, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবি আব্দুল জব্বার খান বাহাদুরের জামাতা ও ভাগ্নে।[88] পত্রিকাটির মতে, চট্টগ্রামে লবণ-ভেসেলে কর্মরত মুসলিম শ্রমিকেরাও মাঝে মধ্যেই এরকম অভিজ্ঞতার সাক্ষী হন। বিদেশি লবণে মল-মূত্র মিশে থাকার এমন প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞতা সাত-আট মাস আগে হিতবাদী পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল বলেই এই প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল। সর্বোপরি, বাজারে লিভারপুল লবণের এই ঘৃণ্য অপরিচ্ছন্নতার জন্য ইংরেজদের খাওয়ার নুন ব্রিটেন থেকে আলাদা মৃৎপাত্রে ভারতে আসে বলেই *ডেইলি হিতবাদী* যুক্তি তুলে ধরেছিল।[89]

বিদেশি লবণে মল-মূত্র মিশে থাকার এই অভিযোগ যেন পরিচ্ছন্নতা তথা শুদ্ধতার প্রশ্নে উপনিবেশের ওপর সাম্রাজ্যিক শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবি ছিল তা প্রত্যাখ্যান করে এক পাল্টা জবাব দিয়েছিল। কারণ সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার বয়ানে উপনিবেশ ছিল এক চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর পরিসর যার যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা মল আদতে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতা ও জাতিগত নিকৃষ্টতার চিহ্ন বহন করে। এই উপস্থাপনার রাজনীতি মলময় উপনিবেশবাদ বা Excremental Colonialism রূপে অভিহিত হয়।[90] স্বদেশি পর্বে লবণকে কেন্দ্র করে মলময় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যেন হুবহু এক পাল্টা বয়ান উঠে আসে ও সাম্রাজ্যের দিকেই তা ছুঁড়ে দেওয়া হয়। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষদর্শী পরিচিতি তুলে ধরে এই স্বদেশি প্রচার অবশ্য সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেনি। বরং শহুরে স্বদেশি নেতাদের এই প্রচার যে মনগড়া, ভিত্তিহীন, বিদেশি লবণ বয়কটের এক কৌশল মাত্র তা তারা নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, সাধারণ বোধ-বুদ্ধিতেই বুঝতে পেরেছিলেন। স্বদেশি নেতৃত্বের গ্রামীণ মানুষের সাথে সংযোগহীনতা, তাদের জীবনবোধ সম্পর্কে এক অবজ্ঞাও

[88] *Daily Hitavadi*, July 9, 1906— (RNP (B) for week ending 14 July, 1906). NAI.

[89] Ibid.

[90] Warwick Anderson, "Excremental Colonialism: Public Health and the Poetics of Pollution," *Critical Inquiry*, Vol. 21, No. 3 (Spring, 1995), 640-669.

যেন এই লবণ বিতর্কের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়। স্বদেশি আন্দোলন চলাকালীন বুদ্ধিজীবী সমালোচনাতেও তার রেশ ফুটে ওঠে।

'শহরে নেতা ও গাঁয়ে চাষা' শীর্ষক এক নিবন্ধে লেখক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত 'চাষারও যে বুদ্ধি আছে, চাষাও যে মানুষ- দেশের একজন' তা বোঝাতে নিজের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেছিলেন।[91] এক খ্রীষ্টান মাঝির সাথে লেখকের আলাপ হলে তিনি কথাচ্ছলে জানতে পারেন যে, মাঝির স্ত্রী বিদেশি নুন খেতে অভ্যস্ত এবং স্বদেশির উত্তুঙ্গ আবহেও সেই অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। মাঝির সাথে স্ত্রীর অহরহ গার্হস্থ্য অশান্তির অন্যতম কারণও ছিল এই বিদেশি নুন। অবশেষে মাঝি একদিন মতলব এঁটে তার স্ত্রীর কাছে নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করে শহরে এক গা-ঘিনঘিনে অভিজ্ঞতা দেখার কথা জানিয়েছিল: "এক স্টীমার লবণের মধ্য হইতে রাশি রাশি মলমূত্র, গলিত পশুপক্ষী, সরীসৃপ ইত্যাদি বহুবিধ অস্পৃশ্য জিনিস বাহির হইয়া পড়িয়াছে; লবণ নাকি উহা দিয়াই সাফ করা হয়। ঐ স্টীমারের লবণ ব্যতীত শহরে আর লবণ মোটেই নাই। সুতরাং উহা শীঘ্রই এদিকে চালান হইবে, আর আমরা ছত্রিশ জাতির মলমূত্র উদরসাৎ করিতে থাকিব"। বলাবাহুল্য, মাঝির কথায় 'সুলভ-চপলা স্ত্রী সহজে গলিয়া পড়িল; এবং তদবধি শপথ করিয়া তাহারা বিলাতী লবণের চির-নির্বাসন করিয়াছে' বলে কার্তিকচন্দ্র তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। আপাত সাধারণ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একইসাথে লেখকের সমালোচনার কৌশল এবং কিছু অসঙ্গতিও এখানে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। এই অভিজ্ঞতার প্রাথমিক অসঙ্গতিগুলো হল— প্রথমত, যে গ্রাম্য মাঝি (ধর্মান্তরিত) খ্রীষ্টান তার বিদেশি লবণে আপত্তির কারণ স্পষ্ট নয়! দ্বিতীয়ত, 'সুলভ-চপলা স্ত্রী সহজে গলিয়া পড়িল'— লেখকের এই অভিব্যক্তির মধ্যে সামাজিক-পারিবারিক কাঠামোতে লিঙ্গ বৈষম্যগত ব্যবধানের ধারণা স্পষ্ট। তাঁর অভিজ্ঞতার 'পুরুষ' মাঝি যুক্তিপ্রবণ ও কৌশলী যে স্বদেশির যুক্তি বুঝতে পারে ও তা কার্যকর করতে মাথা খাটিয়ে কৌশল বার করতে সক্ষম। অন্যদিকে মাঝির 'স্ত্রী' যুক্তিহীন ও আবেগসর্বস্ব তাই স্বদেশির যুক্তি বুঝতে অপারগ এবং আবেগসর্বস্বতার কারণে পুরুষের কৌশল ধরতে না পেরে সহজে মেনে নেয়। তবে মাঝির পরিকল্পিতভাবে শহরে মলমূত্রময় লবণ দেখে আসা ও গ্রামে স্ত্রীকে তা বলে বিশ্বাস করানোর কৌশলের মধ্যে কার্তিকচন্দ্রের বার্তা প্রদানের নিজস্ব কৌশলও কি স্পষ্ট নয়? শহুরে নেতৃত্বর নিজেদের যুক্তিপ্রবণ ও কৌশলী (মাঝির মতোই) ভাবার

[91] শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত, 'সহরে নেতা ও গাঁয়ে চাষা', *নব্যভারত*, পঞ্চবিংশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, (আষাঢ়, ১৩১৪), ১৬২-১৬৩।

পাশাপাশি, আর গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ যেন যুক্তিহীন ও আবেগসর্বস্ব (মাঝির স্ত্রীর মতোই) ধরে নেওয়া যে ভুল তার বার্তাটি কি তিনি এখানে ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছিলেন? না হলে শুরুতে কেন লিখবেন, 'স্বীকার করি,- গাঁয়ে চাষা নিরেট মূর্খ; স্বীকার করি,- তাহারা দর্শন বিজ্ঞানের যুক্তি বুঝে না। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতো সহুরে নেতা, তুমি কি জীবনে কখনো সহর ছাড়িয়া কোন পল্লীগ্রামে পদার্পণ করিয়াছ?' আর এই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শেষে লিখেছিলেন, "চাষাভূষাও যে সত্য আবিষ্কারে অপটু নহে; বরঞ্চ অর্থনীতির ধার না ধারিয়া যে, যে যেভাবে বুঝে, তদনুরূপ সরল সত্যে দেশের অবস্থা বুঝিয়া, আরো দশজনকে, তাহার ভাবে দলে টানিয়া আনিতে পারে, এ দৃষ্টান্তটি তাহারই প্রমাণ।"[92] অবশ্য, কার্তিকচন্দ্রের মতো সমালোচকদের আবেদন সত্ত্বেও স্বদেশি নেতৃত্ব যে তাতে বিশেষ আমল দেননি তা স্পষ্ট, কারণ তাঁরা যে কোনো মূল্যে বিদেশি বয়কট কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। গরু-শুয়োরের রক্ত-হাড়-চর্বি মেশানো অথবা মল-মূত্র মিশ্রিত বিদেশি লবণ বর্জনের আহ্বান সাধারণ মানুষের নিজেদের জীবন বোধে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় গ্রহণীয় না হলে তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করে তা কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছিল। অশুচিতার আবেদন ভোঁতা হয়ে যেতে স্বদেশি নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবকেরা হুমকি-বলপ্রয়োগের রাস্তা অবলম্বন করেছিলেন। যার পরিণামে দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মানুষ বিদেশি লবণ বয়কটকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত হেনস্থা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন এবং সামাজিকভাবে স্বদেশি নেতৃত্বও তাদের কার্যক্রম থেকে আরো দূরে সরে গিয়েছিলেন। স্বদেশি সমাজে সব স্তরের 'মানুষ-বাঁধা' নয়, বরং মানুষের মধ্যে ব্যবধানই লবণ বয়কটের রাজনীতি সূত্রে পরিলক্ষিত হয়।

।। ৩ ।।

দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর নিপীড়ন

দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের জীবনে ন্যূনতম নুনের বাস্তবতা স্বদেশি নেতৃত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৮৯০-তে *সঞ্জীবনী* পত্রিকা লবণ কর বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ সরকারের পাশাপাশি বাংলার শহুরে শ্রেণিরও কড়া সমালোচনা করেছিল, কারণ নুনের দাম বাড়লে গরীবের দুর্দশা যে চরমে পোঁছায় তা সম্পর্কে উভয়ে উদাসীন ছিলেন। সামান্য নুন পাতে থাকলে তা দিয়েই গ্রামের গরিব মানুষ ভাত গলাধঃকরণ করে এবং খিদের জ্বালা যে মেটায়— সেই নিদারুণ বাস্তবতার দিকেই পত্রিকাটি সরকারের পাশাপাশি শহুরে শিক্ষিত শ্রেণিরও

[92] তদেব।

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল।[93] দেড় দশক পরে সঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্ণকুমার বিদেশি পণ্য বয়কটের আহ্বান জানিয়ে পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'আমরা করকচ্ খাইব, তবু লিভারপুলের লবণ খাইব না।'[94] পরে তাঁর আত্মজীবনী থেকেও জানা যায় কিভাবে তিনি 'জনসাধারণকে দৃঢ়সংকল্প করাইবার জন্য' নির্দেশ দিয়েছিলেন 'বিলাতী লবণ পরিত্যাগ করিয়া দেশী কালো করকচ লবণ ব্যবহার করিবে'।[95] বাংলার গ্রাম-মফঃস্বল এলাকাতে যে 'পিকেটিং উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছিল' এবং ব্যবসায়ীরা বিলাতি বিক্রয়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করলে যুবকেরা যে তাদের দোকান থেকে বিদেশি লবণ কেড়ে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছিল তা এখানে তুলে ধরেছেন; কিন্তু সস্তা লবণ ছেড়ে দরিদ্র মানুষ বেশি দামে করকচ ব্যবহার করতে পারবে কিনা সে প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ করেননি।[96] উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কুমারটুলির লবণ বিক্রেতারা চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে প্রতি ১০০ মণ করকচ লবণের দাম ৩৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫১ টাকা করেছিল। তাতে তাদের ঝুলি যেমন ভরছিল তেমনই সাধারণ মানুষের জন্য লিভারপুল লবণ ব্যবহারের চাপ বাড়ছিল বলে *বেঙ্গলি* পত্রিকা তুলে ধরেছিল।[97] দরিদ্র মানুষের কাছে সামান্য লবণের মূল্য কতটা গুরুত্ব রাখে সে প্রসঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনকারীদের চূড়ান্ত ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হয়। সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা চোখে পড়ে। যেমন, উত্তরপাড়াতে কুমার রাজেন্দ্রলাল মুখার্জি বাজারের সব লিভারপুল লবণ কিনে তা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাও আবার তাঁর শর্ত ছিল যে সেই লবণ ফুরিয়ে যাওয়ার পর কেউ যেন এক ছটাকও বিদেশি লবণ না কেনে![98]

স্বদেশি আন্দোলনের পর্ব জুড়ে সামাজিক বয়কটের পাশাপাশি বলপ্রয়োগ ও নিপীড়নের ঘটনাও সমানভাবে অব্যাহত ছিল। গরিব মানুষের কাছ থেকে লবণ কেড়ে নষ্ট করে দেওয়া, হুমকি, গালিগালাজ, মারধর করা, জরিমানা আদায় করার ঘটনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়; যদিও পূর্ববঙ্গে তার তীব্রতা বেশি ছিল। ১৯০৬ এর ডিসেম্বর মাসে খুলনার সেনহাটি বাজারের কয়েকটি দোকানে জবরদস্তি লিভারপুল লবণ নষ্ট করা

---

[93] *Sanjivani* 4 January, 1890— RNP (B) for week ending 11 January, 1897. Internet Archive

[94] কৃষ্ণকুমার মিত্রের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছিলেন, শ্রী বিধূভূষণ দত্ত, 'বিলাতী পণ্যবর্জ্জনে স্বদেশী দীক্ষা', *নব্যভারত,* (আশ্বিন, ১৩১৩), ২৯০-৩১৩।

[95] কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, (প্রবাসী প্রেস, মাঘ ১৩৪৩, ১ম সংস্করণ) ২৩৯।

[96] তদেব, ২৪৩-২৪৪।

[97] *Bengalee*, October 5, 1905— (RNP (B) for week ending 21 October, 1905), NAI.

[98] *Bengalee*, August 26, 1905 — RNP (B) for week ending 2 September, 1905. NAI.

হয়।[99] বাঁকুড়ার জমিদার রাইচরণ ধোবালের নির্দেশে তার পেয়াদারা বাজারে লোকেদের বিদেশি নুন ও কাপড় বিক্রি না করার নির্দেশ দেয়। তার কয়েকমাস আগে রাইচরণের বিরুদ্ধে এক মহিলার কাছ থেকে জোর করে বিদেশি লবণ কেড়ে নিয়ে নষ্ট করার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।[100] ১৯০৭ এর ৭ নভেম্বর হুগলিতে লিভারপুল লবণ নষ্ট করার অভিযোগ দায়ের হয়। ১৯০৮-র ২০ জানুয়ারি, দশ-বারোজন জবরদস্তি সাতবেড়িয়ার একটি দোকানে ঢুকে লিভারপুল লবণ নষ্ট করে দেয়।[101] ১৯০৭-এর অক্টোবরে, মেদিনীপুরের লালবাগে বিদেশি লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যে বোঝাই একটি গাড়িকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[102] ১৯০৭-এর জানুয়ারিতে, সোনাকান্দায় উমেশ চন্দ্র ও তার দলবল রোমান ক্যাথলিক চার্চ সংলগ্ন হাসহারা হাটে দুর্জ ভূষণ, জয় চন্দ্র বৈদ্য, সিমিয়ন এবং রোজারিও-কে লিভারপুল লবণ বিক্রিতে বাধা দেয়। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[103] ১৯০৭-এর ১০ এপ্রিল, ব্রিটিশ লবণ বিক্রি করার জন্য বৈষ্ণব চন্দ্র সাহার জরিমানা করা হয়। স্বদেশি তহবিলে সেই জরিমানা জমা দেওয়ার নির্দেশ পেয়েও সাহা কোনো অভিযোগ দায়ের করেন নি।[104] ১৯০৭-এর ২০ এপ্রিল, ইছাপুরা ও মালকাগাঁও-এর ছাত্রেরা ছোটোখাটো হিন্দু কারবারীদের বাধ্য করেছিল তাদের ১৫ ব্যাগ ব্রিস্টল লবণ নদীতে ফেলে দিতে। সেরাজুদ্দি খাঁ-র ঘাটে নৌকা থেকে নামানোর সময় এই ঘটনা ঘটেছিল। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[105] ১৯০৭-এর ২৮ এপ্রিল, কুশিয়াওয়ানাতে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোকে মিলে, যাদের মধ্যে স্কুল ছাত্রেরাও ছিল, প্রায় দশ সের লিভারপুল লবণ ছুঁড়ে নষ্ট করে ফেলে। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[106] ১৯০৭-এর ৩ মে, কাপাসিয়ার কিছু দালাল মিলে ব্রিটিশ লবণ বোঝাই নৌকা ঘাটে ভিড়তে বাধা দেয়। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[107] পাবনার মথুরা বাজারে এক ব্যবসায়ী একশ বস্তা লিভারপুল লবণ আনালেও কুলি ও গাড়োয়ানরা তা বয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। রাতে কেউ স্টিমারে উঠে দু-তিন বস্তা লবণ নদীতে ফেলে

[99] No. 36, December 1906, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[100] No. 7, Bankura, 21 January, 1909, *List of Cases of Intimidation*. NAI.

[101] No. 17, Hooghly, 20 January, 1908, Ibid.

[102] No. 62, Midnapore, 11 October, 1907, ibid.

[103] No. 14, Dacca, 12 January 1907, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[104] No. 18, Dacca, April, 1907, ibid.

[105] No. 20, Dacca, 20 April, 1907, ibid.

[106] No. 23, Dacca, 28 April, 1907, ibid.

[107] No. 24, Dacca, 3 May, 1907, ibid.

দেয় আর বাকি বস্তায় কাদা লেপে দেয়। *ডেইলি হিতবাদী* সরকারকে লবণের বস্তাগুলি নষ্ট করার জন্য আবেদন জানিয়েছিল যাতে উক্ত ব্যবসায়ী কাদা মেশানো দূষিত লবণ বাজারে বিক্রি করতে না পারেন।[108]

স্বদেশি আন্দোলনকারীদের জুলুমের প্রতিবাদে পুলিশে অভিযোগ ও আদালতে মোকদ্দমার প্রভূত নজির মেলে। পুলিশী ও আদালতের নথি থেকেই জবরদস্তি লবণ বয়কটের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ গ্রাম-মফস্বলে কিভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার ছবিটি স্পষ্ট হয়। স্বদেশি আন্দোলন দমনে সরকারের নির্দেশেই অবশ্য পুলিশের এই তৎপরতা তুঙ্গে ছিল। ১৯০৬-এর ২৬ নভেম্বর, বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার কেশগুিয়া গ্রামে অক্ষয় মণ্ডলের বাড়িতে ভেবিয়ার মহীন চন্দ্র ব্যানার্জি সহ আরো সাতজন জবরদস্তি ঢুকে পড়ে ও প্রায় ১১ আনা মূল্যের ১১ সের বিদেশি লবণ নষ্ট করে দেয়। অক্ষয় প্রতিবাদ করলে মহীনের নির্দেশে মেহের মণ্ডল ও প্রশান্ত মণ্ডল তাকে মারধর করে। মহীন ছাড়াও কেশগুিয়ার মেহের ও প্রশান্তর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলেও প্রমাণের অভাবে প্রত্যেকেই বেকসুর খালাস হয়।[109] কর্ণেলগোলার রাধানাথ দে বিদেশি লবণ বিক্রি করতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাকে বাধা দেয়। রাধানাথ তার বাধা অগ্রাহ্য করলে বিদেশি লবণ বিক্রি করলে তার খারাপ পরিণতি হবে এমন হুমকি দেওয়া উড়ো চিঠিও পেয়েছিল। ১৯০৭-এর ৫ নভেম্বর, রাত দুটোর সময় রাধানাথ দে-র দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষুদিরাম বসু সহ অন্যান্য স্বদেশিনেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার সূত্র খুঁজে পেয়েছিল।[110] খুলনার বাগেরহাটে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গজেন্দ্রনাথ সাহা লিভারপুল লবণ নষ্টের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।[111] খুলনার মহেশ্বরপাড়াতে লিভারপুল নুন মিশ্রিত মাছ নষ্ট করার অভিযোগে নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, মতিলাল প্রামাণিক, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ফটিকচন্দ্র মুখার্জি, ললিত মজুমদারের বিরুদ্ধে পরশুল্লা নিকারি অভিযোগ দায়ের করেছিল। খুলনার সোনাকাঠিতে ললিত মোহন সেনের দোকানে ঢুকে লিভারপুল লবণ কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে নষ্ট করার অভিযোগে মামলা চলেছিল বিজয় কুমার রায়, যামিনী কুমার সেন, কানাই লাল সেন, কালাচাঁদ রায়, পাঁচকড়ি রায়, ললিত মোহন দাস, জটাই মুনশি-র বিরুদ্ধে।[112] যশোরের কালিয়া বাজারে নিজের দোকানে লিভারপুল লবণ বিক্রি করার সময় তারক চন্দ্র ভৌমিককে বাধা ও হুমকি দিয়েছিলেন বসন্ত কুমার ঘোষ।

[108] *Daily Hitavadi*, April 15, 1906— RNP (B) for week ending 21 April, 1906. NAI.

[109] Direct Case No. 1164 of 1906 in *Swadeshi and Political Cases*, Home Confidential, File No. 94/1909 WBSA

[110] Midnapore P.S. [Police Station], Case No. 6, 6th Nov. 1907, ibid.

[111] Khulna, Bagerhat P.S., Case No. 30., September 1907, ibid.

[112] Ibid.

বিচারে বসন্তের এক মাসের সশ্রম কারাবাসের সাজা হয়।[113] যশোরের কোতোয়ালিতে স্থানীয় স্কুলছাত্রেরা জেলেদের লিভারপুল লবণ মেশানো মাছ বিক্রি করতে, আর জনতাকে তা কিনতে বারণ করেছিল। কিন্তু তাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ না হলে তারা জোট বেঁধে জেলেদের মারধর করে তাদের হাঁড়িভর্তি মাছ নিয়ে পালিয়ে যায়। ছাত্রদের অভিভাবকেরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মুচলেকা দেওয়ায় অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[114] যশোরের লোহাগড়াতে স্বদেশি দলের বিধুভূষণ ব্যানার্জি ও রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাজারে বিদেশি লবণ আমদানিতে আব্দুল কাদের ফকিরকে জবরদস্তি বাধা দেওয়া ও ভয় দেখানোতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।[115] ঢাকাতে বিশ্বনাথ চন্দ্রের বাড়িতে ঢুকে পরে দেশীয় লবণকে লিভারপুল লবণ ভেবে ছুঁড়ে নষ্ট করা হয়! বিশ্বনাথ প্রতিবাদ জালালে তাকে রবি পাল, হরিদাস ঘোষ মারধর করেছিল।[116] ফরিদপুরের কেশরীটোলাতে স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবকেরা এক লিভারপুল লবণ বিক্রেতাকে ডুবিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে টেনে নদী পর্যন্ত নিয়ে যায়। পরে লিভারপুল লবণের কারবার না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই বিক্রেতা রক্ষা পায় এবং পুলিশে কোনো অভিযোগ দায়ের করে নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাটের নায়েব তহশিলদারকে বরখাস্ত করেন কারণ এই ঘটনায় তাদেরও যোগসাজশ ছিল।[117] তমলুকের কাকগেছিয়াতে মদন মাইতির বিদেশি লবণের দোকান লুট করার জন্য বাবু নীলমণি দাস শর্মা-র দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বাহান্ন বছর বয়সি নীলমণিকে স্বদেশি মায়ের প্রতি মেদিনীপুরের প্রথম উৎসর্গ বলে *তমালিকা* পত্রিকা গৌরবের সাথে জানিয়েছিল।[118] সাধারণ নিম্নশ্রেণি ও নিম্নজাতিভুক্ত মানুষের অভিযোগে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ভদ্রলোকের শাস্তির নজিরও যথেষ্ট ছিল। স্বদেশির মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ভদ্রলোকের ব্যর্থতা লবণ কেন্দ্রিক এই প্রতিরোধের ঘটনাগুলিতেও পরিস্ফূট হয়।

১৯০৬-এর জানুয়ারিতে ঢাকার নরসিংডি বাজারে সাধু কুলু লিভারপুল লবণ বিক্রি করলে মোহিনী রায়, হাট মালিকের ভাই রাজকুমার চক্রবর্তী, এবং লালু বাদ্যকর তাকে নিষেধ করে। পরে তর্কাতর্কির সময়ে বাদ্যকর সাধুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং মারধর করে, এবং লবণ ছুঁড়ে ফেলে নষ্ট করে দেয়। ভারতীয়

---

[113] Jessore, Kalia P.S., Case No. 7 of July 1908. Ibid.

[114] Kotwali Police Station, Case No. 39, 30 August, 1906, ibid.

[115] Fortnightly report on the partition agitation and the boycott movement in Bengal. No. 3536 dated Calcutta, 22nd September, 1908. Home Political Proceedings, October 1908, No. 105. NAI.

[116] Serial No. 33, Dacca, 15 June 1907, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[117] Home Political Progs. A, August 1907, No. 114. NAI.

[118] *Tamalika*, November 30, 1907— (RNP (B) for week ending 7 December, 1907)

দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ৩২৩/১১৪ ধারায় রাজকুমার চক্রবর্তীর ৩০০ টাকা জরিমানা ও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অন্যদিকে লালু বাদ্যকরের ছয় সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা হয়।[119] ১৯০৬-এর ১৭ অক্টোবর, ঢাকায় প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, কালীকুমার দে সহ জনা বিশেক লোক বিষাণ নাথ চন্দের বাড়িতে বিদেশি লবণের খোঁজে জবরদস্তি ঢুকে পড়ে। তারা বিষাণ ও তার ছেলেকে ধাক্কাধাক্কি করে, লবণ জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বিচারে প্রিয়নাথ ও কালীকুমারের তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তার পাশাপাশি উভয়কেই ১০০ টাকার বন্ডের বিনিময়ে এক বছরের শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল নতুবা আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হয়েছিল।[120] ১৯০৭-এর ২৫ মে, ঢাকা থেকে ৬ মাইল দূরে পানি বাজারে স্বদেশি 'ভলান্টিয়ার'রা স্প্যানিশ লবণকে ভুল করে লিভারপুল লবণ ভেবে ছুঁড়ে নষ্ট করে দেয়। অভিযুক্তদের চিনতে না পারার দরুন কেস নথিভুক্ত করা যায় নি।[121] ১৯০৭-এর ৫ জুন, রূপগঞ্জের কিষেণগাঁও-র বাসিন্দা লাখু মণ্ডল কেন্দুয়া হাটে লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে গেলে কেন্দুয়া জমিদারির তহশিলদার জগৎ রক্ষিত সহ আরো দুজন ব্যক্তির হাতে আক্রান্ত হয়। তারা লাখুকে মারধর করে এবং লবণ কেড়ে নষ্ট করে দেয়।[122] সিধেরগঞ্জ হাটে আলাপদি ইংরেজ লবণ বিক্রি করলে জমিদারের লোকেরা তাকে নিষেধ করে। আলাপদি নিষেধ অমান্য করলে নায়েবের নির্দেশে জমিদারের লোকেরা তার লবণ কেড়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। ৪২৬ ধারায় অভিযোগের বিচার চলে।[123] ১৯০৬ এর ৩ জুন কাশীপুর হাটে রাইচরণ যুগীর ঝুপড়িতে পাঁচজন জোর করে ঢুকে পড়ে ও লিভারপুল লবণ পার্শ্বস্থ চুল্লীতে ফেলে নষ্ট করে দেয়। রাইচরণ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে হিন্দুরা তাকে সামাজিকভাবে একঘরে করার হুমকি দেয়। তবে রাইচরণের অভিযোগে অভিযুক্তদের তিনজনের তিন সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, দুইজনের একমাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়।[124] বিদেশি লবণ বয়কটে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ওপর ক্রমাগত জবরদস্তি, বলপ্রয়োগের ঘটনাগুলি স্বদেশি সমাজে শ্রেণিগত ব্যবধান বাড়িয়ে তুলেছিল, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের আবহকে জোরালো করে তুলেছিল।

---

[119] No. 1, Dacca, January 1906, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[120] No. 12, Dacca, 17 October 1906, ibid.

[121] No. 28, Dacca, 25 May 1907, ibid.

[122] No. 29, Dacca, 5 June 1907, ibid.

[123] No. 30, Dacca, June 1907, ibid.

[124] Judgement No. 14, Barisal, 19 July, 1906, Appendix A, Home Pol. A, September, 1910. No. 41-50. NAI.

নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও লবণ বয়কট

বিদেশি লবণের বয়কট ও দেশীয় করকচ লবণের ব্যবহারের প্রশ্নে স্বদেশি নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবকেরা নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের কাছ থেকে জোরালো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ভদ্রলোক নেতৃত্বের লবণ রাজনীতির বিরোধিতায় নমঃশূদ্রদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বরিশালের বিভিন্ন জায়গায় নমঃশূদ্ররা যে সস্তা করকচের বদলে বেশি দাম দিয়ে বিদেশি লবণ ব্যবহার করছিলেন তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখাতেও তুলে ধরেছিলেন।[125] স্বদেশির উত্তুঙ্গ পর্বে নমঃশূদ্ররা পূর্ববঙ্গে লিভারপুল লবণ ব্যবহার করছিলেন জেনে ব্রিটিশ সরকারের আশ্বস্ত হওয়ার নথিও মেলে।[126] অন্যদিকে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া নমঃশূদ্রদের বিদেশি লবণ ব্যবহার রোখা যায় নি। যেমন, ১৯০৯-এর ২৩ জানুয়ারি, আমগ্রাম বাজারের মালিকেরা লিভারপুল লবণের বিক্রিতে নমঃশূদ্রদের বাধা দেয় এবং তাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগও আনে। কোনো অভিযোগ হয় নি।[127] নমঃশূদ্রদের এককাট্টা মনোভাব দেখে স্বদেশি নেতৃত্ব তাদের মন জয় করার চেষ্টা করলেও তা খুব কাজে আসেনি। যেমন, ১৯০৮-এর ১৭-১৯ আগস্ট বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স-এর সভায় শ্রী চরণ সেন তাঁর বক্তৃতায় নমঃশূদ্রদের বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে সবচাইতে লড়াকু শ্রেণি বলে প্রশংসা করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে হিন্দুসমাজ যে ঐক্যবদ্ধ তা তুলে ধরতে তিনি দাবি করেছিলেন যে, নমঃশূদ্ররা লিভারপুল লবণ ব্যবহার বন্ধ করে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুদের হাতে হাত মিলিয়েছে।[128] ব্রিটিশ সরকারও সচেষ্ট ছিল যাতে নমঃশূদ্ররা স্বদেশি আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন। গোপন সরকারি প্রতিবেদন থেকেই জানা যায় যে, বাখরগঞ্জে স্বদেশ বান্ধব সমিতির তরফে নমঃশূদ্র ও সাহাদের সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। স্বদেশ বান্ধব সমিতির সদস্যরা নমঃশূদ্র সহ অন্যান্যদের দুয়ারে লিভারপুলের চেয়ে কম দামে করকচ লবণ বিক্রি করছিল। এবং তার দরুন লিভারপুল লবণের ব্যবহার সাময়িক কমেছিল।[129] কিন্তু এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লিভারপুল লবণ সহ বিদেশি পণ্য বয়কটের স্বদেশি কর্মসূচি অচিরেই গতি হারায়।

---

[125] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সদুপায় [প্রবন্ধ], *প্রবাসী,* অষ্টম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩১৫), ২২২।

[126] Fortnightly Report for the period ending 20th July 1907, in Political Proceedings A, August 1907, No. 114. NAI.

[127] No. 413, Cachar, 22 August, 1906, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[128] Home Political Proceedings A, October 1908, No. 104 [Confidential], NAI.

[129] Ibid.

স্বদেশি আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দীপনা কিছুদিন পর যে পূর্ব বাংলায় থিতিয়ে গিয়েছিল তার অন্যতম কারণ সম্ভ্রান্ত নমঃশূদ্র নেতৃত্ব ও তাদের কৃষক অনুগামীদের যোগদানে অনীহা এবং বিরোধিতা। ঔপনিবেশিক পর্বে নিম্নতর সামাজিক অবস্থানে থাকা নমঃশূদ্ররা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী গোষ্ঠী। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কৃষি সম্প্রসারণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে নমঃশূদ্রদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র সম্পন্ন গোষ্ঠী সামাজিক মর্যাদার সিঁড়িতে ওপরে উঠেছিলেন। মহাজনি কারবার, ব্যবসা অন্যান্য পেশার পাশাপাশি নমঃশূদ্রদের অনেকে লবণ উৎপাদনে নিযুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন লবণ কারবারেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই সম্পন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নেতৃত্বে নমঃশূদ্ররা সামাজিক অবদমন থেকে মুক্তির পাশাপাশি আত্মসম্মান ও সামাজিক গতিশীলতার আশা করেছিলেন।[130] নমঃশূদ্রদের গোষ্ঠীগত পরিচিতি নির্মাণের প্রক্রিয়া যে স্বদেশি আন্দোলনের পর্বেই চূড়ান্ত সংহত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, স্বদেশি কর্মসূচিতে এই সামাজিক বর্গের আশা-আকাঙ্খা পূরণের বা স্বীকৃত হওয়ার কোনো জায়গা ছিল না। স্বভাবতই ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে নমঃশূদ্ররা উচ্চবর্ণ হিন্দু এলিটদের আন্দোলন হিসেবে দেখেছিল।[131] স্বদেশি আন্দোলনের প্রারম্ভিক বছরগুলিতে নমঃশূদ্র নেতৃত্বের রাজনৈতিক অবস্থানে দুটি প্রবণতা চোখে পড়ে, প্রথমত, মুসলমানদের সাথে জোটবদ্ধতা এবং দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সহায়তার লক্ষ্যে তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার চেষ্টা।[132] যেমন, যশোর ও খুলনাতে নিচু শ্রেণির অশিক্ষিত মুসলমান ও নমঃশূদ্র একজোট হয়ে স্বদেশির বিরোধিতা করছিলেন বলে *বসুমতী* পত্রিকার সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন।[133] অবশ্য নমঃশূদ্র ও মুসলিম সম্পর্ককে একমুখীন মাত্রায় দেখা যায় না; বরং কখনো সাময়িক সংঘাত, উত্তেজনা, আবার তা থিতিয়ে গেলে দুই গোষ্ঠী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকত। তবে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যখন তারা একত্রিত হত, তখন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা দেখা যেত।[134] বিদেশি লবণ বয়কটকে কেন্দ্র করে নমঃশূদ্রদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্বদেশি আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

---

130 The Namsudras: A Socio-Economic Profile' শীর্ষক প্রথম অধ্যায় দেখুন, Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity in Colonial India, The Namasudras of Bengal 1872-1947, Richmoond: Curzon Press, 1997, 11-29.

131 'Social Mobility and Politics in the Swadeshi era', ibid., 64-98.

132 Ibid., 65.

133 *Basumati*, May 23, 1908— (RNP (B) for week ending 30 May, 1908). NAI.

134 'Social Mobility and Politics in the Swadeshi era', ibid., 64-98.

।। ৪ ।।

লবণ বয়কট ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্বদেশি আন্দোলনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবং পরিশেষে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা রূপে প্রমাণিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের স্বেচ্ছাচারী প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলাভাষী মানুষের প্রকৃত ঐক্যের নামে আন্দোলন শুরু হলেও শেষ হয়েছিল দুই যুযুধান সামাজিক-ধর্মীয় গোষ্ঠীতে। বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে আড়াআড়ি বিভাজনে বাঙালি হিন্দুও মুসলিম প্রায় সমানভাবে একে অপরের থেকে আরো দূরে সরে গিয়েছিল, এবং পারস্পরিক বৈরিতা সম্পর্কে আগের চেয়ে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিল বলেই দাবি করা হয়।[135] মুসলিমদের কাছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরে লবণ নানা প্রতীকী অর্থ বহন করত। যেমন, 'নমক হালাল' তথা নুনের (মালিকের) প্রতি আজীবন আনুগত্য বজায় রাখার পাশাপাশি ধর্মনাশের মতো সংকটে নুনের আনুগত্য ভেঙে ফেলার বিষয়টিও সহজাত ছিল [প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত]। তবে দরিদ্র মুসলিমদের জীবনে কোনোমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সংস্থানে অপরিহার্য নুনই যদি না জোটে, বা ন্যূনতম নুনের সেই সংস্থানই যদি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়, তাহলে তারা যে আনুগত্যের অঙ্গীকার ভেঙে বিক্ষোভ-প্রতিরোধে সামিল হতেন তা স্বদেশি আন্দোলনের পর্বেই স্পষ্ট হয়। স্বদেশি আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক নানা মাত্রার পাশাপাশি বিদেশি লবণের বয়কটকে কেন্দ্র করেও সামাজিক স্তরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত ব্যবধান ও বৈরিতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল; বিশেষত, যখন স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবকেরা গরিব মুসলিম দোকানদার ও ক্রেতাদের ওপর লিভারপুল লবণ বয়কট জবরদস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সস্তা বিদেশি লবণ বাদ দিয়ে গরিব মুসলিমদের বেশি দামের করকচ লবণ কিনতে ও ব্যবহার করতে স্বদেশি আন্দোলনকারীরা বাধ্য করেছিলেন। স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবকদের হুমকি ও হিংসার প্রয়োগ এবং তা রুখতে মুসলিমদের পাল্টা-হিংসার ঘটনা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান, বিদ্বেষ ও বৈরিতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। সাধারণ গরিব মানুষের জীবনে সস্তা দামে সামান্য নুনের গুরুত্ব বুঝতে উচ্চশ্রেণিভুক্ত স্বদেশি নেতৃত্ব যে ভুল করেছিলেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা যেমন জানিয়েছিল যে, হিন্দুদের আন্দোলনের জন্য গরিব

[135] See, Chapter VIII 'Hindu Muslim Relations' in Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement*, 405-464.

মুসলিমেরা দুর্দশায় পড়েছেন, কারণ তাদের লিভারপুল লবণের পরিবর্তে জেড্ডা-মাসকট থেকে কৃত্রিম করকচ লবণ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।[136]

স্বদেশি আন্দোলনের শুরু থেকেই লিভারপুল লবণের ছোটখাটো দোকানদার থেকে বড় ব্যবসায়ী-আড়তদারেরা জবরদস্তি বয়কটের শিকার হয়েছিলেন। বিদেশি লবণ বয়কটের বেশিরভাগ ঘটনাই, যথা- নুন নষ্ট করে দেওয়ার সাথে গালিগালাজ, মারধর, প্রাণহানির হুমকি ইত্যাদি, মূলত পূর্ববঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে যেমন অভিযোগ দায়ের হয়নি, তেমনই যে পরিমাণ পুলিশে অভিযোগ ও মামলা-মোকদ্দমা দায়ের হয়েছিল তার সংখ্যা খুব কম কিছু ছিল না। ১৯০৫-এর ১৯ অক্টোবর, বাখরগঞ্জের লবণ ব্যবসায়ী নাজির মোল্লা ও তার ভাইপো বাগিরেরপুর গ্রামের বাজারে আট মণ ইয়োরোপীয় নুন বিক্রির জন্য গিয়েছিল। কালু হাওলাদারের ঘাটে সাত-আটজন তাদের ঘিরে ধরে বিদেশি নুন বিক্রির জন্য অকথ্য গালিগালাজ করে; তারপর বিদেশি নুনের পোঁটলা ও দাঁড়িপাল্লা কেড়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়।[137] ভোলা-তে হিন্দু দোকানদারেরা বিদেশি লবণ বিক্রি বন্ধ করলে মুসলিম জ্ঞাতিভাইদের অনুরোধে ইয়াকুব আলি লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে শুরু করে। ১৯০৫-এর ২ ডিসেম্বর, দুই উকিল মহেন্দ্র চন্দ্র রায় এবং নবীন চন্দ্র দাস ইয়াকুবের মুখোমুখি হয়ে লিভারপুল লবণ বিক্রি বন্ধ করতে বলে। ইয়াকুব তাতে রাজি না হলে মহেন্দ্র ও নবীন ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হুমকি দেয় ও অকথ্য গালিগালাজ করে। পরের দিন স্কুলের ছাত্ররা ইয়াকুবকে হুমকি দেয় এবং সেই রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ইয়াকুবের দোকানে ভাঙচুর চালায় এবং কেরোসিন ঢেলে প্রায় পঁচিশ মণ লবণ নষ্ট করে দেয়।[138] আদালতে ইয়াকুব ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে অশ্লীল ‘তোমার সোগায় [পশ্চাদ্দেশ] বাঁশ দেবো’ এমন গালাগালির অভিযোগ তুলেছিল এবং জান মহম্মদ, ইমান আলি সহ অন্যান্য মুসলিম সাক্ষীরা তাঁর সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এই কুৎসিত গালিগালাজ যে ভদ্রলোক পরিচিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা মামলা চলাকালীন বারংবার মুসলিমদের তরফে তুলে ধরা হয়েছিল।[139] ১৯০৬-এর ২০ নভেম্বর, মুসলিম বিক্রেতা কোকরদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেন যে বাইশারী বাজারে চারজন স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবক জোর করে তার নৌকা ও বিক্রির জন্য আনা লিভারপুল লবণ কেড়ে নিয়ে যায়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১৪৩ ও ৩৭৯ ধারায়

[136] *Mihir-o-Sudhakar*, January 19, 1906— RNP (B) for week ending 27 January, 1906. NAI.

[137] No. 68, Bakarganj, 19 October 1905, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[138] No. 69, Bakarganj, 2 December 1905, ibid.

[139] Judgement No. 12, Barisal, 26 January, 1906, Appendix A, Home Political Proceedings A, September, 1910, No. 41-50. NAI.

অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।[140] ১৯০৬-এর ২৪ নভেম্বর, গৌরনদীতে দশ-বারোজন ছেলে জনৈক মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছে লিভারপুল লবণ কিনে নিয়ে তারপর ছুঁড়ে নষ্ট করে দেয়। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[141] ১৯০৭-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি, চরপালংয়ের পাঁচকড়ি শেখ পালং-মেছুয়া বাজারে কুড়ি সের লিভারপুল লবণ বিক্রির জন্য নিয়ে যায়। প্রায় দশ থেকে বারো সের বিক্রি করার পর আন্দোলনকারীরা তাকে বাজার ছাড়তে কার্যত বাধ্য করে। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[142] ১৯০৭-এর ২৯ জুন, খিলাপাড়ার মনিরুদ্দিনের ছেলেকে বাজিরহাট বাজার থেকে লিভারপুল লবণ কেনার জন্য কাশী চন্দ্র দে হুমকি দেয় ও হেনস্থা করে।[143] হরিরামপুরের ইনস্পেক্টরের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল শেখেরগ্রামের জোহারুদ্দি কারিকরের হেনস্থার কথা। জয়পুর হাটে জোহারুদ্দির লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে গেলে লালাখোলার মনমোহন গোহাদার, আনন্দি চৌকিদার, নৈমুদ্দি এবং সোহু কেমকার সেই লবণ ছুঁড়ে নষ্ট করে দেয়।[144] ১৯০৮-এর ১৩ এপ্রিল, যশোরে বিদেশি নুনের কারবারি গুলাম কেদার কাজি উড়ো চিঠিতে অগ্নিসংযোগ ও প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছিলেন।[145] ১৯০৮-এর ২৬ জুলাই, মাথাভাঙ্গার সোনাউল্লা শেখ অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, ছোঁটানিয়া গ্রামে লিভারপুল লবণ বিক্রির সময়ে শরৎ চন্দ্র, বাণী বোস, লালন দাস, হীরালাল দাস, শীতল দাস ও অন্যান্যরা এসে তার লবণ ছুঁড়ে দেয়, তারপর তাকে মারধর করে তার বটুয়া নিয়ে চলে যায়। ১৪৩, ১৪৭, ৩৭৯ ধারায় অভিযোগের বিচার হয়।[146] ১৯০৮-এর ১৯ সেপ্টেম্বর, পাবনা শহরে বশির শেখ যেহেতু লিভারপুল লবণের কারবার করত তাই স্থানীয় এক উকিল তার কেস নেওয়ার জন্য সাধারণ ফি-র চেয়ে অতিরিক্ত ১০ টাকা বেশি নিয়েছিল। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[147] ১৯০৮-এর ১২ নভেম্বর, নরসিংদি থানার মাইসুরা গ্রামের রেজর শেখ পাঁচদোনা বাজার থেকে এক সের লিভারপুল লবণ কিনে ফেরার পথে বঙ্গচন্দ্র দাস ও তার ছেলে মহেন্দ্র চন্দ্র দাসের হাতে আক্রান্ত হন। রেজরের লবণ জলাধারে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং বঙ্গচন্দ্র-র নির্দেশে রজনীকান্ত শীল

---

[140] No. 91, Bakarganj, 20 November 1906, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[141] No. 94, Bakarganj, 24 November 1906, ibid.

[142] No. 295, Faridpur, 23 February1907, ibid.

[143] No. 35, Dacca, 29 June 1907, ibid.

[144] No. 58, Dacca, 16 January, 1909, ibid.

[145] No. 33, Jessore, 13 April, 1908, *List of Cases of Intimidation*. NAI

[146] No. 379, Faridpur, 26 July, 1908, *List of Cases in Eastern Bengal and Assam*. NAI.

[147] No.534, Pabna, 19 September, 1908, ibid.

এবং ঈশ্বরচন্দ্র রাউত তাকে প্রহার করে। ৩৭৯ এবং ৩৫২ ধারায় অভিযুক্তদের বিচার হয়।[148] ১৯০৯-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি, কামিনুদ্দিন বাখরগঞ্জের আদালতে কালীনাথ রতবান্দা এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বিলাতি লবণ কেড়ে নিয়ে নষ্ট করার অভিযোগে মোকদ্দমা করে। অভিযোগ তুলে না নিলে অভিযুক্তরা তাকে পেটানোর হুমকি দেয়। কামিনুদ্দিন ৫০৬ ধারায় আর একটি অভিযোগ আদালতে দায়ের করে।[149] অন্যদিকে লিভারপুল লবণের কেনাবেচার অভিযোগে স্বদেশি মুসলিমের হাতে হিন্দুদেরও আক্রান্ত হওয়ার কিছু অভিযোগ ছিল। যেমন, ১৯০৮-এর ২রা মে পাঙ্গাসিয়ার কাশী ঘরামি সাবডিভিশনাল অফিসারের কাছে পিটিশন দায়ের করে জানায় যে, আগের দিন কাজীনাতলা বাজার থেকে লিভারপুল লবণ কিনে ফেরার পথে ফৈজুদ্দিন শেখ সহ তিনজন তাকে ঘিরে ধরে সব কেড়ে নেয়। ৩২৩, ৩২৯ ধারায় অভিযোগের বিচার হয়।[150] ১৯০৮ ডিসেম্বরে, মাহিষাল্লার বিধু মালিককে লিভারপুল লবণ বিক্রির জন্য হুমকি দিয়েছিল রোশন আলি চৌধুরি ও অন্যান্যরা।[151]

স্বদেশি হিন্দু জমিদারেরা নিজেদের এলাকাতে নায়েব-গোমস্তা-লাঠিয়াল দিয়ে মুসলিম রায়ত ও দোকানদারদের হুমকি দিয়ে ও হেনস্থা করে বিদেশি লবণ বয়কট কার্যকর করতে চেয়েছিলেন। ১৯০৬-এর ২৮ জুলাই, ভৈরবের তারা গাজি ময়মনসিংয়ের রায়পুরা বাজারে লবণ বিক্রি করতে গেলে জমিদারের নায়েব তাকে বাধা দেয় ও বাজার ছাড়তে বাধ্য করে। পুলিশে কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[152] বিভিন্ন জায়গায় স্বদেশি জমিদার ও স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবকেরা মিলে মুসলিম ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই পুরোপুরি কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। যেমন, বাখরগঞ্জে জমিদারের পেয়াদা এবং তরুণ স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবকদের গা-জোয়ারির কারণে মুসলিমরা লিভারপুল লবণের কেনা-বেচা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯০৬-এর ৪ আগস্ট, মুসলিম ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ সমবেতভাবে একটি আবেদনপত্র পেশ করে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে বিষয়টি জানান। বন্দেমাতরম ব্যাজ পরিহিত তরুণ স্বেচ্ছাসেবকেরা লাঠি হাতে বাজার ঘুরতেন এবং লিভারপুল লবণ সহ বিদেশি পণ্যের ওপর নজরদারি চালাতেন।[153] সাইজুদ্দিন ব্যাপারি বিলগু হাটে লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে গেলে স্বদেশি ভলান্টিয়াররা বাধা দেয়। পরে গয়লার শরৎচন্দ্র সেনের নির্দেশে স্বদেশি

---

[148] No. 54, Dacca, 5 December 1908, ibid.

[149] No. 176, Bakarganj, 13 February 1909, ibid.

[150] No.364, Faridpur, 2 May, 1908, ibid.

[151] No. 405, Faridpur, December, 1908, ibid.

[152] No. 211, Mymensingh, 28 July 1906, ibid.

[153] No. 79, Bakarganj, 4 August 1906, ibid.

ভলান্টিয়ার এ. সি. চক্রবর্তী ও এন. চক্রবর্তী ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে যে হাটে অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ লবণ বিক্রি না করার ফরমান জারি করে।[154] ১৯০৮-এর ১২ এপ্রিল, কামারপুর হাটের গোমস্তা লোকনাথ ভট্টাচার্য পুরোনো বিবাদের জেরে আকিলুদ্দি খানকারের ওপর হামলা চালায় ও বিলাতি লবণ ছুঁড়ে ফেলে দেয়। লোকনাথের বিরুদ্ধে আগেও জবরদস্তি বাজারে বিদেশি নুন বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ছিল।[155] কোথাও কোথাও স্বদেশি মুসলিম জমিদারেরা তাদের প্রজাদের, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে, লিভারপুল লবণ বয়কটে বাধ্য করেছিলেন। তবে এই ধরণের ঘটনা ছিল হাতে গোনা। ১৯০৬ এর ২৮শে মে, তাড়িহাটে এমনই এক ঘটনায় দুই মুসলিম জমিদার প্রায় শ'খানেক লোকের জমায়েতকে লিভারপুল লবণ না ছোঁয়ার নির্দেশ দেন। যদি প্রজারা নির্দেশ অমান্য করে তাহলে তাদের খারাপ পরিণতির হুমকি দিয়েছিলেন দুই জমিদার ।[156]

স্বদেশি জমিদার ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিম রায়ত ও ব্যবসায়ীরা পুলিশ ও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসনও আন্দোলন দমনের জন্য তৎপর ছিল এবং ব্রিটিশ লবণ বয়কটে জবরদস্তির অভিযোগ পেলে দ্রুত পদক্ষেপ নিত। এই প্রসঙ্গে *সন্ধ্যা* পত্রিকায় বাবু মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা কটাক্ষের সুরে জানিয়েছিলেন যে, আগে যেখানে ডাকাতি বা খুন হয়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরেও পুলিশের দেখা মিলত না, সেখানে স্বদেশির সময়কালে হাফ সের লবণ কিনতে কেউ বাধাপ্রাপ্ত হলে পুলিশ তড়িঘড়ি ছুটে আসত।[157] বিদেশি লবণ বয়কটে জুলুম ও শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের জরিমানা ও কারাদণ্ডের সাজা হত। মুসলিমদের অভিযোগে হিন্দু স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবক ও জমিদারের কর্মচারীরা সাজা পেতে শুরু করলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৈরিতার মনোভাব আরো বেড়েছিল তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

১৯০৬-এর ২৯ শে মে মৌজা বৈসারির বাজার মালিক প্যারীমোহন বসুর বিরুদ্ধে আমির খান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল। প্যারীমোহন আমির খানকে জবরদস্তি লিভারপুল লবণ বয়কটে বাধ্য করেছিলেন এবং তার নুন বিক্রির তিন টাকা কেড়ে নিয়েছিলেন। বিচারে প্যারীমোহনের ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে

---

[154] No. 169, Bakarganj, 9 January 1909, ibid.

[155] No.357, Faridpur, 12 April 1908, ibid.

[156] No. 72, Bakarganj, 28 May, 1905, ibid.

[157] *Sandhya*, January 25, 1906— RNP (B) for week ending 3 February, 1906. NAI.

তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা হয়েছিল।[158] ফারমান খান ও তার ভাই শানদার খান কলশকাটি হাটে পাঁচ মণ লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে যায়। তারা বাজার থেকে দূরে খালের অন্য পারে নৌকা রাখে। কিছু স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবক খবর পেয়ে খাল পেরিয়ে নৌকা টেনে এনে সমস্ত লবণ জলে ফেলে দেয়। ১৯০৭-এর ২৭ জুলাই, ফারমান অভিযোগ দায়ের করলে বিচারে ১৪৭ ও ৪২৬ ধারায় চণ্ডীচরণ দাসের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়;[159] কালীচরণ ওরফে শ্যামাকান্ত চক্রবর্তীর ছয় সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[160] ১৯০৭-এর ৪ অক্টোবর, সাতপাড়ার ললিত চক্রবর্তীর নায়েব রাজকুমার চক্রবর্তী নরসিংদি হাটে ইয়াসিন শেখকে লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে বাধা দেয়। কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নি।[161] ১৯০৮-এর ২৫ মার্চ আজিমপুরের বাসিন্দা ফেজু মেন্দিগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে ব্রজবাসী ধুপির বিরুদ্ধে প্রায় এক টাকা মূল্যের হাফ মণ লবণ চুরির অভিযোগ দায়ের করে। ৩৭৯ ধারায় অভিযুক্তের একমাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।[162] ১৯০৮-এর মার্চ মাসে, সামিরুদ্দি শেখ গঙ্গাপ্রসাদের হাটে ইয়োরোপীয় লবণ বিক্রি করলে বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারের কর্মচারিরা তাকে হেনস্থা করে লবণ কেড়ে নেয় এবং জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে। পরে কাছারিতে তাকে আটকে রাখা হয় এবং বিলাতি লবণ বিক্রি না করার প্রতিশ্রুতি দিলে ছাড়া পায়। ১৪৭ ও ৩৪২ ধারায় অভিযোগের বিচারে দোষী তিনজনের দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং মাথাপিছু ১০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়।[163] সিলেটের বলাগঞ্জে রাধামাধব সর্দারের আড়তের দুই কর্মী জনৈক মুসলিমের বিলাতি লবণ ছুঁড়ে ফেলার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস দুজনকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১৫০ টাকা জরিমানা ধার্য করেন।[164] ১৯০৮-এর ২৭ জুন, টিপ্পেরার সুলতানপুর বাজারে ইংরেজ লবণ বিক্রি করায় উমর আলি হুমকি ও হেনস্থার সম্মুখীন হন। পরে বাজার থেকে সরে এসে দূরে রাস্তায় বসে বিক্রি করলেও একই লোকেরা তাকে আবার হেনস্থা করে যায়। ১৩ ধারায় পাঁচ অভিযুক্তর ১৪ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৭ দিনের

---

158 No. 74, Bakarganj, 29 May 1906, List of Cases in Eastern Bengal and Assam. NAI.

159 No. 120, Bakarganj, 27 July 1907, ibid.

160 No. 121, Bakarganj, 27 July 1907, ibid.

161 No. 38, Dacca, 4 October 1907, ibid.

162 No. 144, 25 March 1907, ibid.

163 Judgement No. 31, 2nd April, 1908, Appendix A, Home Pol. Proceedings A, September, 1910. No. 41-50, NAI.

164 *Basumati,* May 8, 1908— RNP (B) for week ending 15 May, 1908. NAI.

সশ্রম কারাদণ্ড ধার্য হয়।[165] জনৈক আইনুদ্দিন কয়রাবাজ হাটে ব্রিটিশ লবণ বিক্রি করতে গেলে দুই-তিনজন তাকে বাধা দেয়। পরে বাজারের বাইরে এককোণে ব্রিটিশ লবণ বিক্রি করতে দেখে দুজন তার একঝুড়ি লবণ কেড়ে নদীতে ফেলে দেয়। তার ওজন বাটখারা ও নগদ কিছু টাকাও নিয়ে যায়। পরে দুই অভিযুক্তের আই.পি. সি. ৩৭৯ ধারায় এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[166] গ্রামীণ জীবনে ব্যক্তিগত বিবাদ বা শত্রুতার জের মেটাতে বিদেশি লবণ বয়কটে জবরদস্তি করা হচ্ছে এমন অভিযোগকে ঢাল করা হয়েছিল। পুলিশি তদন্তে ও আদালতের বিচারে কিছু প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। মেদিনীপুরের গেঁওখালিতে মেহের আলি যেমন শ্রীনাথ প্রামাণিক সহ সাতজনের বিরুদ্ধে দেওয়ানগঙ্গা হাটে লিভারপুল লবণ বিক্রিতে বাধা দেওয়া ও জবরদস্তি নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিল। পরে আদালতে জেরায় প্রমাণিত হয় মেহের কুখ্যাত জুয়াড়ি ও শ্রীনাথের কাছে টাকা ধার নিয়েছিল! শ্রীনাথ টাকা ফেরত চাইতে গেলে তার নামে মেহের মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করেছিল। আদালতের নির্দেশে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা রুজু হয়, অভিযুক্তরা স্বভাবতই বেকসুর খালাস হয়ে যায়।[167]

বিদেশি লবণ বয়কটে জবরদস্তির ঘটনায় স্বদেশি মুসলিমরাও অনেক জায়গায় জড়িত ছিলেন। তারা লিভারপুল লবণের কারবারি স্বজাতিভুক্ত মুসলিমদের লবণ নষ্ট করার পাশাপাশি শারীরিক নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জরিমানা ও কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করেছিলেন। ১৯০৬-এর জানুয়ারিতে ফরিদপুরের রহিম অভিযোগ করে যে, মোহর মোল্লা তাকে লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে বারণ করে, এবং তা না মানায় মোহর তাকে ছাতা-পেটা করে তাঁর দাঁড়ি-পাল্লা ও বাটখারা কেড়ে নেয়। আদালতে মোহরের ৫০ টাকা জরিমানা ও ছয় মাসের শান্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে ৩০ টাকার বণ্ড ধার্য হয়।[168] ১৯০৭-এর ১৫ জুন, ঢাকার ভাণ্ডারখোলাতে, তেলেপুর-গ্রামের কালু শেখ গদাধর এবং আব্বাস নামে দুজনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিল। তারা কালুর বিদেশি লবণ ভর্তি নৌকা জবরদস্তি আটকে রাখা এবং জমিদারের কাছারিতে নিয়ে গিয়ে তাকে পেটায় ও দশ টাকা জরিমানা আদায় করে। ৩৪০ ধারায় অভিযোগের বিচার হয়।[169] ১৯০৮-এর ২৪ নভেম্বর, ঝালাকাটি হাটে মনিরুদ্দিকে স্বদেশি সমর্থক মুসলিম

---

[165] No. 467, Tippera, 27 June, 1908, List of Cases in Eastern Bengal and Assam, NAI.

[166] No. 179, Bakarganj 10 March 1909, ibid.

[167] Gewakhali, Case No. 1 dt. 9th Sep. 1908 in Home Confidential, File No. 94/1909 (WBSA)

[168] No. 280, Faridpur, 10 March 1906, List of Cases in Eastern Bengal and Assam, NAI.

[169] No. 59, Dacca, 27 January 1907, ibid.

যুবকেরা লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে নিষেধ করে। মনিরুদ্দি তা অগ্রাহ্য করে হাট সংলগ্ন খালপাড়ে নৌকা থেকে লবণ বিক্রি লিভারপুল লবণ বিক্রি করতে থাকলে তারা নৌকায় জোর করে উঠে দুই ঝুড়ি লবণ তুলে নিয়ে যায়। তার দাঁড়িপাল্লা ও সামান্য কিছু টাকাও কেড়ে নেয়। অভিযুক্ত মূর্তালি তালুকদার ও সবদর আলি তালুকদারের ৩৭৯ ধারায় দুইমাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়। অপর দুই অভিযুক্ত সাদি এবং সেদুর ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে চৌদ্দ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ধার্য হয়।[170] রোহিতপুরে স্থানীয় বাজারে কালু শেখ-কে বিলাতি লবণ বিক্রিতে বাধা দেওয়ার জন্য জমিদারের নায়েব রামনিধি মিত্রের ৫০ টাকা জরিমানা ও পিয়ন আব্বাসের তিন সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা হয়। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা আব্বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তির মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জ্ঞানশঙ্কর বাবুর স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত দেখতে পেয়েছিল। কারণ নায়েবের নির্দেশকেই পিয়ন কার্যকর করেছিল অথচ পিয়নের কারাদণ্ড হল, নায়েব জরিমানা দিয়ে ছাড় পেয়ে গেল।[171]

স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে, ১৯০৬ সালের মে মাসে ময়মনসিং জেলার ঈশ্বরগঞ্জে, পরে ১৯০৭-এ পূর্ববঙ্গের অন্যত্র, যথা- কুমিল্লা, জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বাখরগঞ্জে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে তার দায়ভার নিয়ে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ময়মনসিংয়ের দাঙ্গায় মুসলিম কৃষকরা তাদের শ্রেণিগত বিক্ষোভের কারণে হিন্দু ভূস্বামীদের কাছারি ও মহাজনদের দোকান আক্রমণ করেছিল। স্বদেশি পর্বের দাঙ্গাকারীদের ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় এক সামাজিক গোষ্ঠী রূপে গণ্য করা হয়, যাদের শ্রেণি নির্ভর প্রতিবাদ বিশ শতকের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমশ সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় পরিণত হয়েছিল।[172] কিছু জায়গায় হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল লবণ বয়কটকে কেন্দ্র করে। *চারুমিহির* ও *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র প্রতিবেদন থেকে যেমন জানা যায় যে, ময়মনসিংয়ের ঘাটাইলে হিন্দু দোকানদারেরা শুধু করকচ লবণ বিক্রি করলে মুসলিমরা রাতে তাদের দোকান লুট করেছিল।[173] কুমিল্লাতে স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবকেরা জবরদস্তি বিদেশি লবণ বিক্রি বন্ধ করলে গোলমাল শুরু হয়। হিন্দুদের ওপর মুসলিম দুষ্কৃতীদের হামলা চালানোর অন্যতম কারণ ছিল সেটাই।[174] ব্রিটিশদের তরফে যথারীতি স্বদেশি আন্দোলনকেই মূলত দাঙ্গার জন্য দায়ী করা হয়। তাদের

---

[170] No. 162, Bakarganj, 24 November 1908, ibid.

[171] *Mihir-o-Sudhakar*, October 2, 1907— RNP (B) for week ending 5 October, 1907. NAI.

[172] Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal 1905-1947* (Oxford University Press, Delhi, 1993).

[173] *Charumihir*, October 30, 1906— RNP (B) for week ending 10 November, 1906; *Amrita Bazar Patrika*, November 14, 1906— RNP (B) for week ending 17 November, 1906. NAI.

[174] *Daily Hitavadi*, April 14, 1907— RNP (B) for week ending 27 April, 1907. NAI.

ব্যাখ্যা অনুযায়ী হিন্দু জমিদাররা বয়কট কার্যকরী করতে মুসলিম রায়ত ও দোকানদারদের ওপর জোর খাটিয়েছিলেন এবং তার পরিণামে পাল্টা হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দাঙ্গার রূপ নিয়েছিল। অন্যদিকে স্বদেশি নেতৃত্ব ও সংবাদপত্রের তরফে সরকারের প্ররোচনাকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। এই পারস্পরিক দোষারোপ যে খণ্ড সত্য তা প্রমাণিত হয় কুমিল্লার ঘটনায়। দাঙ্গার পরে কুমিল্লার মগরা বাজারে মুসলিমদের লিভারপুল লবণের দোকান পাহারা দিতে পুলিশ অফিসার লী নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। *ডেইলি হিতবাদী* তাই প্রশ্ন তুলেছিল কেন মুসলিমরা বিদেশি লবণ বিক্রিতে সাহায্য করার জন্য এত উৎসুক? তার পেছনে ব্রিটিশ সরকারের মদত রয়েছে বলেই পত্রিকাটি দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিল।[175] অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রেস বয়কটকে প্রহসন ও স্বদেশি আন্দোলনকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করেছিল। পাল্টা স্বদেশিপন্থী *মুসলমান* পত্রিকার জিজ্ঞাস্য ছিল ইয়োরোপীয় জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারিন্টেডেন্টকে কেন পিকেটিং রুখতে ও লিভারপুল লবণের হয়ে প্রচার চালাতে হচ্ছে?[176] বলাবাহুল্য, ব্রিটিশ মদতের বিষয়টি অমূলক ছিল না। পূর্ববঙ্গে বিলাতি লবণ বয়কট জোরালো হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার পাল্টা সক্রিয়তা দেখিয়েছিল। যেমন, বরিশালে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিস চত্বরে সরকারের অনুমোদনে বিদেশি লবণ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[177] মাদারিপুরে লবণ বিক্রেতারা লিভারপুল লবণের কারবার বন্ধ করলে সাব-ডিভিশনাল অফিসার মি. ব্রিসকো তাদের ব্যবসার লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দেন। এক ডিলারের লাইসেন্স বাতিলের জন্য বোর্ড অফ রেভেনিউকে চিঠি লেখেন।[178] ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মি. বোথামের বিরুদ্ধেও লিভারপুল লবণের প্রচার করার পাশাপাশি দেশীয় লবণের কারবারিদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।[179] *মিহির ও সুধাকর, ইসলাম প্রচারকের* মতো স্বদেশি বিরোধী পত্রিকাগুলিও এই সময় একযোগে পাল্টা প্রচার চালিয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের নামে হিন্দু জমিদার ও সুদখোর মহাজন, হিন্দু উকিল মোক্তার ও হিন্দু পুলিশ সকলে যে একযোগে 'মুসলমান দলনের', মুসলিম ব্যবসায়ীদের সর্বস্বান্ত করতে এবং গরিব মুসলিমদের 'পকেট খালি করিবার' পন্থায় লিপ্ত এমন প্রচারই করেছিল *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকা। গরিব মুসলমান চাষীদের বেশি দামে করকচ লবণ কিনতে বাধ্য করা

---

[175] *Daily Hitavadi*, April 3, 1907— RNP (B) for week ending 13 April, 1907. NAI.

[176] *Mussalman*, August 16, 1907— RNP (B) for week ending 24 August, 1907. NAI.

[177] *Hitavarta*, September 16, 1905— RNP (B) for week ending 22 September, 1905. NAI.

[178] *Bengalee*, December 27, 1905— RNP (B) for week ending 30 December, 1905. NAI.

[179] *Indian Mirror*, December 27, 1905— RNP (B) for week ending 30 December, 1905. NAI.

হয়েছিল বলেই এই সাময়িক পত্র অভিযোগ করেছিল।[180] "এতদিন ঘৃনার সহিত "নেড়ে চাচা" বলিতে; আজ স্নেহভরে "কনিষ্ঠভাই" বলিতেছ, এ ভাব কয়দিন থাকিবে"— স্বদেশি আন্দোলন প্রসঙ্গে এমনই সংশয় ছিল ইসলাম প্রচারকের।[181]

স্বদেশি আন্দোলনের হিন্দু চরিত্র এবং বয়কটকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন দেখে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। ১৯০৫-এ আন্দোলনের সূচনায় তিনি পুরোভাগে থাকলেও খুব দ্রুত তাঁর মোহভঙ্গ হয়। আন্দোলন চলাকালীন 'সদুপায়', 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এর মতো প্রবন্ধে (পরে 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে'-র মতো উপন্যাসেও) হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি প্রসঙ্গে কঠোর সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিদেশি লবণ বয়কটকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের ওপর জবরদস্তি ও নিপীড়নের ঘটনাগুলি যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে তিক্ত করেছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব আরো বাড়িয়েছিল— তা দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি তুলে ধরেছিলেন। 'সদুপায়' প্রবন্ধে যেমন জানিয়েছিলেন যে, বরিশালে করকচ লবণ সস্তা হলেও মুসলিমরা জেদ করে বিলাতি লবণ খাচ্ছিলেন। 'বিলাতী লবণ' সহ ব্রিটিশ দ্রব্যের বয়কটকে যেকোনো মূল্যে কার্যকর করতে গিয়ে 'সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা সুবিধা অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া' এবং 'ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার' ধৈর্য স্বদেশি নেতৃত্ব রাখতে পারেননি।[182] শুধু ব্রিটিশদের দোষারোপ নয়, তার থেকেও বেশি জরুরি যে সমাজের অন্দরে বৈষম্য-শোষণ-অবজ্ঞা জনিত ভেদাভেদ সম্পর্কে সচেতনতা এবং অন্তরের শুশ্রূষা— তা স্বদেশবাসীর সচেতনার্থে 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এর মতো প্রবন্ধে তুলে ধরেছিলেন। অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সামাজিক ব্যবধান যে ক্রমশ গভীরতর হয়েছিল, লবণকে কেন্দ্র করেই তা আবারো লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩০-এ গান্ধীর লবণ আইন অমান্যের আহ্বানে বাংলা সহ দেশজুড়ে মুসলিম সমাজের বৃহৎ অংশ সাড়া দেয়নি। গরিব মুসলমানেরাও করভার জনিত লবণ বঞ্চনার কারণে শোচনীয় দুর্দশার সম্মুখীন— সেই বাস্তবতা তুলে ধরে গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহে মুসলিমদের সমর্থনের আবেদন

[180] বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন, *ইসলাম প্রচারক*, ভাদ্র ১৩১২, ১৯৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

[181] তদেব, আশ্বিন ১৩১২, ২৪৪।

[182] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সদুপায় [প্রবন্ধ], *প্রবাসী*, অষ্টম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩১৫), ২২২।

জানিয়েছিলেন।[183] হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লবণ তৈরি করার আবেদন জানালেও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কার্যত তা বিফল হয়েছিল।[184]

।। ৫।।

দেশীয় লবণ উৎপাদনের প্রসঙ্গ ও স্বদেশি নেতৃত্বের নীরবতা

স্বদেশি নেতৃত্ব দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিদেশি লিভারপুল লবণ বয়কট ও তার পরিপূরক রূপে দেশীয় করকচ লবণ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে বিদেশি লিভারপুল পাঙ্গার পরিপূরক হিসেবে বাংলার বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূলে লবণ উৎপাদনের কোনো উদ্যোগ বা কর্মসূচি গৃহীত হয়নি। অথচ স্বদেশি শিল্পোদ্যোগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সংগঠন। তাহলে লবণের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম কেন হয়েছিল? প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব থেকেই দেশীয় লবণ শিল্পের সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ ঐতিহ্য, কোম্পানি রাজের একচেটিয়া লবণ বাণিজ্যিক অধিকার, পরে ব্রিটিশ রাজের সূচনায় তার বিলুপ্তির কাহিনি তো স্বদেশি নেতৃত্বের অজানা ছিল না! মাত্র কয়েক দশক আগেই কিভাবে সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণে অনৈতিক ও জবরদস্তিমূলক ঔপনিবেশিক নীতি প্রণয়ণের মাধ্যমে দেশীয় লবণশিল্পের বিলোপ ঘটানো হয়েছিল— তার জোরালো সমালোচনাই বরং স্বদেশি বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের বক্তৃতায়, লেখনীতে, সংবাদপত্রের প্রচারে বারংবার উঠে এসেছিল। 'শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ভিন্ন' বাঙালির যে 'আর গত্যন্তর নাই' তা জানিয়ে ফরিদপুরের এক স্বদেশি নেতা তাঁর বক্তৃতায় যেমন আক্ষেপ করেছিলেন, '২০ বৎসর হইল, লবণের কারবার মাটি হইয়াছে'।[185] *অমৃত বাজার পত্রিকা* এক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছিল কিভাবে বাংলার দেশীয় লবণ শিল্পকে ব্রিটিশরা হিংসাত্মক উপায়ে শ্বাসরোধ করেছিল। বাংলার লক্ষ লক্ষ জনতা বংশপরম্পরায় যে কাজ করে আসছিল সহসা তাদের সেই রুজি রুটি ছিনিয়ে নিয়ে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত

---

183 Speech at Broach, March 26, 1930 in *CWMG*, Vol. XLVIII (New Delhi, Publications Division Government of India, 1999), 477-480.

184 লবণ তৈরির জন্য হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একাধিক আবেদনের অন্যতম উদাহরণ: Speech at Rayma, March 28, 1930, *CWMG*, ibid, 494-495; ১৯৩০-এ হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে এম. এ. আনসারি 'Lowest Water-mark reached in Hindu-Muslim Unity' অভিহিত করে গান্ধীকেই চিঠি লিখেছিলেন: Letter from Dr. Ansari to Gandhi, February 13, 1930, *CWMG*, ibid, 524-528.

185 ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র, ফরিদপুর জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা, *নব্যভারত*, পঞ্চবিংশ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা (চৈত্র, ১৩১৪), ৬২৯।

হয়েছিল।[186] কলিকাতার পাশাপাশি মফস্বলের পত্র-পত্রিকায়ও একই সুরের সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রোপকূলবর্তী কাঁথির *নীহার* পত্রিকা সখেদে জানিয়েছিল যে, মানুষ ট্যাক্সের ভারে ভূপতিত; অথচ লবণ যোগানের উৎসের সবচেয়ে কাছাকাছি থেকেও তার জন্য বিদেশিদের প্রচুর টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে; এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে![187]

ঔপনিবেশিক লবণ নীতির বৈষম্যমূলক পরিণাম সম্পর্কে এই প্রচারের পাশাপাশি আন্দোলন চলাকালীন ‘স্বদেশি লবণ’ বলতে ঠিক কি বোঝায়, বিশেষত বহির্ভারত থেকে বাংলায় আমদানি হওয়া করকচ লবণকে স্বদেশি বলা যায় কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন ও সমালোচনা অব্যাহত ছিল। স্বদেশি ও বয়কটের কট্টর সমালোচক *ইসলাম প্রচারক* যেমন আন্দোলনকারীদের তীব্র কটাক্ষ করে লিখেছিল, “স্বদেশি লবণ খাইব, এবং হনুমানের মতো দগ্ধ করিব! চুপ! চুপ! তুই স্বদেশি লবণ পাবি কিনা, তাই দেখ! তা নয়, বিদেশি করকচ লবণ স্বদেশি বলিয়া ভক্ষণ করিতেছে! হাসিব কত!!”[188] স্বদেশি আন্দোলনের সূচনায় *ইসলাম প্রচারক*-এর এই লবণ সমালোচনা শুধু বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ও মুসলিম স্বার্থরক্ষায় পক্ষপাতজনিত কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া ছিল না। আন্দোলন শুরু হওয়ার এক বছর আগেই *মহাজন বন্ধু* পত্রিকাও অনুরূপ ব্যঙ্গের সুরে লিখেছিল— ‘তোমরা আর একটা যে ধূয়া ধরিয়াছ, দেশি জিনিস ব্যবহার করিয়া দেশোদ্ধার করিবে। শুনিলে হাসি পায়। বাঙ্গালীর একথা বলিবার সময় এখনও হয় নাই! গঙ্গাজলে লবণ করিবার অধিকার তোমাদের আছে কি? তবে কোন্ লবণ ব্যবহার করিবে?’[189] স্বদেশি পর্বে দেশীয় লবণ উৎপাদনের দাবিতে বণিক স্বার্থরক্ষায় প্রকাশিত *মহাজন বন্ধু* ধারাবাহিকভাবে সরব হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে লিভারপুল পাঙ্গার স্বদেশি পরিপূরক রূপে যখন করকচ ব্যবহারের প্রস্তাব হয়েছিল তখন *মহাজন বন্ধু* পত্রিকা সেই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। পাঙ্গা লবণের কারবারি দেশীয় ব্যবসায়ীরা এতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্বদেশির বছরগুলিতে ব্রিটিশ তথা বিদেশি পাঙ্গা লবণের চাহিদা কমার পাশাপাশি মাদ্রাজ ও ভারতের বাইরে থেকে করকচ আমদানির পরিমাণ

---

[186] *Amrita Bazar Patrika*, August 12, 1907— RNP (B) for week ending 17 August, 1907. NAI.

[187] *Nihar*, February 26, 1907— RNP (B) for week ending 9 March, 1907. NAI.

[188] বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশি আন্দোলন, *ইসলাম প্রচারক*, (অগ্রহায়ণ ১৩১২), ৩১৩।

[189] বাবু ব্যবসাদার, *মহাজন বন্ধু*, ৪র্থ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, (আষাঢ়, ১৩১১) ১০৯।

উত্তরোত্তর বেড়েছিল।[190] এই পরিস্থিতিতে দেশীয় লবণ ব্যবসায়ীদের লোকসানের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র বিকল্প ছিল বাংলায় পাঙ্গা লবণের উৎপাদন তথা সেই শিল্পের পুনরুজ্জীবন। মূলত এই কারণেই *মহাজন-বন্ধুর* সমালোচনায় করকচ লবণের তীব্র বিরোধিতা ও দেশীয় লবণ উৎপাদনের দাবি উঠে এসেছিল। পত্রিকাটি শ্লেষের সুরে জানিয়েছিল যে, যথার্থ স্বদেশি লবণ চাইলে স্বদেশীয়দের হয় লবণবিহীন আহারে অভ্যস্ত হতে হবে নতুবা দেশীয় লবণ আগের মতোই প্রস্তুত করতে হবে। লিভারপুল লবণ বয়কট ও করকচ ব্যবহারের জন্য স্বদেশি নেতৃত্ব আবেদন জানালে তাদের 'বাবু ব্যবসাদার' বলে ঠেস দিয়ে এই পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "[...] বিলাতী শিল্প যে তোমাদের হাড়ে হাড়ে, রক্ত-মাংসে বিঁধিয়া গিয়াছে। এ সকল পরিত্যাগ করিবে কি করিয়া? উলঙ্গ হইয়া মাটির বাসনে কেবল চাউল ভাত রাঁধিয়া খাও, তাহাতে লবণ দিও না, তাহা হইলে তোমার দেশি জিনিস ব্যবহার করা হইবে।"[191] বঙ্গীয় জনরুচিতে করকচ ও পাঙ্গা লবণের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা তুলে ধরে *মহাজন বন্ধু*-এই প্রতিবেদনে জানিয়েছিল যে, বাংলা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঙ্গা লবণ উৎপাদন ও পরিশোধনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে পত্রিকাটি বিভিন্ন সংখ্যায় একাধিকবার এই দাবি তুলে ধরেছিল। যথার্থ স্বদেশির সূচনা যে দেশীয় নুন সহযোগে হতে পারে সেই আবেদনও পত্রিকাটি জানিয়েছিল: "স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিতে চাও, বাপু! আমি করজোড়ে বলি, দোহাই বাপধনেরা! নুনটা অগ্রে ধর। কথায় বলে 'নুন না খেলে গুণ গাওয়া যায় না'। দেশি নুন খাও, তবে ত দেশের গুণ গাবে।"[192] স্বদেশি শিল্পোদ্যোগের সীমাবদ্ধতা, বিশেষত দেশীয় লবণ উৎপাদন অগ্রাধিকার না পাওয়ার কারণে স্বভাবতই এই বণিক স্বার্থবাহী পত্রিকা আশাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দেশীয় লবণ উৎপাদনের হৃত অধিকার ফিরে পেতে স্বদেশি ভদ্রলোক নেতৃত্বকে ঔপনিবেশিক শাসকের সাথে বোঝাপড়ার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিল— 'লবণ সম্বন্ধে রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্বে যেমন লবণ বঙ্গে হইত, আবার সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর। বিদেশি লবণ করকচ বলিয়া খাইয়া, আর শত্রুর মুখ হাসাইও না। খাসা স্বদেশি লবণ চিনিয়া খাইতেছ!! এজন্য আর কত হাসিব?'[193] 'বঙ্গে লবণের কারখানা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেশীয় পদ্ধতিতে পূর্বে কিভাবে লবণ

---

[190] অধ্যাপক সরকার এই পরিসংখ্যান দিয়েছেন, যদিও পাঙ্গা ও করকচ লবণের প্রভেদ উল্লেখ করেননি। Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement*, 141.

[191] 'বাবু ব্যবসাদার', তদেব।

[192] 'প্রসঙ্গ বাবু ব্যবসাদার', *মহাজন বন্ধু*, ৪র্থ খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ, ১৩১১), ১৫৪।

[193] 'তিনটী কথা ঘোষণা কর!' *মহাজন বন্ধু*, ৫ম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ, ১৩১১), ১৮৮।

উৎপাদন হত তার বিস্তারিত বর্ণনা *মহাজন-বন্ধু* তুলে ধরেছিল। পত্রিকাটি দেশের মানুষকে আবেদন করেছিল- ‘বঙ্গবাসী! নুনের কারখানা করিবার জন্য চেষ্টা কর, সত্য সত্য স্বদেশি লবণ তাহা হইলে খাওয়া হইবে’।[194]

বিদেশি লবণ বয়কটের যথার্থ পরিপূরক যে বাংলায় দেশীয় পাঙ্গা লবণের উৎপাদন, মাদ্রাজ বা বহির্ভারতের করকচ নয়— স্বদেশি পর্বে সেই দাবি ধারাবাহিকভাবে উঠে এসেছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতায় যখন স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার ও স্বদেশি শিল্পোদ্যোগের পরিকল্পনা হয়েছিল তখন থেকেই দেশীয় লবণ উৎপাদন তথা এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের দাবি জোরালো হয়েছিল। *ডেইলি হিতবাদী* পত্রিকা দি ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স, দি ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও দি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সহ বাংলার বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানিয়েছিল, যাতে তারা একজোট হয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে দেশে পুনরায় লবণ উৎপাদন শুরু করে। এমনকি, লবণ উৎপাদনের জন্য পূর্ববঙ্গের ফেজারগঞ্জ উপযুক্ত বলে পত্রিকাটি প্রস্তাব দিয়েছিল।[195] দেশীয় লবণ উৎপাদনের এহেন প্রস্তাবে স্বদেশি নেতৃত্ব ও সংগঠনগুলি যে স্পষ্টতই নীরব ও নিস্পৃহ ছিলেন তা সাময়িকপত্রগুলির সমালোচনায় স্পষ্ট। অথচ স্বদেশি আন্দোলনের দুই দশক পরেই, ১৯৩০-এ সারা ভারত তীব্রভাবে আন্দোলিত হয়েছিল আইন অমান্য করে দেশীয় লবণ উৎপাদনের জন্য। গান্ধীর সত্যাগ্রহের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবৈধ বা বেআইনি লবণ উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তা স্বদেশি লবণ তথা স্বরাজের প্রতীক বলে গণ্য করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে লবণের স্বদেশি রূপান্তরের ইতিহাস এই প্রেক্ষিতে স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিতবাহী। সময়ান্তরে এই বৈপরীত্যের প্রেক্ষিতেই দেশীয় লবণ উৎপাদনে স্বদেশি নেতৃত্বের অনীহা তথা নীরবতার দিকটি তাই আরো ভাবিয়ে তোলে। অধ্যায়ের শেষাংশে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সম্ভাব্য সূত্র সংক্ষেপে নির্দেশিত হল।

প্রথমত, আন্দোলনের পথে হেঁটে দেশীয় লবণ উৎপাদন করতে হলে স্বদেশি নেতৃত্বকে প্রত্যন্ত উপকূলীয় গ্রামে গিয়ে কৃষক-জনতাকে সংগঠিত করতে হত; প্রকাশ্যে আইন অমান্য ও শাস্তিবরণের মাধ্যমে লবণ উৎপাদনের জন্য তাদের সম্মত করতে হত। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলন মুখ্যত ছিল এক শহরকেন্দ্রিক আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকগোষ্ঠী। স্বদেশি ভদ্রলোক নেতৃত্বের

---

194 *মহাজন বন্ধু,* ৫ম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা, (ফাল্গুন, ১৩১২), ২৮৫-২৮৬।

195 *Daily Hitavadai*, February 9, 1906— (RNP (B) for week ending 17 February, 1906) NAI.

শহরকেন্দ্রিকতা ও গ্রামীণ জীবনের সাথে সংযোগহীনতার প্রেক্ষিতেই দেশীয় লবণ উৎপাদনের বিষয়টি যে তাদের কাছে গ্রহণীয় হয় নি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে স্বদেশি বুদ্ধিজীবীদেরই একাংশ সরব হয়েছিলেন। কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তর 'সহরে নেতা ও গাঁয়ে চাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিভাজন প্রসঙ্গে সমালোচনা আগেই তুলে ধরা হয়েছে। শহরের নেতারা যে স্বদেশি আন্দোলনের আগে গ্রামের থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন তা তাঁর সমালোচনায় স্পষ্ট।'[196] অন্যদিকে *নব্যভারত* পত্রিকার সম্পাদকীয় বয়ান অনুযায়ী গ্রামীণ নিম্নশ্রেণির মানুষ যেন স্বদেশি ভদ্রলোক নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল- "আমরা তোমাদের কথা শুনিব কেন? তোমরা আমাদের শিক্ষার জন্য, নানা অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছ? তোমরা আমাদের কে যে, আমরা সস্তার জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দুর্মূল্য জিনিস কিনিব?"[197]

দ্বিতীয়ত, স্বদেশি পর্বে ভদ্রলোক ও কৃষকের এই শ্রেণিগত দূরত্ব বিভিন্ন সমিতিগুলির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, যেগুলি গ্রাম-মফস্বলে আন্দোলনের সংগঠন ও বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সমিতি আন্দোলন হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সব শ্রেণিকে ছুঁলেও সেই সীমানার বাইরে যে তেমন যেতে পারে নি; বিশেষত, সমিতি আন্দোলনে কর্মী হিসাবে কৃষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[198] অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি ব্যতীত অন্য স্বদেশি সমিতিতে মুসলিমদের উপস্থিতি প্রায় চোখে পড়ে না। সর্বোপরি, সমিতি আন্দোলনের অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিল কেন্দ্রীয় সমন্বয় বা কার্যকরী পরিকল্পনার অভাব।[199] সুতরাং এই পর্বে [সুরাট অধিবেশনে] বিভাজিত দুর্বল কংগ্রেসের পাশাপাশি স্বদেশি সমিতিগুলির সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা যে দেশীয় লবণ উৎপাদনের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হয়ে উঠত তা নিয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই। বস্তুত এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেই, ১৯৩০-এ বাংলায় লবণ সত্যাগ্রহের গণ আন্দোলনকে সফল করে তুলতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের পাশাপাশি, গান্ধীয় গ্রামীণ পুনর্গঠনের ভাবনায় গড়ে ওঠা খাদি প্রতিষ্ঠান (সোদপুর), অভয় আশ্রম (কুমিল্লা) সহ

---

196 শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত, 'সহরে নেতা ও গাঁয়ে চাষা', ১৬২-১৬৩।

197 'বিদেশি-বর্জ্জন ও স্বদেশি-গ্রহণ' [সম্পাদকীয়], *নব্যভারত*, চতুর্বিংশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, (আষাঢ়, ১৩১৩), ১৪৩।

198 Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement*, 359. অনুরূপ অভিমত রয়েছে, Rajat Roy, *Social Conflict and Political unrest In Bengal: 1875-1925* (Delhi: Oxford University Press, 1984), 162.

199 Sumit Sarkar, Ibid., 360.

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯২০-র দশক থেকে গ্রামীণ পরিসরে খাদি, চরকা, বুনিয়াদি শিক্ষা সহ নানান গঠনমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষক-জনতার কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল।[200]

তৃতীয়ত, লিভারপুল লবণ সহ ব্রিটিশ পণ্যের ব্যবহার রোখার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সম্মত করতে স্বদেশি নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবকেরা যেখানেই ব্যর্থ হয়েছিলেন সেখানেই জবরদস্তি-বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বয়কট কর্মসূচিকে সফল করে তোলার দিকে ঝুঁকেছিলেন। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সামান্য নুনের প্রয়োজনীয়তা ও তার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বুঝতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে লিখেছিলেন:

"আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া, বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার-সাধনের কাছে আর-কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে-হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণির প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।"[201]

বিদেশি লবণ বয়কট জবরদস্তি নিপীড়নমূলক রূপ পরিগ্রহ করায় মুসলমান, নমঃশূদ্র সহ নিম্নবর্ণীয় মানুষ যে স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধী হয়ে পড়েন তা এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শ্রেণি-জাতপাত-সম্প্রদায়গত এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেশীয় লবণ উৎপাদনে সর্বস্তরের মানুষকে সম্মত করা স্বদেশি নেতৃত্বের আয়ত্তের বাইরে ছিল। যে কারণে শুধু স্বদেশি আন্দোলনই নয়, পরবর্তীকালে বাংলায় লবণ আইন অমান্য সহ বিবিধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকেও মুসলিম এবং নমঃশূদ্ররা নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন।[202] জাতপাত-সম্প্রদায়গত মাত্রার পাশাপাশি স্বদেশি নেতৃত্বের আহ্বানে জেল-জরিমানা-নিপীড়ন সহ্য করে প্রকাশ্যে

---

[200] Mario Prayer, *The Gandhians of Bengal: Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942* (Roma: Istituti Editoriali E Poligrafici Internazionali, 2001).

[201] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সদুপায়, *প্রবাসী*, ২২২।

[202] Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal 1872-1947* (Richmond: Curzon Press, 1997), 152-153.

দেশীয় লবণ উৎপাদনে সাধারণ জনতা কতটা সাড়া দিতেন না তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের দ্ব্যর্থহীন মন্তব্যে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়, 'কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, *যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না* [নজরটান সংযোজিত]।'[203]

চতুর্থত, স্বদেশি আন্দোলন পর্বে লবণ উৎপাদনের কার্যকলাপ ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ; *মহাজন-বন্ধু*-র কথায়, 'এক্ষণে বঙ্গে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এক তিল লবণ প্রস্তুত করিলে তাহাকে জেলে যাইতে হইবে।'[204] লবণ উৎপাদনের বিষয়টি যেহেতু দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ ছিল সে কারণেই কি বাঙালি ভদ্রলোক আইনি গেরো তথা 'অপরাধী' পরিচিতি থেকে দূরত্ব তৈরি করতে চেয়েছিলেন— সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরী। সেক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আইন ও দণ্ডবিধানের প্রতিষ্ঠান, বিশেষত ফৌজদারি আদালত ও কারাগার সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারণা কি ছিল তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক সরকার ফৌজদারি আদালত ও কারাগারের মাধ্যমে বাংলা প্রেসিডেন্সি'র (প্রদেশের) অপরাধীদের যে শ্রেণিবিভাগ করেছিল, তা উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যবর্তী বিভাজন রেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।[205] অপরাধীদের এই শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক ধারণা ও বিবরণের উপর ভিত্তি করে বাঙালি ভদ্রলোক মানসে তার নিজস্ব এক 'non-criminal' বা অনপরাধী সত্তা নির্মিত হয়েছিল। ভদ্রলোকের এই নিজস্ব অনপরাধী সত্তার নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল এক অপরায়ন (otherization)-এর মধ্য দিয়ে, যখন অপরাধী পরিচিতি সামাজিক নিম্ন স্তরে 'ছোটলোক'-দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে

---

203 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সদুপায়, *প্রবাসী,* ২২৩।

204 *মহাজন বন্ধু,* ৫ম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা, (ফাল্গুন, ১৩১২), ২৮৪।

205 See Chapter 2 'The Official Discourse: Creation of Categories' in Anindita Mukhopadhyay, *Legal and penal Institutions Within a Middle-Class Perspective in Colonial Bengal: 1854-1910* (Ph.D. Thesis, SOAS, London,1996). Available at: https://eprints.soas.ac.uk/28506/1/10672665.pdf [accessed on 12.05.2024]

‘ভদ্রলোক’রা ফৌজদারি আদালত ও কারাগারগুলিকে সাধারণত ‘ছোটলোক’-দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন মানসিক ধারণা গড়ে তুলেছিলেন।[206]

এই ভাবনার নিরিখে দেখলে, ঔপনিবেশিক পর্বে লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত মলঙ্গিরা ছিলেন দরিদ্র নিম্নবর্ণীয় কৃষিজীবী মানুষ যাদের সাথে ভদ্রলোকদের স্বভাবতই শ্রেণিগত ও মানসিক দুস্তর ব্যবধান ছিল। ব্রিটিশ রাজের পর্বে দেশীয় নুন উৎপাদন নিষিদ্ধ হওয়ায় এই মানুষেরাই রুজি-রুটি হারান, সেইসাথে পেশাগত ‘মলঙ্গি’ পরিচিতির বৈধতা হারিয়ে প্রান্তিকীকৃত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে স্বদেশি আন্দোলনের পর্ব জুড়ে এই ভূতপূর্ব মলঙ্গিদের অনেকেই নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে কার্যত বাধ্য হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলে চোরাগুপ্তা অবৈধ নুন উৎপাদনে লিপ্ত হয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক আইনে ‘অপরাধী’ বলে পরিগণিত এই লবণ উৎপাদকেরা চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন [দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত]। স্বদেশি আন্দোলনের এক দশক আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে সখেদে লিখেছিলেন- “কেহ কেহ হয়তো লুকাইয়া এক-আধ বিন্দু লবণ তৈয়ারি করিতে যায়; কিন্তু সে পাপের কী প্রচন্ড শাস্তি তাহা প্রতিদিনের পুলিস রিটার্ন ও ফৌজদারি রিপোর্টেই প্রকাশ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি মহাশয় স্বদেশিয় ইতর সাধারণের একটা সন্তোষের কারণ?”[207] রুজি-রুটি হারানো মলঙ্গিদের প্রতি বাঙালি ভদ্রলোকের সহানুভূতি থাকলেও তাদের দৃষ্টিতে আইন ভঙ্গকারী লবণ উৎপাদকেরা যে হীনতর প্রতিপন্ন হতেন তা এখানে ‘স্বদেশিয় ইতর সাধারণ’ শব্দপ্রয়োগে স্পষ্ট।

স্বদেশি পর্বে ভদ্রলোক নেতৃত্ব দেশীয় লবণ উৎপাদন প্রসঙ্গে নিস্পৃহ, নীরব থাকলেও উপকূলবর্তী মানুষ যে আইন ভঙ্গ করে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছিলেন তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে। *মহাজন-বন্ধু* যেমন লিখেছিল যে, যাবতীয় শাস্তিভোগ, কড়াকড়ি সত্ত্বেও ‘তবু মাঝে মাঝে শুনা যায়, কলিকাতার দক্ষিণ দিকের উমুক দরিদ্র প্রজা লবণ প্রস্তুত করিয়াছিল, জেলে গেল।’[208] *যুগান্তর* পত্রিকার মতে, বাংলার সমুদ্র তীরে চাইলে যেকোনো পরিমাণে নুন উৎপাদন করা যেতে পারে। তাহলে কেন সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দারা প্রত্যেক দিন লবণ

---

206 See Chapter 3 ‘The Middle-Class Discourse, 1854-1880’, in Ibid.

207 ১৮৯৪ এ ভাইসরয় লর্ড এলগিন(দ্বিতীয়)-এর সময়ে প্রণীত কটন ডিউটিস অ্যাক্ট এর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আবদারের আইন’ নামক প্রবন্ধটি লেখেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর বৈদ্যুতিন সংস্করণ দেখুন, পরিশিষ্ট -আবদারের আইন- ৩ | *রবীন্দ্র রচনাবলী* (nltr.org) (https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15973 [last accessed on 21.12.2023]

208 তদেব।

তৈরি করতে গিয়ে গ্রেফতার ও শাস্তি পাচ্ছেন— পত্রিকাটি সেই প্রশ্ন তুলেছিল।[209] ভদ্রলোকদের পাশাপাশি স্বদেশি জমিদারেরাও, যারা নিজেদের জমিদারিতে বিদেশি লিভারপুল লবণের বয়কট কার্যকরী করেছিলেন তাঁরাও অপরাধমূলক দেশীয় লবণ উৎপাদনের ফৌজদারি ঝঞ্ঝাটে জড়াতে রাজি ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে *মহাজন-বন্ধু* পত্রিকা যেমন লিখেছিল, '[...] কেহ লুকাইয়া লবণ করিলে তাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। আবার যে জমিদারের প্রজা দণ্ডভোগ করে, সেই প্রজা অপেক্ষা জমিদারের শাস্তি অধিক। কেন না, তোমার প্রজা ইহা করিতেছে, তুমি ইহার সংবাদ রাখ না কেন?'[210]

দেশীয় লবণ উৎপাদনে স্বদেশি নেতৃত্ব কেন নীরব, নিস্পৃহ ছিলেন তা উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়। দেশীয় লবণ উৎপাদন যেহেতু ফৌজদারি অপরাধ ছিল এবং সেই অপরাধের জন্য নিম্নবর্ণীয় প্রান্তীয় মানুষ 'অপরাধী' হিসেবে জেলবন্দী হয়েছিলেন, স্বভাবতই উচ্চবর্ণীয় স্বদেশি ভদ্রলোক নেতৃত্ব ও জমিদারেরা তার থেকে দূরত্ব রচনা করেছিলেন। ভদ্রলোক নেতৃত্ব নিজেদের 'অনপরাধী' ভাবমূর্তির সচেতনতায় এবং শ্রেণিগত ব্যবধানের দরুন লবণ উৎপাদনের ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত করে আইনের চোখে নিম্নবর্ণীয় অপরাধীদের সমগোত্রীয় গণ্য হয়ে কারাবন্দী হতে চান নি বলেই মনে হয়। স্বদেশি পর্বেই যেমন স্বদেশি ডাকাতদের বাদ দিলে, উচ্চবর্ণীয় অপরাধীরা অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সহজে অপরাধী সত্তায় নিজেদের চিহ্নিত করতে চায় নি। এমনকি পরবর্তী দুই দশকেও যখন উচ্চ বর্ণের লোকেদের অপরাধে ঝোঁকার প্রবণতা বেড়েছিল, তখনও অপরাধীদের নিম্নবর্ণীয় পরিচিতি অনুসারে চিহ্নিতকরণের প্রবণতা বহাল ছিল।[211] বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিজেদের অনপরাধী সত্তা সম্পর্কে ভদ্রলোকের ধারণা আরো সুদৃঢ়-সংহত হয়েছিল। এই পর্বে রাজনৈতিক বন্দী রূপে ভদ্রলোকের ওপরেই ঔপনিবেশিক আইন ও দণ্ডবিধানের পদ্ধতি প্রযুক্ত হলে ভদ্রলোকের কাছে তা আইনের অপব্যবহার ও অবৈধ প্রয়োগ রূপে প্রতিপন্ন হয়েছিল, যা অপরাধী ছোটলোক সম্পর্কিত মানদণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বদেশি পর্বে বিদেশি লবণ বয়কট করে 'রাজনৈতিক বন্দী' রূপে জেলযাত্রাই বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে মান্যতা পেয়েছিল, লবণ উৎপাদনের ফৌজদারি অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদশা নয়। জেলমুক্ত হওয়ার পর ভদ্রলোক নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রকাশ্য সভায় সংবর্ধনা, স্বর্ণপ্রদক প্রাপ্তির ঘটনাতেও স্পষ্টতই বোঝা যায় যে স্বদেশি সমাজ বিদেশি লবণ বয়কটকেই মান্যতা

---

[209] *Yugantar*, December 7, 1907— RNP (B) for week ending 14 December, 1907. NAI.

[210] 'বঙ্গে লবণের কারখানা' *মহাজন বন্ধু*, ৫ম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা, (ফাল্গুন, ১৩১২), ২৮৫।

[211] Anindita Mukhopadhyay, *Legal and penal Institutions*, 167-168.

দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসনও যে অপরাধের ক্ষেত্রে ভদ্রলোককে ভিন্ন চোখে দেখত স্বদেশি সংক্রান্ত সরাকারি নথিপত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ১৯১৩-তে গোয়েন্দা বিভাগ ঢাকা শহরে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও ‘ভদ্রলোক অপরাধ’ নিয়ে গোপন ফাইল তৈরি করেছিল, যার শিরোনাম: ‘History of the Political Agitation and Bhadralog crime in the city of Dacca from 1905 to 1913’.[212] উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে ঔপনিবেশিক আইন ও দণ্ডবিধানের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভদ্রলোকের ধারণায় স্পষ্টতই এক রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল, যখন আদর্শবাদ এবং কঠোর নৈতিক মানদণ্ডের সমন্বিত শক্তি দিয়ে ব্রিটিশ শাসকীয় অধীনে ফৌজদারি আদালত ও কারাগারের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিল এই শ্রেণি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে ভদ্রলোক নেতৃত্বের ভাবনায় ও ভাষ্যে জেলে যাওয়া যেন ‘তীর্থযাত্রার’ মহীয়ান রূপকে উন্নীত হয়েছিল।[213] ১৯৩০-এর দশকে লবণ প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সমুদ্রোপকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রাকে ‘তীর্থযাত্রা’ এবং লবণ আইন অমান্য করে বন্দীত্বের দশায় জেলকে ‘মন্দির’ রূপে গান্ধী অভিহিত করেছিলেন।[214] লবণ আইন অমান্যের ‘তীর্থযাত্রার’ সূত্রেই স্বয়ং মোহনদাসই যে ‘সন্ত গান্ধী’ রূপে বাংলা তথা ভারত সহ বিশ্বে বন্দিত হয়েছিলেন তা লবণের ‘স্বদেশি’ রূপান্তরের আখ্যানে এক পৃথক অধ্যায়কে তুলে ধরে।

---

212 সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের এই [IB, 1913] নথির উল্লেখ রয়েছে, Rajat Roy, *Social Conflict*, 1984, 160.

213 Anindita Mukhopadhyay, *Legal and penal Institutions*, 213, 301.

214 ডান্ডিকে তীর্থক্ষেত্র রূপে গান্ধী উল্লেখ করেছিলেন: Speech at Dandi, April 5, 1930, *CWMG*, Vol. XLIX, (New Delhi: Publications Division Government of India, e-book, 1999), 15-19; ১৯৩০-এ লবণ আইন অমান্যের ফলশ্রুতিতে পুনের ইয়েরওয়াড়া কারাগারে বন্দি হলে গান্ধী তা ‘ইয়েরওয়াড়া মন্দির’ বলে অভিহিত করেছিলেন: M. K. Gandhi, *From Yeravda Mandir: Ashram Observances*, Eng. Trans. V. G. Desai (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1932).

চতুর্থ অধ্যায়

গান্ধী ও লবণ:

স্বরাজের দ্যোতনা

১৯৩০-এর গ্রীষ্মে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারতে এক ‘অদ্ভুত বিপ্লব’ বিস্ময়ের সাথে চাক্ষুষ করেছিল গোটা বিশ্ব। পশ্চিম ভারতে প্রখর দাবদাহের মধ্যে এক ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি তাঁর কিছু অনুগামীর সাথে পদব্রজে সমুদ্রোপকূলের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য? বেআইনিভাবে লবণ তৈরি করা! চারদিকে যেন এক বিস্ময়ের ঘোর, বাঙালি কবির কথায়, “তা নয়, পাগোল, বাধাইতে গোল, ছাড়ি’ গৃহ-সংসার,/ কোন্ উপরোধে, চৈত্রের রোদে, হইল ঘরের বা’র!/ মাটীর মায়ের দেহের পরশ প্রতিপদে পাবে বলে’/ শুনেছি সে নাকি, নুণে দিতে ফাঁকি, মুক্তিতীর্থে চলে [বানানরীতি অপরিবর্তিত]!”[1] লক্ষ্যপূরণে অবিচল মানুষটি অবশ্য চব্বিশ দিনে দুশো একচল্লিশ মাইল পথ হেঁটে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর এক সকালে (১৯৩০-এর ৬ এপ্রিল), তিনি সমুদ্রতটে লবণাক্ত জল জমে তৈরি হওয়া একমুঠো কাদাবালি মিশ্রিত লবণ হাতে তুলে নেন এবং ঔপনিবেশিক লবণ আইন অমান্যের সূচনা করেন। অবিশ্বাস্য হলেও এরকমই এক সাধারণ ঘটনা ঘটিয়েই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৌধটিকে নড়িয়ে দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

লবণকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে গান্ধীর এই গণ আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে ভারতীয়দের তো বটেই, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকেও হতবাক করেছিল। ভারতীয়দের বিমূঢ়তা স্বয়ং নেহরুর বয়ানেই ফুটে ওঠে, “লবণ অকস্মাৎ এক রহস্যময় শব্দ হয়ে উঠল, এক শক্তিশালী শব্দ। লবণ করকে আক্রমণ করা হবে, লবণ আইন ভঙ্গ হবে। আমরা বিভ্রান্ত ছিলাম এবং সাধারণ লবণের সাথে এক জাতীয় সংগ্রামকে পুরোপুরি মেলাতে পারছিলাম না।”[2] সেই সময় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনের ভিন্নতর পন্থার কথা নেহরু, এবং অন্যরাও ভেবেছিলেন। নেহরু স্বয়ং যেমন সমান্তরাল সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। বল্লভভাই প্যাটেল চেয়েছিলেন দিল্লী পর্যন্ত গণ পদযাত্রা সংগঠিত করতে। যমনালাল বাজাজ ভাইসরয়ের আবাস পর্যন্ত

[1] যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ‘নুণায়ন’, *মাসিক বসুমতী,* ৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, (বৈশাখ, ১৩৩৭), ১৫০।

[2] Jawaharlal Nehru, *An Autobiography* (London: Bodley Press, 1939), 210.

পদযাত্রার প্রস্তাব রেখেছিলেন। তাছাড়াও খাজনা বন্ধের দাবি, আইন আদালত বা বিদেশি বস্ত্রের বয়কটের ভাবনা ও উত্থাপিত হয়েছিল।[3] কিন্তু লবণকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে গণ আন্দোলন? ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তো ভেবেছিল, 'এক কৌতুক', 'এক বিচার-বুদ্ধিহীন তামাশা' চলছে যা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনে অচিরেই ইতি টানবে; কারণ তিনি 'বাস্তবের সাথে সম্পর্ক হারিয়েছেন'।[4] এই আবহ যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় চমৎকার ফুটে উঠেছে: "গান্ধী যে দিন সিন্ধুর সাথে চুক্তি করিল নুণ,/ বিশ্ব শুদ্ধ আবালবৃদ্ধ সেদিন ভাবিয়া খুন!/ [...] পাগলের সাথে পাগলের জোট-বুদ্ধি মিলেছে ঠিক।/ ইঙ্গবঙ্গ হেরিয়া রঙ্গ হাসিল দিগ্বিদিক [বানানরীতি অপরিবর্তিত]!"[5] ভাইসরয় লর্ড আরউইনও শুরুতে, ১৯৩০-এর ২০ ফেব্রুয়ারি, ভারত সচিব ওয়েজউড বেন-কে জানিয়েছিলেন যে, লবণ সত্যাগ্রহের সম্ভাবনা অন্তত তার রাতের নিদ্রাভঙ্গ করছে না। যদিও এক বছর পরে, ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারিতে, আরউইন গান্ধীকে সাক্ষাৎকালে জানিয়েছিলেন যে, লবণের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তিনি এক চমৎকার কৌশল পরিকল্পনা করেছিলেন![6] আমেরিকান সাংবাদিক উইলিয়াম শায়ারার লবণকে কেন্দ্র করে 'গান্ধীর অদ্ভুত বিপ্লব' প্রত্যক্ষ করতে ১৯৩০-এর আগস্টে ভারতে এসেছিলেন। পরে স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছিলেন, "গান্ধীর প্রতিভা আকস্মিকভাবে এমন এক প্রতীকী অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল, যা শুধু তাঁকে ছাড়া প্রত্যেককেই বিমূঢ় করে তুলে জনমানসের কল্পনাকে দ্রুত আকর্ষিত করেছিল, এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তকে প্রজ্জ্বলিত করেছিল"।[7] শায়ারার কিন্তু কোনো ব্যতিক্রম নন; বরং তাঁর সময় থেকে বর্তমান সময়পর্বেও সাধারণভাবে মনে হয় যে, লবণকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গান্ধীর গণ আন্দোলনের আহ্বান ছিল একটি প্রতীকী ঘটনা এবং তাঁর মতো প্রতিভাধর মানুষের ভাবনায় তা আকস্মিকভাবেই এসেছিল।

লবণ সত্যাগ্রহের ঐতিহাসিক পর্যালোচনাও ব্যক্তি গান্ধীর প্রতিভার দিকে নির্দেশ করে। লবণ কর বেছে নেওয়া গান্ধীর চমৎকার উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচায়ক;[8] অথবা, গান্ধীর অতুলনীয় প্রতিভার কারণেই লবণের

---

3 Thomas Weber, *On the salt march: The Historiography of Mahatma Gandhi's March to Dandi* (New Delhi: Rupa, 2009), 95.

4 William L. Shirer, *Gandhi: A Memoir* (New York: Simon and Schuster, 1979), 92.

5 যতীন্দ্রমোহন বাগচী, 'নুণায়ন', ১৫০।

6 Sumit Sarkar, *Modern India* (Delhi: Pearson, 2014), 245-246.

7 William L. Shirer, *Gandhi*, 92.

8 Judith M. Brown, Gandhi and Civil Disobedience, The Mahatma in Indian Politics: 1928-34 (London: Cambridge University Press, 1977), 92-4.

মতো বিষয় 'বিপুল বিশ্বাস, আকাঙ্খা এবং জনপ্রিয় প্রতীকে' পরিণত হয়েছিল, এবং সে কারণেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল— এমন ধারণাই ঐতিহাসিক মহলে মান্যতা পায়।[9] লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীর ভাবনা ও কর্মকাণ্ড অবধারিতভাবে তাঁর স্বকীয় সৃজনশীল প্রতিভাকেই তুলে ধরে, কিন্তু ইতিহাসবিদ্যায় তা এক ভিন্নতর সমস্যা বা সংকটও তৈরি করে। কারণ, ইতিহাস প্রতিভার ব্যাখ্যা দেয় না, এবং তা ঐতিহাসিকের বিষয়ও নয়। ইতিহাসবিদ্যায় এই সমস্যা বা সংকটের সমাধানে অবশ্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করা হয়। গান্ধীর প্রতিভার কারণ না খুঁজে বরং দেশের মানুষ কেন সেই সময় তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়েছিল সেই দিকটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া, বিশেষ মানুষের বদলে বৃহত্তর পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করাটাই ইতিহাসে বেশি জরুরি।[10] অর্থাৎ, কোটি কোটি মানুষ কেন ১৯৩০-র দশকে গান্ধী নির্দেশিত লবণকে স্বরাজের প্রতীক মেনে নিয়েছিল এবং লবণ আইন অমান্যের পথে চলতে উৎসুক হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক অবস্থাকে বোঝাই ইতিহাস গবেষণার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বর্তমান অধ্যায়ে অবশ্য লবণ আইন অমান্যের গণআন্দোলনে বৃহত্তর পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি বুঝতে, বিশেষ মানুষ থেকে গড়পড়তা সাধারণ মানুষের ভূমিকার পর্যালোচনার পাশাপাশি, আন্দোলনের মূল লক্ষ্যবস্তু লবণ প্রসঙ্গেও সমধিক গুরুত্বে অনুসন্ধান করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমজনতা কেন গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে লবণ আইন অমান্যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নিয়েছিল, তা আলোচনার পাশাপাশি লবণ কিভাবে গান্ধীয় মননে ও কর্মসূচিতে স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠল— সেই প্রসঙ্গেরও অবতারণা করা হয়েছে। এই অবতারণার প্রাথমিক কারণ হল, গান্ধীয় প্রতীকের ঐতিহাসিক গবেষণা-চর্চায় লবণ এখনো পর্যন্ত অনালোচিত, অনাদৃত থেকেছে। বিশেষত, স্বরাজের প্রতীক হিসেবে খাদি ও চরকা প্রসঙ্গে যে মননশীল ইতিহাসচর্চা অব্যাহত, সেখানে লবণ প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই পরিলক্ষিত হয় না! উদাহরণ হিসেবে, খাদির বস্তুগত থেকে প্রতীকী রূপান্তরের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এখানে তুলে ধরা যেতে যেতে পারে। গান্ধীর জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে খাদির প্রাথমিক বিশ্লেষণ হয়েছিল। 'ভারতীয় স্বাধীনতার বয়ন বস্ত্র' (Fabric of Indian Independence) রূপে খাদি গান্ধীর 'যোগাযোগের' (Communication) মাধ্যম হয়ে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাসমূহকে সকল ভারতীয়র

[9] C. A. Bayly, "The Origins of swadeshi (home industry): cloth and Indian society, 1700-1930", in Arjun Appadurai edited, *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspectives* (UK: Cambridge University Press, 1986), 312.

[10] অশীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য* (কলকাতা: আনন্দ, ১৯৮৯), ১৭-১৮।

কাছে বোধগম্য করে তুলেছিল।[11] অন্যদিকে, নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী খাদি এক নয়, বহুস্তরীয় এবং পরস্পরবিরোধী 'পরিচিতি'-র ("multiple and conflicting" identities) ব্যঞ্জনা বহন করে। খাদি কিভাবে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের পছন্দের পোষাক হয়ে উঠল সেই প্রসঙ্গে পরিধানের অন্তর্নিহিত চিহ্নবিজ্ঞানকে (Semiotics) বিশ্লেষণ করলে খাদি 'বিকল্প আধুনিকতার আকাঙ্খায়' প্রতিভাত হয়।[12] নৈতিক স্তরে মহাত্মার দর্শন যদি আধুনিকতার প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিকল্প হয়, তাহলে খাদি-ভাবনা ও কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে গান্ধী কিভাবে এক অনাধুনিক, নৈতিক জীবনচর্যার বুনন তৈরি করেছিলেন সেই প্রসঙ্গও তলিয়ে দেখা হয়েছে।[13] গান্ধীর আন্দোলনের অপর প্রতীক চরকাকেও একইসাথে এক দৃশ্যমান প্রতীক এবং এক প্রতীকী অনুশীলন রূপে আজকের ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণ করেন।[14] এই যুক্তিক্রমেই কোম্পানির চিত্রকলাতে প্রাথমিক ঔপনিবেশিক প্রকাশ থেকে উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত চরকার ঐতিহাসিক কুলুজী (genealogy) বিশ্লেষিত হয়।[15] বলাবাহুল্য যে, গান্ধীয় প্রতীকের বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এই ইতিহাসচর্চায় প্রাথমিক অনুপস্থিতির কারণেই লবণ গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

গান্ধী ও লবণের পারস্পরিকতা বিচারের অন্য গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল বস্তুর 'সামাজিক জীবনের' ধারণা। অর্থাৎ, বস্তু কেবল মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত নিষ্ক্রিয় উপাদান নয়, বরং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সম্পর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। বস্তুর 'সামাজিক জীবন' যে মানুষের চিন্তা এবং আচরণকে প্রভাবিত করে, নির্দিষ্ট আকার-অভিমুখ দেয় – তা সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিকেরা যুক্তি ও নিদর্শ সহ তুলে ধরেছেন।[16] সুতরাং, গান্ধী যদি সাধারণ লবণকে সত্যাগ্রহের আদর্শে জারিত করে স্বরাজের শক্তিশালী প্রতীকে রূপান্তরিত করতে পারেন, তাহলে লবণও যে নিজস্ব দ্রব্যগুণে ও মূল্যমানে গান্ধীর জীবন ও ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে সেই

---

[11] Susan Bean, "Gandhi and Khadi, The Fabric of Indian Independence," in *Cloth and Human Experience*, edited by Annette B. Weiner and Jane Schneider (Washington, D.C.: Smithsonian Institute Press, 1991).

[12] See, "Khadi and the Political Man", in Dipesh Chakrabarty, *Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies* (Delhi: Permanent Black, 2004), 51-64.

[13] Rahul Ramagundam, *Gandhi's Khadi: A History of Contention and Conciliation* (New Delhi: Orient Longman, 2008).

[14] Rebecca Brown, *Gandhi's Spinning Wheel and the Making of India* (NY: Routledge, 2010); Mohit Chakrabarti, *The Gandhian Philosophy of the Spinning Wheel* (New Delhi: Concept Publishing, 2000); Nikhil Menon, Gandhi's Spinning Wheel, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 81, No. 4 (October 2020), 643-662; Sadan Jha, Charkha, "Dear Forgotten Friend' of Widows: Reading the Erasures of a Symbol", *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 28 (Jul. 10-16, 2004), 3113-3120.

[15] Rebecca Brown, ibid.

[16] Arjun Appadurai, *The Social Life of Things*, 1986.

প্রসঙ্গটিও সামাজিক-ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দাবি রাখে। উল্লিখিত প্রেক্ষিত থেকেই, বর্তমান অধ্যায়ে তাই বিষয়ী গান্ধী ও তাঁর বিষয় লবণকে পারস্পরিকতায় বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার সূত্রপাত, গান্ধী কেন লবণকে বেছে নিয়েছিলেন; তাঁর সেই নির্বাচন আকস্মিক, না দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলশ্রুতি— মূলত এই প্রশ্নকেই কেন্দ্র করে। প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় লবণ কিভাবে গান্ধীর রাজনৈতিক সচেতনতায় সমন্বিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে একরকম ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হয়। অথচ গান্ধীর জীবন ও রচনাসমগ্রে অভিনিবেশ করলে স্পষ্টতই এক বহুবর্ণী বয়ান ফুটে ওঠে। লবণ সত্যাগ্রহের প্রায় চারদশক আগে থেকেই, ভারতীয়দের জীবনে লবণের অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতে ও ভারতের দারিদ্র্যে ব্রিটিশ আরোপিত লবণ-করভারের ভূমিকা প্রসঙ্গে, গান্ধী সমালোচনায় সোচ্চার হয়েছিলেন। লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীয় ভাবনার প্রবাহে ধারাবাহিকতা ও বাঁকবদল অনুসন্ধান করাই এই পর্বের আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য।

গান্ধীর সত্যাগ্রহের ভাবনায় ও গৃহীত কর্মসূচিতে (অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক আইন ভঙ্গ করে উৎপাদন, ব্যবহার, বন্টন, বিক্রয়ের মতো কর্মকাণ্ডের সূত্রে) লবণ স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। একইসাথে তাঁর গভীর প্রত্যয় ছিল যে, প্রকৃত স্বরাজ অর্জন করতে হলে সত্যাগ্রহীর দেহ ও মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক; অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ও সুস্বাস্থ্য উভয়েই সত্যাগ্রহীর জন্য অপরিহার্য এবং আহারের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে তা সাধিত হয়। 'সত্যের সন্ধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়' প্রতিভাত আত্মজীবনীতেও গান্ধী নিজেকে আদ্যন্ত খাদ্য সংস্কারক হিসেবে দাবি করেছিলেন। এই প্রেক্ষিত থেকে, ব্যক্তি গান্ধীর জীবনে লবণ কি তাৎপর্য বহন করত; বিশেষত তাঁর শরীর, সত্যাগ্রহ, ব্রহ্মচর্যের ভাবনাতে লবণ কি অর্থ ও প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল তা বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে। লবণ কেন্দ্রিক এই পর্যালোচনার সূত্রে ব্যক্তি গান্ধীর জীবনচর্যা ও ভাবনার বিবিধ বিন্যাসকে যেমন চিহ্নিত করা যায় তেমনই তা সমষ্টিগতভাবে গান্ধীর সাথে পরিবার-আশ্রমিক-সত্যাগ্রহীদের সম্পর্কের নানান পরতকে তুলে ধরে।

লবণ সত্যাগ্রহের পথে অভিযাত্রী মহাত্মা 'সন্ত গান্ধী' অভিধায় বন্দিত হয়েছিলেন।[17] গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ধর্মীয় প্রতীক ও ধারণাকে নিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারতেন; এবং তাঁর সেই নৈপুণ্যের ওপরেই অনুগামী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা নির্ভর করত। আমজনতার ধারণাতেও গান্ধী ছিলেন মুক্তিদাতা, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী; যিনি অসাধারণ ক্ষমতাবলে সাধারণকে দুর্দশা-শোষণ-নিপীড়ন থেকে

[17] "Saint Gandhi", *Time*, Vol. XV, No. 13, 31 March, 1930.

মুক্তি দিতে পারেন।[18] লবণ সত্যাগ্রহকেও গান্ধী ধর্মীয় রূপদান করেছিলেন। লবণ আইন অমান্যের দীর্ঘ পদযাত্রাকে ‘তীর্থযাত্রা’, এবং সত্যাগ্রহীদের লবণ উৎপাদনকে তিনি ‘যজ্ঞ’ রূপে অভিহিত করেছিলেন। গান্ধীর তীর্থযাত্রা জনতার কল্পনায় কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল, লবণ ‘যজ্ঞ’ আমজনতার কাছে কি অর্থ বহন করেছিল, সর্বোপরি লবণ কি ক্ষমতাহীনের কাছে ক্ষমতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল— এই প্রেক্ষিত থেকে জনমানসে মহাত্মার ‘মিলেনারিয়ান’ [Millenarian] আবেদনের দিকটিকেও বোঝার প্রয়াস রয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে। জাতীয়তাবাদের সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সামাজিকভাবে নির্মিত সম্প্রদায় রূপেই জাতি চিত্রিত হয়, যেখানে মানুষ একে অপরকে না দেখে বা পরস্পরের মুখোমুখি না হয়েও শুধুমাত্র সমষ্টিগত কল্পনার সূত্রেই নিজেদেরকে এক গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে অনুভব করে।[19] ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজেও লবণ বহুতর প্রতীকী অর্থ বহন করত। কিন্তু আইন অমান্যের পর্বে লবণ কোন অর্থে সমষ্টিগত কল্পনাকে সংহত করেছিল— ভারতীয় জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে বোঝার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অধ্যায়ের শেষাংশে লবণের বস্তুগত মাত্রাকে স্বতন্ত্রভাবে বোঝার প্রয়াস রয়েছে। উপনিবেশের লবণকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যিক রাজনীতি গান্ধীয় সত্যাগ্রহের পর্বে কি রূপ নিয়েছিল, সত্যাগ্রহীদের দেশীয় পদ্ধতিতে উৎপাদিত লবণ কি শুদ্ধ ছিল; অন্যভাবে বলা যেতে পারে, লবণের ‘অশুদ্ধি’ নির্ণয়ের সাম্রাজ্যিক রাজনীতিকে কি তা প্রতিহত করতে পেরেছিল— এই প্রশ্নসমূহকে গুরুত্ব সহকারে তলিয়ে দেখা হয়েছে। সত্যাগ্রহীদের উৎপাদিত লবণের গুণমানকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যিক ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অব্যাহত প্রচার-যুদ্ধে রসায়নবিদ্যা ও ব্যাকটেরিয়োলজির বিশ্লেষণ অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। গান্ধীয় জাতীয়তাবাদের আবহে সত্যাগ্রহ লবণের শুদ্ধতা ও স্বাস্থ্যমান নির্ণয়কে কেন্দ্র করে কিভাবে আধুনিক ‘জাতীয়তাবাদী’ বিজ্ঞানের সূচনা পরিলক্ষিত হয় তা এই অধ্যয়নের অন্যতম উপজীব্য।

---

[18] Sahid Amin, “Gandhi as Mahatma: Gorakhpur District, Eastern UP, 1921-22”, *in Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society*, Vol. III, edited by Ranajit Guha (Delhi, Oxford University Press, 1989) 1-61.

[19] Benedict Anderson, *Imagined Communities: reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (UK: Verso, 1983).

।।১।।

গান্ধী মননে লবণ: চার দশকের ভাবনা

লবণ প্রসঙ্গে গান্ধীর রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁর ছাত্রজীবনেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচনা সমগ্র বা কালেক্টেড ওয়ার্কস এক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান আকর হয়ে ওঠে। কালেক্টেড ওয়ার্কস-এর প্রথম খণ্ডেই যে চমকপ্রদ তথ্য মেলে তা হল, গান্ধীর জীবনের প্রথম প্রকাশিত লেখায় ও জনসমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় লবণ করের প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী! একুশ বছরের মোহনদাস গান্ধী তখন লণ্ডনের ইনার টেম্পলে আইন পাঠরত। একই সময়ে 'ভেজিটেরিয়ানিজম'-এর প্রতি গভীর অনুরাগবশত তিনি লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটি নামে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সদস্য হয়েছিলেন। এই সোসাইটির সাপ্তাহিক মুখপত্র *দি ভেজিটেরিয়ান* পত্রিকায় গান্ধীর প্রথম লেখা— 'ইন্ডিয়ান ভেজিটেরিয়ান' শীর্ষক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। ১৮৯১-এর ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত, এই প্রবন্ধমালার প্রথম পর্বেই তিনি সখেদে লিখেছিলেন যে, দরিদ্র ভারতীয়দের বেঁচে থাকার একমাত্র আহার 'রুটি ও লবণ, অত্যধিক কর আরোপিত এক দ্রব্য'।[20] এখানে গান্ধীর মূল প্রতিপাদ্য ছিল জাত-পাত ও ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে কিভাবে ভারতে নিরামিষভোজীদের নানান স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এহেন বিতর্কহীন নিরামিষ লেখাতেই, 'লবণ, অত্যধিক কর আরোপিত এক দ্রব্য'— এই সংক্ষিপ্ত শব্দসমষ্টিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁর উদ্বেগ এবং অসন্তোষ প্রাথমিকভাবে ধরা পড়ে। ভেজিটেরিয়ানিজম'-এর প্রতি গান্ধীর আবেগ ও অনুরাগ তাঁকে আবারো প্রণোদিত করেছিল। ১৮৯১-এর ২রা মে, লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত এক মিটিংয়ে ভারতের আহার্য প্রসঙ্গে, 'The Foods of India' শিরোনামে তিনি তাঁর প্রথম সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন। সেই বক্তৃতাতেও গান্ধী দারিদ্র্যপীড়িত ভারতীয়দের জীবন ও বেঁচে থাকার সংস্থান সম্পর্কে আবারো উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'ভারতে এমন লাখো লাখো মানুষ রয়েছে যারা দিনে এক পাই তথা এক পেনির এক-তৃতীয়াংশতে বেঁচে থাকে। [...] এই গরিব লোকেদের দিনে শুধু একবারই আহার জোটে, আর তা বাসি রুটি ও লবণ, অত্যধিক কর আরোপিত এক দ্রব্য'।[21]

---

[20] ছয় পর্বে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯১-এর ৭ ফেব্রুয়ারি ও ১৪ মার্চের মধ্যে। 'Indian Vegetarians-I', The Vegetarian, 7 February, 1891, in *Collected Works of Mahatma Gandhi* [hereafter *CWMG*], Vol. I, Electronic Book, (New Delhi: Publications Division Government of India, 1999), 19. [এই অধ্যায়ের সব তথ্যসূত্রে Publications Division, Government of India, 1999 এর *CWMG* ই-বুক ব্যবহৃত হয়েছে]

[21] The Vegetarian Messenger, 1 June, 1891, in *CWMG*, Vol. I, 35.

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে গান্ধীর প্রাথমিক লবণ-সমালোচনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার সূচনাপর্বেই, 'লবণ, অত্যধিক কর আরোপিত এক দ্রব্য'- এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও তাঁর লেখনী ও বক্তৃতায় বারংবার এই লবণ-সমালোচনা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং লবণ কর বাতিল না হওয়া পর্যন্ত গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। দ্বিতীয়ত, গান্ধীর আত্মজীবনী অনুযায়ী, লণ্ডনে এই ছাত্রাবস্থার পর্বেই, তিনি জীবনে 'পরিবর্তনের' সন্ধানে 'আহার্য' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন।[22] এই সমালোচনা তাই খাদ্য সংস্কারক গান্ধীর লবণকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকালীন আবিষ্টতার (Obsession) সূচনাকেও চিহ্নিত করে, যা তার জীবনব্যাপী 'সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার' সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়েছিল। তৃতীয়ত, উপনিবেশিত মানুষের জীবনে লবণ বঞ্চনার এই বাস্তবতা গান্ধী পেশ করেছিলেন সাম্রাজ্যিক পরিসরে, কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে উঠে আসা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, প্রান্তিক জীবনশৈলীতে বিশ্বাসী লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির গোষ্ঠী-সাহচর্যে ও বন্ধুতায়, যা 'Affective Communities' বলে গণ্য হতে পারে।[23] চতুর্থত, গান্ধীর রাজনৈতিক সচেতনতায় শুরু থেকেই দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের জন্য যে গভীর উদ্বেগ ফুটে ওঠে তা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিরোধের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর সচিব প্যারেলাল সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে লবণ-সত্যাগ্রহের রচয়িতা ও দরিদ্রনারায়ণের প্রতিনিধি হবেন যিনি, সেই মোহনদাস ১৮৯০-এর দশকেই লবণ করের অবিচার এবং ভারতে দারিদ্র্যের ট্র্যাজেডিকে চিহ্নিত করে ফেলেছিলেন।[24]

সময়ের সাথে সাথে, লবণ কর সম্পর্কে গান্ধীর সমালোচনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় যখন স্বদেশীর ধারণা রাজনৈতিকভাবে সংহত ও সম্প্রসারিত হয়েছিল সেইসময় থেকে গান্ধীর লেখাতেও লবণের বিষয়টি আরো জোরালোভাবে ব্যক্ত হতে থাকে। সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইতে এবং ভারতীয় অভিবাসীদের জন্য নাগরিক অধিকারের দাবি তুলে ধরতে গান্ধী *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকাতেও তিনি ভারতে লবণ কর বিলুপ্তির দাবি জানিয়েছিলেন।

---

[22] See 'Changes', and 'Experiments in Dietics' in M. K. *Gandhi, An Autobiography: The Story of My Experiments with Truth*, Edited by Tridip Suhrud (New Haven: Yale University Press, 2018)124-134.

[23] Leela Gandhi, *Affective Communities: Anticolonial Thought, Fin-de-Siecle Radicalism, and the Politics of Friendship* (Durham: Duke University Press, 2006).

[24] Pyarelal, *Mahatma Gandhi Volume 1 The Early Phase* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1965), 262.

ভারতীয়দের আহার্যে লবণের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদনে তিনি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ড. জোনাথন হাচিনসনের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেন। লবণ কর অব্যাহত রাখা এক ‘বর্বর প্রথা’, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের জন্য তা ‘মহা লজ্জাজনক’ বলেই ড. হাচিনসন সমালোচনা করেছিলেন।[25] টিকাকরণ ও কুষ্ঠরোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে গঠিত রয়্যাল কমিশনের (১৮৮৯-১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) সদস্য রূপে এই খ্যাতনামা চিকিৎসক ভারতে এসেছিলেন কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত পরিদর্শন করে কুষ্ঠরোগের অন্যতম কারণ হিসেবে ড. হাচিনসন লবণ করভার প্রসূত ভারতীয়দের দৈহিক লবণ-বঞ্চনার কথাই তুলে ধরেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে ভারতে লবণ করের অবিলম্বে বিলুপ্তির যে দাবি ড. হাচিনসন জানিয়েছিলেন তাতে গান্ধী স্বভাবতই নিজ ভাবনার সমর্থন পেয়েছিলেন।[26] তার মাসখানেক পরেই লর্ড কার্জনের বিদায় উপলক্ষ্যে, যিনি বাংলা বিভাজনের কুখ্যাত পরিকল্পনার জন্য নিন্দিত হচ্ছিলেন, গান্ধী খানিক ভিন্নসুরে লিখেছিলেন যে, লবণ কর হ্রাস ‘সর্বদাই তাঁর [কার্জনের] কৃতিত্ব হয়ে থাকবে’।[27] স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল আঁচের মধ্যেও, স্বদেশের দরিদ্র মানুষ কার্জনের লবণ করভার কমানোর সিদ্ধান্তে যে উপকৃত হয়েছেন— এই বাস্তবতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে গান্ধীর নির্দ্বিধ মনোভাব এখানে লক্ষণীয়। জনতার অবদমিত আকাঙ্খা কখনো কখনো জনজীবনে আকস্মিক গুজবের মধ্য দিয়ে নির্গম পথ খুঁজে পায়। ঔপনিবেশিক পর্বে নানাবিধ গুজবের লক্ষ্যবস্তু লবণকে ঘিরে চলতে থাকা এমনই এক জল্পনার বিবরণ গান্ধী তুলে ধরেছিলেন। ভারতে প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর রাজকীয় সফরের আগে উত্তুঙ্গ জল্পনা ছিল যে, ভারতীয় জনতার ক্ষোভ প্রশমিত করতে ব্রিটিশ সরকার লবণ কর পুরোপুরি বিলোপ করতে পারে! সাধারণ মানুষের সেই জল্পনার যে ‘যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে’ এবং তা যেন ‘সত্য প্রমাণিত হয়’ বলেই গান্ধী *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নে* আশা ব্যক্ত করেছিলেন।[28] দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধীর কাছে দেশের মানুষের লবণ সমস্যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল, যদিও কোনো আশু সমাধানের পথ তিনি জানতেন না। সেই অসহায় দিনগুলির স্মৃতিচারণে গান্ধী পরে লিখেছিলেন, “দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার

---

[25] Indian Opinion, 8th July, 1905, in *CWMG*, Vol. IV, 345-346.

[26] Ibid. ১৯০৩-এর ১৫ মার্চ ব্রিটেনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ডা: হাচিনসন বৃহৎ শ্রোতামণ্ডলীকে কুষ্ঠরোগের কারণ নির্ণয়ে তাঁর তৎকালীন ভারত সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন (ভারতসচিব) যিনি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনিও এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ‘Leprosy’ শিরোনামে ডা: হাচিনসনের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল: *The British Medical Journal*, May 23, 1903; 1217-1218.

[27] Indian Opinion, 26-8-1905 in *CWMG*, Vol. IV, 389.

[28] [From Gujarati] Indian Opinion, 14-10-1905, in *CWMG*, Vol. IV, 454.

সময় থেকেই এই [লবণ] আইনটি দীর্ঘসময় ধরে আমাকে কাঁটার মতো বিঁধে চলেছে। কিন্তু তখন আমি যেন ডানা কাটা পাখির মতো ছিলাম।”[29]

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর দেশের দরিদ্র জনতা যে অভাবনীয় দুর্দশা ও নিদারুণ খাদ্যাভাবের মধ্যে দিনযাপন করতেন গান্ধী তার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন। বিহারের প্রত্যন্ত চম্পারণে তাঁর প্রথম পরীক্ষামূলক সত্যাগ্রহ সংগঠিত করতে গিয়ে গান্ধী গ্রামজীবনে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের প্রেক্ষিতে সামান্য লবণের বাস্তবতাকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। নীলকরদের আধিপত্য গ্রামজীবনে যে দুর্দশা বয়ে এনেছিল তার বর্ণনায় তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি, ঠিক এই মুহূর্তে, হাজার হাজার মানুষের মাঝে রয়েছি যাদের শুধু সেঁকা (roasted) ডাল অথবা জলে মেশানো ছাতু ও লবণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না’।[30] চম্পারণ সত্যাগ্রহ সফল করে তুলতে যে একঝাঁক আদর্শবাদী তরুণ কর্মী সত্যাগ্রহী রূপে তাঁর ছত্রছায়ায় অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষক-জনতাকে সংগঠিত করেছিলেন, গান্ধী তাঁদের ‘salt of the earth’ বা ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ সন্তান রূপে অভিহিত করেছিলেন। সত্যাগ্রহীদের মূল্যায়নে গান্ধী অতঃপর প্রায়শই এই অভিধাটি ব্যবহার করতে থাকবেন।[31] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ভারতে অর্থনৈতিক সংকট আরো তীব্র হয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হতে থাকে। এমন সময়ে লবণ কর বাড়ানোর প্রস্তাব উঠলে সাধারণ মানুষের জীবনে তার অভিঘাত কি হবে তা ভেবে গান্ধী একরকম ‘শিউরে’ উঠেছিলেন।[32] এমন অপরিণামদর্শী প্রস্তাব দেওয়ার জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেভনস-কে গান্ধী কঠোরভাবে জানিয়েছিলেন, “আপনি যদি জানতেন [লবণ] করের কারণে মানুষের কী অবস্থা, তাহলে আপনি বলতেন, “অন্য কিছু হোক না হোক, এই কর আজই তুলে দিতে হবে”। শুধু করের বোঝাই নিপীড়নের একমাত্র কারণ নয়, তার পাশাপাশি গান্ধী সেইসময় লবণের আকাশ ছোঁয়া দামের জন্য সরকারের ‘সল্ট মনোপলি’কে দায়ী করেছিলেন, যার পরিণামে গরিব মানুষের পক্ষে ন্যায্য দামে লবণ কেনা কঠিন হয়ে উঠেছিল। গান্ধী একান্তই অনুভব করেছিলেন যে, “গরিবের জীবনে লবণ জল

---

[29] Gandhi’s Morning Prayer Speech on 27 February, 1918, in Mahadev Desai, *Day-To-Day With Gandhi*, Vol. 1 (Rajghat: Sarva Seva Sangh Prakashan, 1968) 52.

[30] Letter To “Indian Opinion”, December 15, 1917, in *CWMG*, Vol. XVI, 176.

[31] Gandhi’s Morning Prayer Speech on 27 February, 1918, in Desai, *Day-To-Day With Gandhi*, Vol. 1, 52.

[32] হারবার্ট স্ট্যানলি জেভনস সেই সময়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘পলিটিক্যাল ইকনমি’-র অধ্যাপক ছিলেন। Letter to Prof. Jevons, August 11, 1918, *CWMG*, XVII, 188-189.

আর বাতাসের মতোই অপরিহার্য” এবং সেই অনুভূতি ব্যক্ত করে অধ্যাপক জেভনসের মতো ব্যক্তিদের সংবেদনশীল হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন।[33]

তিনটি আঞ্চলিক সত্যাগ্রহের [চম্পারণ, খেড়া, আহমেদাবাদ] সাফল্যই ঔপনিবেশিক-বিরোধী ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর ক্ষমতায় উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। এই পর্বেই তিনি লবণ করের বিরোধিতায় সর্বভারতীয় স্তরে এক সত্যাগ্রহ সংগঠিত করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন! লবণের বিষয়টি শুধু গান্ধীর সচেতন ভাবনাতেই নয়, তার অবচেতনেও যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তা মহাদেব দেশাইয়ের ডায়রি থেকে জানা যায়। ১৯১৯-এর গোড়ার দিকে, অর্শের গুরুতর সমস্যায় ভুগতে থাকা গান্ধীকে অস্ত্রোপচার করতে হয়। অস্ত্রোপচারের পর সেই সন্ধ্যাতেই অচেতন গান্ধী প্রলাপ বকতে থাকেন যে, সরকারের লবণ কর রদ করা উচিত। খানিক উত্তেজিত কিন্তু অসংলগ্নভাবে বলতে থাকেন, “এই নিষ্ঠুর লবণ কর লোকে কিভাবে মেনে নিল, তা আমি কোনোমতেই বুঝতে পারছি না। যখন এই আইন পাশ হয়েছিল তখনই সরকারের বিরুদ্ধে গোটা দেশ জ্বলতে পারত বা বিদ্রোহ হতে পারত। মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য লবণে কিভাবে কর থাকতে পারে”?[34] তার মাস দুই পরে গান্ধী আত্ম-সমালোচনার সুরে জনসমক্ষে জানিয়েছিলেন যে, বিনা প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে লবণ আইন মেনে নেওয়ার মতো বড় অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, “আমি মনে করি, আমরা লবণ কর দুর্বলভাবে মেনে নিয়ে আমাদের জাতির প্রতি এক ঘোরতর পাপ করেছি। আমরা যদি নিপীড়িত জনতা না হতাম, তাহলে অনেক আগেই এর বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করতে পারতাম।”[35] ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতের আত্ম-নির্ভরতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি ভারতীয়দের যৌথভাবে আবারো লবণ উৎপাদনের দায়িত্ব নিতে আবেদন জানিয়েছিলেন। গান্ধীর এহেন আবেদনের কারণ? তাঁর বৈগ্রহিক ডান্ডি পদযাত্রার এক দশক আগেই, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লবণ করের বিরুদ্ধে এক আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন! সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে লবণ কর নিয়ে গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করতে তিনি তাঁর তরুণ অনুগামী এস. পি. পটবর্ধনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশদ গবেষণার জন্য তিনি পটবর্ধনকে তৎকালীন বম্বে স্থিত ‘কাস্টমস, সল্ট অ্যান্ড এক্সাইজ’ দফতরে পাঠিয়েছিলেন।

---

[33] Ibid., 189.

[34] ১৯১৯ এর ২১শে জানুয়ারির এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে [ইংরেজি উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ নিজস্ব], Mahadev Desai, *Day-To-Day With Gandhi*, Vol. 1, 271.

[35] Pilgrimage to Madras, Gandhi’s Speech on 18 March, 1919, in ibid., 314.

সেখানকার আধিকারিককে গান্ধী চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন— পটবর্ধনকে যাতে প্রয়োজনীয় বই এবং লবণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক নথি, যথা- 'ক্যাপ্টেন পেডারের ১৮৭১-৭২-এর রিপোর্ট এবং বম্বে গভর্নমেন্ট নিযুক্ত কমিশনের ১৯০৫-এর রিপোর্ট', পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়।[36] অবশ্য তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আকস্মিক পট পরিবর্তন হলে গান্ধী লবণ করের বিরুদ্ধে তাঁর পরিকল্পিত কর্মসূচি স্থগিত রাখেন এবং দেশজুড়ে নিষ্ঠুর রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সংগঠিত করতে এগিয়ে যান। রাওলাট সত্যাগ্রহ গান্ধীকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে এবং দেশবাসীর কাছে তাঁর 'মহাত্মা' পরিচিতি চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।[37]

পরের দশক জুড়েও গান্ধীকে স্বদেশী, খাদি, গোরক্ষা ইত্যাদি নানান বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লবণ করের বিষয়ে সোচ্চার হতে দেখা যায়।[38] অসহযোগ আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই, লবণ সহ আমজনতার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ গান্ধী সরকারকে তীব্র ধিক্কার জানান এবং তা যেন দেশ জুড়ে চলা 'মারণ নৃত্য' ['the death dance'] বলে সমালোচনা করেন। আমজনতার দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'রক্ত চোষা লবণ আইনকে' তীব্র কষাঘাত করেছিলেন। তাঁর মতে, সংস্কারের নামে দ্বিগুণ লবণ করভার আসলে ভারতীয়দের ওপর দুঃসহ 'প্রেতাত্মার মতো চেপে বসে আছে'। এই কুশাসনের অবসান ঘটাতে গান্ধী সকল 'অসহযোগী' এবং সাধারণ মানুষকে অহিংসা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, কারণ 'অহিংসাই স্বাধীনতার পথ— কিন্তু তা বলপূর্বক হিংসার দাসত্বে নয়, নির্ভীক ও স্বাধীন মানুষের স্বেচ্ছাধীন অহিংসা'।[39] ১৯৩০-এর শুরুতে প্রকাশিত 'Monograph on Common Salt' গ্রন্থটি হাতে পেয়ে গান্ধী নিজের লবণ ভাবনায় আরো প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। ভারত যে নিজস্ব লবণ জোগাতে স্ব-নির্ভর সেদিকে শুল্ক দফতরের (Tariff Board) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং জনগণকে অবগত করতে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রির (FICCI) তরফে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলেই সেক্রেটারি এম.

---

36 Letter to E. L. Sale, June 19, 1919, in *CWMG*, Vol. XVIII, 126.

37 রামচন্দ্র গুহর মতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম যে সম্মান সূচক 'মহাত্মা' অভিধা পেয়েছিলেন তা এই পর্বে চিরস্থায়ীত্ব লাভ করে। Ramchandra Guha, *Gandhi the years that changed the world 1914-1918* (India: Penguin Random House, 2018), 164-165.

38 Gandhi raised the issue of salt in his public address on Swadeshi (Speech at Women's Meeting, Surat, May 26, 1919 in *CWMG,* Vol. XVIII, 60-64; Khadi ('Propagation of Khadi' in My Notes, Navajivan, March 12, 1922) in *CWMG*, Vol. XXVI, 338-345, Cow-protection (Presidential Address at Cow-Protection Conference at Belgaum, December 28, 1924), in *CWMG*, Vol. XXX,19-26.

39 'The Death Dance', Young India, March 9, 1922, in *CWMG*, Vol. XXVI, 321-322.

পি. গান্ধী মুখবন্ধে জানিয়েছিলেন।[40] কোম্পানি আমল থেকে ব্রিটিশ রাজের পর্ব পর্যন্ত ভারতে লবণ-শিল্পের অবস্থা ও লবণ-শুল্কের প্রভাব সম্পর্কে বিশদ পরিস্যংখ্যান সমেত বিবরণের পাশাপাশি ভারতীয়দের লবণ-বঞ্চনার প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা হয়েছিল। পৃথক অনুচ্ছেদে যেমন আলোচিত হয়েছিল: 'A poor man needs more salt than a rich one'; 'Baneful effects of the duty on the alimentary consumption'; 'Unjust bearing on the poor'; 'Does not the duty press upon the people' ইত্যাদি।[41] 'বাংলার লবণ শিল্পকে কিভাবে অসদুপায়ে মেরে ফেলা হয়েছিল' এবং 'যে মাটি সামান্য শ্রমের বিনিময়ে ভালো লবণ উৎপাদন করতে পারে সেখানে কিভাবে লিভারপুল লবণ এনে স্তূপীকৃত করা হল' তার প্রামাণ্য ইতিহাস এই 'মহামূল্যবান প্রকাশনায়' বিধৃত বলেই গান্ধী ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় তুলে ধরেছিলেন।[42] বলাবাহুল্য, কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহরুও 'সল্ট মনোপলি নিয়ে আগ্রহী কংগ্রেসীদের জন্য' এই বইটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির সংগ্রহে রাখার নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন।[43]

গান্ধীর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও তাঁর রচনাসমগ্র স্পষ্টতই পাঠককে অবগত করে যে, লবণকে কেন্দ্র করে সত্যাগ্রহ কোনো আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত ধারণার বাস্তবায়ন ছিল না। ডান্ডি অভিমুখে নির্গত হওয়ার পূর্বে প্রায় চার দশক ধরে তিনি লবণের বিষয়টি নিয়ে ভেবেছিলেন, আর এক দশক আগেই সত্যাগ্রহ সংগঠনের পরিকল্পনাও করেছিলেন। ভারতের দারিদ্র্যের কারণ এবং দরিদ্র ভারতীয়দের প্রাত্যহিক জীবনে ন্যূনতম নুনের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি যে আদ্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন তা এই চার দশকের ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের প্রবাহে প্রতিভাত হয়। এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা জরুরি যে, লবণ করকে কেন্দ্র করে গান্ধীর ধারণা বা ভাবনা যখন সংহত হচ্ছিল তার কয়েক দশক আগে থেকেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-প্রতিবাদের ধারা অব্যাহত ছিল; এমনকি গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতো গান্ধীর পূর্বসুরী রাজনীতিবিদেরাও তা অবহিত ছিলেন এবং জোরালো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির বিরুদ্ধে বাংলাতে যেমন সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নিদর্শ পরিলক্ষিত হয় [দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদে আলোচিত]। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, লবণকে কেন্দ্র করে নৈতিক সন্দর্ভের

---

[40] Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, *Monograph on Common Salt*, (Calcutta: FICCI, 1930).

[41] Ibid.

[42] "Salt Tax", Young India, 27.02.1930 in *CWMG*, Vol. 48, 349-351.

[43] Nehru's Circular to PCCs' dated 22 February, 1930 in S. Gopal edited, *Selected Works of Jawaharlal Nehru*, Vol. 4 (New Delhi: Orient Longman, 1973) 271-273.

উদগাতা গান্ধী নন, বরং উনিশ শতকে লবণ করকে কেন্দ্র করে অব্যাহত বিতর্কে এবং ১৮৭০ এবং ১৮৮০-র দশকে প্রতিবাদের নিদর্শে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি অবশ্য লবণের নৈতিক ধারণাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এবং, স্বল্পকালীন মেয়াদে হলেও, রাজনৈতিক সক্রিয়তার এক নতুন পরিসরে উন্নীত করেছিলেন।[44] এই প্রেক্ষিত থেকে, গান্ধীর লবণ-ভাবনাতে কিভাবে অন্যান্য প্রভাবের সম্মিলন ঘটেছিল তার কিছু মাত্রা তুলে ধরা যেতে পারে।

প্রথমত, ভারতীয় জনজীবনে ঔপনিবেশিকতার দুঃসহ পরিণাম গান্ধী প্রায়শই আমজনতার কাছে সহজবোধ্যভাবে শারীরিক দুর্দশার (রোগ, ক্ষুধা, পরিধেয়র অভাব ইত্যাদি) নিরিখে তুলে ধরতেন। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য কিভাবে অগণিত ভারতীয়কে ক্ষুধার গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে তা বোঝাতে লবণ কর তাঁর অন্যতম হাতিয়ার ছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের প্রদত্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করেই গান্ধী তাঁর লবণ সমালোচনার নৈতিক বৈধতাকে প্রতিপন্ন করেছিলেন। ১৯১৯-এ গুজরাটে এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি যেমন বলেছিলেন: "বিগত কয়েক বছরে অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট যে ভারতের এক বিশাল অংশের মানুষের পর্যাপ্ত খাবার জোটে না। চল্লিশ বছর আগে স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার সরাসরি বলেছিলেন যে, ভারতে তিন কোটি মানুষের দিনে একবারই খাবার জোটে, তাও আবার শুধু সাধারণ রুটি ও নুন। [...] প্রত্যেক আধিকারিকই সরকারি তথ্যসম্বলিত বইতে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভারতের দারিদ্র্য দিন দিন বেড়ে চলেছে, এবং কৃষককুলের অবস্থা বিশেষত শোচনীয় হয়েছে [...]।[45]

দ্বিতীয়ত, লবণ কর প্রসঙ্গে গান্ধীর সমালোচনায় তাঁর পূর্বসূরী কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃত্বের অর্থনৈতিক-জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক-জাতীয়তাবাদী চিন্তকদের অগ্রপথিক ছিলেন দাদাভাই নওরোজি, যিনি ভারতে দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানে তথ্য ও পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ যুক্তিক্রমে ব্রিটিশদের 'অ-ব্রিটিশসুলভ' শাসনের চরিত্র উদঘাটিত করেছিলেন। তিনি লবণ করকে 'ব্রিটিশ নামে এক কলঙ্কের দাগ' [a stigma in the name of British] বলে সমালোচনা করেছিলেন।[46] গান্ধী স্বয়ং 'জাতীয়তাবাদের রচয়িতা' নওরোজির ঋণস্বীকার করেছিলেন, কারণ ইংরেজরা কিভাবে ভারতীয়দের 'প্রাণরস [life-blood] শোষণ

44 David Arnold, 'Salt: An Afterword', *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 46:4, (2023), 886-894.

45 Speech at Gujrati Bandhu Sabha, Puna, August 8, 1919, in *CWMG*, Vol. XVIII, 272-275.

46 Dadabhai Naoroji, *Poverty and Un-British Rule in India* (London: Swan Sonnenschein, 1901), 215; also cited in Bipan Chandra, *The Rise and Growth of economic Nationalism in India: Economic Policies of Indian National Leadership, 1880-1905* (New Delhi: People's Publishing House, 1966), 536.

করছিল' সে বিষয়ে তিনিই ভারতীয়দের সচেতন করেছিলেন।[47] গান্ধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন যে, এ তাঁর 'কল্পনা থেকে আঁকা কোনো ছবি নয়', বরং 'ভারতের মহান প্রবীণ ব্যক্তি দাদাভাই নওরোজির অফুরন্ত উদ্যমে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে' এই বিবৃতি তিনি তুলে ধরেছেন। নৌরজির অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে গান্ধী লিখেছিলেন, 'তিনিই প্রথম আমাদেরকে ইংরেজ প্রশাসকদের দ্বারা প্রস্তুত করা পরিসংখ্যানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এই পরিসংখ্যান থেকে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ভারত প্রতিদিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।'[48] ভারতের দারিদ্র্য ও লবণ কর প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনা কিভাবে গান্ধীর লবণ ভাবনাকে নির্দিষ্ট আকার-অভিমুখ দিয়েছিল তা আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

তৃতীয়ত, ভারতীয়দের দারিদ্র্য ও তাদের আহার্যগত বঞ্চনার নিরিখে গান্ধী যে লবণ-রাজনীতির ভাষ্য নির্মাণ করেছিলেন তা 'অপুষ্টি' সংক্রান্ত বিশ শতকীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞানচর্চা ও কর্মসূচির প্রেক্ষিতে আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী পর্বে 'ঔপনিবেশিক অপুষ্টির আবিষ্কার' হয়েছিল, যখন মেট্রোপলিটান বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বিকশিত ধারণা ও কৌশলের ফলশ্রুতিতে 'অপুষ্টির বিষয়টি একটি সাম্রাজ্যিক সমস্যা হিসাবে গঠিত হয়েছিল এবং বিশ্ব রাজনৈতিক কর্মসূচিতে স্থান পেয়েছিল'।[49] ১৯২০-র দশকের আগে অপুষ্টির বিষয়টিকে পাখির চোখ করে প্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা অনুসন্ধানের চল পরিলক্ষিত হয় না। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী পর্বে পুষ্টি-বিশেষজ্ঞ পেশাদার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উত্থান, আহার সমীক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ, সর্বোপরি আহার ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে যোগসূত্রগুলি উপলব্ধি করার সূত্রে অপুষ্টির বিষয়টি ভারত সহ অন্যান্য উপনিবেশেও স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৮৬০-এর দশক থেকে ভারতীয়দের সম্পর্কে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের একটি শাখা রূপে অপুষ্টির বিষয়টিকে গণ্য করা হয়েছিল, এবং তার অন্যতম নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও তার সম্পদের ঔপনিবেশিক 'আবিষ্কার'। যদিও ১৯৩০ দশকের অন্ত্যপর্বে ভারতীয়দের জন্য তা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মসূচির অংশ হয়ে উঠছিল।[50]

---

[47] M. K. Gandhi, *Hind Swaraj and other writings*, Edited by Anthony J. Parel (Cambridge: Cambridge University Press, 1997) 15.

[48] Speech In Reply to Welcome Addresses, Tiruchengode, March 21, 1925, in *CWMG*, Vol. XXX, 463-465.

[49] Michael Worboys, "The Discovery of Colonial Malnutrition between the Wars", in David Arnold ed., *Imperial Medicine and Indigenous Societies* (Manchester: Manchester University Press, 1988), 208-25.

[50] David Arnold, "The "Discovery" of Malnutrition and Diet in Colonial India", *Indian Economic & Social History Review*, 31:1, (1994) 1–26.

উল্লিখিত প্রেক্ষিত থেকে লবণকে যদি ন্যূনতম পুষ্টি সুনিশ্চিত করার উপাদান রূপে দেখা হয় তাহলে গান্ধীর লবণ আইন অমান্যের আহ্বান আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে। দরিদ্র ভারতীয়দের কোনোমতে একবেলা নুন-রুটি বা নুন-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার নিদারুণ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে— সাম্রাজ্য আরোপিত লবণ-কর, গান্ধীর ভাবনা অনুসারে বলা যায় যে, ভারতীয়দের ন্যূনতম আহার্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের অনাহার ও অপুষ্টির গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করেছিল। ১৯১৫-তে দেশে ফেরার পর করভারে পীড়িত সাধারণ মানুষের লবণ-বঞ্চনা গান্ধী আরো কাছ থেকে, গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। লবণ-বঞ্চনার সূত্রে দরিদ্র ভারতীয়রা যে শারীরিক অপুষ্টির শিকার— এই নিদারুণ বাস্তবতা তাঁর কাছে অসহনীয় উদ্বেগ ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিল। আর তাই দেশজুড়ে প্রথম গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে ১৯১৯-এ লবণ আইন অমান্যের কথাই তিনি ভেবেছিলেন। ১৯৩০-এ লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীর সত্যাগ্রহ দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী পর্বে ঔপনিবেশিক ‘অপুষ্টি আবিষ্কারের’ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেই আরো তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। গান্ধীয় ভাবনায় লবণ শুধু ভারতীয়দের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রতীক নয়, তা একই সাথে অনাহার ও অপুষ্টি থেকে মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

চতুর্থত, মোহনদাস থেকে মহাত্মা হয়ে ওঠার অপ্রতিম আখ্যানে লবণ সেই অবিশ্বাস্য উপাদান যার মধ্য দিয়ে স্বরাজের বিমূর্ত আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং সত্যাগ্রহী গান্ধী বিশ্বের সামনে সন্ত গান্ধী রূপে বন্দিত হয়েছিলেন। দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপট থেকে লবণ কিভাবে স্বরাজের আদর্শে সমন্বিত হয়েছিল তা অনুসন্ধান করতে হলে পাঠকের তাই গান্ধীর জীবন ও রচনায় সমর্পিত হওয়া জরুরি। পশ্চিমী ধারণার বিপরীতে ভারতীয় জাতির স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করতে গিয়ে গান্ধীর পরিণত রাজনৈতিক ভাবনার প্রথম প্রকাশ, তাঁর অসামান্য রচিত, হিন্দ স্বরাজ গ্রন্থে। এই মৌলিক রাজনৈতিক ভাষ্যে ‘সম্পাদক’ গান্ধী তাঁর ‘পাঠকের’ কাছে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে দুই নৈতিক আয়ুধ স্বরাজ ও স্বদেশির অনন্যতা ও অপরিহার্যতা তুলে ধরেছিলেন। সেইসূত্রেই তিনি ‘পাঠককে’ দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছিলেন ‘লবণ কর কোনো সামান্য অবিচার নয়’।[51] অবিচারের ভিন্নধর্মী ধারণাতেই গান্ধী তাঁর পূর্বসুরী নরমপন্থী ও চরমপন্থী [extremist] রাজনৈতিক নেতৃত্বের লবণ ভাবনা থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছিলেন। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নরমপন্থীরা যেখানে লবণ-করের বোঝার মধ্যে অ-ব্রিটিশসুলভ শাসনের নিদর্শ দেখেছিলেন, এবং চরমপন্থীরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সূত্রে ব্রিটিশ লবণের বয়কট দাবি করেছিলেন, গান্ধী সেখানে সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকেই নস্যাৎ করেছিলেন। ভারতে

[51] M. K. Gandhi, ‘*Hind Swaraj’ and other writings*, 20.

ব্রিটিশ আরোপিত লবণ করের মধ্যে গান্ধী পাশ্চাত্য সভ্যতার অনৈতিক আগ্রাসী লালসাকেই দেখতে পেয়েছিলেন।[52] পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগবাদী অনৈতিকতা, আগ্রাসন, লালসাকে প্রতিহত করতে এবং ভারতীয় জাতীয়তাকে প্রজ্জ্বলিত করতে তাই গান্ধীর কাছে নৈতিক আয়ুধ রূপে স্বরাজ ও স্বদেশির ধারণা অপরিহার্য ছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, উভয় ধারণাতেই 'স্ব' উপসর্গ 'আত্ম' তথা আত্মগত বোধের নির্দেশক। আধুনিক পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতা যেখানে ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে জাগিয়ে তোলে সেখানে মননে স্বরাজের সন্ধানরত গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠার জন্য অপরিহার্য। ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণে গান্ধী পরীক্ষিত বহুতর পন্থার অন্যতম ছিল 'অস্বাদ' তথা লবণ-বিহীন আহার্য গ্রহণ। স্বরাজের সন্ধানে সত্যাগ্রহীর জীবনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তথা আত্মগত বোধের অন্যতম নির্দেশক রূপে লবণ-বিহীন আহার্যের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা গান্ধী শুরু করেছিলেন হিন্দ-স্বরাজ প্রকাশের কিছুকাল পরেই।

।। ২ ।।

লবণ-বিহীন মহাত্মা: দেহ, গেহ ও ব্রহ্মচর্য

আমি লবণবিহীন আহার গ্রহণ করে থাকি...শরীরকে নিগ্রহের জন্য আমি তা করি না বরং শরীর, মন, আত্মা যাতে তাদের নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এবং পবিত্রতর হতে পারে তার জন্য করি।

- মহাত্মা গান্ধী[53]

গান্ধীর প্রথম প্রকাশিত লবণ সমালোচনা কিভাবে 'ভেজিটেরিয়ানিজমের' সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। 'ভেজিটেরিয়ানিজম' সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রাথমিকভাবে লবণবিহীন আহার গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল।[54] গভীর অধ্যয়নে গান্ধী অনুধাবন করেছিলেন, 'মানুষের

---

[52] হিন্দ স্বরাজের শেষেও তিনি লবণ করের ক্ষতিকর চরিত্রের জন্য তার বিলুপ্তি চেয়েছিলেন; একইসাথে গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজদের প্রতি তাঁর কোনো বৈরিতা না থাকলেও তাদের সভ্যতার প্রতি তিনি বৈরিতা পোষণ করেন। Ibid., 118.

[53] Letter to DR. Pranjivan Mehta, 22nd October 1911, *CWMG*, Vol. XII, 75.

[54] আহার্য সম্পর্কিত গান্ধীর বৌদ্ধিক অনুসন্ধান যে সুখপাঠ্য গ্রন্থগুলির পাঠে পরিতৃপ্ত হয়েছিলে সেগুলির অন্যতম ছিল Henry Salt's *Plea for Vegetarianism* (1886); অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- Howard Williams's *The Ethics of Diet* (1883), Dr. Anna Kingsford's *The Perfect Way in Diet* (1881), and Dr. Thomas Allinson লিখিত সুস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক গ্রন্থাদি, যথা- *A System of Hygienic Medicine* (1886), *The Advantages of Wholemeal Bread* (1889). গান্ধীর আত্মজীবনীতেই এর বিবরণ মেলে: M. K. Gandhi, *An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth*, Translated from the original in Gujrati by Mahadev Desai (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1926), 68.

আহারের জন্য লবণ কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্য নয়', বরং 'তার বিপরীতে, লবণবিহীন আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর'। একইসাথে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, লবণবিহীন আহার ব্রহ্মচর্য পালনে সহায়ক হবে।[55] দক্ষিণ আফ্রিকায় লবণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে গান্ধী তাঁর অসামান্য [অথচ বিচিত্র খামেখেয়ালিতে পরিপূর্ণ] আত্মজীবনীতেই স্মৃতিচারণ করেছিলেন: '[...] এমন এক সময় এল, যা আমায় লবণ পুরোপুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করল, এবং এই বিধিনিষেধ আমি দশ বছর ধরে একটানা অব্যাহত রেখেছিলাম'।[56] সেই 'এক সময়' ছিল সম্ভবত ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, যখন তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা গুরুতর রক্তক্ষরণের সমস্যায় ভুগছিলেন। অসুস্থ কস্তুরবার সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য লবণমুক্ত আহারের শপথ গান্ধী সস্ত্রীক গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এই লবণমুক্ত অভ্যাসেই কস্তুরবা রোগমুক্ত হবেন। লবণবিহীন আহার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথমে কস্তুরবা বেঁকে বসেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর ও বা'য়ের মধ্যে যে রীতিমতো বাদানুবাদ চলেছিল তা গান্ধী জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিভাবে তাঁরা সন্ধিতে পৌঁছলেন সেই প্রসঙ্গে, কস্তুরবা নীরব থাকলেও, পরিহাসপ্রিয় গান্ধী তা 'সত্যাগ্রহের এক দৃষ্টান্ত' এবং তাঁর জীবনের 'সুমধুর স্মৃতিগুলির মধ্যে একটি' বলেই অভিহিত করেছিলেন।[57]

এই সময় থেকেই গান্ধী শরীরের জন্য লবণের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে শুরু করেছিলেন। লবণের বিরুদ্ধে 'ডা: ওয়ালেস' সহ অন্যান্য চিকিৎসকদের যুক্তি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুক্তিতে প্রভাবিত গান্ধীর কাছে, লবণ ছিল 'এক শক্তিশালী রাসায়নিক', প্রকৃতপক্ষে এক প্রদাহজনক পদার্থ, যা স্বাস্থ্যের ওপর, বিশেষত অসুস্থদের শরীরে বিরূপ প্রভাব তৈরি করে। কিন্তু, এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে, গান্ধী মনে করেছিলেন 'লবণবিহীন খাদ্যের প্রভাব লক্ষ্য করার' জন্য আরও সময় প্রয়োজন। আর তাই, যতদিন সম্ভব 'লবণবিহীন পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার'

---

55 M. K. Gandhi, *An Autobiography,* 398-399.

56 Ibid., 398.

57 *Ibid.* গান্ধী ঠিক কখন এই পরীক্ষা শুরু করেছিলেন তা নিয়ে স্বল্প তথ্যই রয়েছে। তিনি অবশ্য ১৯১১ সালের ৯ মার্চ মগনলাল গান্ধীকে প্রেরিত একটি চিঠিতে তাঁর লবণ-মুক্ত আহার্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা তুলে ধরেছিলেন: 'I give you a piece of information now which I have withheld. So far.' এই চিঠিতেই তিনি 'গত একমাসে' [কস্তুরবার সাথে] লবণ-মুক্ত আহার গ্রহণের ফলাফল সম্পর্কে মগনলালকে জানিয়েছিলেন। সুতরাং গান্ধীর লবণ-মুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে এটা 'প্রথম' চিঠি বলে গণ্য হতে পারে এবং ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তা শুরু হয়েছিল বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

কথা তিনি ভেবেছিলেন।[58] *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘General Knowledge About Health’ শীর্ষক প্রতিবেদনেও তিনি দৃঢ়ভাবে দাবি করেছিলেন যে, লবণ একেবারেই শরীরোপযোগী নয় বরং শরীরে বিষময় প্রভাব ফেলে। আর লবণ-মুক্ত আহারে কফ, অর্শ, শ্বাসকষ্ট, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি উপসর্গ দূর হয়। লবণ বিহীন আহারে রক্ত পরিশ্রুত হয় এবং সাপের বিষকেও তা প্রতিরোধ করতে পারে বলেই তিনি মনে করতেন! তাঁর বিশ্বাস ছিল লবণ বিহীন আহার ধৈর্য ধরে অনুশীলন করতে পারলে তার উপযোগিতা প্রতিজ্ঞা পালনকারী পুরস্কার রূপে পেতে থাকবেন।[59] লবণ-রহিত আহার্যের উপকারিতা সম্বন্ধে গান্ধী আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিমত জানতে আগ্রহী ছিলেন। চিকিৎসক প্রাণজীবন মেহতাকে জানিয়েছিলেন যে, লবণ বিহীন আহারের গুণ শাস্ত্রেও স্বীকৃত। গান্ধীর ভাবনায় লবণ প্রদাহজনক, ক্ষতিকর, কৃত্রিমভাবে ক্ষুধা বাড়িয়ে তোলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তোলে।[60] এক দশক পরে গান্ধী অবশ্য লবণ নিয়ে দুই ধরণের মতামত তুলে ধরেছিলেন। একদিকে তাঁর বিশ্বাস ছিল, লবণ-বিহীন আহারে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। কারণ, জল সহ নানান উৎস থেকে শরীরে অল্প পরিমাণে লবণ গৃহীত হয়। তাছাড়া লবণ থেকে সাময়িক বা পুরোপুরি বিরত থাকা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপকারী হলেও তিনি এই বিষয়ে আর কাউকে প্রভাবিত করতেন না বলেই জানিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের জন্য কেউ লবণ-বিহীন আহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইলে কোনও ভাল ডাক্তার বা বৈদ্যের পরামর্শ নিয়ে তা করা বাঞ্ছনীয়; আধ্যাত্মিক কারণে কেউ তা গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনে দৃঢ়চিত্ত হওয়া উচিত বলেই তাঁর অভিমত ছিল।[61] ব্রহ্মচর্য এবং শারীরিক সুস্থতার নিরিখে গান্ধীর লবণ-মুক্ত আহারের পরীক্ষা কার্যত শুদ্ধতার এক নৈতিক অনুশীলন হয়ে উঠেছিল, যাতে আধ্যাত্মিকতা এবং (চিকিৎসা) বিজ্ঞান দুয়েরই সমাহার পরিলক্ষিত হয়।

গান্ধীর একান্ত ব্যক্তিগত পরীক্ষা সমষ্টিগতভাবে অনুশীলিত হয়েছিল যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায়, তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত [১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ] টলস্টয় ফার্মে (ভবিষ্যতের গান্ধীয় আশ্রমের এক আদিরূপ, যেখানে সত্যাগ্রহীরা থাকতেন), আবাসিকদের জন্য লবণবিহীন আহার্য বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তাঁর পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ফিনিক্স সেটেলমেন্টের [১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ] সদস্যদের জন্যও পরে তিনি একই আহার্যবিধি বলবৎ করেন। আফ্রিকায় গান্ধীর

---

[58] Letter to Maganlal Gandhi, March 9, 1911, *CWMG*, Vol. XI, 261-262.

[59] ‘General Knowledge About Health,’ Indian Opinion, March 29, 1913, *CWMG*, Vol. XIII, 29.

[60] Letter to Dr. Pranjivan Mehta, October 22, 1911, ibid., 74-77.

[61] Some Questions, *Nava Jivan*, September 27, 1926, *CWMG*, Vol. XXXIII, 7.

প্রথমদিকের দুই পাশ্চাত্য সহযোগী মিলি পোলক এবং তার স্বামী হেনরি পোলক লবণ-বিহীন আহার্যের অন্যতম শরিক ছিলেন। টলস্টয় ফার্মের আহার্য ব্যবস্থা কিভাবে লবণবিহীন (‘saltless table’) হয়ে উঠেছিল তা মিলি পোলকের স্মৃতিচারণ ‘In the South African Days’ থেকে জানা যায়। পোলক দম্পতির কাছে গান্ধীর যুক্তি ছিল যে, প্রকৃতি প্রদত্ত আহার্যেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় লবণ থাকে; তা ব্যতীত, লবণ ‘শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, চরিত্রের জন্যও খারাপ’ বলে তিনি খারিজ করে দিয়েছিলেন।[62] তবে সেই লবণহীন আহার মুখে তোলা, এমনকি হজম করা যে কখনো কখনো দুঃসহ হয়ে উঠত মিলি পোলক তা স্পষ্টতই তুলে ধরেছেন। একদিন যেমন, স্যুপের নামে বিনা নুনের বাঁধাকপি জল খেয়ে হেনরি পোলক রীতিমতো অসুস্থ হয়ে অফিস কামাই করেছিলেন![63] লবণ-রহিত আহারের নির্দেশ হেনরি যদিও অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, তাঁর অর্ধাঙ্গিণী মিলি কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করতেন না। গান্ধীর সাথে কথোপকথনে মিলির ভিন্নমত তথা তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। গান্ধীর অগোচরেই লবণ সহ অন্যান্য লোভনীয় কিন্তু নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য গোপনে এনে কোনো কোনো আশ্রমিক যে টলস্টয় ফার্মে খেতেন সেই তথ্যও মিলি পরবর্তীকালে নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন।[64]

১৯১১-র মার্চ থেকেই গান্ধী তাঁর পুত্র সহ নিকটাত্মীয় ও প্রিয় সহযোগীদের নিয়মিত চিঠি লিখে জানাতে শুরু করেছিলেন কিভাবে লবণবিহীন আহার্যের পরীক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকার আশ্রম জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ফিনিক্স ফার্মে সত্যাগ্রহীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে গান্ধী আশ্রমিকদের লবণ বিহীন আহার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রিয়জনেরা যখন সত্যাগ্রহী হিসেবে কারাবাসে থাকবেন সেই সময় স্বাদযুক্ত আহার গ্রহণ কি সঙ্গত হবে এমন প্রশ্ন তুলে ধরে গান্ধী আশ্রমিক শিশুদেরও প্রত্যয়ী করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। প্রভুদাস গান্ধীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি ও গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস গান্ধী সপ্তাহের ছয়দিন এই শপথ পালন করতেন। রবিবার আশ্রমের সকলকে লবণ-যুক্ত আহারের অনুমতি গান্ধী দিয়েছিলেন।[65] যমনাদাস গান্ধী ও মগনলাল গান্ধী, যাঁরা একসময় লবণ যুক্ত মশলাদার আহারের স্বাদে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা যে ধীরে ধীরে

[62] Millie Graham Polak, ‘In the South African Days’, March 12, 1948, London, available at https://www.gandhi-manibhavan.org/gandhi-comes-alive/the-south-african-days.html [last accessed on 11.06.2024]

[63] Millie Graham Polak, *Mr. Gandhi: The Man* (London: George Allen, 1931), 83.

[64] Ibid., 123.

[65] Prabhudas Gandhi, *My Childhood with Gandhiji* (Ahmedabad: Navajivan, 1957), 132.

লবণ রহিত 'অস্বাদ' আহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন তা প্রভুদাসের বিবরণ থেকে জানা যায়।[66] জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলালকে (যিনি সেই সময় ভারতে ছিলেন) লেখা এক চিঠিতে গান্ধী আনন্দের সাথে জানিয়েছিলেন যে, লবণবিহীন আহারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে 'ভালো বোধ' করেন এবং এই পথ্যেই কস্তুরবার 'জীবন রক্ষা হয়েছে' এবং তিনি যেন 'একেবারে নতুন এক নারী' হয়ে উঠেছেন। আশ্রমিক ছেলেমেয়েরাও তখন এক সপ্তাহ অন্তর লবণ-বিহীন আহার্য গ্রহণ করছিল এবং তারা ভবিষ্যতে নিজেদের 'ভালোর জন্যই তা গ্রহণ করে চলবে' বলেই গান্ধী আশা ব্যক্ত করেছিলেন।[67] তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, লবণবিহীন আহার 'রক্তকে বেশ উচ্চ মাত্রায় পরিশোধিত করে'। গান্ধী হরিলালকে চিঠিতে আরো জানান যে, তাঁর জার্মান-ইহুদি স্থপতি বন্ধু হারম্যান ক্যালেনবাখ (যিনি টলস্টয় ফার্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন) এই আহার্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।[68]

ক্যালেনবাখকে লিখিত গান্ধীর নানান চিঠিতে স্পষ্ট হয় কিভাবে লবণবিহীন আহার্য নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা টলস্টয় ফার্মে গোষ্ঠীজীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল: লবণহীন আহার্যের অভ্যাস বজায় রাখতে গান্ধী কতটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন;[69] ফার্মের ছেলেরা রবিবার ছাড়া অন্য দিনগুলিতে লবণবিহীন আহার্য গ্রহণে সম্মতি জানিয়েছিল, এমনকি তাদের কয়েকজন জানিয়েছিল যে 'বিনা-লবণের আহারই ভালো';[70] শুধুমাত্র লবণবিহীন খাদ্য গ্রহণের শর্ত সাপেক্ষে গান্ধী ফিনিক্স আশ্রমে ছেলেদের ভর্তি নিয়েছিলেন।[71] লবণবিহীন খাদ্য গ্রহণের শপথ নিয়ে টলস্টয় ও ফিনিক্স ফার্মের আবাসিকেরা ধীরে ধীরে সপ্তাহে ছয়দিন লবণ ছাড়া থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। দুই-একজন তার ব্যতিক্রম হলেও কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষায় গান্ধী কোনো শৈথিল্য দেখান নি। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, লবণবিহীন খাবার থেকে কোনো ধরণের বিচ্যুতি আশ্রমবাসীদের নৈতিক ও শারীরিক সুস্থতাকে ব্যাহত করতে পারে।[72] কস্তুরবা যখন লবণযুক্ত খাবার আবার খেতে শুরু করেন এবং তাঁর পুরোনো রক্তক্ষরণের প্রকোপ ফিরে আসে, তখন গান্ধী স্বভাবতই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। গান্ধী অবশ্য

---

[66] Ibid., 94.

[67] Letter to Harilal Gandhi, 25 July, 1911, *CWMG*, Vol. XII, 8-9.

[68] Letter to Harilal Gandhi, July 25,1911, *CWMG*, Vol. XI, 129-31

[69] ক্যালেনবাখকে লিখিত ১৯১১-র ৫ এবং ৮ এপ্রিলের চিঠি: *CWMG*, Vol. XI, 325-326, 338. Letter to Hermann Kallenbach, April 5 & April 8 of 1911, ibid., 325,338.

[70] Ibid., August 20, 1911, *CWMG*, Vol. XII, 33.

[71] Ibid., August 27, 1911, ibid., 43; Gandhi also informed the same to Chhaganlal and Maganlal Gandhi: Letter to Chhaganlal and Maganlal Gandhi, August 23, 1911, ibid., 37.

[72] Letter to Hermann Kallenbach, October 29, 1911, ibid., 84.

নিশ্চিত ছিলেন না যে 'লবণকেই কি এর জন্য দায়ী করা যায়, হয়তো বা যায় না', তবুও তিনি লবণকেই দোষারোপ করেছিলেন।[73] কয়েক বছর পরে, শরীরের উপর লবণের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে তিনি আরো দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কারণ, শপথ গ্রহণের পর গান্ধী স্বয়ং একবার ['দশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সময়পর্বে'], ১৯১৪ সালে লণ্ডনে, লবণ মিশ্রিত আহার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেদিনেই তাঁর পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হয় এবং জীবনে প্রথমবার কাশির সাথে রক্ত দেখতে পান। তারপরে গান্ধী তাঁর নিজস্ব নিরাময় পদ্ধতি—লবণবিহীন খাদ্যাভ্যাসে ফিরে গিয়ে সেই ব্যথা থেকে মুক্তি পান, এমনকী অর্শের পুরোনো সমস্যা থেকেও আপাতভাবে স্বস্তি পেয়েছিলেন।[74]

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের লক্ষ্যে গান্ধীর জীবনে লবণ বিহীন আহার এক গভীর অঙ্গীকারে পরিণত হয়েছিল। লবণ বিহীন আহারের ব্যক্তিগত পরীক্ষাকে তিনি প্রাথমিকভাবে আশ্রমিক জীবনেও আবশ্যক করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লবণ বিহীন আহারকে কেন্দ্র করে গান্ধী এক্ষেত্রে বৈপরীত্যমূলক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন। একদিকে তিনি যেমন (সংখ্যাগরিষ্ঠের) সমর্থন পেয়েছিলেন, কারোর বা পূর্ণ সমর্পণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আবার তেমনই নিকটজনের থেকে কঠোর সমালোচনা এবং চিরতরে আত্মিক বিচ্ছেদের সম্মুখীনও হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে একদিকে তুলে ধরা যেতে পারে গান্ধী-ক্যালেনবাখের বন্ধুত্বকে ('আত্মার দোসর' বা 'Soulmate' ও বলা যেতে পারে), যাঁরা শুধু লবণবিহীন আহার্যই নয়, সেই আহার্যের উপযোগিতা এবং উৎকর্ষতার বিচারে সমান অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন।[75] অন্যদিকে লবণ-মুক্ত আহারের প্রতি গান্ধীর নিজের ব্যক্তিগত গভীর আসক্তি এবং আশ্রমে তার কঠোর আরোপিত অনুশীলন নিয়ে মিলি পোলকের মতো অনেকেই, এমনকি কস্তুরবা সহ পরিবারের সদস্যেরাও প্রশ্ন তুলেছিলেন (যদিও শেষে মেনে নিয়েছিলেন)। গান্ধী যদি পারিবারিক বৃত্তে কস্তুরবার প্রাথমিক আপত্তির মধ্যে মধুর স্মৃতির সন্ধান পেয়ে থাকেন, তাহলে লবণবিহীন খাদ্যের কঠোরতা প্রসঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলালের উগ্র সমালোচনা নিশ্চিতভাবেই তাঁর অন্যতম তিক্ত স্মৃতি হয়ে থাকবে।

---

[73] Ibid, September 9, 1911, 50; Gandhi also mentioned the same in his Letter to Maganlal Gandhi, September 9, 1911, ibid., 52.

[74] Letter to Maganlal Gandhi, October 25, 1914, ibid., 303.

[75] Shimon Lev, *Soulmates: The Story of Mahatma Gandhi & Hermann Kallenbach* (Hyderabad: Orient Blackswan, 2012). গান্ধী পরিহাসছলে এবং স্নেহবশত ক্যালেনবাখকে 'লোয়ার হাউস' এবং নিজেকে 'আপার হাউস' বলতেন। ক্যালেনবাখের পাশাপাশি নিকটাত্মীয় মগনলাল গান্ধীকেও গান্ধী নিয়মিত ভাবে লবণ-মুক্ত পরীক্ষা সম্পর্কে জানাতেন।

হরিলাল লবণ-সংযমের যৌক্তিকতা ও পন্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাঁর পিতাকে অন্যান্য আশ্রমিক ও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে 'আত্ম-প্রবঞ্চনার অনুশীলন' চারিয়ে দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন।[76] হরিলাল দ্ব্যর্থহীনভাবে গান্ধীকে জানিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র আত্ম-নিরীক্ষণ এবং 'অপরিগ্রহ, সাহস এবং অনাড়ম্বরতা'র মতো নানাবিধ মানবীয় গুণাবলীর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংযমই কোন ব্যক্তির পক্ষে নৈতিকভাবে লাভজনক হতে পারে। যারা মানবিক গুণসমূহ ও সাধুর নৈষ্ঠিক গুণাবলী বিবর্জিত তেমন লোকেদের প্রতি হরিলাল সংশয়ী ছিলেন; শুধুমাত্র তাদের লবণবিহীন আহার গ্রহণকে তিনি 'আত্ম-সংযম' নয়, বরং দ্বিচারিতার নামান্তর বলে নিন্দা করেছিলেন। তিনি গান্ধীকে লিখেছিলেন, "তারা মনে করে, তারা আত্ম-সংযম প্রাপ্ত হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরভাব তাদের মধ্যে প্রকাশিত। তারা নিজেদেরকে সবার থেকে উত্তম মনে করে, যদি সবার থেকে নাও হয়, তাহলে অন্তত যারা লবণ এড়িয়ে চলে না তাদের থেকে তো বটেই।" হরিলালের সোচ্চার যুক্তিতে, লবণবিহীন আহারের শপথ ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু পুরুষ ও নারীদের ব্রত পালনের চেয়ে আলাদা কিছু নয়, যেহেতু তাদের নির্জলা উপবাস রাখতে হয়। তাছাড়া, কিছুজনকে ব্যতিক্রম ধরলে, অন্যান্যদের যথাযথ [লবণ-বিহীন আহার্যের] প্রতিজ্ঞা রক্ষার গুণ ছিল না বলেই হরিলাল সংশয় ব্যক্ত করেছিলেন। এই ধরনের সংযম তাই 'চরিত্রের দৃঢ়তা বা নীতিবোধ তুলে ধরে না'— এমন রূঢ় মন্তব্যের সাথে পিতার প্রতি হরিলালের সমালোচনা-পত্র শেষ হয়েছিল। লবণ বিহীন আহারের মধ্যে গান্ধী অস্বাদের যে নৈতিক অনুশীলনের আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তার প্রতি হরিলালের তীব্র বিতৃষ্ণাই এখানে পরিলক্ষিত হয়েছিল।[77] পিতার আদর্শে একসময়ে সম্পূর্ণ সমর্পিত হরিলাল বিবিধ বিষয়ে বঞ্চনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের আদর্শগত ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং মহাত্মার থেকে জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলাল পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। জাতির জনক মহাত্মা আপন আদর্শে দেশকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ব্যক্তি জীবনে পিতা হিসেবে ব্যর্থ হয়েছিলেন— নিজ আদর্শ ও নৈতিকতার অনুশীলনে পুত্র হরিলালকে দীক্ষিত করতে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের লাবণ্য যে হারাতে বসেছিল তা লবণ বিহীন আহারকে কেন্দ্র করে মতান্তরের মধ্য দিয়েও পরিলক্ষিত হয়।

---

[76] Appendix 1, Harilal's Semi-public Letter, in Chandulal Bhagubhai Dalal, *Harilal Gandhi: A Life*, Edited and Translated by Tridip Suhrud (New Delhi: Orient Longman, 2007), 138-139.

[77] Ibid.

ব্যক্তিগত এই আঘাত সত্ত্বেও গান্ধী নিজের বিশ্বাসেই স্থিত ছিলেন। শরীরের জন্য কতটা লবণ উপযোগী, না কি লবণ রহিত আহারই উপযুক্ত, তা বোঝার প্রয়াস আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বেও অব্যাহত রেখেছিলেন। মীরাবেনকে লেখা চিঠিতে ১৯৩০-এর ডিসেম্বর বা ১৯৩১-এর চিঠিতে গান্ধী স্বেচ্ছায় সামান্য লবণ গ্রহণ করছেন বলেই জানিয়েছিলেন।[78] আবার ১৯৩২-এর মার্চ থেকেই মীরাবেনকে তিনি লবণ রহিত আহার্যের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[79] মীরাবেন প্রায় আট মাস ধরে এই লবণহীন অনুশীলন অব্যাহত রেখেছিলেন। অন্যদিকে ৮ই জুন থেকেই গান্ধী পুনরায় ধারাবাহিক লবণহীন আহারের অনুশীলন শুরু করেছিলেন।[80] সপ্তাহ দুয়েক পরে অবশ্য গান্ধী লবণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। লবণ শূন্য আহারে শরীরের ওজন কমে— এই যুক্তিতে কারাবন্দী গান্ধীকে যারভেদা জেলের কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বিরত করেছিলেন।[81] জুলাই মাসে মীরাকে লেখা চিঠিতে গান্ধী জানাচ্ছেন যে, লবণ বিহীন আহারের সুফল প্যারেলাল (ব্যক্তিগত সচিব) পাচ্ছেন ও তা অব্যাহত রেখেছেন। মীরাবেনকেও ফললাভের জন্য যেন অন্তত এক বছর এই পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন।[82] ১৯৩২-এর ডিসেম্বর থেকে গান্ধী আবারো লবণ বিহীন আহার গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন এবং প্রায় তিনমাস তা অব্যাহত রেখেছিলেন।[83] গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন জুড়ে লবণকে কেন্দ্র করে এমনই আবিষ্টতার উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়। গান্ধী, যিনি লবণ রহিত আহার গ্রহণ করতেন, তিনিই আবার ভারতীয়দের লবণ বঞ্চনার দাবিতে দেশজুড়ে গণ আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন— এই বৈপরীত্যের কারণ কি? ব্রহ্মচর্য ও সত্যাগ্রহের সাথে লবণ সংযোগের (বা শূন্যতার) মাত্রাটি বা কিভাবে এখানে নির্ধারিত করেছিলেন? বলাবাহুল্য যে, এই প্রশ্নগুলি বহুতর সম্ভাবনার দিকে নির্দেশ করে। মনোসমীক্ষণ ও ধর্মীয় সংস্কৃতি বিশ্লেষণের সূত্রে তেমনই এক সম্ভাব্য দিক এখানে খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

ব্রিটিশ আরোপিত লবণ কর ভারতীয়দের লবণ সহযোগে আহার থেকেই বঞ্চিত করেছিল, খাদ্যগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সাধারণ গরিব মানুষের আহারে লবণ-বঞ্চনার জন্যই কি

---

[78] Letter No. 125, 20 December, 1930; Letter No. 128, 12 January, 1931, in *Bapu's Letters to Mira, 1924-1948* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1949), 141, 150.

[79] Letter No. 149, 26 March, 1932, ibid.,176.

[80] Letter No. 157, 8 June, 1932, ibid.,192.

[81] Letter No. 159, 22 June, 1932, ibid.,195.

[82] Letter No. 161, 14 July, 1932, ibid.,198.

[83] Letter No. 193, 22 December, 1932; মীরাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি এক সপ্তাহ আগে লবণ-বিহীন আহার থেকে বিরতি নিয়েছেন: Letter No. 205, 17 March, 1933, ibid.,198, 255.

গান্ধী সমানুভূতিতে ‘অস্বাদ’ তথা লবণ রহিত আহার্য গ্রহণ করতেন? মনোসমীক্ষণের প্রেক্ষিত থেকে এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা মিলতে পারে। গান্ধী স্বয়ং লবণহীন আহার্য গ্রহণ করলেও বিপুল সংখ্যক ভারতীয় জনতার কাছে লবণ ছিল অপরিহার্য। আর লবণ বিহীন আহার গ্রহণ করার জন্যই গান্ধীর পক্ষে লবণ করের বিরোধিতাও সহজতর হয়েছিল। জনতার সেবক বা নেতা (উভয় ভূমিকাকেই গান্ধী একই ভাবতেন) হিসেবে তিনি নিজের জন্য নয়, অপরের জন্যই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[84] দরিদ্রদের বঞ্চনা ও দুর্দশার কারণেই গান্ধীর কাছে ব্রিটিশ আরোপিত লবণ কর সবচেয়ে নিকৃষ্ট গণ্য হয়েছিল; ভারতীয়দের লবণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম গান্ধীর কাছে মানবাধিকারের সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল।

ব্রহ্মচর্যের সাথে জড়িত গান্ধীর লবণবিহীন খাদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিভাবে সত্যাগ্রহীর জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল সেই প্রসঙ্গ ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। গান্ধীর কাছে লবণবিহীন খাদ্য ছিল রসনার নিয়ন্ত্রণ তথা ‘অস্বাদ’, যা সত্যাগ্রহীর গ্রহণীয় ও অবশ্যপালনীয় এগারো শপথের মধ্যে অন্যতম।[85] ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এই শপথগুলির মধ্যে ‘অস্বাদ’ তথা রসনার নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কঠিন ছিল, কারণ সবার মতো তিনিও সুস্বাদু আহার পছন্দ করতেন।[86] অন্যদিকে শপথের অর্থ তিনি ব্যক্ত করেছিলেন “A vow means unflinching determination, and helps us against temptations.”[87] সুতরাং লবণবিহীন আহার তথা অস্বাদের শপথ, গান্ধীয় ভাবনা অনুসারে, সত্যাগ্রহীর অবিচল সংকল্প তুলে ধরে এবং প্রলোভনের ইন্ধন বা temptations থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এই প্রলোভনের ইন্ধন বা temptations কি তা বুঝতে ব্রহ্মচর্য ধারণাকে খানিক তলিয়ে দেখা দরকার।

গান্ধীর ব্রহ্মচর্য ধারণা যৌনতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ তথা যৌন অনুভূতি-শূন্য হয়ে ওঠার ভাবনায় ও অনুশীলনে নির্ধারিত ছিল। যৌন-বাসনা যে প্রবল শক্তিতে মানুষের ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকে পরাভূত করে এবং তার অনুষঙ্গে বীর্যক্ষরণে শুধু দৈহিক নয়, আত্মিক শক্তিক্ষয়ও হয়— এমন ধারণাতেই গান্ধী বিশ্বাস করতেন। সুতরাং

---

[84] E. Victor Wolfenstein, *Revolutionary Personality Lenin, Trotsky, Gandhi* (Princeton: Princeton University Press, 1971), 220.

[85] Gandhi’s eleven vows Satya (Truth), Ahimsa (Non-violence), Brahmacharya (Chastity), Aswada (Control of the Palate), Asteya (Non-stealing), Asangraha (Non-possession), Sarvatra Bhayvarjana (Fearlessness), Sparshbhavana (Remove untouchability), Sharirshrama (Bread labour), Sarva Dharma Samanatva (Equality of all religions), Swadeshi (Use locally made goods)

[86] Verrier Elwin, *The Tribal World of Verrier Elwin: An Autobiography* (Oxford University Press, 1964), 53.

[87] M. K. Gandhi, *From Yeravada Mandir Ashram Observances* (Ahmedabad: Navajiban, 1992 (1932)), 29.

সত্যাগ্রহী পুরুষকে তার জীবনচর্যায় সতর্ক হয়ে কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে এই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ, তার ব্যত্যয় ঘটলে পুরুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশ ও জাতির সেবা করা সম্ভব হবে না।[88] গান্ধীর এই বদ্ধমূল ধারণার মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে হিন্দু সমাজের একাংশে অন্তর্নিহিত এক উদ্বেগ যেন ধরা পড়ে। সেই উদ্বেগ হল এক বিন্দু বীর্য তৈরি হতে নাকি চল্লিশ দিন চল্লিশ ফোঁটা রক্তের প্রয়োজন হয়![89] লবণ কি তাহলে গান্ধীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণের বা যৌনতা-শূন্য হয়ে ওঠার সাথে সম্পর্কিত ছিল? লবণের দুই মৌলিক প্রতীকী তাৎপর্যের অন্যতম হল 'লবণ মানুষের বীর্য'।[90] মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, গান্ধীয় অবচেতনে যদি লবণের এহেন অর্থ নিহিত থাকে, তাহলে তাঁর লবণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা একপ্রকার যৌনসংযমের উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। একইভাবে, লবণ সত্যাগ্রহের প্রেক্ষিতে, ব্রিটিশদের কাছ থেকে গান্ধীর লবণ [অধিকার] ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম ভারতীয় জনতার হৃত পৌরুষ ও [যৌন] সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রকল্প হয়ে ওঠে। লবণ উৎপাদনের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য [মনোপলি] কায়েম করে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের পৌরুষ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। গান্ধী, সেই একচেটিয়া অধিকার ভেঙ্গে দিয়ে ভারতীয় জনগণের পৌরুষ পুনরুদ্ধারের জন্য, শাস্তি ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিলেন। লবণ সত্যাগ্রহ ছিল আত্মত্যাগী প্রকল্প যার জন্য গান্ধী আহারে লবণ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং যা ব্রহ্মচর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।[91]

যৌনতার নিয়ন্ত্রণ বা যৌনতা-মুক্ত হয়ে ওঠার সাথে লবণের সংযোগ গান্ধী সরাসরি ব্যক্ত করেননি। কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুগামীদের মধ্যে, যারা লবণমুক্ত আহারের প্রতি আবিষ্ট ছিলেন, তার প্রতিফলন দেখা যায়। লবণমুক্ত আহার্যের প্রতিজ্ঞা তথা যৌনতার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য তাঁদের আচরণ মাঝে মাঝেই অন্যদের চোখে অস্বাভাবিক বলে গণ্য হত। গান্ধীর শিষ্যা মিরা বেনের আমন্ত্রণে দ্বিপ্রাহরিক আহার করতে গিয়ে এমনই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার স্বাক্ষী হয়েছিলেন খ্যাতনামা নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলউইন। মীরা তখন বোম্বের সমুদ্র সৈকতে একটি আবাসনে থাকতেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতার পর আহার পরিবেশন করার সময় মীরা

---

[88] See 'Nakedness, Non-violence, and Brahmacharya: Gandhi's Experiments in Celibate Sexuality', in Vinay Lal, *Of Cricket, Guiness and Gandhi: Essays on Indian History and Culture* (New Delhi: Penguin,2003) 114-153.

[89] G. Morris Carstairs, The Twice-Born, A Study of a Community of High-Caste Hindus (Bloomington: Indiana University Press, 1961) 83. Also cited in Vinay Lal, ibid., 133.

[90] Ernest Jones, "The Symbolic Significance of Salt," in *Essays in Applied Psycho-Analysis* II (New York, 1964), 43-44.

[91] E. Victor Wolfenstein, *Revolutionary Personality: Lenin, Trotsky, Gandhi* (New Jersey: Princeton University Press, 1971), 220-221.

আকস্মিকভাবেই তাঁর ঘরগুলির জানালা বন্ধ করে দেন। বেশ গরম থাকায় ভেরিয়ার মীরাকে জানালা খোলার অনুরোধ জানালে তিনি একটু রূঢ়ভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। নিজকর্মের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে মীরার সোজাসাপটা যুক্তি ছিল যে, সমুদ্রের বাতাস-বাহিত লবণের কণা খাবারের উপর পড়তে পারে এবং তাতে ভেরিয়ারের পক্ষে নিজের যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে![92]

গান্ধীর ব্রহ্মচর্য ভাবনার উৎস শুধু হিন্দু প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে বহুধর্মীয় ভাবনা এবং ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ভূত চিন্তাধারার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। গান্ধীর ব্রহ্মচর্য গ্রহণের কারণ হিসেবে তাঁর নিজের বিচারবোধ এবং হিন্দুধর্মর পাশাপাশি ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের উদ্ভূত চিন্তাপ্রবাহ কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।[93] তবে গান্ধীর ব্রহ্মচর্য ভাবনায় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রভাবেই লবণ রহিত আহার্যের সংযোগটি জোরালো হয়ে ওঠে বলেই মনে হয়। এই গবেষণায় তার দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা তুলে ধরা হল।

প্রথমত, লবণ-মুক্ত আহার্য গ্রহণে গান্ধীর অন্যতম প্রেরণা হয়েছিলেন পেশায় জহুরী ও পরম জৈন ধার্মিক শ্রীমদ রাজচন্দ্র। তরুণ গান্ধীর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক 'রাজচন্দ্রভাই' আহার প্রসঙ্গে চূড়ান্ত ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের তথা আত্ম-সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, কাম-বাসনার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের সাথে আহার্যে আত্ম-সংযমের নীতি ওতপ্রোত জড়িত। তিনি নিজের আহার্যে রসনা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিবাহিত জীবনে যৌনবাসনা নিয়ন্ত্রণে 'কঠোর ব্রহ্মচর্য' পালন করতেন।[94] গান্ধী আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে 'আধ্যাত্মিক সংকটে' 'পথপ্রদর্শক ও সহায়তাকারী' রাজচন্দ্রভাইয়ের শরণ নিতেন। জৈন ধর্মীয় ঐতিহ্যে শরীর ও মনের শুচিতা, প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থনার উদ্দেশ্যে নৈতিক কৃচ্ছসাধনের অঙ্গরূপে অনশনের পাশাপাশি 'রস পরিত্যাগ'-এর রীতি প্রচলিত। বিনা আহার্য গ্রহণকে যেমন অনশন বলা হয়, তেমনই 'রস পরিত্যাগ' হল প্রিয় স্বাদের ও স্বাদযুক্ত আহারের দমন ও বর্জন। বিভিন্ন স্বাদের অন্যতম লবণের বর্জনও এই রস পরিত্যাগের

---

[92] ভেরিয়ের এলউইন সবরমতীতে গান্ধী ও অন্যান্য আশ্রমিকদের সাথে উল্লেখযোগ্য সময় কাটিয়েছিলেন। মীরা বেন-এর সাথে তার আহার-সাক্ষাৎ-এর বিবরণ রয়েছে 'Saints and Satyagrahis' শীর্ষক অধ্যায়ে Verrier Elwin, *The Tribal World of Verrier Elwin: An Autobiography* (New York: Oxford University Press, 1964), 56.

[93] Patricia Caplan, "Celibacy as a Solution? Mahatma Gandhi and Brahmacharya," in Patricia Caplan ed. *The Cultural Construction of Sexuality* (London: Routledge, 1987), 286.

[94] Uma Majumdar, *Gandhi and Rajchandra, The making of the Mahatma* (Lexington Books, 2020), 43.

অন্তর্ভুক্ত ছিল।[95] রাজচন্দ্রভাইয়ের প্রভাবেই গান্ধী জীবনের দীর্ঘ সময় আত্ম-সংযমের অনুশীলনে লবণ-বিহীন আহারও গ্রহণ করেছিলেন।[96] দ্বিতীয়ত, প্রাচীন আয়ুর্বেদ মতে আহার্য তিন গুণে সমন্বিত, যথা- সত্ত্ব, তমো, এবং রজো গুণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই গুণত্রয় সাংখ্য দর্শনে 'অস্তিত্বের মাধ্যম' রূপে দার্শনিক ও মানসিক ধারণায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।[97] গীতায় এই ত্রিগুণের প্রভাবে কিভাবে জীবাত্মার মধ্যে আসক্তি, অভিমান জন্ম নেয় ও জীবাত্মাকে আবদ্ধ হতে হয় তা বিবৃত হয়েছে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে এই তিন গুণের আধারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে লবণাক্ত স্বাদের আহারকে রজোগুণের ধারক যা প্রবৃত্তির জনক, এবং দুঃখ, বিষণ্ণতা ও শারীরিক রোগব্যাধির কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে।[98] রজোগুণের বৃদ্ধি যে লোভ, লালসা, বাসনাকে জাগিয়ে তোলে তা এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে।[99] গান্ধী রচিত গীতা ভাষ্যেও স্বভাবতই লবণ বিহীন আহার্য এই তাৎপর্যে উল্লেখ রয়েছে। অর্জুনের জিজ্ঞাসায় ভগবান কৃষ্ণের উত্তরকে উদ্ধৃত করে গীতা ভাষ্যতে গান্ধী লিখেছেন যে, দীর্ঘায়ু প্রদানে সহায়ক এবং শক্তি, সামর্থ্য ও স্বাস্থ্যবর্ধক যে আহার তা সাত্ত্বিক আহার। রাজসিক আহার তীব্র তিক্ত, অম্ল, লবণাক্ত, উষ্ণ এবং কটুস্বাদের এবং তা শরীরের রোগ-ব্যথার প্রকোপ বাড়ায়। আর বাসি, দুর্গন্ধযুক্ত এবং অপরের অবশিষ্ট আহার্য তামসিক আহার রূপে পরিচিত।[100] এই ভাবনার আলোকে দেখলে, ভারতীয়দের জীবনে লবণের বস্তুগত বাস্তবিক বঞ্চনার প্রতিকার করতে গান্ধী যে সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করেছিলেন তাতে লবণ রহিত হওয়া তথা লবণের প্রতি অনাসক্তি যেন এক প্রাক-শর্ত হয়ে ওঠে। এ ও এক অদ্ভুত সমাপতন যে, সবরমতি থেকে ডান্ডির উদ্দেশ্যে যেদিন তিনি নির্গত হয়েছিলেন, ১৯৩০-এর ১২ মার্চের সেই দিনটিতেই, মহাত্মাকৃত গীতা ভাষ্য 'অনাসক্তি যোগ' প্রকাশিত হয়েছিল।

---

95 Jagmanderlal Jaini, *Outlines of Jainism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1916), 131.

96 Ibid.79, 98.

97 সাংখ্য দর্শনে এই তিন গুণ তিন 'ভাব' [মানসিক গুণ অতিরিক্ত] অর্থেও প্রকাশিত। Gerald James Larson, *Classical Saṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning* (Delhi: Motilal Banarasidas, 2001), 49.

98 কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিন।/ আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ।।৯।।/ সপ্তদশ অধ্যায়, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* [গীতা মধুকরী], শ্রী শ্রীমৎ কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামী কর্তৃক বাংলায় বিরচিত (কলিকাতা: প্রকাশক আশুতোষ দাস ১৩২১), ৫৭৮।

99 লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।/ রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভারতর্ষভ ।।১২।। / চতুর্দ্দশ অধ্যায়, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* তদেব, ৫২১।

100 Mahadev Desai, *The Gita According to Gandhi* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, August, 1946), 213 [e-book].

।।৩।।

গণকল্পনা ও জল্পনায় লবণ: মহাত্মার মাহাত্ম্য

গান্ধী রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় নৈতিকতার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। রাজনীতি ও ধর্মের সংযোগ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও গান্ধী ভাবনায় উভয়ে অবিচ্ছেদ্য। ধর্ম গান্ধীর ক্ষমতার অন্যতম মৌল আধার; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে এবং ভারতের ওপর তাঁর অবিসংবাদী প্রভাবেরও অন্যতম উৎস রূপে ঐতিহাসিকেরা গণ্য করেন। গান্ধীর গভীর ধর্মপ্রাণতাই তাঁকে নৈতিক শক্তি ও দৈহিক বল জুগিয়েছিল, যে কারণে সুদীর্ঘ সময়পর্বের সংগ্রাম, পরাজয় এবং বন্দীদশার সহনে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।[101] গান্ধী বরাবরই নিজের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক ও ধারণাকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতেন এবং তাঁর আন্দোলনও এক ধর্মীয়-নৈতিক রূপ পরিগ্রহ করত। বলাবাহুল্য তাঁর এই নৈপুণ্যের ওপরেই জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা নির্ভর করত। অন্যদিকে সাধারণ জনতা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতাহীনতার নিরিখে গান্ধীকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী বলেই ভাবত। আমজনতার কল্পনাতে গান্ধী হয়ে উঠেছিলেন এক মুক্তিদাতা, যিনি সাধারণকে দুর্দশা-শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণের এই মহাত্মা প্রকৃত গান্ধী নন, বরং তাদের কল্পনার প্রতিরূপ তিনি। অথচ জনতা ভেবে নিত তারা যা করছে তার বিধান আসছে এই কল্পনার মহাত্মা থেকেই।[102] লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই ধারণার বাত্যয় হয় নি। ভারতীয় জনমানসের কল্পনায় গান্ধীর দৈবপ্রেরিত মুক্তিদাতার ভাবমূর্তি এবং লবণ কিভাবে মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল— সেই প্রসঙ্গ পৃথক ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দাবি রাখে। বর্তমান আলোচনায় তার এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হল।

লবণ প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সমুদ্রোপকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রাকে ‘তীর্থযাত্রা’, সত্যাগ্রহীদের লবণ উৎপাদনকে তিনি ‘যজ্ঞ’ রূপে অভিহিত করেছিলেন। লবণ আইন অমান্য করে বন্দীত্বের দশায় জেলকে ‘মন্দির’ রূপে গান্ধী অভিহিত করেছিলেন।[103] লবণ আইন ভঙ্গের আগে সমুদ্রে স্নান করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ‘আইন

---

[101] See, ‘Gandhi’s Religion’ in David Arnold, *Gandhi: Profiles in Power* (USA: Routledge, 2001), 165.

[102] Sahid Amin, ‘Gandhi as Mahatma…’ 1989, 1-61.

[103] গান্ধী বর্ণিত তীর্থযাত্রা ও যজ্ঞ প্রসঙ্গ রয়েছে: Speech at Dandi, April 5, 1930, *CWMG*, Vol. XLIX, 15-19; ১৯৩০-এ লবণ আইন অমান্যের ফলশ্রুতিতে পুনের ইয়েরওয়াড়া কারাগারে বন্দি হলে গান্ধী তা ‘ইয়েরওয়াড়া মন্দির’ বলে অভিহিত করেছিলেন: M. K. Gandhi, *From Yeravada Mandir*, 1932.

অমান্যের এই ধর্ম যুদ্ধ লবণ-জলে স্নান করে আমাদের নিজেদের শুদ্ধকরণ করার পরেই শুরু করা উচিত'।[104] জনগণের কেন লবণ আইন অমান্য করা উচিত তার ব্যাখ্যাতেও তিনি নৈতিক-আধ্যাত্মিক ধারণাকেই তুলে ধরেছিলেন। যেমন, ১৯৩০-এর ২৬ এপ্রিল, গুজরাটের ছরবাড়াতে এক জনসভায় গান্ধীর উদ্দেশ্যে জনতা 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' এর পাশাপশি 'মিতকাকা চোর কি জয়' বা 'নমক চোর কি জয়' বলে নতুন জয়ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল। জনতা প্রদত্ত এই নতুন নাম গান্ধীর বেশ পছন্দ হয়েছিল। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি জানিয়েছিলেন যে, 'মহাত্মা আজকাল যে কেউ হতে পারেন, কিন্তু নমক চোর হওয়া সহজ কথা নয়'। ধারাসানার লবণ গোলা থেকে নমক চুরি করতে পারলে কেউ আর 'নমক চোর' থাকবেন না, সবাই 'নমকের মালিক' হয়ে উঠবেন। যদিও সেই লবণ নিতে গিয়ে কঠিন ক্লেশ সইতে হবে; মাথাও ফাটতে পারে। কিন্তু সেই আঘাত সহ্য করতে হবে, শান্ত থাকতে হবে। ঈশ্বর তখনই ক্ষমাসুলভ চোখে চাইবেন। গান্ধী নিজেই লবণ চোর হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলে জানিয়েছিলেন। আর কেউ যদি সত্যিই গান্ধীর মতো লবণ চোর হতে চায় তাহলে তাকে নিজেকে আগে শুদ্ধ করতে হবে।[105] গান্ধী দর্শিত পথেই কংগ্রেস নেতৃত্বও লবণ আইন অমান্য আন্দোলনকে ধর্মীয় অনুষঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

বাংলায় আইন অমান্য পরিষদের সভাপতি, গান্ধীবাদী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত যেমন জনতার উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন যে, আইন অমান্য এক 'পবিত্র ও ধর্মীয় আচার-রীতি' সর্বস্ব কর্মকাণ্ড. লবণ আইন অমান্য প্রত্যক্ষ করতে কৌতুহলী জনতার উদ্দেশ্যে তিনি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন: 'এই যজ্ঞে শুধুমাত্র যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরই উপস্থিত থাকার অধিকার আছে'। [...] 'দেশের জন্য কঠোর তপস্যারত সত্যাগ্রহীদের' অবাঞ্ছিত চিৎকার-হট্টগোলে মনসংযোগ নষ্ট না করার আর্জি জানিয়েছিলেন।[106] স্থানীয় স্তরেও নেতৃত্ব সেই পথেই আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। কাঁথি মহকুমা রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক যেমন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, 'মহাত্মা গান্ধীর সেনাপতিত্বে ১২ মার্চ্চ ভারতে নিরস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই ধর্ম্মযুদ্ধে আমাদের কোন কর্তব্য আছে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য [...] কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয় গৃহে কর্ম্মী সম্মিলনী

[104] Francis Watson, *The Trial of Mr. Gandhi*, 1969, cited in David Arnold, *Gandhi*, 147.

[105] *Amrita Bazar Patrika*, April 26, 1930.

[106] *Amrita Bazar Patrika*, April 5, 1930.

হইবে।”[107] তবে এখানে অবশ্যই লক্ষণীয় হল, হিন্দু ধর্মীয় অনুষঙ্গেই আন্দোলনের নৈতিক-আধ্যাত্মিক রূপ জনতার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল।

হিন্দু মহাকাব্যিক-পৌরাণিক চরিত্র এবং কীর্তির নিরিখে গান্ধীর লবণ আইন অমান্যকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতাও কংগ্রেসের প্রচারে পরিলক্ষিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃত্ব থেকে সাধারণ স্থানীয় নেতৃত্ব যেমন সচেতনভাবেই এই প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। মতিলাল নেহরু যেমন, গুজরাতের জাম্বুসারে এক জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাতে, রামায়ণের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় লবণ সত্যাগ্রহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন। গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযানকে রামচন্দ্রের ‘ঐতিহাসিক’ লঙ্কা অভিমুখে যাত্রার সাথে তুলনা করে তিনি উপস্থিত জনতাকে জানিয়েছিলেন যে, ভাবীকালের কাছে গান্ধীর লবণ যাত্রা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং তার যাত্রাপথ পবিত্র বলে গণ্য হবে।[108] লবণ সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতৃত্বের প্রচারেও ধর্মীয় রূপকের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ রাজের তীব্র সমালোচনায় হিন্দু ধর্মীয় আখ্যানের দুষ্ট চরিত্র যথা- রাবণ, কংস, দানব, শয়তান, পাপাত্মা ইত্যাদির উপমা তুলে ধরা হয়েছিল। অন্যদিকে গান্ধী যেন সেই দুষ্টের বিনাশে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে আনবেন এমনই প্রতিশ্রুতি তাদের বক্তৃতায় পরিলক্ষিত হয়। উত্তরপ্রদেশ জুড়ে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতৃত্বের এমন জোরালো প্রচার পরিলক্ষিত হয়।[109]

১৯৩০-এর এপ্রিলে কানপুরে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা বালকৃষ্ণ শর্মা তাঁর বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন যে, ‘শয়তান’ সরকারকে ধ্বংসের জন্যই লবণ আইন অমান্য করতে গান্ধী সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গ উপলক্ষে, ৬ এপ্রিল, মীরাটে ইন্দ্র মণি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, ভগবান কিভাবে শয়তানের বিনাশ করেন ধর্মপুস্তক তা তুলে ধরে। তাহলে ভগবান কেন ব্রিটিশদের ধ্বংস করছেন না— তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না! এপ্রিল মাসেই লখনৌতে সাত হাজার লোকের জমায়েতে ভগবান দীন নামে জনৈক বৃদ্ধ কবিতায় প্রভু রাম এবং কৃষ্ণের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন অযথা বিলম্ব না করে পাপাত্মাকে নিধন করতে, কারণ এ তো তাদেরই দেশ![110] কানপুরে ১৩ সেপ্টেম্বর রামশঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী

[107] *নীহার*, ২৫ মার্চ ১৯৩০।

[108] *Liberty*, March 25, 1930.

[109] William Gould, *Hindu Nationalism and the Language of Politics in Late Colonial India* (UK: Cambridge University Press, 2004),

[110] Ibid., 70-71.

করেছিলেন যে, সরকার রাবণের মতই ধ্বংস হবে। অক্টোবরের মাঝামাঝি কানপুরের ইটারা-তে মনবোধন সিং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, রাম যেমন রাবণকে ধ্বংস করেছিলেন তেমনই গান্ধী এই সরকারকে ধ্বংস করবেন। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারিতে আলিগড়ে এক বক্তৃতায় গান্ধী কৃষ্ণের অবতার রূপে বর্ণিত হয়েছিলেন। আর দৈব শক্তিতে তিনি অনায়াসে ব্রিটিশ বুলেটকে নিষ্ক্রিয় করতে পারেন বলে প্রচারিত হয়েছিল। ১৯৩১-এর জুনে এলাহাবাদের পতরপুর গ্রামে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা গান্ধী এবং সরকারকে কৃষ্ণ এবং কংসের সাথে তুলনা করে ছিলেন।[111] এমনই সব উদাহরণ তুলে ধরে ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ সরকারি নথিতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছিল যে আইন অমান্য আন্দোলন 'হিন্দু' চরিত্রের হয়ে উঠেছিল। উত্তরপ্রদেশের গভর্নর হেইলে যেমন, আইন অমান্য আন্দোলনকে 'বিদেশি প্রভাবের বিরুদ্ধে এক হিন্দু আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।[112] কংগ্রেস নেতৃত্বে প্রচারে অবশ্য গান্ধীর নেতৃত্বকে মহিমান্বিত করার প্রয়াস মুখ্যত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জনমানসের কল্পনায় গান্ধীর সংগ্রামের আয়ুধ রূপে লবণও বর্ণময় হয়ে ওঠে। আন্দোলনের পর্বে রচিত সাহিত্য, বিশেষত রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত সাহিত্যকর্মতে (proscribed literature) মহাত্মার দৈব-মাহাত্ম্যের সাথে সাথে লবণকে কেন্দ্র করে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের নানা মাত্রাও ফুটে ওঠে।

রাজদ্রোহের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকারের বাজেয়াপ্ত সাহিত্য কর্মে গান্ধীর এই হিন্দু ধর্মীয় পরিত্রাতার রূপ পরিলক্ষিত হয়। *গান্ধী-কি-জয়* শীর্ষক তামিল পুস্তিকাতে গান্ধীকে ভারতের গুরু রূপে বন্দিত হয়েছিলেন। গান্ধীকে ঈশ্বর ভারতভূমিতে প্রেরণ করেছেন দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করতে। ১৯৩১-এ প্রকাশিত তামিল পুস্তিকা *গান্ধী পাত্তু*-তে (গান্ধী গীত) স্বরাজ আনয়নের জন্য 'কলিযুগে' গান্ধী অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। *দেশভক্তর গীতম* (দেশভক্তর গান) শীর্ষক তামিল গ্রন্থে লেখক এস. বিশ্বনাথ দাস গান্ধীকে রক্ষাকর্তা রামচন্দ্র রূপে বর্ণনা করেছিলেন যিনি ব্রিটিশ রাজ তথা 'রাবণের' অশুভ প্রকোপ থেকে মুক্তির জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।[113] গোরখপুরের এক স্থানীয় কবির বর্ণনায় গান্ধী সাক্ষাৎ কৃষ্ণাবতার, এবং তার নমকচুরি কৃষ্ণলীলার মাখন চুরির সমার্থক হয়ে ওঠে।[114] ব্রিটিশ বাজেয়াপ্ত বাংলা সাহিত্যেও মহাত্মা কৃষ্ণাবতার রূপে বর্ণিত

---

[111] Ibid., 72-73.

[112] Ibid., 46.

[113] *গান্ধী-কি-জয়, গান্ধী পাত্তু, দেশভক্তর গীতম* প্রসঙ্গে দেখুন, V. Venkatraman, Kaliyuga Prahalatha: The Personification of Mahatma Gandhi in the Seditious Literature of the Madras Presidency, 1920-1933 in *SSRN Electric Journal*, August 2018, 1-12.

[114] 'Krishnavtar ab Gandhi avtaar hain', Sangrahkarta Umacharan Lal, Gorakhpur, 1931, Cited in Sahid Amin, 'The Pedagogy of Nationalism', *Seminar*, issue no. 686, October 2016, 37.

হয়েছিলেন: “বাস্তবে করিতে তারে পরিণত এসো বারে,/ সুদর্শনে নাশ তারে বিশ্বে ত্রাস যে দিতেছে।।”[115] আমজনতার কল্পনায় লবণও যে নিছক দ্রব্য নয়, বরং দৈব গুণ সম্পন্ন উপাদান এমনই দ্যোতনা পরিলক্ষিত হয়। লবণ আইন অমান্যের জন্য গুজরাতে মহিলারা ভজন সঙ্গীতে তুলে ধরেছিলেন- “ডাণ্ডি দরিয়া কিনারে মোহন মিথুন বানায়োবে” ।[116]

লবণের প্রয়োজনীয়তার অনুষঙ্গ তুলে ধরে জনতাকে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন সত্যাগ্রহীরা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব মানুষের কাছেই যে লবণ অপরিহার্য এবং একদিনও যে লবণ ছাড়া অতিবাহিত হয় না তা অন্ধপ্রদেশের লবণ আইন অমান্যকারীরা গানে তুলে ধরেছিলেন। “ডালে, চাটনিতে/ তরকারিতে, রসমে/ সাম্বারে, ঘোলে... জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একদিনও আমরা লবণ ছাড়া বাঁচতে পারি না—হে ঈশ্বর।”[117] ভারত লবণের উৎসে সমৃদ্ধ কিন্তু তারপরেও বিদেশি লবণের ব্যবহার কেন অব্যাহত সেই প্রসঙ্গে দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) ফুট কেটে লিখেছিলেন: “জলে নুন, স্থলে নুন-নিমকের দেশে।/ আসিছে বিদেশী নুন জাহাজেতে ভেসে।”[118] লবণ করের যৌক্তিকতা, লিভারপুল লবণের গুণমান নিয়ে তিনি খোঁচাও দিয়েছিলেন: “লিভারপুলের নুনে বৃদ্ধি লিভারের।/ শুল্কের তাড়শে প্রাণ যায় ভারতের।”[119] দেশীয় নুনের তুলনায় বিদেশি লিভারপুল লবণকে বিদ্রূপ করে ‘নুণায়ন’ কবিতায় লেখা হয়েছিল “খচখচ করে করকচে’ নুণ-যেন বোলতার হুল!/ সাগরের পারে শূলের ব্যাথায় গোঙায় লিভারপুল!”[120] অনুরূপে ব্রিটিশ বাজেয়াপ্ত *স্বরাজ সঙ্গীত*-এর রচনাকার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, “নদীমাতৃক ভারত তবু এ দেশে/ লবণের কর দাও প্রতিটী গ্রাসে/ মানুষ না মেষ তুমি/ রক্তহীন কি ধমনী।”[121] প্রতিবাদ স্বরূপ তাই লবণ আইন অমান্যের অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া জরুরি এবং সেই লক্ষ্যে সত্যাগ্রহীকে সজ্জিত করতে মা-

---

115 প্রতাপ চন্দ্র মাইতি, *স্বরাজ সঙ্গীত* (প্রকাশক এ. সি. মাইতি, ১৯৩১) ৫২-৫৩। Proscribed Literature, NAI.

116 Aparna Basu, *Mridula Sarabhai: Rebel with a Cause* (New Delhi: Oxford University Press, 1996) 35.

117 “Into Daul, into sauce/ into curries, into rasam/ into sumber, into butter-milk/ [...] Since the day of Birth to death/ Not even a single day/ We can live without salt- O God.” Cited in, Ch. M. Naidu, *Salt satyagraha in Coastal Andhra* (Delhi: Mittal, 1986),65.

118 দাদাঠাকুর, লবণ সংগ্রাম, *জঙ্গিপুর সংবাদ*, ১৬শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা, ১৩৩৭।

119 তদেব।

120 যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ‘নুণায়ন’, *মাসিক বসুমতী*, ১৫০।

121 প্রতাপ চন্দ্র মাইতি, *স্বরাজ সঙ্গীত*, ৫৬।

বোনেদের আবেদন জানিয়ে গান বেঁধেছিলেন হরি মোক্তার- "লবণ শুল্ক করগো ভঙ্গ/ ছেড়ে দাও আমোদ, ছেড়ে দাও রঙ্গ/ অহিংস বর্মে আচ্ছাদি অঙ্গ/ দাও গো সাজায়ে জননী ভগিনী।।"[122]

লবণ আইন অমান্য করতে গিয়ে সত্যাগ্রহী ও জনতা যে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং দেশজুড়ে তা কি প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল তা আন্দোলনের পর্বে লিখিত সাহিত্যে ফুটে ওঠে। *জঙ্গিপুর সংবাদে* দাদাঠাকুর লিখেছিলেন, "ফাটে হাঁড়ি, ফাটে কড়া, ফাটে কাঁচা মাথা।/ সত্যাগ্রহে কি নিগ্রহ-কাঁদে দেশ-মাতা।।"[123] মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণকারী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মুক্তির পথে* কাব্যগ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। লবণকে কেন্দ্র করে পুলিশের অত্যাচার শিশুমনেও রেখাপাত করেছিল— এমনই প্রসঙ্গে লিখিত 'শিশুর প্রশ্ন' কবিতায় অবোধ শিশু তার মা'কে শুধিয়েছিল: "কাকার সেদিন হাত দিল যে ভেঙ্গে/ পুলিশ এসে ভাঙ্‌তে নুনের হাঁড়ি /পিঠে কত পড়্‌ল যে কালসিটে/ তমলুকেতে খেয়ে বেতের বাড়ি"।[124] অন্যদিক অত্যাচার সত্বেও জনতার পিছু না হটার বার্তা বারংবার ফুটে ওঠে ব্রিটিশ বাজেয়াপ্ত *স্বরাজ সঙ্গীত* গ্রন্থে: "এলো নুন ধরা এলো।/ পকেটে হাত পড়েছে দেখবে না আর প্রজার ভালো।।/ ভাঙ্গবে এবার নূনের হাঁড়ি ঘরে ঘরে দিয়ে হানা, / তা বলে ভাই হুমকী দেখে চমকালে তো চলবে না,"[125] যতই অত্যাচার চলুক নুনের অধিকার না ছাড়ার বার্তা সরকারকে দেওয়া হয়েছিল: "ছাড়বোনাতো নূনের মুঠো/ পারিস যদি মেরে নে।/ বিচার কেমন সভ্য জাতির/ দেখবে সত্য দেশের জনে।।"[126] গান্ধীর আদেশে প্রাণ থাকতে লবণ না দেওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছিল: "করেছি পণ দেবনা লবণ/ আসবে কে আসুক দেখি,/ মাথা দিতে যদি হয় দিব তা'/ আদেশ দি'ছেন গান্ধীজী"[127]

লবণকে কেন্দ্র করে জনমানসে সরকার বিরোধিতার সুরটি আরো তীব্র এবং আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল। অহিংস, শন্তির পথে আন্দোলনের আবেদন তুলে ধরা হলেও প্রয়োজনে অন্যপথে সরকারকে 'সমঝে' দেওয়ার

---

122 হরি মোক্তারের গান, গান্ধীসজ্জিত বিরাট বাহিনী, সংকলিত হয়েছে অনুরাধা রায় সম্পাদিত, *স্বাধীনতা সংগ্রামের গান ও কবিতা বিংশ শতাব্দী* (সাহিত্য আকাদেমি ১৯৯৯), ৩১৯।

123 দাদাঠাকুর, লবণ সংগ্রাম, প্রাগুক্ত।

124 প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শিশুর প্রশ্ন', *মুক্তি-পথে* (কলিকাতা: প্রবাসী প্রেস, ১৯৩১) ৬২-৬৬। Proscribed Literature, NAI.

125 প্রতাপ চন্দ্র মাইতি, *স্বরাজ সঙ্গীত*, ৬২।

126 তদেব, ৫১।

127 তদেব, ৫৩।

বার্তাও ছিল। ন্যাশনাল আর্কাইভসে সংরক্ষিত *নমক কা গোলা, নমকিন জঙ্গ* গোছের ব্রিটিশ বাজেয়াপ্ত পুস্তিকায় এই দিকটি ফুটে ওঠে। নুনের গোলা ভারত থেকে দাগলে সাত সমুদ্র পেরিয়ে তা ব্রিটিশদের বদন বিগড়ে দিতে পারে, তাই সরকারকে সমঝে চলার হুমকি মিশ্রিত পরামর্শ দিয়েছিলেন জনৈক কবি রামচন্দ্র: "নমক কা গোলা চলা য়হাঁ শকল বিগড় গই লন্ডন বালোকি।/ মিলজুল কর রামচন্দ্র সমঝাবে হৈ জালিম সরকার।/ নমক কা গোলা পহুঁচা সাত সমন্দ্র পার।"[128] একই সাথে রামচন্দ্র আবার দেশবাসীকে আবেদন জানাচ্ছেন তাঁর মতোই জনতাও যেন ঘরে নুন তৈরি করেন, আর সরকার বাধা দিলে শান্তিপূর্ণভাবে কারাবরণ করতে– "হাম তো য়হীঁ সে নমক খুদ ঘর বনানে লাগে।/ ভারতবাসিয়োঁ কো ঘর ঘর নমক বনানা চাহিয়ে।।/ গর নমক ঘর কো বনানে সে সজা সরকার দে।/ শান্ত ময় সত্যাগ্রহ কর জেল জানা চাহিয়ে।।"[129] *নমকিন জঙ্গ*-এ একইভাবে গান্ধীর নির্দেশে লবণ যুদ্ধ শুরু করার আহ্বান ছিল: "ভাই নমকিন কা জঙ্গ মচানা।/ সির্ফ শান্তি সে হোনা খানা।।/ হ্যায় নিমক জঙ্গ ছিড়া আগে আও।/ হুকুম গান্ধী কা বীরো বজাও।।"[130] অহিংস সত্যাগ্রহের আহ্বান যে একদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডংকা বাজিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে গান্ধীই প্রহ্লাদ হয়ে জনতাকে আন্দোলনের মার্গ দর্শে দিচ্ছেন তা *গান্ধী গীতসাগরে* তুলে ধরা হয়েছিল-

ভারত মে ডংকা আজাদী কা বজবা দিয়া গান্ধী বাবা নে।
সত্যাগ্রহ ঝাণ্ডা দুনিয়াঁ মে ফহরা দিয়া গান্ধী বাবা নে।।
সরপর গঠরী থী গুলামী কী অতি দুর থী হম সে আজাদি।
বনকর প্রহলাদ হমেঁ সত্ পথ দিখলা দিয়া গান্ধীবাবা নে।।[131]

গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের আহ্বান প্রায়শই জনমানসের কল্পনায় সামরিক দ্যোতনাতে মিলেমশে সহাবস্থান করত। রাজদ্রোহে নিষিদ্ধ বাংলা পদ্যেও অনুরূপ নিদর্শ পরিলক্ষিত হয়। মাতৃ দুগ্ধে সন্তানের যেমন অধিকার, তেমনই নুন তৈরি করার অধিকার ভারতীয়দের রয়েছে। কিন্তু সরকার তা অবজ্ঞা করলে পাল্টা অবজ্ঞার পথে

---

128 রামচন্দ্র, নমক কা গোলা (দিল্লি মার্তণ্ড প্রেস, সন-তারিখহীন), ৮। Proscribed Literature, NAI.

129 তদেব, ৪।

130 নত্থারাম কুঞ্জবিহার, *নমকিন জঙ্গ* (কানপুর: প্রেম প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৩০), ৭। Proscribed Literature, NAI.

131 লাল বাবুলাল, *গান্ধী গীতসাগর* (কানপুর: সুরসারি প্রেস, ১৯৩০), ১। Proscribed Literature, NAI.

ভারতীয়রা যে নুন তৈরি করবে এবং যাবতীয় সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে তার স্পষ্ট বার্তাও ছিল- "বেশ করেছি নুন মেরেছি/ তোদের বাবার কি? / মোদের মায়ের বুকের রসে/ তোদের কি দাবী?"[132]

লবণ আইন অমান্যের জন্য গান্ধী ডাণ্ডির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলে জনমানসে লবণকে কেন্দ্র করে জল্পনাও প্রবল হয়ে উঠেছিল। যত্রতত্র লবণ প্রাপ্তির গুজবকে কেন্দ্র করে লবণ আইন অমান্যের জল্পনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বাংলার গ্রামাঞ্চলে যেখানে লবণ তৈরির কোনো উপায় বা নিদর্শন ছিল না সেখানেও এমন অবাস্তব খবর দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন, বর্ধমানের কাটোয়া সাবডিভিশনে শেরান্ডি ও সুদপুর গ্রাম দুটিতে লবণ পাওয়া গেছে এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবক সেখানে লবণ আইন অমান্য করে নুন তৈরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে ব্যাপক গুজব ছড়িয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিক স্বভাবতই এই সম্ভাবনার বাস্তবতা, বিশেষত উক্ত দুই গ্রামে লবণের অস্তিত্বের খবর সত্য আদৌ কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।[133] ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেই এমন লবণ প্রাপ্তি গুজব ছড়িয়েছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমস মজা করে লিখেছিল যে, সমুদ্রতট থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কিভাবে এমন রহস্যজনক লবণ উৎসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা ভূতাত্ত্বিকদের বদলে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা ভালো দিতে পারবেন! যত্রতত্র সন্দেহজনকভাবে, যেমন এলাহাবাদের এক পরিত্যক্ত গৃহের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এরকম এক রহস্যজনক লবণ উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল! [134] কোনো নির্দিষ্ট রচয়িতা ছাড়া গুজব এক সামাজিক রচনা যার মধ্য দিয়ে দুর্বল, নিপীড়িত বা ক্ষমতাহীন মানুষের অবদমিত আকাঙ্খা নির্গমনের পথ খুঁজে পায়। গান্ধীর সত্যাগ্রহ দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে লবণকে কেন্দ্র করে এমনই জল্পনার সঞ্চার করেছিল এবং গণকল্পনাকে সংহত করেছিল, যা আরো গভীরতর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। গান্ধীর সত্যাগ্রহে লবণ ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে 'শুদ্ধতায়' প্রতিভাত হয়েছিল এবং দেশের জনতার কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল। কিন্তু সত্যাগ্রহীদের তৈরি করা লবণ বাস্তবিক গুণমানে কতটা শুদ্ধ ছিল তা নির্ণয়ে ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানের মধ্যে আরেক সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয়। লবণের বস্তুগত গুণমানের সেই দিকটি পৃথক পর্যালোচনার দাবি রাখে।

---

[132] প্রতাপ চন্দ্র মাইতি, *স্বরাজ সঙ্গীত*, ৫২-৫৩।

[133] *Amrita Bazar Patrika*, April 4, 1930.

[134] 'Salt deposits found in house', *New York Times*, April 10, 1930. Cited in, Thomas Weber, *On the Historiography*, 2009, 458.

।। ৪ ।।

সত্যাগ্রহ লবণের শুদ্ধতা: এক জাতীয়তাবাদী রসায়ন?

গান্ধী সমুদ্রতীরে পৌঁছে কিভাবে লবণ আইন অমান্য করবেন, অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে তিনি দেশীয় লবণ সংগ্রহ করে সত্যাগ্রহের সূচনা করবেন, তা নিয়ে ভারতীয় জনমানসে যথেষ্ট ঔৎসুক্য ছিল। বিদেশিদের মধ্যেও এই বিষয়ে যে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল তা সেই সময়ের আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম থেকেই স্পষ্ট হয়। আমেরিকার 'টাইম' ম্যাগাজিন যেমন এক প্রতিবেদনে লিখেছিল যে, গান্ধী সামান্য সমুদ্রের জল হাতায় তুলে এবং জনসমক্ষে তা [ফুটিয়ে] বাষ্পীভূত করে সামান্য এক চিমটে লবণ সংগ্রহ করবেন![135] অবশ্য ডাণ্ডি অভিমুখে গান্ধী যখন লবণ আইন অমান্যে অগ্রসর হয়েছিলেন তখন ব্রিটিশ সরকার প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু অচিরেই একদিকে দেশজুড়ে গণ উন্মাদনার আবহ, অন্যদিকে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রচারসূত্রে লবণ সত্যাগ্রহ আন্তর্জাতিক ইভেন্টে পর্যবসিত হলে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীকে নিরস্ত করতে তৎপর হয়।[136] আর গান্ধীর প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম উপায় ছিল যাতে কোনোভাবেই তিনি ডাণ্ডির সমুদ্রোপকূলে লবণ-জল জমে তৈরি হওয়া প্রাকৃতিক লবণ সংগ্রহ করতে না পারেন। ১৯৩০ এর ২৪ মার্চ, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, মহাদেব দেশাই, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী সহ গান্ধীর কিছু অনুগামী ডাণ্ডিতে লবণ আইন অমান্যের সম্ভাব্য স্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ সেখানে কুলিদের সাহায্য নিয়ে সমুদ্রোপকূলের লবণ চেঁছে তুলে নিয়ে তা আবার কাদার সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল, গান্ধী যাতে লবণ সংগ্রহে অসুবিধায় পড়েন এবং লবণ আইন অমান্যে অসমর্থ হন![137] মহাত্মাকে লবণ সংগ্রহে নিরস্ত করতে সাম্রাজ্যিক আধিকারিকদের সেসময় যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয়েছিল; কারণ, ফ্রি প্রেসের বিবরণ অনুযায়ী, ডাণ্ডির

---

135 India: Pinch of Salt, *Time: The Weekly Magazine*, Vol. XV, No. 13, March 31, 1930.

136 ব্রিটিশ ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রচারযুদ্ধ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে, "The Battle in the Press" in Thomas Weber, *On the Historiography*, 446-456; বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দৌলতে কিভাবে লবণ সত্যাগ্রহ আন্তর্জাতিক ইভেন্টে পর্যবসিত হল তার সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ করেছেন, Chandrika Kaul, *Communications, Media and Imperial Experience: Britain and India in the Twentieth Century* (UK: Palgrave Macmillan, 2014).

137 ফ্রি প্রেস অফ ইন্ডিয়ার সংবাদসূত্র উদ্ধৃত করে এই প্রতিবেদন লিখেছিল, *Amrita Bazar Patrika*, March 26, 1930.

সমুদ্রোপকূলের প্রাকৃতিক লবণ-ক্ষেত্র বেশ প্রশস্ত ছিল এবং প্রায় চার মাইল জুড়ে ভূমির ওপর সাদা লবণের স্তর ছড়িয়ে ছিল![138]

লবণ সত্যাগ্রহের প্রথাগত ইতিহাসচর্চার অভিমুখ অবশ্য গান্ধী সহ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের লবণ-আইন ভঙ্গের আহ্বান ও তার পরিণামের দিকে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু লবণ আইন ভঙ্গের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ সত্যাগ্রহীদের লবণ উৎপাদন পদ্ধতি, তৎসহ সেই উৎপন্ন লবণের শুদ্ধতা, তা খাদ্যোপযোগী কিনা, ইত্যাদি বিষয় এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের কাছে একরকম অনাদৃত, গুরুত্বহীন থেকেছে। আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্যবস্তু লবণ কেন ঐতিহাসিক আলোচনায় অনুপস্থিত বা অনালোচিত থাকে? তা মুখ্যত দুটি কারণে বলেই মনে হয়। প্রথমত, লবণ সত্যাগ্রহ যেহেতু প্রতীকী আন্দোলন, তাই সেই প্রতীকের স্রষ্টা গান্ধীর ওপরেই ঐতিহাসিকেরা সহজাতভাবেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন। এমনকি লবণ আইন অমান্যের দৃশ্যমাত্রিক বিশ্লেষণেও সমুদ্রোপকূল থেকে লবণ তোলার বৈগ্রহিক আলোকচিত্রতেও ঝুঁকে পড়া মহাত্মাই আলোকপ্রাপ্ত, কিন্তু তীরভূমিতে ছড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক সাদা লবণ দৃশ্যমান হয়েও আলোচনায় অদৃশ্য, অনুপস্থিত থাকে [পরিশিষ্ট আলোকচিত্র ৩.১ দ্রষ্টব্য]। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকেরা ধরেই নেন যে, সত্যাগ্রহীদের উৎপাদিত নুন অশুদ্ধ এবং খাদ্যোপযোগী নয়। গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গের পরিকল্পনা যে মূলত প্রতীকী তার বিশ্লেষণে ধরেই নেওয়া হয় যে অবৈধ উপায়ে প্রস্তুত নুন অশুদ্ধ হবে এবং হয়তো যথাযথ স্বাদেরও হবে না; যদিও সেই নুন জনতাকে আইন ভঙ্গ করে শাসকীয় ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করার প্রেরণা জুগিয়েছিল।[139] আর এমন অনুমানের ভিত্তিতে, ঐতিহাসিক তাঁর অজান্তেই, সত্যাগ্রহী লবণের শুদ্ধতা প্রসঙ্গে সেকালের সাম্রাজ্যিক (অপ?)প্রচারের উত্তরাধিকার বর্তমানে বয়ে নিয়ে বেড়ান। অথচ লেখ্যাগারে সংরক্ষিত সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউর হর্তাকর্তাদের গোপন সরকারি প্রতিবেদনগুলিতে চোখ বোলালেই 'সত্যাগ্রহ' লবণের (অ)শুদ্ধতা নির্ণয়ে (অপ)প্রচেষ্টার বয়ানটি বোঝা যায়। 'সত্যাগ্রহ' লবণের শুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য ব্রিটিশ আধিকারিকেরা রাসায়নিক বিশ্লেষণের পথ নিয়েছিলেন। যদিও কে, কিভাবে নমুনা সংগ্রহ করলেন তা উহ্য রেখে, সেই লবণ যে শুধু 'অশুদ্ধ' এবং 'খাওয়ার অনুপযুক্ত' এমন প্রচার চালাতেই ঔপনিবেশিক সরকার ব্যগ্র ছিল। অবশ্য তারপরে জুতসই জাতীয়তাবাদী জবাব পেয়ে সরকার যে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল তাও লেখ্যাগারিক নথি থেকেই স্পষ্ট হয়! এখানে আরো তাৎপর্যপূর্ণ হল, আইন অমান্য আন্দোলনে

---

[138] Ibid.

[139] Thomas Weber, *On the salt march: The Historiography of Mahatma Gandhi's March to Dandi* (New Delhi: Rupa, 2009) 95.

উৎপাদিত লবণের শুদ্ধতার সত্যাসত্য নির্ণয়ে আগ্রহী ব্রিটিশ আধিকারিকেরা 'সত্যাগ্রহ' লবণ নামটিই ব্যবহার করেছিলেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণের পাশাপশি বেনামে প্রচারপত্র ছড়িয়ে সত্যাগ্রহ লবণ যে জীবাণু সংক্রামক, অস্বাস্থ্যকর এমন প্রচারও পরিলক্ষিত হয়। সেই দাবিও যে ভিত্তিহীন, অসার ছিল তা ভারতীয় চিকিৎসক-ব্যাকটেরিয়োলজিস্টদের বিশ্লেষণে ফুটে ওঠে। বর্তমান অধ্যায়ের শেষাংশে রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়োলজি বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'সত্যাগ্রহ' লবণের শুদ্ধতা নির্ণয়ের ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং তার পাল্টা জাতীয়তাবাদী বয়ান প্রসঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা রইলো।

লবণ আইন অমান্যের সূচনার সাথে সাথেই সত্যাগ্রহীদের তৈরি বেআইনি দেশীয় লবণ তথা 'সত্যাগ্রহ' লবণ স্বাস্থ্যসম্মত এবং খাওয়ার উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার তৎপর হয়েছিল। ১৯৩০-এর ২ মে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউ-র সদস্য এ. এইচ. লয়েড মাদ্রাস, বোম্বে ও উত্তর ভারতের লবণ-রাজস্ব আধিকারিকদের স্থানীয় 'সত্যাগ্রহ' লবণের নমুনা সংগ্রহ করতে এবং তা বিশ্লেষণের জন্য লাহোর সরকারি কলেজের কেমিস্ট ড. হোরেস ডানিক্লিফের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ড. ডানিক্লিফ আবার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউ-র স্পেশাল কেমিক্যাল অ্যাডভাইসার পদে নিযুক্ত ছিলেন।[140] সত্যাগ্রহ লবণের নমুনার প্রাপ্তিস্বীকার করে ড. ডানিক্লিফ যথাসময়ে বিশ্লেষণের রিপোর্ট পাঠাবেন বলে জানিয়েছিলেন। তিনি আরো জানান যে, ইতিমধ্যেই নিজের উদ্যোগে লাহোরে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত দুটি লবণের নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন সেগুলিতে অশুদ্ধি হিসেবে সোডিয়াম সালফেটের পরিমাণ অত্যধিক বেশি, যথাক্রমে ২৯ ও ১৯ শতাংশ।[141] এই প্রক্রিয়া চলাকালীনই সত্যাগ্রহ লবণ প্রসঙ্গে সরকারের এক বিবৃতিও বোম্বের *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*-তে প্রকাশিত হয়ে যায়। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সত্যাগ্রহ লবণের অশুদ্ধি নির্ণয়ে সরকার যে ভীষণ ব্যগ্র ছিল তা এই চটজলদি বিবৃতিতেই স্পষ্ট হয়। বোম্বেতে লবণ সত্যাগ্রহের স্থান থেকে সংগৃহীত দুটি লবণ নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিশদে তুলে ধরে এই বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল যে, ক্যালসিয়াম সালফেট ও ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের আধিক্যের কারণে তা মানুষের মুখে তোলার উপযুক্ত ছিল না।[142] রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয় লবণের গুণমান নির্ণয়ে ঔপনিবেশিক

---

140 D.O.C. No. 51-Salt/30 dated 2nd May, 1930, Central Board of Revenue [hereafter C.B.R.]. NAI

141 Letter to A.H. Llyod, dated 5th May, 1930. S.C.A., salt-1930 No. 53, C.B.R. NAI

142 'Samples of Salt made by Satyagrahis Analysed: Unfit for Consumption', Times of India, Bombay, May 3, 1930. C.B.R. NAI.

রাষ্ট্রের এই তোড়জোড় যে খুব নতুন কিছু নয়, তা এখানে খেয়াল রাখা আবশ্যক। কারণ, এক শতক আগেও, ১৮৩০-এর দশক থেকে, উদারনৈতিক মুক্ত বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতীয় লবণের গুণমান নির্ধারণে একতরফা আধুনিক কেমিস্ট্রির আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশ কেমিস্টদের বিশ্লেষণে লিভারপুল লবণের গুণমানগতগত শুদ্ধতা ও শুভ্রতার নিরিখে বাংলার দেশীয় লবণের অশুদ্ধতা ও অপরিচ্ছন্নতাকে তুলে ধরা হয়েছিল। দেশীয় লবণের গুণমান নির্ধারণে সাম্রাজ্যিক সেই রাজনীতির প্রতিস্পর্ধী কোনো বয়ান তখন পরিলক্ষিত হয় নি; বরং ধর্মীয় ও জাতপাতগত মূল্যবোধে বিশ্বাসী রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে বিদেশী লবণের বিরুদ্ধে অশুচিতার অভিযোগে প্রতিরোধ তৈরি হয়েছিল [প্রথম অধ্যায়ে বিশদে আলোচিত]। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ লবণকে অশুদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর প্রমাণের চেষ্টা করলে, পাল্টা জবাবে ভারতীয় বিজ্ঞানী-গবেষকরা আধুনিক রসায়নের যুক্তি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগেই তা খণ্ডন করেছিলেন। আধুনিক রসায়নের সেই যুক্তি কি ছিল? কিভাবে তা লবণের গুণমান নির্ধারণে ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক রসায়নের অসারতা প্রতিপন্ন করেছিল?

১৯৩০-এর ৫ মার্চ, *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*-তে উল্লিখিত সরকারি বিবৃতি প্রকাশিত হবার সপ্তাহ দুয়েক পরে *লিডার* পত্রিকায় লেখা এক চিঠিতে সত্য প্রকাশ নামে এলাহাবাদের জনৈক কেমিস্ট্রি গবেষক এই বিশ্লেষণের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।[143] তিনি বোম্বের বাজারে আইনসম্মতভাবে যে বাণিজ্যিক লবণ পাওয়া যায় তার দুই প্রকার নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। বোম্বেতে অধিকাংশ গরিব মানুষ মোটা দানার সম্ভর লবণ ব্যবহার করতেন, অন্যদিকে সেন্ধা বা লাহোরি লবণ ছিল ধনীদের পছন্দ। এই দুই লবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উভয় লবণেই যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট অথবা ক্লোরাইড রূপে উপস্থিতি রয়েছে। সত্যাগ্রহীরা আইন অমান্য করে যে লবণ প্রস্তুত ও ব্যবহার করছিলেন তার সাথে বাজারে সরকারি আইন মোতাবেক প্রাপ্ত লবণের খুব কিছু তারতম্য ছিল না বলে সত্য প্রকাশ স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন।[144] তাঁর চিঠির শেষে তিনি 'বেআইনি' সত্যাগ্রহ লবণের সরকারি রিপোর্টে এক বড় ত্রুটি তুলে ধরে পুরো রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়েই বিদ্রূপ করেছিলেন। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী সত্যাগ্রহীদের তৈরি লবণে অশুদ্ধি হিসেবে 'সোডিয়াম পারক্লোরাইডের' উল্লেখ ছিল যা, সত্য প্রকাশের মতে,

[143] 'Analysis of Common Salt', *Leader*, Allahabad, May 16, 1930. C.B.R. NAI.

[144] Ibid.

কেমিস্ট্রির দুনিয়ায় কেউ কোনোদিন শোনেনি! বোম্বের সরকারি বিশ্লেষককে তিনি প্রায় প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন এই নতুন রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে, যা সত্যাগ্রহ লবণে যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত রয়েছে ও গুণমানগত অবনমন ঘটিয়েছে, বিশদে জানাতে; কারণ তা যে স্বাভাবিকভাবেই কেমিস্ট্রির জ্ঞানচর্চায় নতুন কিছু সংযোজন করবে![145]

সত্য প্রকাশের চিঠিতে সরকারের শীর্ষস্তরীয় আমলাদের টনক নড়েছিল। সিমলা থেকে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউ-র মেম্বার জি. এস. হার্ডি লাহোরে ড. ডানিক্লিফের কাছে এ বিষয়ে মতামত চাইলে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে সোডিয়াম পারক্লোরাইড বলে কোনো কিছু হয় না! তাছাড়া বোম্বের সত্যাগ্রহ লবণ যে মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত সেই দাবির সাথেও ডানিক্লিফ সহমত ছিলেন না (সাম্রাজ্যিক স্বার্থের চেয়েও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি ডানিক্লিফের দায়বদ্ধতাই এখানে প্রকাশিত— আন্দোলনের উত্তুঙ্গ আবহে, গড়পড়তা ঔপনিবেশিক আমলাদের তুলনায়, যা বেশ ব্যতিক্রমীও বটে)।[146] একেই তখন মে মাসের দাবদাহ, তায় লবণ আইন অমান্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতি দোসর; এমত পরিস্থিতিতে সত্যাগ্রহ লবণের খুঁত খুঁজতে গিয়ে প্রকাশ্যে বেআব্রু হয়ে পড়ার বিষয়টি বোধহয় সিমলার ঠাণ্ডাতেও হার্ডিকে ঘামিয়ে দিয়েছিল। কিভাবে সরকারের মুখ বাঁচানো যায় তার পথ খুঁজতে তিনি ও অন্যান্য আমলারা তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মুখরক্ষার ব্যাখ্যা অনেকটা এই ধাঁচের ছিল যে, বোম্বের সল্ট রেভেনিউ কালেক্টর এইচ. টি. সোরলে বোম্বের কাস্টমস কেমিস্টকে দিয়ে সত্যাগ্রহ লবণের বিশ্লেষণ করিয়ে তা 'ডাইরেক্টর অফ ইনফরমেশন'-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু টাইপিস্টের ভুল করে 'Mg' (ম্যাগনেসিয়াম) বদলে 'Na' (সোডিয়াম) লিখে পাঠানোয় এমন বিপত্তির সূচনা! অতঃপর 'ডাইরেক্টর অফ ইনফরমেশন' আবার বোম্বের 'কলেজ অফ সায়েন্স'-এর কাছে এই বিশ্লেষণকে সরকারি বয়ানের আদলে লিখতে বলে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। তখন কলেজই আবার ভুল করে 'সোডিয়াম পারক্লোরাইড' লেখে। এমন অদ্ভুত উপাদান আবিষ্কারের দায়, আমলাদের মতে, অবশ্যই কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপরেই তো বর্তায়! আর সত্যাগ্রহ লবণ যে মানুষের মুখে তোলার অনুপযুক্ত— সেই বিবৃতির ব্যাখ্যা কি? খুব সোজা, কাস্টমস কেমিস্টের মন্তব্যকে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে! কাস্টমস কেমিস্ট নাকি কখনোই বলেননি যে সত্যাগ্রহ লবণ মুখে তোলার অনুপযুক্ত! বরং তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, সত্যাগ্রহ লবণ

[145] Ibid.

[146] C.B.R. No., C. No. 51-Salt/30 dated 31-05-30. NAI.

বাণিজ্যিক মানের উপযোগী নয়; কারণ তাতে এমন কিছু অশুদ্ধি থাকে যা লবণকে আর্দ্র করে তোলে ও নষ্ট করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে আর বেশি উচ্চবাচ্য করারও প্রয়োজন নেই বলে হার্ডি মনে করেছিলেন।[147] এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারের মুখরক্ষার জন্য অন্যের ঘাড়ে দায়ভার চাপানোর এই খেলায় যার ঘাড়ে বন্দুক রাখা হয়েছিল তিনি ছিলেন এক ভারতীয়– এস. এস. আয়ার, বোম্বের কাস্টমস অ্যান্ড সল্ট-এর কেমিক্যাল এক্সামিনার।[148] তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা তা অবশ্য এই সরকারি চিঠি-চাপাটির ভিড়ে মেলে না।

সরকার অবশ্য সত্যাগ্রহ লবণের গুণমান নির্ধারণের বিষয়ে সহজে হাল ছাড়তে রাজি ছিল না। বেনারস থেকে বাজেয়াপ্ত সত্যাগ্রহ লবণের তিনটি নমুনা বিশ্লেষণের জন্য ড. ডানিক্লিফের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পুনরায় কেলাসিত করলে এই নমুনাগুলিতে হয়তো ৯৬-৯৭% পর্যন্ত সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ সামরিক চাহিদার সাথে তা মানানসই নয়, কারণ ৯৭ শতাংশের কম সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ৩ শতাংশের বেশি অন্যান্য লবণ থাকলে, বিশেষত তাতে যদি আবার সোডিয়াম নাইট্রেটের আধিক্য দেখা যায়, তাহলে কাসৌলির মিলিটারি ফুড ল্যাবরেটরিতে তা নির্ধারিত গুণমানের পরীক্ষায় উতরোতে পারবে না।[149] দিল্লীর উপকণ্ঠে সত্যাগ্রহীরা যে লবণ তৈরি করেছিলেন তার দুই ধরণের নমুনা সংগ্রহ করার পর, সরকারি আধিকারিকেরা 'লেবেল'-এর তালগোল পাকিয়ে ফেলে তা পাঠিয়েছিলেন। ড. ডানিক্লিফ তা ঠিক করে নিয়ে জানিয়েছিলেন যে, ময়লা সাদা মিহি লবণে অশুদ্ধি বেশি: অদ্রবীভূত অজৈব উপাদান প্রায় ২০.৯০ শতাংশ, আর ২.০৬ শতাংশ জৈব উপাদান! এই লবণকে তিনি একেবারে খাওয়ার অযোগ্য বলে নাকচ করে দেন। অন্যদিকে বাদামি রংয়ের দানা লবণে অশুদ্ধি প্রায় নগণ্য: অদ্রবীভূত উপাদান মাত্র ০.৬৬ শতাংশ, যার ০.০৩ শতাংশ জৈব উপাদান। শেষোক্ত লবণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মাত্রা ৯৩.৬৫ শতাংশ, এবং সোডিয়াম নাইট্রেটের উপস্থিতি শূন্য। বলাবাহুল্য যে, এই শেষোক্ত বাদামি রংয়ের সত্যাগ্রহ লবণের বিশ্লেষণী রিপোর্টে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলা খুশি হন নি। কারণ, ব্রিটিশদের বদ্ধমূল বর্ণবাদী ধারণায় লবণের শুভ্রতাই যে তার পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতার নির্ধারক [প্রথম অধ্যায়ে

[147] G.S. Hardy's Report, C.B.R. No., C. No. 51-Salt/30 of 31-05-30. NAI

[148] এ. আর. এল. টটেনহ্যাম হার্ডিকে পাঠানো নোটে লিখেছিলেন যে, 'The analyst is of course mainly to blame…' Ibid.

[149] Letter No. S.C.A., salt, 1930-65, dated 6 June, 1930, From H.B. Dunnicliff to the Commissioner, Northern Indian Salt Revenue, C.B.R. NAI

আলোচিত]। আর যেখানে সত্যাগ্রহীদের তৈরি সাদা লবণই গুণমানে অশুদ্ধ, সেখানে শুভ্রতাহীন বাদামি লবণ কি করে শুদ্ধ গুণমানের হতে পারে! দেশীয় পদ্ধতিতে উৎপাদিত শুদ্ধ গুণমানের বাদামি রংয়ের সত্যাগ্রহ লবণ সম্ভবত ব্রিটিশ জাত্যাভিমানের ফানুসটিকে চুপসে দিয়েছিল। তা নইলে কি আর এমনি এমনি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউর উর্ধ্বতন আধিকারিক এ. আর. এল. টটেনহ্যামকে লেখা চিঠিতে নর্দার্ন ইন্ডিয়া সল্ট রেভেনিউ-র কমিশনার এ. এল. হোয়েলের বিস্ময় ও সংশয় উভয়েই ফুটে ওঠে: "It seems that *the powdery salt unexpectedly is the worse of the two*, and is unfit for human consumption, because containing Sodium Nitrate. *The brown flakes, on the other hand*, contain a very respectable percentage of Sodium chloride and no nitrate, and *are reported to be not actually harmful* when taken in small quantities in food [emphasis added]."[150]

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কিভাবে কেমিস্ট্রির জ্ঞান-চর্চা ও প্রায়োগিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উপনিবেশের সম্পদ, পরিবেশ ও প্রজার ওপর শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চেয়েছিল তা বোঝাতে সমাজবৈজ্ঞানিক মহলে 'কলোনিয়াল কেমোপলিটিক্স' কথাটি ব্যবহৃত। ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আধারে কেমিস্ট্রির প্রয়োগ – বস্তুগত উপাদান (যেমন, লবণ) ও বিশেষজ্ঞ রসায়ন জ্ঞান (ল্যাবরেটরি, গবেষণা ইত্যাদি সূত্রে), উভয় ক্ষেত্রেই - আধিপত্য, নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের ভারতে কেমিস্ট্রি সহ বিজ্ঞানচর্চায় ঔপনিবেশিক বর্ণবাদী বৈষম্য ও আধিপত্যের রেশ যথেষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[151] তবে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মাধ্যমে আধুনিক কেমিস্ট্রি চর্চার বিশ্বব্যাপী বিস্তার ঘটলেও ভারতীয় উপনিবেশে 'রসায়ন', 'কিমিয়া' প্রভৃতি পরা-রাসায়নিক (parachemical) জ্ঞানচর্চার উত্থান 'কলোনিয়াল কেমোপলিটিক্স'কে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছিল। ঔপনিবেশিক পরিসরে আধুনিক কেমিস্ট্রির চর্চা অবশ্য শুধুমাত্র 'সংস্পর্শের ক্ষেত্র' হিসাবেই নয়, বরং 'সংঘাতের ক্ষেত্র' হিসাবেও উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে রসায়ন, কিমিয়া প্রভৃতি পরা-রসায়নের অব্যাহত বৈধতা ও অনুশীলন আধুনিক কেমিস্ট্রির নিয়ন্ত্রণ তথা আধিপত্যকে বিঘ্নিত করেছিল।[152] বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও

[150] Letter to A. R. L. Tottenham from A. L. Hoyale, D.O. C. No. 72-G1. 30 (i) dated Simla, 17th July, 1930. C.B.R. NAI

[151] Deepak Kumar, "Racial Discrimination and Science in Nineteenth Century India", *The Indian Economic and Social History Review*, Vol. XIX, No. I, (1982), 63-82.

[152] Projit Bihari Mukherji, "Parachemistries: Colonial Chemopolitics in a zone of contest," *History of Science*, Vol. 54, Issue 4 (December 2016), 362-382.

গবেষকেরা আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনে অগ্রগতির জন্য সহায়ক কাঠামো তৈরি করতে লড়াই করেছিলেন। ১৯২০-র দশক থেকে জাতীয়তাবাদী আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক-পরিকাঠামোগত ভিতটি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে; রসায়নচর্চার ক্ষেত্রে যেমন ভারতীয় বিজ্ঞানী-গবেষকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি (১৯২৪), দি সোসাইটি অফ বায়োলজিক্যাল কেমিস্টস (১৯৩০) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৩০-এ গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান দেশজুড়ে যে উত্তুঙ্গ জাতীয়তাবাদী আবহ তৈরি করেছিল তার আঁচ বৈজ্ঞানিক-রসায়নবিদদের জীবনেও পরিলক্ষিত হয়। রসায়ন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যেমন জানিয়েছিল, "আমি যে আজ বিজ্ঞানচর্চ্চা অবহেলা করিয়া মহাত্মার বাণী প্রচার করিয়া ফিরিতেছি, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, *বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিলম্ব করা যায়, কিন্তু স্বরাজসাধনার বিলম্ব করা চলে না*" [নজরটান সংযোজিত]।[153] গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলশ্রুতিতে বাংলায় দেশীয় লবণশিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। গান্ধীয় জাতীয়তাবাদের আবহেই ভারতীয় বিজ্ঞানী-গবেষকরা আধুনিক রসায়নের যুক্তি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির সহায়তায় সত্যাগ্রহ লবণের গুণমানগত শুদ্ধতা নির্ণয় করতে তৎপর হয়েছিলেন। সত্যাগ্রহ লবণের বিশ্লেষণে ভারতীয় বিজ্ঞান-গবেষকদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও যুক্তির মান্যতা এখানে একাধিক মাত্রায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে তা রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লবণের গুণমান নির্ণয়ের ঔপনিবেশিক রাজনীতি তথা colonial chemopolitics-এর বিপরীতে এক প্রতিস্পর্ধী জাতীয়তাবাদী বয়ান তুলে ধরেছিল। অন্যদিকে তা ভারতীয় সমাজে জাত-পাত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জনিত লবণের অশুচিতার ধারণাকেও পিছু ঠেলে দিয়েছিল। বলা যেতে পারে যে, উক্ত দুই প্রেক্ষিতে সত্যাগ্রহ লবণের শুদ্ধতাকে কেন্দ্র করে এক জাতীয়তাবাদী আধুনিক রসায়নের আগমন পরিলক্ষিত হয়েছিল। লবণ সত্যাগ্রহের ফলশ্রুতিতে ১৯৩০-এর দশক থেকেই ভারতীয় লবণ শিল্পের পুনর্গঠনে এই ঔপনিবেশিকতার প্রতিস্পর্ধী জাতীয়তাবাদী আধুনিক রসায়নের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় [পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে]।

লবণ আইন অমান্যের সূচনা থেকেই সত্যাগ্রহ লবণে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে অশুদ্ধি রয়েছে— শুধু এমন কেমোপলিটিক্সেই সরকারি (অপ)প্রয়াস ও (অপ)প্রচার শেষ হয়নি। গান্ধীর নির্দেশিত পথে দেশীয়

---

[153] 'বর্ত্তমান সমস্যা', আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের শিলচরে প্রদত্ত বক্তৃতা, *মাসিক বসুমতী*, আশ্বিন, ১৩৪৩, *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন, পঞ্চম খণ্ড* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), ১৩৮।

পদ্ধতিতে উৎপাদিত সত্যাগ্রহ লবণ কি স্বাস্থ্যসম্মত হতে পারে— এই প্রশ্নটিও সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক এই ভাবনা যেন, কবির কথনে, "লবণে যেটুকু ল্যাবণ্য আছে, দেয় বুঝি মাটী করে,'/ কালো সিন্ধুর কালো জল তুলে' কালো হাত দিয়ে ধরে'! [বানান অপরিবর্তিত]"[154] সত্যাগ্রহ লবণ কতটা স্বাস্থ্যকর বা শারীরিকভাবে পুরোপুরি নিরাপদ কিনা— তা বিশ্লেষণের জন্য, সরকারি ওপর মহলের নির্দেশ অনুযায়ী, ড. ডানিক্লিফ লাহোর মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর জে. জে. হার্পার নেলসনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। নেলসন নমুনাগুলিতে শতাংশের হিসেবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতি কম এবং সোডিয়াম নাইট্রেটের ভাগ ৮-১০ শতাংশ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছিলেন। মানবদেহে অল্প মাত্রায় সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রাথমিকভাবে শুধু মূত্রের বেগ বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আধিক্য বাড়তে থাকলে তাতে পাকস্থলী-অন্ত্রের নানাবিধ সমস্যা, যথা- বমনোদ্রেক, বমি, উদরাময়, এমনকি বমি ও মলের সাথে রক্ত বেরোতে দেখা যেতে পারে। তবে সত্যাগ্রহ লবণে উপস্থিত সোডিয়াম নাইট্রেটে শরীরের কতটা ক্ষতি হবে তা প্রফেসর নেলসনও পুরোপুরি নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি! দীর্ঘদিন ধরে বেশি মাত্রায় সোডিয়াম নাইট্রেট শরীরে গেলে তা যে ভোক্তার জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে সেই সাবধানবার্তাই তিনি শুধু দিয়েছিলেন।[155] ঔপনিবেশিক প্রশাসন অবশ্য শুধু তাতে থেমে থাকার পাত্র ছিল না।

গান্ধীয় স্বেচ্ছাসেবকেদের তৈরি সত্যাগ্রহ লবণ যে একেবারেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়, বরং বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগের জীবাণুতে পরিপূর্ণ— এমন দাবি করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেনামি প্রচারপত্র ছড়িয়ে সতর্কতার নামে জনতাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলেছিল। বেনামি প্রচারপত্রের কারণ? যদি এই দাবির বাস্তবতা থাকত, তাহলে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার নিজেই আসরে নামত। বাংলায় এমন প্রচার একেবারে মফঃস্বল স্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। 'বঙ্গীয় স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতির' নাম দিয়ে এমনই এক প্রচারপত্রে দাবি করা হয়েছিল যে, ডায়মণ্ড হারবারের কোন গ্রামে 'অবৈধ লবণ ব্যবহারে' বহু ব্যক্তি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন! বঙ্গোপসাগরের লোনা জলে প্রস্তুত লবণে কলেরার জীবাণু কিলবিল করছে এমন বার্তা দিয়ে জনতাকে সত্যাগ্রহীদের তৈরি অবৈধ নুন ব্যবহারে সতর্ক করা হয়েছিল। এমনকি এই প্রচারপত্র ইংরেজিতেও ছাপা হয়েছিল।[156] কংগ্রেস নেতৃত্বও পাল্টা স্থানীয় স্তরে প্রচার চালিয়ে জনগণকে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচার সম্পর্কে সতর্ক করে

---

154 যতীন্দ্রমোহন বাগচী, 'নুণায়ন', *মাসিক বসুমতী,* ১৫০।

155 From J.J. Harper Nelson to H.B. Dunnicliff, Letter dated the 5th June, 1930. C.B.R. NAI

156 *নীহার,* ৮ এপ্রিল ১৯৩০।

দিয়েছিলেন। *নীহার* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, কাঁথির সরস্বতীতলায় অনুষ্ঠিত এক সভাতে কংগ্রেস নেতা প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ উভয়েই বঙ্গীয় স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি প্রকাশিত প্রচারপত্রটির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। প্রমথবাবু ব্যঙ্গের সাথে যেভাবে প্রচারপত্রটির 'অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন', তা শুনে 'সেই বিরাট সভা একটা উৎকট হাসির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়াছিল' বলেই পত্রিকাটি জানিয়েছিল।[157]

অন্যদিকে, সত্যাগ্রহ নুন জীবাণু-সংক্রামক, অস্বাস্থ্যকর কিনা তার সত্যতা যাচাই করতে বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানির তরফেও ডাক্তার দুর্গারতন ধর (M.R.C.S., London) নিজেদের ল্যাবরেটরিতে সত্যাগ্রহ লবণের বিভিন্ন নমুনার বিশ্লেষণ করেছিলেন। কোম্পানির তরফে এক বুলেটিন প্রকাশ করে ডাক্তার ধর তাঁর বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন। প্রাকৃতিক লবণ-জলের দ্রবণ, যার থেকে লবণ উৎপাদিত হয়, তার মতোই বিভিন্ন সংগৃহীত লবণের নমুনাগুলি জলে মিশিয়ে ডাক্তার ধর এক ঘন দ্রবণ তৈরি করেছিলেন। তারপর সেই দ্রবণে টাইফয়েড, কলেরা এবং আন্ত্রিক রোগের মারাত্মক জীবাণুগুলি যোগ করে তা পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন। তাঁর পরীক্ষায় সেই দ্রবণ পুরোপুরি ব্যাকটেরিয়ামুক্ত প্রমাণিত হয়েছিল। শক্ত দানার সত্যাগ্রহ লবণ নিয়েও তিনি একই পরীক্ষা করেছিলেন। প্রতিটি পরীক্ষাতেই সত্যাগ্রহ লবণ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন।[158] ডাক্তার ধরের এই দাবি যেন একইসাথে ভারতে ব্যাকটেরিয়োলজি তথা জীবাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতে ব্যাকটেরিয়োলজি শুধুমাত্র রোগের নয়, সমগ্র ক্রান্তীয় উপনিবেশের মোকাবিলায় উদ্ভূত হয়েছিল এবং 'জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের' ও এক 'নৈতিক ভূগোলের' ধারণা তুলে ধরে ভারতে ব্যাকটেরিয়োলজির চর্চায় এবং প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ব্যাকটেরিয়োলজিস্টরা চূড়ান্ত আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিলেন। আর ১৯৩০-এর দশকে, ভারতীয় ব্যাকটেরোয়োলজি প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর (বিশেষত ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসকে কেন্দ্র করে) একচেটিয়া ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং জাতীয়তাবাদীরা।[159]

---

[157] তদেব।

[158] 'Contraband Salt: Purity' in *Amrita Bazar Patrika,* April 13, 1930.

[159] See, the second chapter 'Moral Geographies of Tropical Bacteriology', in Pratik Chakrabarti, *Bacteriology in British India Laboratory Medicine and the Tropic* (New York: University of Rochester Press, 2012) 61-85.

লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীর সত্যাগ্রহ যখন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, জাতীয়তাবাদের সেই আবহে সত্যাগ্রহ লবণে রোগ-জীবাণুর সংক্রমণকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জীবাণুবিশারদরা ব্যাকটেরিয়োলজিতে ব্রিটিশ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক্তার ধরের মতো ভারতীয় ব্যাকটেরিয়োলজিস্টদের নির্ণীত সংক্রমণমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত সত্যাগ্রহ লবণ, এই প্রেক্ষিতে যেন, ব্যাকটেরিয়োলজিতে ব্রিটিশ আধিপত্যর বিরুদ্ধে আর এক সত্যাগ্রহকে তুলে ধরে। বলাবাহুল্য যে, ১৯৩০-এর দশকে, লবণ সত্যাগ্রহ পরবর্তী পর্বে, লবণের গুণমান ও স্বাস্থ্যমান প্রসঙ্গে শেষ কথা কিন্তু ভারতীয় বিশেষজ্ঞরাই বলতে থাকবেন। তার পাশাপাশ দেশীয় লবণ শিল্পের সংরক্ষণে বিদেশী লবণের ওপর বাড়তি আমদানি শুল্ক আরোপ হলে, তার ফলশ্রুতিতে বিদেশি লিভারপুল লবণও এই সময় উপনিবেশ থেকে পিছু হটতে থাকে। বাংলাতেই যেমন লিভারপুল লবণের জায়গায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নুনের আধিক্য এবং উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ শিল্পের পুনর্গঠনের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হবে।

পরিশিষ্ট আলোকচিত্র ৩.১

১৯৩০-এর ৬ এপ্রিল ডাণ্ডির সমুদ্রোপকূলে গান্ধী লবণ সংগ্রহ করছেন, লবণ আইন অমান্যের পূর্ব মুহূর্ত।[160]

[160] ছবি সংগৃহীত হয়েছে, সল্ট মার্চ, উইকিপেডিয়া থেকে, https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_March [accessed on 02.10.2024]

পঞ্চম অধ্যায়

লবণে স্বরাজ?

আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে ও পরে বাংলার উপকূল

বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে 'মুক্তি-পথে' কাব্যগ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'নুনমহল' কবিতার উপজীব্য, দেশজুড়ে লবণকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা আন্দোলন।[1] কবিতার প্রতিটি ছত্রে আশার এই বার্তা স্পষ্ট যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে ব্রিটিশ রাজে অব্যাহত লবণে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যের বিনাশ হবে এবং অচিরেই সাধারণ মানুষের লবণ বঞ্চনারও অবসান ঘটবে। এই দ্রোহের কবিতার বিশেষত্ব অবশ্য অন্য এক মাত্রায় নজর টানে। নিমক মহলের এক ভাঙা-পরিত্যক্ত লবণ কুঠিকে এখানে যেন জীবন্ত প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তাকে 'অতীত পাপের স্মৃতি' মনে করিয়ে দিতেই কবিতাটির অবতারণা। বলাবাহুল্য যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় লবণ ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার পর বিভিন্ন লবণ উৎপাদন ক্ষেত্রতে কুঠি তৈরি করেছিল। মহিষবাথান থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরেও এরকমই এক পুরোনো লবণ কুঠি ১৯৩০-এর দশকে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এককালের 'বেনে রাজার খাসতালুক' এই লবণ কুঠি কিভাবে 'শুকনো মুখ' করে 'কাতর চোখে দেখছে কালের রীতি', তা কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। লবণ কুঠিটির অতীতের পাপ ছিল, 'নেহাৎ গরীব এক বেলা যে আধপেটাতে দিন কাটায়' তার জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় নুনের - যা নিখরচাতে মানুষ সর্বত্র পায় - অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। এভাবে 'দীনের সর্বনাশ' ঘটতে দেখে 'দীনদুনিয়ার দেবতা কাঁদেন', এমনকি 'আসন তাঁহার তখন ওঠে কেঁপে'। আর তাই নিমক মহল এবং তার দেশীয় গোলামেরা যারা দেশের মানুষকে শোষণ করেছে বা দেশের 'রক্ত শোষে' তাদের চৌদ্দপুরুষ বিধিপ্রদত্ত অভিশাপ ভোগ করতে চলেছে। নিমক মহলের অতীতের দর্প কালের নিয়মে ফুরিয়েছে, কারণ 'দেশজুড়ে আজ প্লাবন এল,/ অনেক ভীতি অনেক ভুল/ ভাসিয়ে দিল অনেক যুগের গ্লানি;' আর তাই নিমক মহলের ধ্বংসাবশেষ দেখে পথিকও অনুভূতিশূন্য- 'এক ফোঁটা জল আনতে নারি চোখে'। কবিতা জুড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত লবণ কুঠিটির বিষণ্ণতা ('শুক্‌নো মুখ'), অসহায়তা ('কাতর চোখে

[1] প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মুক্তি-পথে* (কলিকাতা প্রবাসী প্রেস, আনু. ১৯৩১) ২০-২২। Proscribed Literature, NAI.

দেখছে’), বিপন্নতা (‘মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে আছে’) যেন সামগ্রিকভাবে নিমক মহলের ওপর বিদেশি আধিপত্যের সমাপ্তি তথা মৃত্যুঘণ্টার প্রতীক হয়ে উঠেছে। অচিরেই ভারতীয়দের নিজস্ব দেশীয় নুনমহল যে গড়ে উঠতে চলেছে তাঁর ইঙ্গিত শেষে স্পষ্ট: ‘দেশজুড়ে যে নুন ফুটেছে! কোথাও তোমার নাইক ঠাঁই;/ নিমকমহল! চায় না তোমায় লোকে [বানান অপরিবর্তিত]।’[2]

‘নুনমহল’ রচয়িতা কবি ও চিত্রশিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩০-এ গান্ধীর আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গান্ধীবাদী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে মহিষবাথানে লবণ আইন অমান্য করে কারাবরণ করেছিলেন। কারাবন্দী একাকীত্বের দশায় তিনি ‘নুনমহল’ লিখেছিলেন, যদিও তখন জানতেন না যে তাঁর কবিতার ‘কারা-প্রাচীরের বাহিরে লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিবার সৌভাগ্য’ হবে কিনা।[3] সুতরাং প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনে, বিশেষ রাজনৈতিক আবহে লবণ যে বিশিষ্ট অর্থে, তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে অনুধাবন করা যায় যে, লবণ এখানে শুধু মানুষের জীবনে অপরিহার্য বস্তু নয়, বরং তা ভৌত অস্তিত্ব অতিক্রম করে এক ‘সামাজিক জীবনে’ সম্প্রসারিত হয়েছে, ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিকেরা তাঁদের গবেষণায় তুলে ধরেছেন বস্তু কিভাবে মানুষের চিন্তা এবং আচরণকে প্রভাবিত করে নির্দিষ্ট আকার দিতে পারে। সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির বিভিন্ন মাত্রায় তা ভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে সক্ষম।[4] গান্ধীর প্রতীকী আন্দোলনের আহ্বানে, লবণকে কেন্দ্র করে জনমানসের কল্পনা যে বহুমুখী বিস্তার লাভ করেছিল, এবং তা যে অগণিত মানুষের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্নের সমাহার হয়ে উঠেছিল, তার অন্যতম নিদর্শ ‘নুনমহল’। তবে প্রভাতমোহনের মতো মানুষেরা ‘দেশজুড়ে যে নুন’ ফুটতে দেখেছিলেন তা কি চিরস্থায়ী হয়েছিল, অর্থাৎ লবণ সত্যাগ্রহ পরবর্তী সময়ে দেশীয় নুনমহলের স্বপ্ন কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছিল, সেই প্রশ্ন সমাজেতিহাসের গবেষকের মনে স্বভাবতই উঠে আসে। বাংলায় নুন-ভাতের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে লবণে স্বরাজের ধারণা তাই আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষত লবণ সত্যাগ্রহের চার বছর আগেও স্বরাজ নয়, ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য নুন ভাতের দাবি জানিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল: ‘ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায়

---

[2] তদেব।

[3] ভূমিকা, তদেব।

[4] Arjun Appadurai edited, *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspectives* (UK: Cambridge University Press, 1986).

দুটো ভাত একটু নুন।/ বেলা বয়ে যায়, খায়নিকো বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!'[5] সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে লবণকে কেন্দ্র করে স্বরাজের ধারণার বাস্তবায়ন তাই সঙ্গতভাবেই স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

বাংলায় লবণ আইন অমান্যের ইতিহাসচর্চায় লবণ অবশ্য উপলক্ষ মাত্র, গান্ধীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিশ্লেষণই আলোচনার ভরকেন্দ্রে থাকে। অর্থাৎ লবণের নামমাত্র উল্লেখের পর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা মুখ্যত আলোকপাত করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ও বাঙালি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ওপর, তার পাশাপাশি গান্ধীবাদী নেতৃত্ব ও গ্রামীণ গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, এমনকি বৈপ্লবিক সমিতি-সংগঠনগুলির ভূমিকাতেও আলো পড়ে। লবণ সত্যাগ্রহের পর্যালোচনায় কখনো কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সংগঠনের বাইরে থেকে জাতীয়তাবাদী-মনস্ক স্থানীয় স্তরের ব্যক্তিবর্গ, গ্রামীণ গঠনমূলক কর্মীরা ও বিপ্লবীরা কিভাবে যোগদান করেছিলেন এবং একযোগে আন্দোলনকে সংগঠিত ও সাময়িকভাবে সফল করে তুলেছিলেন সেই দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[6] বিপ্লবী সংগঠনগুলি আইন অমান্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় হিংসা এবং অহিংসার সীমারেখা কতটা স্পষ্ট ছিল কখনো সেই প্রসঙ্গ পর্যালোচিত হয়।[7] আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে প্রতিবাদের রাজনীতি কিভাবে প্রায়শই জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের গতানুগতিক বিন্যাসের বাইরে চলে যায় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যথা- শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী, নারী, ভদ্রলোক সকলেই কিভাবে সেই রাজনীতিতে বিভিন্ন মাত্রায় জড়িয়ে যায় সেই দিকটিও বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।[8] ইতিহাসচর্চায় এই প্রেক্ষিত থেকেও, ১৯৩০-এর দশকে বাংলায় লবণকে কেন্দ্র করে আইন আইন অমান্য আন্দোলন কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা গুরুত্ব সহ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

গান্ধীয় নৈতিক রাজনীতির আবহে বঙ্গীয় জনজীবনে লবণ কি অর্থ ও তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়েছিল, কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল তা এই অধ্যায়ের অন্যতম উপজীব্য। তার পাশাপাশি আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে ও পরে লবণ কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের বিবরণে ও বিশ্লেষণে বাংলার উপকূল অঞ্চল এই অধ্যায়ের কেন্দ্রবিন্দু

---

[5] নজরুল ইসলামের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি সর্বহারা কাব্যগ্রন্থ ১৯২৬ সালে সংকলিত হয়। এখান উদ্ধৃত হয়েছে, *নজরুল-রচনাবলী* জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা বাংলা একাডেমী, ২০১১ পুনর্মুদ্রণ), ১২৭-১৩১।

[6] Srilata Chatterjee, *Congress Politics in Bengal 1919-1939* (London: Anthem Press, 2002).

[7] See chapter 3 'Erosion of Non-violence', in Gitasree Bandyopadhyay, *Constraints in Bengal Politics, 1921–1941, Gandhian Leadership* (Calcutta: Sarat Book House, 1984), 110-158 [150].

[8] Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934, The Politics of Protest* (Delhi: Oxford University Press, 1987), 80.

হয়ে উঠেছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের দীর্ঘ ঐতিহ্য ব্রিটিশ রাজের পর্বে বিলুপ্ত হয়েছিল, এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উপকূলবর্তী মানুষের লবণ উৎপাদনের অধিকার আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যদিও ধারাবাহিকভাবে চোরাগুপ্তা লবণ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে উপকূলের দরিদ্র মানুষ লবণ আইন অমান্যের অগণিত নজির রেখেছিলেন। পুলিশী ও আইনি নথিতে অবৈধ লবণ উৎপাদকদের জেল-জরিমানার পরিসংখ্যান থেকে তা স্পষ্ট হয় [দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত]। গান্ধীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আহ্বান উপকূলের লবণ উৎপাদনের ধারণায় কি তাৎপর্য সঞ্চার করেছিল, অবৈধ উৎপাদনের অপরাধ কিভাবে বৈধ অধিকার রূপে গণ্য হয়েছিল— তা বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে এই অধ্যায়ের প্রাথমিক পর্বে। লবণকে কেন্দ্র করে উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের প্রতিরোধের ধারাবাহিকতা, তৎসহ জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীতে কিভাবে তার সংযোগ, সমন্বয় ঘটেছিল তা অনুসন্ধান করাই এই পর্বের আলোচনার মূল লক্ষ্য।

লবণ আইন অমান্য কিভাবে হয়েছিল তার আলোচনাও এখানে বিশদ পর্যালোচনার দাবি রাখে। কারণ গান্ধী লবণকে স্বরাজের প্রতীক রূপে তুলে ধরলেও লবণের বস্তুগত মাত্রাকে (যথা- উৎপাদন, বহন, বন্টন ও বিক্রয় ইত্যাদি) কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর নৈতিক রাজনীতির কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। বাংলার উপকূলে সত্যাগ্রহীরা কিভাবে লবণ তৈরি করেছিলেন, তা কি খাওয়ার উপযুক্ত ছিল— বস্তুগত বাস্তবিক চাহিদার প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় লবণ উৎপাদনের ঐতিহ্যে যে স্থানীয় বৈচিত্র্য ছিল তা কি এই আন্দোলনের পর্বে কোনোভাবে পরিলক্ষিত হয়? এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। সত্যাগ্রহীরা কিভাবে লবণ বিতরণ বা বিক্রয় করেছিলেন, সেই লবণের মূল্য কি ছিল, জনতার প্রতিক্রিয়াই বা কি ছিল সেই প্রসঙ্গগুলি এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লবণ আইন অমান্য করতে গিয়ে আমজনতা কিভাবে পুলিশী তথা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সামাজিক স্তরে তা কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, তার পর্যালোচনাতেই এই পর্বের সমাপ্তি।

গান্ধী লবণকে স্বরাজের প্রতীক রূপে তুলে ধরে লবণ সত্যাগ্রহ সংগঠিত করেছিলেন। সত্যাগ্রহ পরবর্তী পর্বে লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীয় স্বরাজের ধারণা কিভাবে, কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছিল? আরো স্পষ্ট করে বললে লবণ সত্যাগ্রহের ফলশ্রুতিতে আমজনতার লবণ-বঞ্চনার কি সমাধান হয়েছিল? উপকূলের মানুষ কি দেশীয় নুন তৈরি করার অবাধ অধিকার ভোগ করেছিলেন? লবণ সত্যাগ্রহ পরবর্তী পর্বে ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল? লবণকে কেন্দ্র করে সরকারি নীতিতে কি কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়? এই

প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে অধ্যায়ের তৃতীয় পর্বে। প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণার প্রেক্ষিতেও উল্লিখিত প্রশ্নগুলি গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তার কারণ, সাধারণভাবে ইতিহাসচর্চায় ধরেই নেওয়া হয় যে, লবণ সত্যাগ্রহের পরবর্তী পর্বে আমজনতার জীবনে যাবতীয় লবণ বঞ্চনার অবসান হয়েছিল। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলশ্রুতিতে উপকূলের মানুষ তাদের লবণ তৈরির হৃত অধিকার ফিরে পেয়েছিল এবং জনতা লবণ তৈরি করে তা হাটে বাজারে যথেচ্ছ বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছিল; সর্বোপরি ঔপনিবেশিক পুলিশের পক্ষেও চুক্তি ভঙ্গকারী বেআইনি লবণ উৎপাদক বা কারবারীদের ধরা আর সম্ভব হয় নি— এমন ধারণাই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় তুলে ধরা হয়।[৭] বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে অবশ্য এই প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসে। প্রথমত, চুক্তির শর্ত ভেঙে লবণ উৎপাদন করলে এতকাল ধরে নিপীড়ন চালিয়ে আসা পুলিশ এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কিভাবে রাতারাতি প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়? গান্ধীর আন্দোলন কি প্রশাসন-পুলিশকে এতটাই দুর্বল করে দিয়েছিল? ভারত ছাড়ো আন্দোলন সহ বিভিন্ন গণ আন্দোলনে তীব্রতর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের নজির কিন্তু অন্য চিত্র তুলে ধরে। তাই চুক্তিভঙ্গ করে লবণ উৎপাদন ঘটনা ও পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা খতিয়ে দেখা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে, দেশীয় লবণ উৎপাদন কুটীরশিল্পের আকার নিয়েছিল। কিন্তু বাংলার জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে কুটীরশিল্প কি এককভাবে বিপুল লবণের চাহিদা যোগাতে সক্ষম? তাছাড়া উপকূল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলেই বা মানুষের চাহিদা কিভাবে মিটবে? ভারতের অন্যত্র থেকে লবণের আমদানি ছাড়া অথবা বাংলায় বৃহৎ লবণ শিল্পদ্যোগ গড়ে তোলা ছাড়া তা কিন্তু সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিত থেকে বর্তমান অধ্যায়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে কি বৃহৎ লবণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছিল? যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের লবণ চাহিদা কি বিদেশির বদলে বাংলার দেশীয় লবণ শিল্প মিটিয়েছিল? এই লবণ শিল্পোদ্যোগে উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রমের পরিবেশ, কর্মসংস্থানের ছবিটিই বা কিরকম ছিল? সর্বোপরি এই শিল্পোদ্যোগে সরকারের ভূমিকা কি মুখ্য ছিল না কি বেসরকারি উদোগেই তা পরিচালিত হয়েছিল? গান্ধীয় লবণ সত্যাগ্রহের আদর্শ কি এই লবণ শিল্পোদ্যোগে কোনো প্রভাব ফেলেছিল? এই প্রসঙ্গগুলির পর্যালোচনাই বর্তমান অধ্যায়ের শেষ পর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

[৭] জনগণ, কংগ্রেস ও গান্ধীজী' শীর্ষক প্রবন্ধে এমনই অভিমত তুলে ধরেছেন হিতেশরঞ্জন স্যানাল, *স্বরাজের পথে* (কলকাতা প্যাপিরাস, ২০১৪), ২৫৮।'

।। ১ ।।

‘অবৈধ’ লবণ উৎপাদক থেকে বৈধতার দাবি: উপকূলে ‘গণজাগরণ’

গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে লবণ উৎপাদনকে কেন্দ্র করে উপকূলীয় অঞ্চল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। বাংলার উপকূলভাগে, বিশেষত মেদিনীপুরের মতো জেলায়, লবণ শুধু প্রতীকী তাৎপর্য নয়, আরো ভিন্নতর অর্থ বহন করত। কারণ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই জেলাতে লবণ উৎপাদনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু অবশিল্পায়নের দরুন পরবর্তী সময়ে তার বিলুপ্তি জনমানসে তিক্ত রেশ রেখে গিয়েছিল।[10] তবে, শুধু রুজি-রুটির অধিকার হারানোই নয়, উপকূলবর্তী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে মূল্যবৃদ্ধি জনিত লবণ-বঞ্চনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কারণেও এই তিক্ততার রেশ প্রবল ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে, দেশীয় লবণ উৎপাদনে সরকারি নিষেধাজ্ঞার পর থেকেই, প্রাদেশিক প্রশাসনের সহায়তায় শুল্ক ও লবণ বিভাগের কমিশনার বেআইনি লবণ উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। পুলিশ ও লবণ-আধিকারিকেরা লবণাক্ত অঞ্চলে নজরদারি চালাতেন এবং বেআইনি দেশীয় লবণের সন্ধান পেলে তা বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করতেন।[11] বাংলার উপকূলবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা দারিদ্র্যের কারণে ও নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে লবণ তৈরি করতে গিয়ে প্রায়শই জেল, জরিমানা, পুলিশী নিপীড়নের শিকার হতেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির (মার্চ, ১৯৩১) আগে বাংলার উপকূলে প্রতি বছর আনুমানিক ২০০-৩০০ ‘সল্ট কেস’ ধরা পড়ত বলে ঔপনিবেশিক পর্বের ভারতীয় লবণ আধিকারিক এস. সি. আগরওয়াল দাবি করেছেন।[12] আইনের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ করে পুলিশ ও লবণ-আধিকারিকেরা উপকূলীয় অঞ্চলে যে একরকম ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছিল এবং সময় বিশেষে ‘সল্ট কেস’-এর সংখ্যায় যে বিপুল বৃদ্ধি (আগরওয়ালের অনুমিত হিসেবের কয়েকগুণ) পরিলক্ষিত হয়, তা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার [দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত]। অন্যদিকে, স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে ‘নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের’ (Passive Resistance) পন্থায় বিদেশি লিভারপুল লবণ বয়কটের কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে ভদ্রলোক নেতৃত্বের যাবতীয় উদ্যোগ ও উদ্যম দেখা গিয়েছিল; কিন্তু দেশীয় লবণ উৎপাদনের দাবি উঠলেও সেই প্রসঙ্গে তাঁরা নীরব ও নিরুৎসাহী

---

[10] Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934,* 80.

[11] See ‘Preventive Measures’ in S. C. Aggarwal, *The Salt Industry in India* (Delhi: Govt. of India Press, 1956, 2nd Edition), 51.

[12] Ibid.

ছিলেন। নিজের অনপরাধী ভাবমূর্তি সম্পর্কে ধারণাই সম্ভবত বাঙালি ভদ্রলোককে লবণ উৎপাদনের ফৌজদারি অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল [তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত]। এই প্রেক্ষিতে ১৯৩০-এ বাংলার উপকূলে লবণ আইন অমান্যে গান্ধীবাদী ও কংগ্রেস নেতৃত্বের উদ্যোগ ও তৎপরতা স্পষ্টতই এক পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

বাংলায় আন্দোলনকে উপকূল অভিমুখী করে তুলতে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আপাত বিরতি টেনে গান্ধী-অনুগামীদের সাথে যৌথভাবে তৎপর হয়েছিলেন। বাংলায় লবণ সত্যাগ্রহের সংগঠনে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির মতো গান্ধীবাদীদের এবং গান্ধীয় গ্রামীণ আশ্রমগুলির - বিশেষত খাদি প্রতিষ্ঠান (সোদপুর) ও অভয় আশ্রম (কুমিল্লা); তৎসহ খাদি মণ্ডল (আরামবাগ), খাদি মন্দির বিদ্যাশ্রম (ডায়মণ্ড হারবার) ইত্যাদি – গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।[13] গান্ধীবাদীদের সাথে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বোঝাপড়ায়, ১৯৩০-এর ১১ মার্চ, লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য বেঙ্গল কাউন্সিল অফ সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স [এরপর, বেঙ্গল কাউন্সিল] গঠিত হয় এবং সেনগুপ্তের গ্রেফতারির পর (কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখতে) পরবর্তী প্রেসিডেন্ট সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বেঙ্গল কাউন্সিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[14] এক দশক আগে অসহযোগ আন্দোলনের পর্বে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন স্তরে আন্দোলন পরিচালনা করেছিল, আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে তা পরিলক্ষিত হয় নি। প্রাদেশিক, জেলা, মহকুমা ও গ্রামীণ স্তরে আইন অমান্য আন্দোলনের সংগঠনে কংগ্রেস কমিটির (যা নেতৃত্বের প্রশ্নে ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ ছিল) বদলে বেঙ্গল কাউন্সিল-এর অধীনে জেলা ও স্থানীয় স্তরের কমিটিগুলির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।[15] বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রাথমিকভাবে আলাপ-আলোচনার পর বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ছ'টি উপকূলীয় জেলা, যথা- চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা, ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুর, লবণ আইন ভঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। সকল সত্যাগ্রহী সমুদ্রোপকূলে গিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।[16] তবে লবণ সত্যাগ্রহের স্থান নির্বাচন রাতারাতি হয় নি, বরং বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব ও গান্ধী-অনুগামীদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় ধাপে ধাপে তা সম্পন্ন হয়েছিল। যেমন,

---

[13] Prayer, Mario. "The «Gandhians» of Bengal. Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942." Rivista Degli Studi Orientali 74 (2001): 1–363. Available at: http://www.jstor.org/stable/41913060. [Last Accessed on 12.10.2024]

[14] Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934,* 79.

[15] See 'The Civil Disobedience Movement in Bengal', in Srilata Chatterjee, *Congress Politics in Bengal,*141-178.

[16] *Amrita Bazar Patrika*, 19 March, 1930.

বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নেতৃবৃন্দ লবণ আইন ভঙ্গের জন্য প্রথমে মেদিনীপুরের কাঁথি ও পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিকে মনোনীত করেছিলেন। মহিষবাথানের ভাবনা পরে এসেছিল। পরে মেদিনীপুরে তমলুককেও চিহ্নিত করা হয়েছিল। সিলেট বিদ্যাশ্রমের ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর নেতৃত্বে নোয়াখালিতে লবণ আইন ভঙ্গের পরিকল্পনা স্থির হয়। খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রামও ক্রমে ক্রমে মনোনীত হয়।[17] কাঁথির সমুদ্রোপকূলে মেদিনীপুর সদর, কাঁথি, হুগলি ও বাঁকুড়া থেকে আগত সত্যাগ্রহীরা লবণ আইন ভঙ্গ করবেন বলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। একইভাবে, নরঘাটে তমলুক ও অন্যত্র থেকে আসা সত্যাগ্রহীরা; মহিষবাথানে লবণ হ্রদ সংলগ্ন অঞ্চলে চব্বিশ পরগণা, কলকাতা ও হাওড়ার সত্যাগ্রহীরা; খুলনার রারুলি বা পাইকগাছাতে যশোর, ফরিদপুর, নদিয়া এবং খুলনার সত্যাগ্রহীরা; নোয়াখালিতে কুমিল্লা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের সত্যাগ্রহীরা; সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলের লবণ-ঝোরাতে সত্যাগ্রহীরা লবণ আইন ভঙ্গ করবেন বলে স্থির হয়েছিল।[18] এখানে উল্লেখ্য যে, লবণ আইন অমান্যের জন্য গান্ধী ডান্ডি উপকূল অভিমুখে অগ্রসর হলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চোখে ও আইনি ধারণায় এযাবৎ অবৈধ বলে ঘোষিত লবণ উৎপাদনের কার্যক্রমই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বৈধতা প্রাপ্ত হয়েছিল। আর তাই, লবণ আইন ভঙ্গের জন্য সত্যাগ্রহীরা শিবির তৈরি করেছিলেন এমন সব জায়গায় যেখানে বেআইনি লবণ উৎপাদন বেশ জোরালো ছিল। সরকারি আধিকারিকেরা সেজন্য বেশ উদ্বেগে ছিলেন, কারণ গ্রামবাসীদের সমর্থন ও 'সহানুভূতি ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি, সরকারি আধিকারিকদের জন্য নয়'।[19] অবৈধ লবণ উৎপাদনকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শোষণ-নিপীড়নের কারণেই উপকূলের বাসিন্দারা লবণ আইন ভঙ্গের আহ্বানের সাথে সরাসরি আরো একাত্মতা অনুভব করেছিলেন।

১৯৩০-এর মার্চে ডাণ্ডি অভিমুখে গান্ধীর পদযাত্রা ও লবণ আইন অমান্যের সামগ্রিক কর্মসূচি বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ কেন্দ্রিক কার্যকলাপের ধারণায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনে। বাংলার উপকূল অভিমুখে সত্যাগ্রহীদের লবণ আইন অমান্যের কর্মসূচীকে *অমৃতবাজার পত্রিকা* 'গণজাগরণ' (mass awakening) রূপে অভিহিত করেছিল।[20] উপকূলের গ্রামবাসীদের চোরাগুপ্তা লবণ উৎপাদনের অপরাধ, যা স্বদেশি পরবর্তী পর্বে

---

[17] Bengal Satyagraha Reports [hereafter BSR], Bengal Council of Civil Disobedience [BCCD] to All India Congress Committee [AICC], *AICC Papers*, G 86/1930. NMML (Microfilm)

[18] *Amrita Bazar Patrika*, 5 April, 1930

[19] Fortnightly Reports on Bengal, 1st half of April 1930. GOI Home Poll 18/5/I930, cited in Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934*, 80.

[20] 'Mass Awakening in Bengal: 25 Satyagrahis to start for Contai To begin Salt Satyagraha' in *Amrita Bazar Patrika*, 25 March, 1930.

বাংলায় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কাছে প্রায় গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছিল, তা এই পর্বে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রূপে পরিবেশিত হয়েছিল। দারিদ্র্যের তাড়নায় যে গ্রামবাসীরা অবৈধভাবে দেশি লবণ তৈরি করতে গিয়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাদের পরিচিতি, গ্রামের নাম সংবাদপত্রের পাতায় গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়। *অমৃত বাজার পত্রিকার* প্রতিবেদন থেকে যেমন জানা যায় যে, ১৯৩০-এর মার্চ মাসে, ডায়মন্ড হারবারের মথুরাপুর থানার রাক্ষসখালি গ্রামে লবণ তৈরির অভিযোগে দুই মহিলা সহ সহ সতেরোজন কৃষককে পুলিশ গ্রেফতার করে।[21] ডায়মন্ড হারবারের এস.ডি.ও. প্রত্যেক পুরুষকে দুই টাকা এবং মহিলাদের মাথাপিছু চার আনা জরিমানা করেন। পুরুষদের জরিমানা, অনাদায়ে দুই দিনের কারাবাসের শাস্তিবিধান হয়েছিল। অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই দরিদ্র গ্রামবাসী, এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সামান্য লবণ তৈরি করেছিল বলে দাবি করা সত্ত্বেও তাদের এমন শাস্তির প্রতিবাদে *অমৃতবাজার* সরব হয়েছিল। অভিযুক্তদের মধ্যে রাক্ষসখালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন: হেমন্ত বাগ, বঙ্কিম মাইতি, দ্বারকানাথ শিট, কীর্তিবাস খামি, উপেন্দ্রনাথ গায়েন, শশী ভূষণ মাইতি, মহেন্দ্রনাথ হুজ্জিত, রঘুনাথ মাইতি, শ্যাম মাইতি, ভূষণ মাইতি, সাধু মাইতি। অন্যদিকে নামখানা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন: দ্বারকানাথ দোলুই, হাতি মণ্ডল, নিমাই মণ্ডল, পটেশ্বরী বিবি, যোগেশ্বরী দাসী।[22] *নীহার* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই কাঁথির সমুদ্রোপকূলে গরিব লোকেরা দেশীয় নুন তৈরি করে আসছিল। প্রশাসন সবসময় তাতে খুব একটা গুরুত্ব না দেওয়াতে মানুষের 'এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লবণ তৈরি করলে তা দণ্ডনীয় নয়'।[23] গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের কর্মসূচীর ঘোষণার সাথে সাথে অবশ্য এই আবহ পালটে গিয়েছিল। ১৯৩০-এর মার্চ মাসে কাঁথির সরপাই গ্রামের কয়েকজন গ্রামবাসী দেশীয় নুন উৎপাদনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁরা জরিমানা দিয়ে ছাড় পেয়েছিলেন। অন্যদিকে পিছাবনীর কাছে সোরঘুনী গ্রামের নারী-পুরুষ মিলিয়ে ষোলজন বাসিন্দাও দেশীয় নুন উৎপাদনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বিচারে সাতজন মহিলার প্রত্যেকের এক টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক দিনের জেল এবং নয়জন পুরুষের প্রত্যেকের পাঁচ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আট দিনের জেলের আদেশ হয়। জাতীয়তাবাদী লবণ আইন অমান্যের কর্মসূচীর সাথে এই স্থানীয় স্তরের কার্যকলাপকে মিলিয়ে দেখার প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পত্রিকাটি গুরুত্ব সহকারে জানায় যে সোরঘুনীর 'আসামীগণ

[21] 'Too poor to buy salt', *Amrita Bazar Patrika*, 26 March, 1930.

[22] Ibid.

[23] 'কাঁথিতে নুণ তৈয়ারি দমনের চেষ্টা', *নীহার*, ১৮ মার্চ ১৯৩০।

জরিমানার টাকা না দিয়া জেলে গিয়াছে'।[24] বেআইনি লবণ উৎপাদনে অভিযুক্তরা যারা অধিকাংশ সময়ে দারিদ্র্যের কারণে জরিমানার অর্থ দিতে না পেরে কারাদণ্ড ভোগ করতেন, তাদের শাস্তিভোগকে এই সময়ে গৌরবান্বিত করা হয়েছিল।

১৯৩০-এর ১১ই মার্চ, আলিপুরের আবগারি আধিকারিকেরা [২৪ পরগণার] ভাঙ্গড় এবং মাতলা গ্রামের ১৫ জন বাসিন্দাকে অবৈধ লবণ তৈরি করার সময় গ্রেফতার করেন। *লিবার্টি* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বিচারে অভিযুক্তদের প্রত্যেকেই দোষী সাব্যস্ত হন। আলিপুরের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট মি. এ. দত্ত দোষীদের মাথাপিছু আট আনা করে জরিমানা করেন। গ্রামবাসীরা কোর্টে ক্ষমাভিক্ষা করে জানিয়েছিল যে দারিদ্র্যের কারণে তারা লবণ কিনতে অপারগ এবং নিজেদের সামান্য প্রয়োজন মেটাতেই তারা সেই লবণ তৈরি করেছিল।[25] *বঙ্গবাণী* পত্রিকা অবশ্য এই একই ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছিল যে, অভিযুক্ত গ্রামবাসীরা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটকে দৃঢ় স্বরে যে কোনো শাস্তিবরণ করতে প্রস্তুত বলেই জানিয়েছিল।[26] উপকূলীয় অঞ্চলের 'অবৈধ' লবণ উৎপাদনের এই স্থানীয় ঘটনা সরাসরি জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও কর্মসূচীতে আলোকিত এবং বৈধতা প্রাপ্ত হয়েছিল যখন গান্ধী স্বয়ং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছিলেন। *ইয়ং ইন্ডিয়াতে* তিনি বিশদ 'নোট'-এ লিখেছিলেন যে, গরিব মানুষের কাছে জরিমানার আট আনা কোনো মজার বিষয় নয় ('no joke')। ম্যাজিস্ট্রেট গরিব গ্রামবাসীদের সতর্ক করে মুক্তি দিতে বা তাদের জরিমানা মকুব করতে পারতেন। আর আইন ভঙ্গের জন্য জরিমানা অপরিহার্য হলে তিনি নিজের পকেট থেকেও দিতে পারতেন! কিন্তু তা করলে তিনি লবণ আইনে 'কাপুরুষতার' দায়ে অভিযুক্ত হতেন। চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে লবণ কিনতে না পারা, আদালতে তা জানিয়ে ক্ষমাভিক্ষা করা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের গ্রামবাসীদের আবেদনকে খারিজ করার এই ঘটনাক্রমকেই গান্ধী আইন অমান্য কর্মসূচীর পক্ষে জ্বলন্ত প্রমাণ বলে গণ্য করেছিলেন। আর তাই তিনি দেশজুড়ে জোরালো শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[27]

---

[24] তদেব।

[25] *Liberty*, Sunday, 16 March, 1930, NMML.

[26] *বঙ্গবাণী*, ১৬ মার্চ, ১৯৩০; cited in Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934*, 81.

[27] Notes, Young India, 20 March, 1930. *CWMG*, Vol. XLVIII, (New Delhi: Publications Division Government of India, 1999, e-book), 460-462.

লবণ সত্যাগ্রহ শুধু উপকূলীয় অঞ্চলের লবণ সংক্রান্ত কার্যকলাপের চরিত্রে আমূল রূপান্তর ঘটায় নি, তার পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলকে সরাসরি জাতীয়তাবাদী মানচিত্রে সংযুক্ত করেছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যদি লবণ উৎপাদনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে আইনি সংস্থান এবং পুলিশ ও লবণ আধিকারিকদের নজরদারি, নিপীড়ন তথা নিয়ন্ত্রণের সূত্রে উপকূলের ঔপনিবেশীকরণ করে থাকে তাহলে গান্ধীয় সত্যাগ্রহের সূত্রে যে উপকূলের জাতীয়করণ হয়েছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। উপকূলে লবণ উৎপাদন আর চোরাগুপ্তা, নগণ্য অপরাধ নয়, বরং প্রকাশ্য, গর্বোদ্ধত বিদ্রোহের দ্যোতক হয়ে উঠেছিল। উপকূলের বেআইনি লবণ উৎপাদকদের শরীরী ভাষা, অভিব্যক্তি বদলে গিয়েছিল বলেই সরকারি আধিকারিকদের বয়ান থেকে জানা যায়। কাঁথির সাব-ডিভিশনাল অফিসার শৈবাল গুপ্ত আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বে অবৈধ লবণ উৎপাদনের বেশ কিছু মামলা বিচার করেছিলেন। তিনি সাধারণত ধৃত গ্রামবাসীদের ভয়ে জড়সড়, নিচু গলায় তাদের দোষ কবুল করছে এমন ছবিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হবার অব্যবহিত পরেই তাঁর আদালতে যে ধৃত ব্যক্তিরা এসেছিলেন, তারা দোষ স্বীকার তো দূর, জোর গলায় নুন-তৈরির অধিকারের দাবিতে অনড় ছিল।[28]

এই আকস্মিক রূপান্তরের কারণ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আইন এবং অপরাধ সম্পর্কিত ধারণায় বিপর্যাস (inversion) ঘটিয়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে যারা দীর্ঘসময় ধরে নিজেদের মামুলি অপরাধী রূপে ভেবে এসেছিল তাদের আত্ম-ধারণায় এক আকস্মিক রূপান্তর এসেছিল; নিজেদের ভাবভঙ্গী এবং কার্যকলাপকে পুনর্ব্যাখ্যা এবং নতুন করে বোঝার সুযোগ তৈরি হওয়াতে তাদের কাছে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মানের নতুন প্রবেশদ্বার খুলে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে অবশ্য নিম্নবর্গীয় বিদ্রোহী চৈতন্যের কাঠামোগত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত যখন এই যুক্তি দর্শিত হয় যে, উপকূলবর্তী প্রান্তীয় গোষ্ঠীগুলোর জন্য স্বরাজ শুধু রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তান্তরের মতো কোনও সীমিত ধারণা হতে পারে না; বরং সংগ্রামের আদত প্রক্রিয়াটি অবশ্যই এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা, নতুন মূল্যবোধ এবং সম্ভাবনার সীমানাকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করতে পারে।[29] আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে বাংলায় লবণকে কেন্দ্র করে উপকূলবর্তী সাধারণ মানুষের কার্যকলাপ এই প্রেক্ষিতে পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। সত্যাগ্রহ লবণ তাদের জীবনে স্বরাজের কি ভিন্নতর তাৎপর্য তুলে ধরেছিল তা বুঝতে এই পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক।

---

[28] Author’s interview with Shri Saibal Gupta (Contai SDO in 1930), 20 July 1978, in Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934*, 81.

[29] Ibid.

।। ২ ।।

বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলন: লবণ কেন্দ্রিক প্রতিরোধ

লবণ আইন কিভাবে অমান্য করা হবে, ডাণ্ডী অভিমুখে নির্গত হওয়ার আগে গান্ধী তার স্পষ্ট দিশা দিয়েছিলেন। লবণ উৎপাদনের সুযোগ যেখানে রয়েছে সেখানেই লবণ তৈরি করে আইন ভঙ্গের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। বেআইনি নুন (প্রাকৃতিক লবণ বা লবণ-মাটি সহ) ব্যবহারের জন্য কাছে রাখা ও বিক্রি উভয়ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হত। এবং সেই বেআইনি লবণ কেনাও আইন ভাঙার নজির বলেই গণ্য করা হত। সমুদ্রতীরের প্রাকৃতিক জমা লবণ বয়ে নিয়ে যাওয়াও ঔপনিবেশিক লবণ আইন অনুযায়ী বেআইনি অপরাধের পর্যায়ে পড়ত। সর্বোপরি এই ধরণের লবণ ফেরি করাও অপরাধ ছিল। উল্লিখিত উপায়গুলির মধ্যে যে কোনো একটি বা সবকটি ব্যবহার করে কেউ লবণ আইন অমান্য করতে পারে বলেই গান্ধী জনতার উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন।[30] অর্থাৎ লবণের উৎপাদন, বহন, বিতরণ, বিক্রয়, ব্যবহার তথা বস্তুগত মাত্রা তুলে ধরেই গান্ধী দেশজুড়ে প্রতীকী আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাংলায় লবণ আইন অমান্যের এই কর্মসূচি কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং জনসাধারণ কিভাবে তাতে সাড়া দিয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাই এই অনুচ্ছেদের মূল লক্ষ্য।

লবণ উৎপাদন পদ্ধতি

বাংলায় সত্যাগ্রহীদের সামনে প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ ছিল খাওয়ার উপযুক্ত লবণ তৈরি করা। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসে সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স কমিটির সম্পাদক পূর্ণ চন্দ্র দাস খাদ্য উপযোগী লবণ তৈরির সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছিলেন।[31] প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে তৈরি করা লবণের নমুনা পাঠিয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে লবণ তৈরির পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই পদ্ধতির ধাপগুলি ছিল: (১) যতটা সম্ভব রাতের বেলায় লবণের দ্রবণ তৈরি করে পরের দিন সকালে ফোটানো, যাতে মাটি সহ অন্যান্য অশুদ্ধি উপাদান থিতিয়ে যাওয়ার সময় পায়; (২) ফোটানোর পর প্রথম ধাপে উৎপাদিত কেলাসিত লবণকে পৃথক করা এবং পুরো তরলটিকে ফোটানো; তবে

[30] Speech at Prayer Meetings, Sabarmati Ashram dated 11 March, 1930, published in Young India, 12 March, 1930, *CWMG* VOL. XLVIII, 395-396. 403-406.

[31] *Amrita Bazar Patrika*, 12 April, 1930.

কোনোভাবে তা যেন শুকনো না করে ফেলা হয়; (৩) পাত্রের তলদেশে সবসময় কিছুটা পরিমাণে মূল তরল দ্রবণ রেখে দিতে হবে, যা প্রায় সবরকম অশুদ্ধি উপাদান যেমন মাটি, বালি এবং অন্যান্য লবণ ইত্যাদি ধরে রাখতে পারে। এতে হয়তো মোট উৎপাদনে কিছুটা সময় নষ্ট হবে, কিন্তু এভাবে তৈরি লবণই শুদ্ধ ও নিরাপদ হবে। (৪) এই পদ্ধতি মেনে তৈরি লবণ অশুদ্ধি মুক্ত হবে এবং নিরাপদে সেবন করা যাবে।[32] সত্যাগ্রহীরা যাতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে খাদ্যোপযোগী লবণ তৈরি করেন তার জন্য দেশের নানা প্রান্তে লবণ তৈরির এমন নির্দেশিকা সিভিল ডিসবেডিয়েন্স কমিটিগুলির তরফে জারি করা হয়েছিল। বোম্বাইয়ের [অধুনা মুম্বই] ভিলে পার্লে শিবির থেকেই যেমন কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন করা যাবে সে সম্পর্কে এক বিশেষ বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল।[33]

সত্যাগ্রহীরা নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনেই যে ব্যবহারের উপযুক্ত লবণ তৈরি করেছিলেন তা *অমৃতবাজার পত্রিকায়* তুলে ধরা হয়েছিল। মহিষবাথানে যেমন নুন তৈরির জন্য মৃৎপাত্র ব্যবহার করে পনেরোটি ফিল্টার তৈরি করা হয়েছিল, আর তার মধ্যে জল এবং লবণাক্ত মাটির মিশ্রণ ভর্তি করা হচ্ছিল। ফিল্টার করা জল প্রায় দুই ফুট ব্যাসের পাত্রে ফোটানোর পর তা থেকে মিহি লবণ মিলছিল। এই পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জন্য সত্যাগ্রহীদের গ্রামের প্রায় সিকি মাইল দূর থেকে লবণাক্ত মাটি বয়ে আনতে হয়েছিল। ৬ এপ্রিল বিকেলে মহিষবাথানে প্রায় পাঁচ সের লবণ উৎপাদিত হয়েছিল। দিন দশেক পরে দেখা গেল মহিষবাথানের পার্শ্ববর্তী প্রায় বারোটি জায়গায় ধারাবাহিকভাবে লবণ তৈরি অব্যাহত ছিল যাতে প্রায় তিন হাজার গ্রামবাসী সামিল হয়েছিলেন। আর মহিষবাথানের প্রতিটি ঘরেই লবণ তৈরি হচ্ছিল। সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সন্তোষের সাথে জানিয়েছিলেন যে, মহিষবাথানের বাসিন্দাদের আর লবণ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।[34] মহিষবাথান সহ বাংলার উপকূলবর্তী বিভিন্ন স্থানে এভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফুটিয়ে লবণ তৈরি করা হলেও কোথাও কোথাও তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যা স্থানীয় লবণ উৎপাদন পদ্ধতির বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। বরিশাল থেকে শরৎ চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকেরা লবণ আইন অমান্যের জন্য উপকূলবর্তী মির্জাকালুর উদ্দেশ্যে পদযাত্রা করেছিলেন। যাত্রাপথে তারা নারকেল গাছের শাখা ব্যবহার করে লবণ তৈরি করেছিলেন। মির্জাকালুতে পৌঁছানোর আগেই শরৎ ঘোষকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছিল। লবণ উৎপাদনের এই অভিনব

---

[32] Ibid.

[33] See ‘How to Prepare Salt: Simple Process’ in ibid., 11 April, 1930.

[34] Ibid., 20 April, 1930.

পদ্ধতির কথা বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কাছে পেশ করা রিপোর্টেও তুলে ধরেছিল।[35] পূর্ববঙ্গে এভাবে স্থানীয় পদ্ধতিতে লবণ তৈরি করে আইন অমান্যের একাধিক নজির ছিল। ১৯৩০-এর ২৬ শে এপ্রিল ভাঙা-তে চণ্ডীদাসদি গ্রামে উকিল তারাপ্রসন্ন দাসের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীরা নারকেল পাতা থেকে লবণ তৈরি করে আইন অমান্য করেছিলেন।[36] ঢাকা শহরেও লবণ উৎস না থাকায় সেখানকার স্থানীয় মানুষ নারকেল গাছের শাখা ব্যবহার করে তৈরি লবণে আইন অমান্য করেছিলেন। গন্ডারিয়ার ব্রহ্মমোহন ঘোষ নারকেল পাতা থেকে সামান্য লবণ তৈরি করেছিলেন এবং ঢাকার করোনেশন পার্কে তা ২ টাকা ৮ আনায় বিক্রি হয়েছিল।[37] বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে বিশেষজ্ঞ প্রস্তাবিত ও প্রাদেশিক নেতৃত্বের প্রদত্ত নির্দেশিকা মেনে যেমন লবণ উৎপাদন হয়েছিল, তেমনই স্থানীয় উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে লবণ তৈরি করেও জনসাধারণ আইন অমান্য করেছিলেন। স্থানীয় উদ্ভাবনের এমনই বিভিন্ন নিদর্শ অবশ্য উনিশ শতকের বাংলায়ও দেখা গিয়েছিল, যখন স্থানীয় মানুষ লবণের অভাবে উদ্ভিজ্জ ছাই ব্যবহার করে লবণের অভাব মেটাতেন। অনুরূপে অসমের স্থানীয় বাসিন্দারা কলাগাছের বাস্না (খোল) পুড়িয়ে 'টিপনি' নামে একরকম লবণাক্ত ক্ষার ব্যবহার করতেন [প্রথম অধ্যায়ে 'লবণের 'ভেজাল' বিতর্ক' অনুচ্ছেদে আলোচিত]। লবণের অপরিহার্যতা ও অমিলের কারণেই দেশীয় মানুষ নিজেদের চাহিদা মেটাতে বিচিত্র উৎস থেকে লবণ উৎপাদন করতেন। দেশীয় উৎপাদন পদ্ধতির এই বৈচিত্র্য নিজস্ব মাত্রাতেই লবণ আইন অমান্যের কর্মসূচীতে জায়গা করে নিয়েছিল।

লবণ বিক্রয়, বিতরণ ও প্রতারণা নিবারণ

আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে সত্যাগ্রহীদের উৎপাদিত লবণ জনমানসে কি প্রতিক্রিয়া বা তাৎপর্য সঞ্চার করেছিল সেই বিষয়টিও যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে। বেআইনি নুন কেউ নিজের কাছে রাখলে এবং বিক্রি করলে তা যেমন অপরাধ, তেমনই তার বিতরণও লবণ আইন অমান্যকে সূচিত করে বলে গান্ধী জানিয়েছিলেন। তবে জনতার চাহিদা মেটাতে বিক্রির জন্য উৎপাদন নয়, বরং উৎপাদন ও অন্যান্য কার্যের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ্য আইন ভঙ্গ করাই যে লবণ সত্যাগ্রহের মূল লক্ষ্য তা তিনি তুলে ধরেছিলেন।[38] গান্ধীয়

---

[35] BSR, *AICC* Papers, G 86/1930.

[36] *Amrita Bazar Patrika*, 19 April, 1930.

[37] Ibid.

[38] Young India, 27 March, 1930. *CWMG*, Vol. XLVIII, 486-488.

সত্যাগ্রহের সেই নৈতিক লক্ষ্য কতটা পূরণ হয়েছিল তা পর্যালোচনায় লবণ উৎপাদনের পাশাপাশি কিভাবে তার বিতরণ ও বিক্রয় হয়েছিল, ক্রেতা ও বিক্রেতার তরফে কি মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল— সেই প্রসঙ্গে দৃকপাত আবশ্যক।

আইন অমান্য করে প্রস্তুত বেআইনি লবণ কিভাবে বিক্রয় বা বিতরণ হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ছিল। বাংলায় কিভাবে সত্যাগ্রহীরা অবৈধ লবণ বিক্রয় ও বিতরণ করবেন তার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল (৯ এপ্রিল, ১৯৩০) কলেজ স্কোয়ারে কংগ্রেস কার্যালয় থেকে। কংগ্রেস কমিটির তরফে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত এই কর্মসূচি কিভাবে পরিচালিত হবে তার স্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন: (১) কিভাবে, কখন ও কোন পথ ধরে সত্যাগ্রহীরা বেআইনি লবণ বিক্রয় বা বিতরণ করতে যাবেন তা আইন অমান্যের স্থানীয় কমিটি ম্যাজিস্ট্রেট বা সাভ-ডিভিশনাল অফিসারকে আগেভাগে বিশদে জানিয়ে রাখবেন; (২) ছোট ছোট প্যাকেটে সত্যাগ্রহীরা বেআইনি লবণ নিয়ে যাবেন এবং জন পথগুলিতে (public streets) বিক্রি করবেন; (৩) যদি প্রচুর জনসমাগম হয় অথবা বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে সত্যাগ্রহীরা তখনি লবণ বিক্রয় বন্ধ করবেন; (৪) ইচ্ছুক ক্রেতারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন না। সত্যাগ্রহীরা তাদের বাড়ির পাশ দিয়েই লবণ বিক্রি করতে করতে যাবেন; (৫) সত্যাগ্রহীর পথে জনতাকে জমায়েত না করার, কোনো ধরণের চিৎকার এমনকি বন্দেমাতরম ধ্বনিও না দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল; যদি সত্যাগ্রহীর সাথে পুলিশ খারাপ আচরণ করে বা তাকে গ্রেফতার করে তাহলে জনতা যেন উত্তেজিত না হয়, বরং পুরোপুরি অহিংস থাকে এবং নিজেদের স্বাভাবিক কাজেই নিয়োজিত থাকে বলে সুস্পষ্ট নির্দেশিকায় জানানো হয়েছিল।[39] বেআইনি লবণের বিক্রয়কে কেন্দ্র করে সত্যাগ্রহীরা কিভাবে জনসংযোগ তৈরি করেছিলেন এবং জনতার প্রতিক্রিয়াই বা কি হয়েছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯৩০-এর ৭ এপ্রিল, মহিষবাথানে সত্যাগ্রহ লবণ তৈরি হলে তা বেশ চড়া দামে বিক্রি হয়েছিল। পরের দিন থেকে অবশ্য জনসাধারণের জন্য সুলভে প্রতি সের লবণ চার পয়সা দরে বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তার পাশাপাশি ছোট ছোট প্যাকেটে সত্যাগ্রহ লবণের নমুনাও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। প্রকাশ্যে লবণ ফেরি করে জনতাকে সত্যাগ্রহীরা সচেতন করার প্রয়াস নিয়েছিলেন; তাঁরা প্রচার করছিলেন যে ভারত সরকারের আইন অনুসারে এভাবে লবণের কেনা-বেচা অবৈধ। আর তাই এই লবণ নিজের জিম্মায়

[39] *Amrita Bazar Patrika*, 8 April, 1930.

রাখাও আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য।[40] কলিকাতায় বড়বাজার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবকেরা এক পোয়া [এক সের (বা ৯৩০ গ্রাম) ওজনের এক চতুর্থাংশ] মহিষবাথান লবণ এক পয়সা মূল্যে ফেরি করার জন্য নিয়ে এলে জনতার মধ্যে দারুণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে প্রচুর লোকে স্বেচ্ছাসেবকদের চারপাশে ভিড় করে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় দুই হাজার প্যাকেট লবণ 'হট কেক'-এর মতো উড়ে যায়। আরো কয়েকশো প্যাকেট লবণ এনেও জনতার বিপুল চাহিদা মেটানো যায় নি। স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়মিতভাবে মহিষবাথান থেকে লবণ এনে বাজারে ফেরি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বড়বাজারের অবাঙালি বিশেষত মারোয়াড়ি স্বেচ্ছাসেবকেরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকজন ছিলেন জীবনলাল শেওপুরী, চাঁদুলাল, আনন্দজী কোঠারী, রামজি আচারিয়া, নামদাস খুশল, বল্লভদাস, পুরুষোত্তম লাল গানেরিওয়ালা, রাম সিং, ছেদীলাল এবং নাথুরাম।[41]

বেঙ্গল কাউন্সিল অফ সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স-এর সেক্রেটারি ক্ষিতিশ চন্দ্র দাশগুপ্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিলেন যে, ৬ এপ্রিল মহিষবাথানে দশ সের লবণ তৈরি হয়েছিল এবং কলেজ স্কোয়্যারের কাউন্সিল অফ সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স থেকে তা বিক্রি ও বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল।[42] ৮ই এপ্রিল কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছিল যে, বিডন স্কোয়্যারে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শিশির মুখার্জ্জি, বিভূতি ভুঁইয়া, জ্ঞানেশ্বর ভট্টাচার্য প্রতি সের এক আনা দরে পাঁচ সের লবণ বিক্রি করেছিলেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একই সময়ে বড়বাজারের মিশির লাল বঙ্গোয়া এবং সহদেব সিং, উত্তর কলকাতার বীরেন্দ্রলাল মুখার্জি পাঁচ সের লবণ ১ টাকা ৯ সিকে মূল্যে বিক্রি করেছিলেন।[43] ৯ এপ্রিল সত্যাগ্রহীরা কলিকাতায় শেয়ার মার্কেট, হেসিয়ান মার্কেট ও জুট মার্কেটে মহিষবাথানের লবণ বিক্রি করতে গিয়েছিলেন।[44] কলকাতাতে প্রাথমিকভাবে বেআইনি লবণকে কেন্দ্র যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, বাংলার অন্যান্য স্থানেও তার রেশ দেখা গিয়েছিল। কিভাবে কাঁথি ও তমলুকে অদম্য গ্রামবাসীরা পুলিশের গুলিচালনার ঘটনা ও প্রহারকে উপেক্ষা করে লবণ উৎপাদন ও বিক্রি অব্যাহত রেখেছিলেন তা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সত্যাগ্রহ রিপোর্টে তুলে ধরেছিল।[45] সিলেটের প্রদ্যুম্ন গুপ্ত সহ

---

[40] Ibid., 10 April, 1930.

[41] Ibid., 9 April, 1930.

[42] Ibid.,

[43] Ibid., 8 April, 1930.

[44] Ibid.

[45] BSR, *AICC* Papers, G 86/1930, NMML.

৩০ জন সত্যাগ্রহী নোয়াখালিতে গিয়ে আইন অমান্য করে লবণ তৈরি করেছিলেন এবং বেআইনি লবণ নিয়ে ফিরেছিলেন। মৌলবি বাজারে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেআইনি লবণ বিক্রি করেছিলেন।[46] হাসনাবাদে সদানন্দ চ্যাটার্জি ও বিনোদ চন্দ্র বড়ুয়া নিষিদ্ধ লবণ বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে প্রহৃত হন। এখানে রাজপুরের বাসিন্দারা নিজেদের গ্রামে লবণ তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। হাওড়া কাউন্সিল অফ সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স-এর তরফে দেবব্রত সিনহা, রাধিকা প্রসাদ ব্যানার্জি, জীবন কৃষ্ণ জানা, সূর্য কুমার মিত্র, নিশিকান্ত চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার রায় ও শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জি রামচন্দ্রপুর, সালকিয়া, বাগনান, ডোমজুড়, বালিতে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রি করেছিলেন।[47] ব্যারাকপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জগন্নাথ প্রসাদ সিংহ ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রি করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। বিশাল সংখ্যক জনতা বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে তাঁকে জেলখানা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল। তাঁর গ্রেফতার ব্যারাকপুরে বেশ উত্তেজনা তৈরি করেছিল।[48] বেআইনি লবণ বিক্রিকে কেন্দ্র করে এমনই অগণিত উদাহরণ সংবাদপত্রের পাতায় ও পুলিশের খাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

সত্যাগ্রহ লবণকে কেন্দ্র করে আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনার দিকটিও বেশ লক্ষ্য করার মতো। স্বেচ্ছাসেবকেরা দলে দলে সত্যাগ্রহ লবণের ছোটো ছোটো প্যাকেট নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন। প্রতিদিনের শেষে তাদের সাথে থাকা নোটবুক থেকে লবণ বিক্রির মোট হিসেব আঞ্চলিক কমিটির কাছে পেশ করতেন। উত্তর কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় এক স্বেচ্ছাসেবক বাড়ি বাড়ি ঘুরে সত্যাগ্রহ লবণ বিক্রি করেছিলেন। তিনি যেমন ১৬ এপ্রিল ৯ টাকা ৬ আনা, ১৭ এপ্রিল ১২ টাকা ৯ সিকে, এবং ১৯ এপ্রিল ১৫ টাকা ১০ আনা ৬ সিকে মিলিয়ে মোট ৩৭ টাকা ১ আনা ৩ সিকের হিসেব পেশ করেছিলেন। জনতার মধ্যে সত্যাগ্রহী লবণের চাহিদা রয়েছে এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে তার ফেরি করা হচ্ছে– এই বার্তা দিতে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি পরিসংখ্যান সমেত লবণ বিক্রির প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল।[49] সত্যাগ্রহীদের লবণ বিক্রয় কর্মসূচীর আর একটি দিক এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। বাজারি পরিসরে আকছার নকল পণ্যকে আসল বলে বিক্রি করে ক্রেতাকে প্রতারণার অভিযোগ পরিলক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিক পর্বে লবণকে কেন্দ্র

---

46 *Amrita Bazar Patrika*, 29 April, 1930.

47 Ibid. 22 April, 1930.

48 Ibid. 21 April, 1930.

49 *Amrita Bazar Patrika*, 20 April, 1930.

করেও বাজারে এমনই প্রতারণার অভিযোগ ছিল [দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত]। সত্যাগ্রহীদের উৎপাদিত লবণ যেহেতু চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল, সেখানেও এমন প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। *অমৃতবাজার পত্রিকার* প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মহিষবাথানের সত্যাগ্রহ লবণের এতটাই চাহিদা ছিল যে বাজারে তার জাল বা নকল ফেরি হওয়ার খবর আসছিল। তাই কংগ্রেসের উত্তর কলকাতা জেলা সমিতির সম্পাদক ক্রেতাদের সচেতনার্থে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে সত্যাগ্রহ লবণ আসল কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ক্রেতাদেরকে স্বেচ্ছাসেবকের শংসাপত্র [Certificate] আগে যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ ছিল।[50] আইন অমান্য করে সত্যাগ্রহীদের প্রস্তুত লবণ যেমন আমজনতার মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত হয়েছিল, তেমনই লবণকে কেন্দ্র করে গণপ্রতিরোধ কি রূপ নিয়েছিল সেই দিকটিও তলিয়ে দেখা আবশ্যক।

রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন ও জনতার প্রতিরোধ: লবণ কেন্দ্রিক আখ্যান

লবণকে কেন্দ্র করে প্রতিরোধের চেতনা সাহিত্যিকেরা তাদের সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। গান্ধীর আন্দোলনের সূচনাপর্বেই শ্রী সরোজনাথ ঘোষ লিখিত 'বৈশাখী' গল্পে গ্রাম-মফস্বলে কিভাবে লবণকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। গল্পে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী দেখেছিলেন, 'পল্লীসহরে অর্দ্ধনগ্ন গান্ধীজীর প্রবর্তিত লবণ-আইন অমান্য ব্যাপার লইয়া কয় দিন হইতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা চলিতেছে'; [...] 'এখন দেখিতেছি লবণ অমান্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরা-বর্জ্জনের ব্যাপারও আরম্ভ হইল। আবার সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও এ কার্য্যে অগ্রসর!'[51] চৌধুরী সাহেব যথাবিধি সরকারের সমর্থক এবং আইন অমান্যের অপরাধের জন্য প্রায়শই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করতেন। গল্প মোড় নেয় যখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ হাকিম জানতে পারেন যে, লবণ আইন অমান্য তাঁর ঘরেই সিঁদ কেটেছে। অর্থাৎ তাঁরই একমাত্র পুত্র প্রবীর 'নিষিদ্ধ নুণ বিক্রি করার অপরাধে' সেন্ট্রাল জেলে বন্দী হয়েছে! পুত্রের সাজাপ্রাপ্তিতে হাকিম সাহেবের হতাশা দ্বিগুণ হয়েছিল, কারণ 'জেলার হাকিম হইবার আসন্ন সুযোগ, রায়বাহাদুর পদবী লাভের আশু সম্ভাবনা – সবই তো বঙ্গোপসাগরের অতল সলিলগর্ভে সমাধি লাভ করিল!'[52]

---

[50] Ibid.

[51] শ্রী সরোজনাথ ঘোষ, 'বৈশাখী', *মাসিক বসুমতী*, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, (বৈশাখ ১৩৩৭), ১১-১৬।

[52] তদেব

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পেও আলিপুর ট্রেজারির হাকিম সাহেবকে তার পুত্র লবণ সত্যাগ্রহে উদ্বুদ্ধ হয়ে চিঠিতে অনুরোধ করেছিল চাকরি ছেড়ে দিতে। সেই চিঠি পড়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে হাকিম পিতার উক্তি ছিল, "দেখেছ ছেলে বেটার কাণ্ড! আমি জয় মহাত্মা গান্ধী ব'লে চাকরীটি ছেড়ে দিই, তার পর খাই কি? নুণ? নুণ খেয়ে ক'দিন বাঁচবো?" ছেলেকে বকাবকি বা শাসন করতে অবশ্য হাকিম সাহেবকে নিষেধ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী, কারণ- "শেষে কোন্ দিন ব'লে বসবে, চল্লাম আমি নুণ তৈরী করতে [বানান অপরিবর্তিত]।"[53] এরকমই আরেক হাকিম সাহেবের দুর্দশা ফুটে উঠেছিল 'লিমিটেড বাবা' গল্পে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে কাছারিতে বালক অমিয় চার পয়সায় এক প্যাকেট 'কনট্রাব্যান্ড সল্ট' কেনার অনুরোধ জানিয়ে গ্রেফতার হয় ও বিচারে একমাসের কারাবাস হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে অমিয় নিজের নাম জানিয়েছিল 'লবণ-চোর' এবং পুরো নাম 'লবণ-চোর সত্যাগ্রহী'। আশু ডাক্তারের ছেলে অমিয় শাস্তির তোয়াক্কা না করে তার পিতার নাম জানিয়েছিল 'মহাত্মা গান্ধী' যাঁর আদেশে সে বেআইনি লবণ বিক্রি করেছিল। অমিয়কে সাজা দিয়ে সর্বত্র সমালোচিত ডেপুটি সাহেবের দুর্দশা চরমে পৌঁছায় যখন তাঁর বিবাহিতা কন্যা পিকেটিং করতে গিয়ে দুই মাস কারাবন্দী হয় এবং স্ত্রী ও বিশেষত পুত্র তা সমর্থন করে। গল্পের শেষে দেখা যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উপলব্ধি করেন তার পেশাগত (বহির্জগতে)ক্ষেত্রে তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ হতে পারেন, সবাই তার নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারেন ('কনট্রোল তো সকলেরই উপর আছে') কিন্তু গার্হস্থ্যপরিসরে (আন্তর্জগতে) তার নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নচিহ্নের মুখে।[54] লবণ সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে গণস্বতঃস্ফূর্ততার আবহে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অধীনে কর্মরত বাঙালি আমলাদের মনোজগতের টানাপড়েন এই গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে। যদিও মধ্যবিত্ত নাগরিক পরিশীলিত মেজাজ এই গল্পগুলিতে স্পষ্ট। কিন্তু উপকূলবর্তী অঞ্চলে আইন অমান্য করে লবণ তৈরির জন্য সাধারণ মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর পুলিশ যে নির্বিচারে বেত-লাঠি-গুলি চালিয়েছিল, ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল সেই মর্মন্তুদ বাস্তবতা এই গল্পগুলিতে ধরা পড়ে না। সংক্ষিপ্ত কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল রারুলি কাটিপাড়া সত্যাগ্রহী আব্দুল আজিজের হাত পুলিশ গরম লবণ জলে জোর করে ঠেসে রেখে পুড়িয়ে দিয়েছিল। চারুচন্দ্র রায়চৌধুরির হাতও একইভাবে গরমজলে ঠেসে ধরা

[53] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ঘড়ি', *মাসিক বসুমতী,* ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭), ৩৪৬-৩৫৮।

[54] শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু, 'লিমিটেড বাবা', মাসিক বসুমতী, নবম বর্ষ, আশ্বিন, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৭, ৯৫৭-৯৬৪।

হয়েছিল। সেই দগদগে হাত সারতে তিন মাস লেগেছিল। পুলিন বিহারি ঘোষকে পুলিশ চেপে ধরে তার পায়ে গরম লবণ-জল ঢেলে দিয়েছিল। জ্ঞানচন্দ্র ভৌমিকের হাত ও পিঠ থেকে যতক্ষণ না রক্তপাত হয়েছিল ততক্ষণ পুলিশ পিটিয়ে গিয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা লবণ পাত্রগুলোকে বাঁচাতে গেলে পুলিশ বুট দিয়ে তাদের মাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। ২৪ এপ্রিল, ডায়মণ্ড হারবারে নীলাতে লবণ তৈরির সময় পুলিশ সত্যাগ্রহীদের পেটায় এবং গরম জলে চোবানোর চেষ্টা করে, খবর পেয়ে স্থানীয়রা জমায়েত করলে পুলিশ গুলি চালায়। ষোল বছরের আশুতোষ দোলুইয়ের মৃত্যু হয় এবং ৬ জন আহত হয়। ১ জুন, পটাশপুরের প্রতাপদীঘিতে পুলিশ অফিসার সামসুদ্দোহার নির্দেশে পুলিশ গুলি চালায়। সতেরো বছরের ছাত্র-সত্যাগ্রহী কার্তিক মিশ্র এবং বাগমারি গ্রামের বাসিন্দা রামকৃষ্ণ দাস নিহত হয়। ৬ জুন, রামনগর থানার বালিসাইতে লবণ তৈরির জন্য প্রায় এক হাজার লোকের জমায়েত হয়েছিল। পুলিশ গুলি চালালে অনেকে আহত হয়েছিল। ৮ মে কাঁথিতে লবণ আইন অমান্যের অপরাধে হরসুন্দর চক্রবর্তী সহ নয় জনকে পুলিশ উলঙ্গ করে প্রায় দেড় মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। সুধীর চক্রবর্তীর পায়ুদ্বারে পুলিশ নৃশংসভাবে বেত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস তাদের সত্যাগ্রহ রিপোর্টে এই ঘটনাগুলি তুলে ধরেছিল; তৎসহ জানিয়েছিল যে, গরম লবণ জলে সত্যাগ্রহীদের চোবানো যেন পুলিশের কাছে অবসরের বিনোদন হয়ে উঠেছিল।[55]

লবণ আইন অমান্যকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কতটা নির্ভীক ছিলেন ও অহিংসা অবলম্বন করেছিলেন তা নির্মম নিপীড়নের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়। নন্দীগ্রামের তেরপেখ্যা বাজারের বারবণিতা সত্যবতী সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য নানা জায়গায় পুলিশের হাতে প্রহৃত হত। টাকাপুরা গ্রামে লবণ তৈরির অপরাধে পুলিশ তার জরায়ুতে লাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরেও সত্যবতী আবার সত্যাগ্রহে যোগ দিতেন। কাঁথির সুখদা গ্রামের দুধ বিক্রেতা পদ্মা খোলাখালি সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে লবণ জ্বাল দিয়ে ফোটাতে গিয়েছিল। পুলিশ প্রথমে বুটপায়ে তার শরীর মাড়িয়ে দেয়, তারপর যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অচৈতন্য পদ্মাকে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেছিল, পরে সুস্থ হয়ে আবারো আন্দোলনে ফিরে গিয়েছিলেন।[56] পুলিশি নথি, সংবাদপত্র, কংগ্রেস রিপোর্ট, সংরক্ষিত মৌখিক অভিজ্ঞতার নথি সহ নানা উপাত্তে লবণকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের নিদর্শ ছড়িয়ে রয়েছে। নুন-মাটির কাছাকাছি পৌঁছলে,

---

[55] BSR, *AICC* Papers, G 86/1930. NMML.

[56] দেখুন ‘অভয়’ শীর্ষক প্রবন্ধ, হিতেশরঞ্জন স্যানাল, স্বরাজের পথে (কলকাতা প্যাপিরাস, ২০১৪) ১৩-৫৫ [২৭-২৮]।

সাধারণ মানুষের জীবনে লবণ বঞ্চনার বাস্তবতা অনুধাবন করলে সংবেদী ঐতিহাসিক সাধারণ মানুষের প্রতিরোধী চেতনার মধ্যেও বহু স্বর ও বহু স্তর তুলে ধরতে পারেন। কয়েক দশক আগে এভাবেই চারণিক-ইতিহাসবিদ পৌঁছেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে— পুলিশী নিপীড়ন-কারাদণ্ডের আশঙ্কা সত্ত্বেও কোন প্রতিরোধী চেতনায় তাঁরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তা জানার জন্য। মহিষবাথানে, কৃষ্ণপুর গ্রামের মোক্ষদা নস্কর ২১ দিনের কন্যাসন্তানকে ১২ বছরের ছেলের জিম্মায় রেখে নুন জ্বাল দিতে গিয়েছিলেন কারণ তাদের পয়সা ছিল না; দেশের মাটি থেকে নুন করে খাওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল। মোক্ষদার আত্মীয়া সুভাষী নস্কর অবশ্য নুন জ্বাল দিতে গিয়েছিলেন পতিপরায়ণতা বশত, স্বামী নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশের কাজ করতে। ঘুনি গ্রামের বাসিন্দা গফুর মোল্লা বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরি ছেড়ে লবণ আইন অমান্যে যোগ দিয়েছিলেন এবং আজীবন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে বিশ্বাস রেখেছিলেন। কৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে বিলাতি নুন ছেড়ে করকচ নুন খেতে শুরু করেন। লবণ আইন অমান্যে তিনবার কারাবরণ করেছিলেন। আন্দোলনের বিরোধীরা তাকে টিটকিরি দিত 'ও ঠাকুরদা, ক'মণ নুন নিয়ে এলে। চার পয়সায় যা পাওয়া যায় তার জন্য জেল খাটতে যাওয়া'।[57] নিমদাসবাড়ের পরেশ প্রধান সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভকেই তুলে ধরেছিলেন যে 'আমার কাঁথির নুন আমি মেরে খেতে পারব না এ কিরকম কথা।"[58] লবণ-বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধী চেতনায় এমনই নানা স্তর পরিলক্ষিত। তবে এই স্মৃতি নির্ভর চেতনার বিশ্লেষণে যে নানান স্ব-বিরোধিতা, সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে সে বিষয়ে ঐতিহাসিকের সচেতন থাকা জরুরি। লবণের বস্তুগত দিকটি যে আইন অমান্যের প্রতীকী কর্মসূচীর অন্যতম নির্ধারক তা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি থেকেই বোঝা যায়। এপ্রিল ও মে মাস জুড়ে লবণ আইন অমান্য পুলিশি ধরপাকড়, জেল-জরিমানা-নিপীড়ন সত্ত্বেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু বর্ষার আগমনের সাথে সাথে জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে লবণ আইন ভঙ্গের বিষয়টি বিভিন্ন জায়গায় থিতিয়ে যেতে থাকে।[59] কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে কাঁথি ও তমলুকের গ্রামবাসীরা পুলিশের নির্যাতন ও গুলিবর্ষণেও পিছু না হটে পূর্ণোদ্যমে আইন ভঙ্গ করে লবণ তৈরি এবং বিক্রয় করছেন। কিন্তু বর্ষার আগমনে আর লবণ তৈরি বেশিদিন সম্ভব হবে না বলেই ১১ জুন মহকুমা জুড়ে সর্বাত্মক লবণ আইন ভঙ্গের কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই কর্মসূচীকে চূড়ান্ত সফল

---

[57] মৌখিক সাক্ষাৎকারগুলি হিতেশরঞ্জন তুলে ধরেছেন 'স্বাধীনতা সংগ্রামের স্থানিক মাত্রা' প্রবন্ধে, তদেব, ২৩৩-২৪৯।

[58] 'জনগণ, কংগ্রেস ও গান্ধিজী', তদেব, ২৫৮

[59] Government Review of Movement, in *The Indian Annual Register*, Vol. II July – Dec. 1930, P 105, 113.

এবং এক লক্ষ লোক কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছিলেন বলে প্রতিবেদনে তুলে ধরেছিল।[60] আন্দোলনের সমাপ্তি ও সত্যাগ্রহ পরবর্তী সময়ে দেশীয় লবণ উৎপাদনের বিষয়টি কোন অভিমুখে গিয়েছিল তার আলোচনা পরবর্তী অংশে রয়েছে।

।। ৩ ।।

বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগ: সত্যাগ্রহ পরবর্তী সরকারি নীতি

আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর প্রায় এক বছরের মাথায় ১৯৩১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধী-আরউইনের পারস্পরিক আলোচনা শুরু হয়। লবণ আইন প্রত্যাহার বা শিথিল করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছিল। গান্ধী এই বিষয়টিতে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ায় আরউইনের কাছে অবশ্য তা 'আত্মম্ভরিতা' ঠেকেছিল। তবে 'লবণের বিষয়টি নিয়ে যে কিছু করা দরকার' ভাইসরয় তা ভেবেছিলেন।[61] ১৯৩১-এর ৫ মার্চ গেজেট অফ ইন্ডিয়াতে 'গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট' প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং ভারতের সাংবিধানিক ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পাশাপাশি লবণ আইনের প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়। বলাবাহুল্য যে, ঔপনিবেশিক সরকার কোনো আমূল পরিবর্তন নয়, লবণ আইনে আংশিক পরিবর্তনের কথাই তুলে ধরেছিল: 'সরকার লবণ প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত বর্তমান আইন ভঙ্গের প্রচেষ্টাকে কোনোমতেই প্রশ্রয় দিতে পারবে না, তৎসহ দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে লবণ আইনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করতে অপারগ'; যদিও দরিদ্র শ্রেণিকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক আইনে সামান্য রদবদল করার কথা ভেবেছিল, যা আগে থেকেই কিছু জায়গায় বহাল ছিল। যেসব স্থানে লবণ সংগ্রহ অথবা তৈরি করা যায় তার নিকটস্থ স্থানে, বিশেষত গ্রামগুলির বাসিন্দারা নিজেদের ঘরোয়া চাহিদা মেটাতে পারে ও গ্রামের মধ্যে তা বিক্রি করতে পারে; কিন্তু সেই সীমানার বাইরে থাকা কোনো ব্যক্তিকে তারা বেচতে বা ব্যবসা করতে পারবে না।[62]

[60] BSR, *AICC* Papers, G 86/1930.

[61] Ramchandra Guha, *Gandhi the Years that Changed the World, 1914-1948* (Gurgaon: Penguin Random House, 2018) 374-375.

[62] *Legislative Assembly Debates* [Hereafter LAD], 19 February to 11 March, 1931, Vol. II (Simla: Government of India Press, 1931), 1548.

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর দেশীয় লবণশিল্প গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে থাকে। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি 'সল্ট ইন্ডাস্ট্রি কমিটি'-কে (১৯৩১-এর ৩ ফেব্রুয়ারি গঠিত) তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল। এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে ভারতীয় প্রতিনিধিরাও দেশীয় লবণ শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনার দাবি জানিয়ে আসছিলেন এবং সেই দাবি পর্যালোচনা করে ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট ১৯৩০ সালে অ্যাসেম্বলিতে জমা পড়ে। ১৯৩১-এর ১৩ মার্চ, 'সল্ট ইন্ডাস্ট্রি কমিটি'-র (ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্টের সাথে সাযুজ্য রেখে) রিপোর্টে আমদানিকৃত লবণের ধার্য শুল্কের ওপরে, যা ছিল প্রতি মণ পিছু ১ টাকা ৯ আনা, তার ওপর আরো ৪ আনা ৬ পাই অতিরিক্ত শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। বলাবাহুল্য যে সরকার এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় দেশীয় লবণ শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দিকটি যেমন অগ্রাধিকার পেয়েছিল, তেমনই বিদেশি লবণের চাহিদায় অব্যাহত পড়তির হার আরো ত্বরান্বিত হয়েছিল। এই রিপোর্টে ভারতের পূর্ব উপকূলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় লবণ উৎপাদনের সম্ভাবনা ও তার উপযুক্ত পদ্ধতি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সুপারিশও ছিল।[63] ১৯৩০-এর দশক থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্তর্বর্তী সময়পর্বে বাংলায় লবণ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির কি ভূমিকা ছিল এবং লবণ সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে গান্ধীর দাবিগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল তার পর্যালোচনা অনুচ্ছেদের পরবর্তী অংশে রয়েছে।

দেশীয় লবণের গুণমান, বর্ণ, উৎপাদনের পদ্ধতি:

গান্ধী-আরউইন চুক্তির আগেই অবশ্য আন্দোলন চলাকালীন বাংলায় লবণ শিল্পের পুনরুত্থানের দাবি আরো জোরালো হয়ে উঠেছিল। তবে এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরাও সেই দাবিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং বাংলার দেশীয় লবণের গুণমান, রং প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। ১৯৩১ এর ২৬ শে জানুয়ারি, ইউনাইটেড প্রভিন্সের [দক্ষিণ, মুসলিম গ্রামীণ] প্রতিনিধি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাংলায় লবণ উৎপাদনের জোরালো সওয়াল করতে গিয়ে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে এক শতক আগের ইতিহাসকে উদ্ধৃত করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী অ্যান্ড্রু র‍্যামসে হাউস অফ লর্ডসে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিলেক্ট কমিটিকে প্রদত্ত সাক্ষ্যে দেশীয় লবণের উৎকৃষ্ট গুণমানের সওয়াল করেছিলেন। র‍্যামসে সাহেব জানিয়েছিলেন যে, বাংলার লবণ পরিশোধিত না হলেও তা একবার ফোটানো হয় এবং তাতে লিভারপুল লবণের মতো তেতো ভাব একেবারেই থাকে না; সর্বোপরি তা মিহি দানার

[63] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry in India* (Delhi: Govt. of India Press, 1956, 2nd Edition), 35-37.

লবণ।[64] বাঙালির বিশেষ ধরণের সাদা লবণের প্রতি ঝোঁক রয়েছে যা বাংলায় উৎপাদন সম্ভব নয়— এমন যুক্তি অ্যাসেম্বলিতে তখন তুলে ধরা হলেও আহমেদ তা পাল্টা যুক্তিতে নাকচ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে অতীতেও এমন যুক্তি [চেশায়ার-লিভারপুলের স্বার্থে] উঠেছিল এবং বর্তমানে বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিদের স্বার্থে কেউ কেউ সেই একই দোহাই দিচ্ছেন! সেন্ট্রাল প্রভিন্সের প্রতিনিধি স্যার হরি সিং গৌর মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলায় সাদা লবণের চাহিদা বেশি। আহমেদ তাঁর উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, শুভ্রতার বিষয়টি নির্ধারণ করা কঠিন; তাছাড়া শুভ্রতার এত ধরনের প্রকারভেদ রয়েছে যে বাংলা তার মধ্যে লবণে কোন ধরনের শুভ্রতা চায় তা চিহ্নিত করা দুষ্কর।[65] ভারতের বোম্বাই, করাচি, ওখা, পোরবন্দর, তুতিকোরিন প্রভৃতি স্থানের লবণে বাংলার বাজার তখন ছেয়ে গিয়েছিল এবং সেখানকার বণিকস্বার্থ এই আধিপত্য বজায় রাখতে তৎপর ছিল। আহমেদ তা জানতেন এবং তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছিলেন যে, বাংলা নিজের লবণ চায়, যা ভালো এবং সস্তা হবে। লবণ সস্তা এবং বিষাক্ত না হলেই ঠিক আছে, রংয়ের প্রকারভেদে বিচার করা অর্থহীন বলেই তাঁর যুক্তি ছিল।[66] ১৮৩০-এর দশক থেকে বাংলার বাজার দখল করতে চেশায়ার-লিভারপুলের বণিকগোষ্ঠী গুণমান, বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবি করেছিলেন, এক শতক পরে সত্যাগ্রহের আবহে তা অসার প্রতিপন্ন হয়েছিল। স্থানীয় কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক স্বার্থই এখানে অগ্রাধিকার পেয়েছিল, এবং জনরুচি অনুযায়ী সেই লবণ উৎপাদনে বাংলা যে সক্ষম সেই দাবি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অন্যদিকে দেশীয় লবণ উৎপাদনের পদ্ধতি প্রযুক্তি নির্ভর না কায়িক শ্রম নির্ভর হবে তা নিয়েও আলোচনা অব্যাহত ছিল। তবে গান্ধীর সত্যাগ্রহের প্রভাব প্রাথমিকভাবে এই আলোচনার গতিপ্রকৃতিকে অনেকটা নির্ধারিত করেছিল। লবণ উৎপাদনে সরকারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বৃহৎ মেশিন ও ইঞ্জিন নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহারের যুক্তি জোরালো বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ওড়িশার বি. এন. মিশ্রা যেমন ‘মানুষের হাতে তৈরি ইঞ্জিনের’ চেয়ে ‘প্রাকৃতিক ইঞ্জিন’ তথা অফুরন্ত লবণ-উৎস, সৌর-তাপ ও দেশীয় উৎপাদন পদ্ধতির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। সরকারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রয়োগের দাবি আসলে বৃহৎ পুঁজি ও বেসরকারি বৃহৎ কোম্পানির পথ প্রশস্ত করতে চায় বলে তিনি সমালোচনা করেছিলেন। সরকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মহা আশীর্বাদের [‘Great Boon’] দোহাই দিলেও তা দেশীয় উদ্যোগ, স্থানীয় শিল্প ও শ্রমিককে মেরে

64 *LAD*, 14 January to 18 February, 1931, Vol. I (Simla: Government of India Press, 1931), 211-212.

65 Ibid.

66 Ibid.

ফেলার সামিল বলেই তিনি জানিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিতে, সরকার বৃহৎ মেশিন, বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগে লবণ উৎপাদনের সওয়াল করে টাটাদের মতো বৃহৎ কোম্পানীর পথ প্রশস্ত করছে, যারা যুদ্ধকালীন পর্বে সরকারের স্টিলের চাহিদা মিটিয়েছিল।[67] প্রাকৃতিক উৎস ব্যবহার করে খুব সহজেই যে লবণ তৈরি করা যেতে পারে তার উপযুক্ত উদাহরণ রূপে তিনি ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহের উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন। সরকারের রাজস্ব সংস্থানকে বিঘ্নিত না করে এবং মানুষের ওপর বাড়তি খরচ না চাপিয়েও যে লবণ তৈরি করা যায় তার পথ সত্যাগ্রহীরা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং সরকারের উদ্যোগও যেন সেই অভিমুখী হয় বলে তিনি আর্জি জানিয়েছিলেন।[68] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সত্যাগ্রহ পরবর্তী পর্বে বাংলায় কায়িক শ্রম নির্ভর কিন্তু বেসরকারি লবণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছিল। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং অগণিত কৃষক-শ্রমজীবীর অন্নসংস্থানের সম্ভাবনা তুলে ধরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বয়ং কিভাবে সেই উদ্যোগের পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন— তার পর্যালোচনা এই অধ্যায়ের শেষ পর্বে রয়েছে।

লবণ উৎপাদনের সম্ভাবনা ও সরকার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি

লবণ সত্যাগ্রহ পরবর্তী পর্বে বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক) সরকারের ভূমিকার পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কাল পর্যন্ত লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীর স্বরাজের ধারণা সরকারের লবণ নীতিতে কি প্রভাব ফেলেছিল, বা আদৌ কোনো পরিবর্তন আনতে কি সক্ষম হয়েছিল, তা এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে বাংলার উপকূলে লবণ উৎপাদনের সম্ভাবনা, সম্ভাব্য স্থান, উৎপাদন-পদ্ধতি, বৃহৎ না কুটির শিল্পোদ্যোগ গড়ে ওঠা সম্ভব, এমন একাধিক বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। তবে সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত সমূহ খতিয়ে দেখলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা চোখে পড়ে। প্রথমত, বাংলায় লবণ শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞর নেতিবাচক অভিমত এবং ভারতীয় ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের তা খন্ডন করে সদর্থক অভিমত প্রদান; দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের লবণ শিল্পোদ্যোগে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে তোলা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের অভাব; এবং তৃতীয়ত, ১৯৩৭-এ নির্বাচনের পর বাংলার প্রাদেশিক সরকারের লবণ শিল্পোদ্যোগে আগ্রহ, যদিও তা মুখ্যত বেসরকারি উদ্যোগের সহায়তায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলায় লবণ

[67] Ibid., 214.

[68] Ibid.

শিল্পোদ্যোগে গঠিত সরকারি বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলি কি ভূমিকা নিয়েছিল, তাদের মতামত ভবিষ্যতের জন্য কি রূপরেখা তৈরি করেছিল তার পর্যালোচনা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লেজিসলেটিভ কমিটি সি. এইচ. পিট-কে (যিনি পাঞ্জাবের খেওরা সল্ট রেঞ্জের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় লবণ উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ পরীক্ষক রূপে নিয়োগ করেছিল। পিট সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ, ফেজারগঞ্জ এবং লোথিয়ান দ্বীপ, মেদিনীপুরে কাঁথির নিকটস্থ সমুদ্রোপকূল এবং মহিষবাথানের নিকটবর্তী লবণহ্রদ পরিদর্শন করেছিলেন। পিট তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে, আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য - বিশেষত, অতিরিক্ত আর্দ্রতা, কম তাপমাত্রা, শীতকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় – বাংলায় লবণ উৎপাদণের মরসুম চার মাসের বেশি স্থায়ী হবে না। পিট বাংলায় ক্ষুদ্র লবণ শিল্পের সম্ভাবনা দেখেছিলেন, যেখানে পুরোনো পদ্ধতির সাথে সৌর এবং কৃত্রিম বাষ্পীভবনের পদ্ধতি মিলিয়ে লবণ উৎপাদনের পরীক্ষামূলক কারখানা গড়ে তোলা যেতে পারে। আর লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে উপকূলের মানুষ যেহেতু নিজেদের প্রয়োজনীয় লবণ উৎপাদনের সুবিধে পেয়েছিল তাই তাদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত লবণ বাণিজ্যিকভাবে সংগ্রহের জন্য সরকারি গুদাম গড়ে তোলার পক্ষে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। পিটের সমীক্ষার একাধিক সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন, বাংলার বিস্তৃত উপকূলভাগ সম্পূর্ণ পরিদর্শন করেননি। সুন্দরবনের বিশাল অঞ্চল জুড়ে জলের লবণত্ব পরীক্ষা করার সুযোগ ছিল না, পর্যাপ্ত জ্বালানির যোগানের বিষয়টিও দৃষ্টিগোচর হয় নি। বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেননি।[69]

পিটের নেতিবাচক অভিমত সত্ত্বেও ১৯৩৩-এ মেদিনীপুরের পুরুষোত্তমপুরে প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির বেসরকারি কারখানা গড়ে উঠেছিল। এই প্রেক্ষিতে, লবণের কুটির শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা স্বাধীনভাবে খতিয়ে দেখতে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের শিল্প দফতর একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্টকে নিযুক্ত করে। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলায় বার্মা ও করমণ্ডল (মাদ্রাস) পদ্ধতি মিলিয়ে লবণ উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তার ভিত্তিতে সিন্ধু ও বার্মা থেকে দুজন লবণ বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসেন। ১৯৩৪ সালে বার্মা বিশেষজ্ঞ কাঁথি ও কক্সবাজারে এবং সিন্ধু বিশেষজ্ঞ শুধু মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। বার্মা বিশেষজ্ঞ জানিয়েছিলেন যে, বার্মা পদ্ধতির

[69] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 38.

প্রয়োগে বাংলার সমুদ্রোপকূলে বাণিজ্যিকভাবে লবণ উৎপাদনের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত কক্সবাজার এলাকায়।[70]

১৯৩৭ সালে নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের জোট সরকার গঠিত হয়েছিল। লবণ শিল্পোদ্যোগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য এই সরকার মুখার্জি-রাও কমিটি গঠন করেছিল। শ্রী ডি. এন. মুখার্জ্জি ছিলেন এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট ডিপার্টমেন্টের সুপারিটেন্ডেন্ট, আর ভি. এস. রাও ছিলেন খুলনার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কনজারভেটর। তাঁদের সমীক্ষা অনুযায়ী, সুন্দরবনের সপ্তমুখী এবং হরিণভাঙ্গা নদীর সংযোগস্থলের বিস্তৃত লবণাক্ত অঞ্চল লবণ উৎপাদনের উপযুক্ত ছিল। পিটের রিপোর্টকে নাকচ করে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে বার্মা পদ্ধতির অনুসরণে বার্মার থেকেও ভালো লবণ বাংলায় উৎপাদিত হতে পারে। বিপুল পরিমাণে বনজ জ্বালানির সহজলভ্যতা কাজে লাগিয়ে প্রায় ৩৭ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদিত করা যাবে (বাংলায় তৎকালীন আমদানিকৃত লবণের ৪৬ শতাংশ) বলেই তাঁদের অভিমত ছিল।[71] মুখার্জি-রাও কমিটি বার্মা পদ্ধতির অনুসরণে সমুদ্রের লবণ জল থেকে লবণ তৈরির পরীক্ষামূলক কারখানা সুন্দরবনে গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তার সাথে বার্মা থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৯৩৮-এর ১৭ নভেম্বর বেঙ্গল ক্যাবিনেট এই প্রস্তাব অনুমোদন করে, ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার জন্য দশ হাজার টাকার নন-রেকারিং ও দুই হাজার টাকার রেকারিং অনুমোদনও করেছিল; তৎসহ বার্মা বিশেষজ্ঞের বেতন বাবদ অর্থ মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু ডাইরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে ফিনান্স মিনিস্টারের মতভেদের কারণে কোনো পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয় নি। পরিশেষে, ১৯৩৯-এ লবণ উৎপাদকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবের দিকটিতেই জোর দেওয়া হয়েছিল। কারণ প্রতিটা লবণ কোম্পানিকে পৃথকভাবে তার পেছনে সময়, অর্থ, শ্রম ব্যয় করতে হত।[72]

বাংলার লবণ উৎপাদকদের আয়জিত এই কনফারেন্সে এস. সি. মিত্র (ডাইরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, বেঙ্গল) সভাপতিত্ব করেছিলেন। বাংলার লবণ শিল্পকে কিভাবে তুলে ধরা যেতে পারে তা এই এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল। সম্মেলনের শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, শ্রী মিত্রকে প্রেসিডেন্ট করে একটি 'সল্ট কমিটি তৈরি হবে'; এবং এই কমিটিতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সরকারি আধিকারিক মনোনীত হবেন এবং

[70] Ibid., 38-39.

[71] Ibid., 39-40.

[72] Ibid.

প্রতিটি সল্ট কোম্পানি থেকে একজন করে মনোনীত প্রতিনিধিও থাকবেন। সম্মেলনের অন্যতম দাবি ছিল যে, ১৯৩৯-এর মার্চের বাজেটে অনুমোদিত দশ হাজার টাকা (নন-রেকারিং) এবং দুই হাজার টাকা (রেকারিং) অনতিবিলম্বে লবণ শিল্পের স্বার্থে খরচ করতে হবে। বিশেষত, স্লুইস গেট, সুইট ওয়াটার প্ল্যান্টস, এমব্যাঙ্কমেন্ট ইত্যাদি খাতে খরচ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। যদিও সরকার সেই প্রস্তাবে বিশেষ আমল দেয় নি। তবে সল্ট কমিটি গঠনের প্রস্তাব নিয়ে ভেবে দেখার প্রতিশ্রুতি সরকারি তরফে ছিল।[73] ১৯৩৯-এর ৬ ডিসেম্বর [লেটার নং 12479-G] ডাইরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এস. সি. মিত্র জানিয়েছিলেন যে, বার্মা, মাদ্রাজ অথবা উভয় পদ্ধতি মিলিয়ে লবণ উৎপাদনের জন্য কোম্পানিগুলিকে পরামর্শ দিতে একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হবেন। বাংলায় লবণ শিল্পের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক দিক গবেষণার জন্য সেন্ট্রাল সল্ট ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হবে। বাংলায় লবণ শিল্পের অগ্রগতি নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য সল্ট কমিটি গঠিত হবে।[74] ১৯৪১-এর মার্চে সরকারের নির্দেশে ডাইরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বেসরকারি লবণ শিল্পকে কিভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে তার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলায় সৌরতাপে বাষ্পীভবনের মধ্য দিয়ে লবণ শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউ স্বীকৃতি দেয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের এক দশক পর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তার ফলশ্রুতিতে লবণ শিল্পদ্যোগের সম্পূর্ণ বিষয়টি ১৯৪১-এর ১৩ জুন ‘বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির’ কাছে সঁপে দেওয়া হয়। সার্ভে কমিটি আবার পৃথক ‘সল্ট ইন্ডাস্ট্রি এনকোয়ারি সাব-কমিটি’ গঠন করেছিল, যার রিপোর্ট ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই কমিটির রিপোর্টে বাংলায় স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী লবণ উৎপাদনে বার্মা পদ্ধতি বা মাদ্রাজের সৌরতাপে বাষ্পীভবনের পদ্ধতি, অথবা উভয় পদ্ধতির সম্মিলন ঘটানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সুন্দরবনে জ্বালানির সহজলভ্যতার জন্য বার্মা পদ্ধতি, কাঁথিতে মাদ্রাজ পদ্ধতি, আর চট্টগ্রামে বার্মা ও মাদ্রাজ উভয় পদ্ধতির অনুসরণ উপযুক্ত বলে জানানো হয়েছিল। তাছাড়া কুটির শিল্পের লবণ উৎপাদকদের জন্য আর্থিক-প্রযুক্তিগত সহ সব ধরনের সরকারি সহায়তা প্রদান করার, বেসরকারি উদ্যোগে বৃহৎ-আকারে লবণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার এবং লবণ উপজাত দ্রব্যের অনুসারী শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকারকে এই কমিটি সুপারিশ করেছিল।[75]

---

[73] ‘Promotion of Salt Industries in Bengal’ (28 February, 1941) in *Bengal Legislative Council Debates* [hereafter BLCD], First Session, [Volume I, No. 1-13] (Alipore: Bengal Government Press, 1941) 248-249.

[74] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 39-40.

[75] Ibid. 40-41.

উল্লিখিত কমিটিগুলির ভূমিকা পর্যালোচনা করলে, লবণ সত্যাগ্রহ পরবর্তী প্রায় দেড় দশক জুড়ে, বাংলায় লবণোদ্যোগ প্রসঙ্গে সরকারি স্তরে দীর্ঘসূত্রিতা ও ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হয়। বাংলার উপকূলে লবণ উৎপাদনের সম্ভাবনা ও কোন পদ্ধতি যথোপযুক্ত তা নির্ধারণ করতেই এই সময়পর্ব অতিবাহিত হয়ে যায়। পরিকাঠামো তৈরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের যে ন্যূনতম নিদর্শ ছিল তা মুখ্যত বেসরকারি লবণ শিল্পদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। কুটির শিল্পজাত লবণ শিল্পে সহায়তার উদাহরণ শুধু কয়েকটি সরকারি গুদাম তৈরি ছাড়া আর কিছুতে মেলে না। লবণ শিল্পোদ্যোগে বঞ্চনার পাশাপাশি আমজনতার লবণ বঞ্চনাও বাংলা সহ দেশের সর্বত্র ছিল। তার প্রধান কারণ সরকারের লবণ কর প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্ত। ভারতীয় জনপ্রতিনিধিরা অবশ্য তা নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৩৬-এর ৪ মার্চ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে সি. এন. এম. মুদালিয়ার যেমন ভারতীয় আম-জনতার লবণ বঞ্চনা প্রসঙ্গে সরব হয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে, জনতার মধ্যে বিনামূল্যে লবণ সরবরাহ করতে সরকার যাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা নিয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিরা আইনসভায় বারবার দাবি তুলেছিলেন, কিন্তু সরকার তা গ্রাহ্য করেনি। যদি বিনামূল্যে লবণ প্রদান সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতি মণ পিছু ১ থেকে ২ আনা ন্যূনতম শুল্ক ধার্য করে জনসাধারণের সুবিধার্থে লবণ সুলভ করা হোক বলে তিনি দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও সরকার সেই দাবিতে কর্ণপাত না করে ‘সল্ট মনোপলি থেকে প্রভূত মুনাফা লুটছে’ বলেই মুদালিয়ার তীব্র ক্ষোভের সাথে জানিয়েছিলেন।[76] লবণ বঞ্চনার এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উপকূলের মানুষই বা কতটা লবণ উৎপাদনের অধিকার ভোগ করেছিলেন তার পর্যালোচনা পরবর্তী অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

উপকূলীয় মানুষের লবণ উৎপাদনের অধিকার

অবৈধ লবণ উৎপাদনের অভিযোগে উপকূলবর্তী দরিদ্র মানুষের ওপর ব্যাপক পুলিশী নিপীড়নের ও আইনের যথেচ্ছ অপব্যবহারের যে অভিযোগ ছিল, লবণ সত্যাগ্রহের পর তার কি কোনো সুরাহা হয়েছিল বা কতদূর সুরাহা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গটিও আলোচনার দাবি রাখে। লবণ আইন অমান্যের আগে সাধারণ মানুষের ওপর লবণ করের প্রভাব নিয়ে রাজনীতিবিদেরা সোচ্চার হয়েছিলেন; কিন্তু বেআইনি লবণ উৎপাদনের বিষয়টি, সম্ভবত ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হওয়ার কারণে, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রায় গুরুত্বহীন ছিল। গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ সেই প্রেক্ষিতে উপকূলবর্তী মানুষের লবণ উৎপাদনের অধিকারের বিষয়টিকে জাতীয়তাবাদী

---

[76] *LAD*, 28 February to 17 March, 1936, Vol. III (New Delhi: Government of India Press, 1936), 1924.

রাজনীতির ভরকেন্দ্রে তুলে এনেছিল। যার অভিঘাতে, লবণ সত্যাগ্রহ পরবর্তী পর্বে উপকূলীয় অঞ্চলে বেআইনি উৎপাদনের অভিযোগে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় প্রতিনিধিরা সোচ্চার হয়েছিলেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরেও বেআইনি লবণ তৈরিতে অভিযুক্তদের লবণ আইনে দণ্ডিত করার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার যে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিবিধ ধারায় শাস্তিবিধান করছেন— সেই অনিয়ম প্রসঙ্গে অ্যাসেম্বলিতে লালা হরি রাজ স্বরূপ যেমন সোচ্চার হয়েছিলেন। স্যার জেমস ক্রেরার (law member), জবাবে জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭ ধারা প্রয়োগের বিষয়টি বোম্বে হাইকোর্টের বিচারাধীন। আর ভারতীয় দণ্ডবিধির সেকশন ৪০ অনুসারে লবণ আইনের মতো স্থানীয় আইনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার অনুমোদন রয়েছে।[77] আইনের অপপ্রয়োগ নিয়ে যেমন অভিযোগ ছিল, তেমনই উপকূলবর্তী দরিদ্র মানুষকে নানান অজুহাতে লবণ উৎপাদনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগও উঠেছিল। ১৯৩৬-এর ৩ মার্চ, টি. এস. রাজন অ্যাসেম্বলিতে জানিয়েছিলেন যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে; দরিদ্র মানুষকে প্রয়োজনীয় লবণ উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি 'ডান হাতে দিয়ে তা বাম হাত দিয়ে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে'। লোকেরা যথেচ্ছভাবে লবণ সংগ্রহ করছে এমন অভিযোগ তুলে চুক্তিতে যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সরকার তা কেড়ে নিচ্ছিল বলেই তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন। সরকার আইন ভঙ্গকারীকে সাজা দিতে পারে; কিন্তু দোষীকে ধরতে না পেরে, অপরাধ রুখতে না পেরে সমগ্র গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করার কারণ কি তা তিনি জানতে চেয়েছিলেন।[78] গান্ধীর সত্যাগ্রহের পরেও লবণ আইনে আমজনতার প্রতি অবিচার অব্যাহত রয়েছে বলেই এন. আর. গুঞ্জল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৯৩১-এর ১২ মার্চ তিনি মারাঠিতে বক্তব্য পেশ করে জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয়রা সল্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনোভাবে লাভবান হন নি, বরং লবণ পেতে অসুবিধা অনেক বেড়েছিল। লবণ তৈরির জন্য শাস্তি প্রদানের প্রবণতাও উত্তরোত্তর বাড়ছিল। লবণাক্ত অঞ্চলে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী (Salt-raider) সন্দেহে পুলিশ যথেচ্ছ গ্রেফতার করছিল। পুলিশের সহায়তায় সল্ট ডিপার্টমেন্ট নানাবিধ অবিচারের নিদর্শন তৈরি করেছিল বলেই তিনি ক্ষোভের সাথে দাবি করেছিলেন।[79]

---

[77] *LAD*, 14 January to 18 February, 1931, Vol. I, 1931, 338.

[78] *LAD*, 28 February to 17 March, 1936, Vol. III, 1936.

[79] *LAD*, 12 March to 25 March, 1931, Vol. III, 1931, 2701.

বাংলার উপকূলেও গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছিল বলেই বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি নুর আহমেদ জানিয়েছিলেন। সমুদ্রতীরের বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য লবণ তৈরি করার অনুমতি পেলেও তারা অতিরিক্ত লবণ তৈরি করে পার্শ্ববর্তী বাজারে বিক্রি করছিলেন—এমন অভিযোগ তুলে আবগারি দফতরের আধিকারিকেরা অভিযুক্তদের সাজা দিচ্ছিলেন। আবগারি তদন্ত কমিটির [Excise Investigation Committee] রিপোর্ট তুলে ধরেই আহমেদ কাউন্সিলকে তা জানিয়েছিলেন।[80] এখানে উল্লেখ্য যে, দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার কারণেই উপকূলবর্তী মানুষ বাড়তি উপার্জনের আশায় তাদের উৎপাদিত লবণ অন্যত্র বেআইনিভাবে বিক্রি করতে যেতেন এবং ধরাও পড়তেন। অবৈধ ভাবে লবণ বিক্রির অভিযোগ যে মিথ্যে নয়, বরং তার সত্যতা মেনে নিয়েই এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য আহমেদ স্বয়ং তাঁর বক্তব্যে সরকারকে উদ্যোগী হতে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং কক্সবাজার ও পাঁশখালিতে ভোট প্রচারে গিয়ে দেখেছিলেন সেখানকার বাজারজুড়ে ঘরে তৈরি দেশি নুন বিক্রি হচ্ছিল। এমনকি একাধিক নৌকায় স্তূপীকৃত স্থানীয় উৎপাদিত নুন বিক্রির জন্য পড়েছিল বলেই তিনি কাউন্সিলে তুলে ধরেছিলেন। তিনি আরো জানান যে, উপকূলীয় মানুষ দারিদ্র্যের কারণেই এই বেআইনি কাজে লিপ্ত হন; তাদের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের খানিক সুরাহা হলেই এই সমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত হবে। নুনের এই বেআইনি কারবার বন্ধ করতে গেলে বিপুল সংখ্যক আবগারি দারোগা-আধিকারিককেও নিযুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু সরকার যদি তার বদলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেশীয় লবণ উৎপাদনকারীদের বাজারে বিক্রির অনুমতি দেয় তাহলে লবণের কুটির শিল্পে গতি আসবে, সরকারের ভাঁড়ারেও অর্থাগম হবে বলে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সরকারকে লবণ উৎপাদকদের সমবায় সমিতি গঠনের জন্য এবং অতিরিক্ত লবণ সংরক্ষণ তথা মজুত করার জন্য গুদাম তৈরি করার আর্জিও আহমেদ পেশ করেছিলেন। জানুয়ারি থেকে জুন মাস যেহেতু লবণ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত তাই উপকূলবর্তী কৃষকেরাও এই সময় লবণ-শ্রমিক রূপে রোজ তিন থেকে চার আনা বাড়তি উপার্জন করতে পারবেন।[81] কর্মহীন সাধারণ মানুষকে উপার্জনক্ষম করে তুলতে অবশ্য সরকারের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। তাই নুর আহমেদের প্রস্তাব শুধু সরকারি নথিতেই থেকে যায়, সরকারের নীতিতে কোন হেলদোল পরিলক্ষিত না। সরকারের এই ঔদাসীন্য ও গাফিলতি এক ঘোরতর রূপ নিয়েছিল যখন ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পর্বে লবণ

---

[80] 'Non-Official Resolutions' (6 September, 1940) in *BLCD*, Second Session, [Volume II, 1-32], (Alipore: Bengal Government Press, 1940) 781.

[81] Ibid., 782.

সরবরাহেও চূড়ান্ত সংকট দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লবণ না মেলায় পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছিল যে সরকারকে রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হয়েছিল। বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের মর্মন্তুদ প্রেক্ষাপটে লবণ সরবরাহের সংকট কি রূপ নিয়েছিল তার পর্যালোচনা পরবর্তী অংশে রয়েছে।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও লবণ সরবরাহ

১৯৪৩-এর বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেও যা প্রায় বেনজির, আনুমানিক ২১ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে বাংলার অর্থনীতির (যা মূলত কৃষিভিত্তিক) বৃহৎ অংশ যেমন সম্পূর্ণ ধ্বস্ত হয়েছিল তেমনই বাংলার সমাজ-কাঠামোটিও বিপর্যস্ত হয়েছিল। অর্থশাস্ত্রী ও ইতিহাসবিদেরা যুক্তিসহ এই অভাবনীয় মানবীয় বিপর্যয়কে 'মনুষ্যসৃষ্ট' বলে দাবি করেছেন।[82] পল গ্রীনোর গবেষণায় ১৯৪৩-এ চালের বিপণন ব্যবস্থা তথা খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার বিশদ বিশ্লেষণ মেলে। সরকারি পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে চাল নিয়ে ফাটকাবাজদের মজুতদারি কৃত্রিম ভাবে সংকট তৈরি করেছিল। তার পাশাপাশি একদিকে যুদ্ধকালীন সামরিক চাহিদা মেটাতে সরকারের চাল সংগ্রহনীতি, অন্যদিকে শরণার্থীদের আগমন এই সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। প্রথমে চালের অত্যধিক দাম বৃদ্ধি ও তারপর বাজারে তা অমিল হলে অভূতপূর্ব খাদ্যসংকট দেখা দেয় ও সাধারণ মানুষ তার অসহায় শিকার হয়।[83] বাংলায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়া নিয়ে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলে তীব্র বিতর্ক চলেছিল যেখানে লবণের সরবরাহ নিয়েও আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছিল। কারণ, সংকটের দিনে যে ন্যূনতম নুনই খাদ্য গলাধঃকরণ করতে, অপুষ্টি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়ক হয়। উদাহরণ হিসেবে ১৯৪৩-এর জুলাই মাসে দামোদর নদের বন্যার কথা তুলে ধরা যেতে পারে, যা বর্ধমানের গ্রামীণ অঞ্চলকে প্লাবিত করলে মানুষ অভাবনীয় দুর্দশার শিকার হয়। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে মানুষ ত্রাণের আবেদন জানালেও কোন প্রশাসনিক সাড়া মেলে নি। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বঙ্কিম চন্দ্র মুখার্জি জানিয়েছিলেন যে, সরকারের তরফে কোনো সহায়তা না মেলায় গ্রামবাসীরা চিঁড়ে ও নুন খেয়ে দিনের পর দিন বেঁচেছিলেন।[84]

---

[82] Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Clarendon Press, 1981). Paul Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44* (New York: Oxford University Press, 1982).

[83] Paul Greenough, *Ibid*. 85-138.

[84] 'General Discussions on Budget' (23 February, 1945), *BLCD*, First Session, [No. 5], (Alipore: Bengal Government Press, 1945) 103.

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের আবহে লবণের দাম চড়েছিল এবং লবণ যোগানে কোথাও কোথাও সংকট দেখা গিয়েছিল। সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে কে. সি. নিয়োগীর বক্তৃতা থাকে জানা যায় যে, ভারত সরকারের অনুমোদনে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা ও চট্টগ্রামে কয়েকটি গুদাম তৈরি হয়েছিল ও সেগুলিতে দেশীয় লবণ সংগ্রহ করে ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা চলেছিল। বাংলার সর্বত্র লবণ সরবরাহ যে যথাযথ নেই তা সরকারের এই কাজেই স্পষ্ট বলে তিনি সমালোচনা করেছিলেন। আর এই দেশীয় লবণ সংগৃহীত হয়েছিল উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছ থেকে, যারা গান্ধি-আরউইন চুক্তির মাধ্যমে এই অধিকার পেয়েছিলেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি জানতে চেয়েছিলেন ভারত সরকার কি উপকূলীয় বাসিন্দাদের উৎপাদিত লবণকে কুটির শিল্প হিসেবে গণ্য করে? আর লবণ শুল্ক বিলোপের কোনো প্রস্তাব কি ভারত সরকার বাংলার প্রাদেশিক সরকারের তরফে পেয়েছে তার উত্তরও তিনি চেয়েছিলেন।[85] ফিন্যান্স মেম্বার জেরেমি রেইসম্যান তাঁর জবাবে জানিয়েছিলেন যে, পূর্ববঙ্গে ও আসামে লবণ পর্যাপ্ত রয়েছে; সেইসাথে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে সের পিছু লবণের দামের বিশদ তালিকা পেশ করেছিলেন। নিয়োগী অবশ্য এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বাংলার দূরবর্তী, দুর্গম জায়গায় লবণ সরবরাহের জন্য সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না থাকায় রেইসম্যান তা খাদ্য বিভাগের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। রেইসম্যান অবশ্য জানিয়েছিলেন যে, বাংলার সরকারের তরফে কুটির শিল্প হিসেবে লবণ শুল্ক ছাড়ের প্রস্তাব এসেছে; কিন্তু এই কুটির শিল্পের সাফল্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারত সরকারের সংশয় থাকায় কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না।[86] দেশীয় লবণের অবাধ উৎপাদনে আমজনতাকে ছাড়পত্র দেওয়া ত দূরের কথা, এমনকি বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের অনীহা এখানে স্পষ্ট। যদিও নিয়োগীর মতো বাংলার প্রতিনিধিত্বকারীরা হাল ছাড়তে নারাজ ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৪৪-এর ১৬ নভেম্বর, কে. সি. নিয়োগী আবার বাংলায় বিশেষত পূর্ববঙ্গে লবণের অভাব নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। ন্যায্য দামে বাংলার সর্বত্র লবণ সরবরাহের জন্য লবণ উৎপাদনের কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা তিনি জানতে চেয়েছিলেন।[87]

দুর্ভিক্ষের ফলশ্রুতিতে, ১৯৪৪-এর ১৫ মার্চ, বাংলার বিভিন্ন জেলায় লবণ সংকটের অভিযোগ তুলে খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীরা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছিল।

---

[85] *LAD*, 1 to 13 November, 1944, Vol. IV, No. 1 (New Delhi: Government of India Press, 1944), 855.

[86] Ibid., 856-858.

[87] Ibid., 855.

নগেন্দ্রচন্দ্র মহলানবীশ প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন বাংলার মফস্বল এলাকায়, বিশেষত উত্তরবঙ্গে লবণের যোগান না থাকায় মানুষের দুর্দশা বাড়ছে? হুসেন শাহিদ সুরাওয়ার্দি [Minister of Civil Supplies] জানিয়েছিলেন যে, করাচি থেকে লবণ ভারতে না আসায় এই ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। অবশ্য তাঁর সরকার লবণের মজুত ভাণ্ডার থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তা সরবরাহ করছিল এবং পত্রিকায় জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে তা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল বলে তিনি দাবি করেছিলেন।[88] এই প্রসঙ্গে তাঁর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, বিগত দুই মাস ধরে তাঁর সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল এবং সমাধানের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৬ ট্রাক ভর্তি লবণ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছিল। রেলওয়ে ধর্মঘটের জন্য সমস্যা আরো বেড়েছিল। সরকার স্টিমারের মাধ্যমেও দূরবর্তী অঞ্চলে লবণ সরবরাহের চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে সেই সুযোগও না থাকায় সেখানে সংকট যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল তা তিনি মেনে নিয়েছিলেন।[89] লবণ যদি যথাযথ জোগানো ও বিতরণ না হয় তাহলে পরিস্থিতি যে আরো গুরুতর হতে পারে তা সুরাওয়ার্দি স্বীকার করেছিলেন। একইসাথে সরকার তার নিজস্ব লবণ শিল্পকেন্দ্র - ফাক্টরি ও কুটির শিল্প, উভয়েই - যাতে যথাযথভাবে গড়ে ওঠে তার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছিল এবং লবণের দাম যেহেতু চড়া তাই লবণ শিল্পোদ্যোগ অনেককেই আকৃষ্ট করবে বলেই তিনি সরকারের তরফে তুলে ধরেছিলেন।[90] কিন্তু নগেন্দ্রচন্দ্র মহলানবীশ সুরাওয়ার্দির উত্তরে সন্তুষ্ট হননি। বাজারে নুনের সংকটের জন্য ভারত সরকার এবং বাংলার সরকার উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে এমন সমালোচনার মাধ্যমেই তিনি মুলতুবি প্রস্তাবের সপক্ষে আরো সোচ্চার হয়েছিলেন। হুমায়ুন কবীরও তার সমর্থনে জানিয়েছিলেন সুরাওয়ার্দির অধীনে গণসরবরাহ মন্ত্রকও (সিভিল সাপ্লায়েজ মিনিস্টার) এই সংকটের দায় এড়াতে পারেন না। ১৯৪৩-এর অক্টোবর, নভেম্বর থেকে লবণ সরবরাহে সংকট দেখা দিলেও সরকার তখন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তার পরিণামেই বাংলাজুড়ে লবণের আকাল শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর দায় ঠেলার চেষ্টা করা হলেও বাংলার সরকার যে কোনোমতেই নিজের গাফিলতি এড়াতে পারেন না তা তিনি তুলে ধরেছিলেন।[91]

[88] ‘Adjournment Motion regarding shortage of salt supply in Bengal districts’ (28 February, 1944), in *BLCD*, 7 February to 25 October, 1944, First Session, [No. 1-90], (Alipore: Bengal Government Press, 1944), 502.

[89] Ibid.

[90] ‘Adjournment Motion’ (17 March, 1944), in ibid. 557.

[91] Ibid., 558.

উল্লিখিত প্রেক্ষিতে খেয়াল রাখতে হবে যে, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ চল্লিশের দশকে বাংলায় ভয়াবহ বিতর্কিত দুটি ঘটনায়, যথা ১৯৪৩-এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৬ এর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক গণহত্যায় (স্টেটসম্যান পত্রিকার কথায় 'The Great Calcutta Killing'), সুরাওয়ার্দির বিতর্কিত ভূমিকার দিকে মূলত অভিযোগের আঙুল ওঠে।[92] ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সরবরাহে বিপর্যয়ের দায় সুরাওয়ার্দি নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দায় চাপিয়েছিলেন কালোবাজারিদের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। দুর্ভিক্ষ রুখতে তিনি নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন বলেই দাবি করেছিলেন। যদিও লর্ড ওয়াভেল সুরাওয়ার্দিকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেই মনে করতেন। দুর্ভিক্ষ প্রশমিত করতে সরকার উদ্যোগী হয়ে যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করেছিল তার প্রত্যেকটি থেকেই সুরাওয়ার্দি টাকা সরাতেন; তার নিজের সহযোগীদের গুদামঘর নির্মাণের, খাদ্য পরিবহণের এবং সরকারকে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের বরাত দিতেন বলেই ওয়াভেলের কাছে খবর ছিল।[93] লবণ সঙ্কটের প্রেক্ষিতেও সুরাওয়ার্দি অক্লান্ত প্রয়াসের দাবি তথা দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। তবে এই গুরুতর সঙ্কটের কারণেই বাংলার উপকূলে দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগের প্রয়াসকে সংহত ও জোরালো করে তুলতেই বাংলার সরকার প্রয়াসী হয়েছিল।

সংকটের আঁচ পেয়েও নাজিমুদ্দিনের সরকার কেন বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ তৈরির উদ্যোগে জোর দেয়নি সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র মুখার্জি। ১৯৪২-এর সাইক্লোনের পর মেদিনীপুর উপকূলে পরিদর্শনে গিয়ে মুখার্জি লক্ষ্য করেছিলেন যে, তমলুক ও কাঁথিতে লবণ উৎপাদনের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। সেখানকার মানুষ এবং স্থানীয় শ্রমিকেরা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, দশ টাকা মূল্যের লবণ প্যান তাঁদের দেওয়া হলে তাঁরা রোজ হাফ মণ লবণ তৈরি করতে সক্ষম হবেন। সরকার যদি তিন-থেকে চার হাজার প্যান বিতরণ করে তাহলে প্রতি মাসে দুই হাজার মণ লবণ তৈরি হতে পারে। যদিও সেই মূহূর্তে প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচ্য নয় বলে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় জানিয়েছিলেন; অন্যদিকে লবণের সরবরাহ ও পরিবহণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে, তাই প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে আনা মুলতুবি প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে না বলেই কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছিলেন।[94] মাস দুই পরে অবশ্য আবারো লবণ সংকটের বিষয়টি

---

[92] Rakesh Batabyal, *Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali, 1943-47* (New Delhi; Sage, 2005).

[93] ওয়াভেলের পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত হয়েছে, Thomas Keneally, *Three famines: starvation and politics* (US: Public Affairs, 2011), 97.

[94] 'Adjournment Motion' (17 March, 1944), in *BLCD*, 558-559.

কাউন্সিলে উঠে এসেছিল। হরিদাস মজুমদার তাঁর বক্তব্যে সরকারের উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন যে, ১৯৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় থেকেই লবণ সংকট দেখা গিয়েছিল, যার পরিণামে বাজারে নুনের দামও চড়া ছিল; বাংলার কোনো কোনো জায়গায় প্রতি সের এক টাকা আট আনা দামেও বিক্রি হচ্ছিল। তাই সেই যুদ্ধের সময়, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে, দেশীয় পদ্ধতিতে কুটিরে উৎপাদিত নুনও যাতে সাধারণ মানুষ যেকোনো জায়গায় বিক্রি করতে পারেন তার জন্য সরকারকে অনুমতি প্রদানের আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। বাংলার মানুষ 'দুধ ভাত, না হয় তো নুন-ভাত' —এই প্রাচীন প্রবাদে বিশ্বাস রাখে, তাই দুর্ভিক্ষকালীন মহা সংকটের পর্বে সরকার যাতে লবণ উৎপাদনকে শুল্ক-মুক্ত করে তার আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। হরিদাস মজুমদার আনীত এই 'মোশন'-কে নুর আহমেদ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টও এই প্রস্তাব বাংলার গভর্নরের কাছে পাঠানোর কথা জানিয়েছিলেন।[95] সুরাওয়ার্দি অবশ্য লবণ-শুল্ক রদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে তাঁদের সরকার যে লবণের কুটির ও বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার পক্ষপাতী তা জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই সমুদ্রোপকূলে মোট ১১টি লবণ গুদাম (মেদিনীপুরে পাঁচটি, চব্বিশ পরগণায় দুটি, চট্টগ্রামে ৪টি) সরকার গড়ে তুলেছে যেখানে দুমাসে প্রায় চোদ্দ হাজার মণ লবণ মজুত করার ব্যবস্থা হয়েছে বলেই তিনি জানান। কয়েক বছর আগে 'মডেল সল্ট ফ্যাক্টরি' গড়ে তোলার ভাবনা পরিত্যাগ করলেও তা আবার গড়ে তুলতে বাংলার সরকার বদ্ধপরিকর এবং সেজন্য একজন বিশেষজ্ঞকেও নিয়োগ করা হচ্ছে বলে সুরাওয়ার্দি জানিয়েছিলেন। এখানে ল্যাবরেটরি (গবেষণাগার) গড়ে তুলে লবণের গুণমান পরীক্ষা ও লবণ-উপজাত পদার্থ কিভাবে অর্থকরী হতে পারে তার আনুষঙ্গিক গবেষণাও চলবে বলেই তিনি জানিয়েছিলেন।[96]

১৯৪৬-এর ৩০ মে, বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তরফে লবণ উৎপাদনে অগ্রগতি প্রসঙ্গে এক সরকারি বিবৃতি বেঙ্গল লেজিসটিভ কাউন্সিলের সেক্রেটারিকে পাঠানো হয়েছিল এবং ২৬শে জুলাই কাউন্সিলের অধিবেশনে তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছিল। সরকারি এই বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত ১৯৪৩-এর বেঙ্গল সল্ট রুলস (ভিলেজ ম্যানুফ্যাকচার, স্টোরেজ অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট) অনুসারে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিনা লাইসেন্স ছাড়াই কুটির শিল্প হিসেবে লবণ উৎপাদনের এবং সরকারি গুদামে তা মজুর রাখার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বাংলার উপকূলীয় যে জেলাগুলি এই অনুমতি পেয়েছিল সেগুলি ছিল- মেদিনীপুর,

[95] 'Council Procedure Rules' (19 May, 1944), in *BLCD*, 841-842.

[96] Ibid., 845.

হাওড়া, ২৪ পরগণা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা। এই আইন অনুসারে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় ৭টি এবং চট্টগ্রামে ৪টি মিলিয়ে মোট ১১টি গুদামঘর ১৯৪৩-এ নির্মিত হয়েছিল। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য চট্টগ্রামে আরো ৩টি, নোয়াখালিতে ২টি, বাখরগঞ্জে ১টি— মোট ৬টি গুদামঘর ১৯৪৬ সালে নির্মিত হয়েছিল। হাওড়া এবং খুলনাতে সীমিত ও নিম্নমানের লবণ উৎপাদনের কারণে গুদামঘর তৈরি হয় নি। বাংলা নিজের চাহিদা অনুযায়ী যাতে লবণ উৎপাদনে স্বনির্ভর হয় তাই কুটির শিল্প এবং বৃহৎ কারখানা উভয় ক্ষেত্রেই সরকার মনোনিবেশ করেছিল এবং একজন লবণ উন্নয়ন আধিকারিককে (Salt Development Officer) নিয়োগ করতে মনস্থ করেছিল। কুটির শিল্পকে উৎসাহ প্রদানে সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটির পাশাপাশি বাংলা সরকারও এই আপৎকালীন সময়ে প্রাপ্য রাজস্ব ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে বাংলার প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়িত করায় আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লবণ শিল্প প্রসঙ্গে আর কোনো আবেদন না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[97]

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দোরগোড়ায় এসে বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগ প্রসঙ্গে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। এখানে অবশ্য খেয়াল রাখা জরুরি যে, দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতেই লবণ সরবরাহে সংকট দেখা দিলে সরকারি স্তরে লবণের কুটির শিল্পে সহায়তা করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। তাছাড়া বাংলায় সেইসময় সরকারি স্তরে কোনো লবণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে ওঠেনি। হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি লবণ কোম্পানিগুলি ছিল, যাদের সামগ্রিক উৎপাদন বাংলার মোট লবণ চাহিদা মেটানোর ধারেকাছেও ছিল না [অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট সারণি ৫.১ দেখুন]। এই প্রসঙ্গে আরো মনে রাখতে হবে যে, ১৯৩০-এর দশকে বাংলায় গড়ে ওঠা বেসরকারি লবণ শিল্পদ্যোগেরও নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ছিল এবং তা কাটিয়ে উঠে কাঙ্খিত লাভের মুখ দেখতে তাদের ক্ষেত্রেও সরকারের আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সহায়তা আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের প্রেরণায় গড়ে ওঠা অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি উদ্যোগ বেঙ্গল সল্ট কোম্পানিও, যার সাথে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও জড়িয়ে ছিলেন, তার ব্যতিক্রম ছিল না।

[97] See, Communications from Government intimating action taken on address motions (26 July, 1946), in *BLCD*, 26 July to 25 September, 1946, First Session [No.2], 1946, 56-57.

।। ৪ ।।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি

"আমি যে আজ বিজ্ঞানচর্চ্চা অবহেলা করিয়া মহাত্মার বাণী প্রচার করিয়া ফিরিতেছি, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিলম্ব করা যায়, কিন্তু স্বরাজসাধনার বিলম্ব করা চলে না"।

- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়[98]

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলশ্রুতিতে বাংলায় দেশীয় লবণশিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিংবদন্তী বিজ্ঞানী ও স্বদেশি উদ্যোগপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর বহুমুখী ভূমিকাকে ঐতিহাসিকেরা আধুনিক 'ভারতীয়' বিজ্ঞানের জাতীয়তাবাদী অনুসন্ধান প্রকল্পে পর্যলোচনা করেন: বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র, যিনি আধুনিক রসায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি 'A History of Hindu Chemistry' (১৯০২) রচয়িতা; স্বদেশি উদ্যোগপতি রূপে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস (১৮৯৩) প্রতিষ্ঠা সহ বিবিধ উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তার পাশাপাশি দেশের মানুষের মধ্যে স্বরাজের আদর্শ প্রচার এবং খাদি, চরকার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন— এমন বহুতর নিদর্শ পরিলক্ষিত হয়।[99] রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে অবশ্যই গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৌদ্ধিক চর্চার সূত্রে ক্ষার ধাতু সোডিয়ামের (Na) গুরুত্ব থাকবে। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে বাংলায় লবণ শিল্পোদ্যোগে প্রফুল্লচন্দ্রের সামিল হওয়ার প্রেক্ষিতটি কি ছিল? ভারতীয়দের কাছে ভোজ্য লবণের (সোডিয়াম ক্লোরাইডের) প্রয়োজনীয়তা ও ঔপনিবেশিক পর্বে করভারজনিত বঞ্চনা সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবনা কি ছিল তার অনুসন্ধানেই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে।

দেশীয় লবণ শিল্পের বিলোপ এবং লবণ করভারে দরিদ্র মানুষের দুর্দশা সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র যে ছাত্রাবস্থা থেকেই সচেতন ছিলেন তা ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন গবেষণার সময়েই প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৬-তে 'India Before and After Mutiny' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিণাম সম্পর্কে কঠোর, শ্লেষপূর্ণ সমালোচনা করেছিলেন। 'ভারত রাজা ও নবাবদের

---

98 'বর্ত্তমান সমস্যা', শিলচরে প্রদত্ত বক্তৃতা, মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৪৩, *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন*, পঞ্চম খণ্ড, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), ১৩৮।

99 Pratik Chakraborty, "Science, nationalism, and colonial contestations: P.C. Ray and his Hindu Chemistry", *The Indian Economic & Social History Review*, 37: 2 (2000), 185-213; J Lourdusamy, *Science and national consciousness in Bengal 1870–1930* (Hyderabad: Orient Longman, 2004).

দেশ নয়, ক্ষুধার্ত কৃষকের দেশ'; আর তাই দরিদ্র মানুষের জীবনে সামান্য লবণের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা এই প্রবন্ধে পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।[100] উনিশ শতকে সাম্রাজ্যিক স্বার্থে যেভাবে দেশীয় লবণ শিল্পের বিলোপ ঘটানো হয়েছিল তা 'লজ্জাজনক' ('scandal') এবং 'কলঙ্ক' ('disgrace') বলেই তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন।[101] রিচার্ড টেম্পল লিখিত 'India in 1880' প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছিলেন যে, মূলত সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণের জন্য বাংলায় এককালের সমৃদ্ধ লবণ শিল্পের আর দ্রুত পুনরুজ্জীবন হবে না।[102] ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতি কিভাবে দেশের দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার সংস্থান কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বিপন্ন করে তুলেছে সে প্রসঙ্গে তিনি দ্ব্যর্থহীন সমালোচনা করেছিলেন। দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তি ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজি-রুটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল; লবণ কর দরিদ্রদের ওপর 'অত্যন্ত পক্ষপাতপূর্ণভাবে' আরোপ করা হয়েছিল। লবণ বঞ্চনার কারণে দরিদ্র মানুষের শারীরিক ক্ষতি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাদের আইনি নিপীড়নের কথাও তিনি তুলে ধরেছিলেন। লবণ কিনতে অক্ষম দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ প্রায়শই সমুদ্রোপকূল থেকে লবণাক্ত আস্তরণ চেঁছে নিয়ে তাই লবণ হিসেবে ব্যবহার করে, আর তাতেই রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে তাদের শাস্তি হত। প্রশাসন অভিযোগের ধরণ এমনই ছিল যেন অভিযুক্ত গরীবেরা অবৈধভাবে পরিশ্রুত করে লবণ তৈরি করেছে। অথচ পর্যাপ্ত লবণের অভাব যে নানাভাবে শরীরে ক্ষতিসাধন করতে পারে তা 'ল্যানসেট' উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়েছিলেন।[103] দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ব্রিটিশ চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকারের কানে চেশায়ারের কর্মীদের আওয়াজ পৌঁছে যায়, কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত লক্ষ লক্ষ ভারতীয়র আর্তনাদ ব্রিটিশ উপকূলে পৌঁছায় না বলেই তিনি ক্ষোভের সাথে তুলে ধরেছিলেন।[104]

গান্ধীয় আন্দোলনের পর্বেও ১৯২০-র দশক থেকে প্রফুল্লচন্দ্র ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির সমালোচনায় সরব ছিলেন। দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির অভিভাষণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঔপনিবেশিক আধিকারিক হেনরি ডিনকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিলেন যে, লবণ শুল্ক ব্রিটিশ সরকারের 'নির্দয় ব্যবহারের' নিদর্শন। দেশের মানুষ তাদের যৎসামান্য ভাত যে নুন দিয়ে খায় তার ওপরেই শুল্ক চাপিয়ে ব্রিটিশ সরকার লবণ বঞ্চনার

[100] P.C. Ray, *India Before and After the Mutiny* (published in 1886) (Government of India: Publication Divisions, 2012). 49.

[101] See, footnote in Ibid., 109.

[102] Ibid, 108.

[103] Ibid., 49-50.

[104] Ibid., 108-109.

নিদারুণ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। লবণ শুল্ক বৃদ্ধি করে ঔপনিবেশিক সরকার রাজকোষে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মাত্র দেড় কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছিল, যা স্পষ্টতই সাধারণ গরীব মানুষেরা যে নুন খাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল তার ইঙ্গিত দেয়। ব্রিটিশ লবণ আইনের কঠোরতা প্রসঙ্গে হেনরি ডিনের বিবরণ তুলে ধরে জানিয়েছিলেন যে, 'নোনা জল ভাঁটায় সরে গেলে যে সর পড়ে যদি গরীবেরা তাহা চেঁচে নেয়, অমনি ল অ্যান্ড অর্ডারের মূর্তিমান তাদের জেলে পোরে [...]'।[105] এটাই রাজ্যশাসনের পদ্ধতি ও ট্যাক্স আদায়ের উপায় বলে তিনি বক্তৃতায় তুলে ধরেছিলেন। দরিদ্র মানুষে জীবনে লবণ বঞ্চনার এই প্রেক্ষিতে প্রফুল্লচন্দ্র যে গান্ধীর ডাণ্ডির সমুদ্রোপকূল অভিমুখে যাত্রাকে মোজেসের ইহুদিদের নিয়ে 'এক্সোডাস' বা মুক্তিপথে যাত্রার সাথে তুলনা করবেন তা খুব অপ্রত্যাশিত নয়।[106]

অন্যদিকে, বাঙালির কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবনায় লবণ ব্যবসার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছিল। কোম্পানির আমলে বাঙালিরা যে লবণ ব্যবসায় যথেষ্ট শক্তিশালী ও মুনাফা অর্জন করেছিল তা উল্লেখ করেছিলেন।[107] কিন্তু ব্রিটিশ রাজের পর্বে লবণ আমদানি সহ বিবিধ ব্যবসায় অ-বাঙালি তথা মারোয়াড়ির নিয়ন্ত্রণ এবং বাঙালির উদ্যোহীনতা নিয়ে তিনি খেদ প্রকাশ করেছিলেন।[108] সামান্য মূলধন নিয়ে মারোয়াড়িরা সিকিম ও ভুটানের মতো দুর্গম অঞ্চলেও লবণ সহ বিবিধ পণ্যের ব্যবসা শুরু করে এবং 'সাহস, অধ্যাবসায় ও পরিশ্রমের গুণে পরে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়'।[109] '[...]কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ ভদ্র শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যবসায়ের আদৌ মতিগতি নাই' [বানান অপরিবর্তিত]।[110] একদিকে মানুষের জীবনে লবণের অপরিহার্যতা মেটানোর দাবি, অন্যদিকে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা- উভয় প্রেক্ষিত থেকেই বাংলায় লবণ শিল্পের পুনরুত্থানে বৃহৎ উদ্যোগের পক্ষপাতী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। যে কারণে লবণ-সত্যাগ্রহ পরবর্তী পর্বে বাঙালি মালিকানায় কয়েকটি লবণ কারখানা থাকলেও বাংলার চাহিদা

---

105 দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, শ্রাবণ ১৩৩০-৩১ [১৯২৩-২৪], *বঙ্গবাণী*, ৬৬৯-৬৮২, সংকলিত হয়েছে *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন, পঞ্চম খণ্ড* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), ১২৪।

106 Indian Annual Register, Vol. 1, January-June 1930, 76.

107 'Bengalis in Commerce and Industry', Career-Lectures, 1939, *Acharya Prafulla Chandra Roy: A Collection of Writings, Vol. II A* (Calcutta University, 2009), 530.

108 'বাঙালী কোথায় গেল', প্রবাসী ১৩১৯, [১৯১২], *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯), ১৭০।

109 'ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ' [অন্নসমস্যা- ১৩২৭] সংকলিত হয়েছে, তদেব, ২১৫।

110 তদেব, ২১৩।

মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট নয় বলেই তিনি মনে করেছিলেন।[111] ১৯৩০-এর দশকে বৃহৎ লবণ শিল্পের সম্ভাবনার দিশা দেখাতেই বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির উদ্যোগে সামিল হয়েছিলেন। ১৯৩৪-এর ৭ অক্টোবর, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রফুল্লচন্দ্র এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন: বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির সূচনাতে বাংলায় 'লুপ্ত (লবণ) শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা' হবে এবং লবণ বাবদ ১ কোটি টাকা যে 'বছর বছর পরের হাতে যাবেনা'। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বেকার বাঙ্গালি যুবকের ও লাখো লাখো কৃষক মজুরের 'অন্ন সংস্থানের একটা রাস্তা হ'ল এইটেই বড় আনন্দ'— কর্মসংস্থানের এমন সম্ভাবনাই তিনি তুলে ধরেছিলেন।[112] এই বেসরকারি উদ্যোগ কি প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছিল? গান্ধীয় স্বরাজের প্রতীক লবণকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কাল পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোগের অবস্থা কি ছিল, সরকারই বা কিভাবে বিষয়টি দেখেছিল— তা পরবর্তী অংশে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির উদ্যোগের পর্যালোচনা সূত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি

ভারত যাতে লবণ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হয় সেই উদ্দেশ্যে, ১৯৩১-এর ২৬ মার্চ, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বিদেশি লবণের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করার বিল পাশ হয়।[113] বাংলাতে ব্যারিস্টার যোগেশ চৌধুরি সহ কিছুজনের উদ্যোগে 'The Bengal Salt Manufacturers' Association' গড়ে তুলে পরীক্ষামূলক লবণ তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারের থেকে লাইসেন্স দাখিল করা হয়েছিল। স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র এবং নবাব কে. জি. এম. ফারুকির উদ্যোগে সরকার এই অ্যাসোসিয়েশনকে বাংলায় বাজারজাত পণ্য হিসেবে লবণ উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছিল।[114] উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ছিলেন প্রমথনাথ চৌধুরি, এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন শ্রী মনুজেন্দ্র দত্ত; যাঁদের উদ্যোগে অ্যাসোসিয়েশন লবণ কারখানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। *আনন্দবাজার পত্রিকার* প্রতিবেদন [১৬ নভেম্বর, ১৯৩৪] থেকে জানা যায় যে, বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন পরের বছর শীতকালে মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলে একটি 'লবণের আদর্শ কারখানা' তৈরির জন্য 'বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী নামে নূতন এক প্রতিষ্ঠান সমিতি নথিবদ্ধ করেছেন'। ব্রহ্মদেশে

---

[111] 'Bengalis in Commerce and Industry', *Acharya Prafulla Chandra*, 534.

[112] *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০শে আশ্বিন, ১৩৪১।

[113] S. C. Aggarwal, *The Salt Industry in India*, 36.

[114] See, 'For the Promotion of Salt Industry in Bengal,' 1935 in *Speeches and Addresses of Raja Prafulla Nath Tagore* (Calcutta; The Book Co. 1936) 218-223.

প্রচলিত নুন তৈরির পদ্ধতি খতিয়ে দেখার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের তিনজন প্রতিনিধির বার্মা যাবেন এবং বার্মা-পদ্ধতিতে যে বাংলায় লবণ প্রস্তুত হবে— তা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছিল।[115] লবণ উৎপাদনের উদ্যোগের জন্য মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূল বেছে নেওয়ার মুখ্যত কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, মেদিনীপুরের হিজলীতে লবণ উৎপাদনের দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময় দেশীয় লবণ উৎপাদনের নজির। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে (১৯১৪-১৮) কাঁথির সমুদ্রোপকূলে অ্যান্ড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানির পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনে সাফল্য। কিন্তু উৎপাদনের অত্যধিক খরচ এবং তার পাশাপাশি পরিবহণের জন্যও অতিরিক্ত খরচের কারণে সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছিল।[116]

১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত' বাণিজ্যিক সংস্থা রূপে 'দি বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড্' আত্মপ্রকাশ করেছিল, পরে যা 'বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী' হয়ে ওঠে।[117] কোম্পানির নামকরণের ক্ষেত্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (১৯০১), বা তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিমিটেড (১৯২১)-এর প্রভাব পরিলক্ষিত। কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডে সাতজনের মধ্যে তিনজনই – আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাজশেখর বসু, তৎসহ সত্যানন্দ বসু - ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর।[118] বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির মূল পরিকল্পনা ও যাবতীয় উদ্যোগ ছিল মনুজেন্দ্র দত্ত-র। পেশায় ওকালতি করলেও, মনুজেন্দ্রর যাবতীয় উদ্যোগ ও আকর্ষণ ছিল ব্যবসার প্রতি। মনুজেন্দ্র পুত্র রথীন্দ্র দত্তর বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯৩১-এ বিহারের ডালটনগঞ্জে 'গ্রাফাইট মাইনিং'-এর ব্যবসা শুরু করে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট নাম ও পুঁজি উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ তাঁকে উজ্জীবিত করেছিল 'আন্দোলনকে লবণ শিল্পের আকার দিতে'। গান্ধীর বিদেশি বর্জনের পাশাপাশি স্বদেশি লবণ উৎপাদন ও ব্যবহারের আহ্বান মানুষকে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছিল তেমনই সেইসময় লবণের খুচরো ও পাইকারী দাম বেশ বেড়েছিল; তাছাড়া অনেক সময় দেশীয় লবণ দুষ্প্রাপ্য

---

115 *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪১।

116 S. C. Aggarwal, *The Salt Industry*, 33.

117 কোম্পানির ইংরেজি ও বাংলা প্রসপেক্টাসের মধ্যে, যা প্রায় সাত মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত, এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়: *Prospectus of The Bengal salt Company, Limited*, 12 July, 1934; প্রসপেক্টাস, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড্, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫।

118 Ibid.

হয়ে উঠত।[119] কিন্তু লবণ উৎপাদনের বৃহৎ উদ্যোগে অর্থের সংস্থান কিভাবে হবে? এই প্রসঙ্গে রাজা প্রফুল্লচন্দ্র ঠাকুরের অভিমত ছিল যে, বাংলায় লবণ উৎপাদনের বৃহৎ উদ্যোগ গড়ে তুলতে গেলে শেয়ার বিক্রি এবং সরকারি সহায়তা আবশ্যক; আর কোম্পানির গঠন এমন হওয়া উচিত যাতে পাবলিক শেয়ার কিনতে আগ্রহী হয়।[120] ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে মনুজেন্দ্রর প্রেরণা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর লবণোদ্যোগের সাথে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম জড়িয়ে থাকলে কোম্পানির পরিচিতি সুদৃঢ় হবে এবং কোম্পানির 'ইকুয়িটি শেয়ারের' মাধ্যমে বাজার থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে বলে মনুজেন্দ্র ভেবেছিলেন। বলাবাহুল্য যে, মনুজেন্দ্রর পরিকল্পনা শুনে প্রফুল্লচন্দ্র সানন্দে 'বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী'-র প্রতিষ্ঠাতা ও 'বোর্ড অফ ডাইরেক্টর'-এর চেয়ারম্যান হতে সম্মত হয়েছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের এই 'প্রত্যক্ষ সাহচর্য' ও 'নিরবচ্ছিন্ন নির্দেশ' মনুজেন্দ্র ও বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কাছে 'মুখ্য মূলধন' হয়ে উঠেছিল।[121] 'বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী' বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছিল এক পূর্ণাঙ্গ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি রূপে, যার 'অথরাইজড ক্যাপিটাল' ছিল এক লক্ষ টাকা; ২৫ টাকা মূল্যের চার হাজার শেয়ারে বিভক্ত ছিল।[122]

১৯৩৪-এর ৬ নভেম্বর, মেদিনীপুরের রামনগর ব্লকে দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর মৌজায় লিজ নেওয়া ১০০ একর জমিতে কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সেচ দফতরের আপত্তিতে সেখানে কাজ বন্ধ রেখে দাদনপাত্রবাড় মৌজাতে জমি লিজ নিয়ে সেখানে আরেকটি কারখানা গড়ে তোলা হয়। এই কারখানাতেই ১৯৩৫-এর নভেম্বর মাস থেকে বাণিজ্যিকভাবে লবণ উৎপাদন শুরু হয়েছিল। কিছুদিন পরে ছাড়পত্র মেলাতে পুরুষোত্তমপুরের কারখানার কাজও সম্পূর্ণ করে উৎপাদন শুরু হয়। জনবিরল জলাজমিতে এই কারখানা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাপেক্ষ। মনুজেন্দ্র, প্রমথনাথ এবং ইঞ্জিনিয়ার সৌরীন্দ্র দত্ত-র ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিরেক্টরস রিপোর্টে জানানো হয়, কিভাবে তাঁরা 'হাঁটু ডোবা কাদার মধ্যে গিয়ে, জনবসতি থেকে চার মাইল দূরে কাজের জায়গায় থেকে, অপ্রতুল খাদ্য ও জল নিয়ে আর মাথার উপর কোন ছাদ বিনা আশ্রয়ে রাত কাটিয়ে, দিনের পর দিন কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করে কারখানা দাঁড়

---

119 রথীন্দ্র দত্ত, *পিতৃদেব ও বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী* (কলকাতা: রথীন্দ্র দত্ত, ২০২২), ১১-১২।

120 For the Promotion of Salt Industry, *Speeches and Addresses of Raja Prafulla*, 218-223.

121 তদেব, ১১-১২, ১৬-১৭।

122 প্রসপেক্টাস, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড্, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫।

করিয়েছে।'[123] প্রায় তিন বছরের মধ্যেই এই উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত পরিকাঠামো - বাঁধ, সেতু, কনডেনসর, সল্ট বেড ও রিজার্ভার, লবণ-জল জাল দেওয়ার চুল্লী, গুদাম, অফিস, অতিথিশালা ইত্যাদি - গড়ে তোলার জন্য মনুজেন্দ্ররা একরকম অসাধ্য সাধন করেছিলেন; বিশেষত বর্ষার ফলশ্রুতিতে বছরের অর্ধেক সময় যেখানে কাজ বন্ধ থাকত।[124] উৎপাদন শুরু হওয়ার পর তা দ্রুত উর্ধ্বমুখী করে তোলার জন্য কারখানার সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় লবণ শিল্পের পুনর্গঠনের দাবিকে খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রে এই সময়ে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও তাদের সহায়ক হয়েছিল। কারণ, ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় আইন পরিষদের (Bengal Legislative Council) নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের জোট সরকার গঠিত হয় এবং ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী (Premier) হন।

১৯৩৭-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে শ্রী ললিত চন্দ্র দাস [চট্টগ্রাম ডিভিশন, গ্রামীণ] বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি লিমিটেড সম্পর্কে সরকার কতটা ওয়াকিবহাল, কিভাবে সহায়তা করছে সে সম্পর্কে বিশদে জানতে এগারোটি প্রশ্ন করেছিলেন। বন ও রাজস্ব দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী প্রসন্ন দেব রায়কূট তাঁর জবাবে জানিয়েছিলেন যে, এক্সাইজ ও সল্টের সুপারিন্টেডেন্ট মৌলবি মোকরম হোসেন বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির কারখানা পরিদর্শন করে (১৬ই জুন, ১৯৩৭) এসেছেন। মৌলবি হোসেন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন যে, বার্মা পদ্ধতিতে লবণ-জল সংগ্রহ এবং মাদ্রাজের সৌরতাপে বাষ্পীভবনের পদ্ধতির যৌথ প্রয়োগে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি লবণ উৎপাদন করছিল। প্রতি মণ করকচ লবণ তৈরি করতে মাত্র ২ আনা খরচ হচ্ছিল এবং বাজারে সেই লবণ ৭ আনাতে বিক্রি হচ্ছিল। কিন্তু সেচ দফতরের আধিকারিকেরা সমুদ্রোপকূলের কিছু জায়গায় বাঁধ তৈরি করার অনুমতি না দেওয়ায় এই কোম্পানি নিজের জমিতে লবণ উৎপাদনের জন্য বাড়তি 'কনডেনসার' বসাতে পারছিল না, যার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছিল। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির এই বাধা দূর করতে মৌলবি হোসেন এক্সাইজ কমিশনার ও জেলা কালেক্টরকে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা রিপোর্টে তুলে ধরেছিলেন। লবণ উৎপাদনের এমন উদ্যোগের প্রতি সরকার সচেতন,

[123] রথীন্দ্র দত্ত, *পিতৃদেব,* ২০।

[124] তদেব, ২৮।

এবং আরো সহায়তা করবে বলেই শ্রী রায়কূট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[125] বলাবাহুল্য, সরকারি তরফে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকেরা একে একে দাদনপাত্রবাড় ও পুরুষোত্তমপুরের কারখানা পরিদর্শনে এসে তারিফ করেছিলেন। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এক্সাইজ কমিশনার ডি. ম্যাকফারসন এবং ৮ এপ্রিল সরকারের শিল্প বিষয়ক কেমিস্ট আই. বসু কোম্পানির কারখানা পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি জানিয়েছিলেন। এপ্রিলের শেষের দিকেই সেচ দফতরের মহকুমা অফিসার এল. এম. দত্ত এসে সেচ দফতরের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন।[126]

লবণ সত্যাগ্রহের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠা দেশীয় লবণ উৎপাদনের এই বেসরকারি উদ্যোগে শ্রমের পরিবেশ, শ্রমিক এবং তাদের মজুরি কেমন ছিল সেই প্রসঙ্গটি এখানে আলোচনার দাবি রাখে। সমুদ্রোপকূলে লবণ উৎপাদনের এই উদ্যোগ পুরোপুরি ছিল দৈহিক শ্রম সাপেক্ষ। লবণ উৎপাদনের প্রস্তুতি পর্ব থেকে উৎপন্ন লবণ পরিবহণ করে বাজারে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিটি পর্যায় দৈহিক শ্রম সর্বস্ব ছিল। খোলা আকাশের নিচে, রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য সহ প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা ও ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এই শিল্পোৎপাদন কিভাবে অব্যাহত ছিল? মাটি কাটা ও তা বয়ে নিয়ে যাওয়া, বাঁধ তৈরি, পায়ে মাটি পিষে ‘সল্ট বেড’ তৈরি করা, ‘বেড কনডেনসর’ আলবাঁধ দিয়ে ঘেরা, ‘সল্ট বেডে’-র লবণ চেঁছে মাটিতে জড়ো করা, ভর্তি লবণ কাঁধে নিয়ে প্রায় ৫০ থেকে ৩০০ ফুট বহন করা, ট্রলিতে ভর্তি করে পেশাই বা ধোলাইঘরে তা খালাস করা, লবণ স্তূপ তৈরি, শেষে বস্তায় ভরে তা কাঁধে নিয়ে ৪০০ দূরে গাড়িতে চাপানো – প্রতিটি কাজই ছিল চূড়ান্ত শ্রমসাপেক্ষ। লবণ উৎপাদনের সময়পর্বও ছিল ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মাঝামাঝি; অসহ্য তপ্ত আবহাওয়ার মাঝে কর্মরত শ্রমিকদের কাছে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতার দাবি থাকত। অন্যদিকে, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসা করতেন একজন কম্পাউন্ডার; তাঁর কুইনাইন আর মিক্সচারে কাজ না হলে কাঁথি হাসপাতালে শ্রমিককে পাঠাতে হত।[127] ১৯৩৮-৪০ সালের মধ্যে পুরুষোত্তমপুরের কারখানায় বাংলার বাইরে থেকে শ্রমিক এনে নিয়োগ করা হয়। মাদ্রাজের (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের) নৌপদা থেকে লবণ উৎপাদনে দক্ষ শ্রমিকদের এবং ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার উপজাতীয় লোকেদের কুলি হিসেবে এনে মনুজেন্দ্র কারখানায়

---

[125] ‘Workings of the Bengal Salt Company, Limited’ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর পর্ব, ১৯৩৭-এর ১৬ অক্টোবরের জন্য দেখুন, Question and Answers, Bengal Legislative Council Debates, Third Session, [Volume III] (Alipore: Bengal Government Press,1937), 165-166.

[126] রথীন্দ্র দত্ত, *পিতৃদেব*, ২০।

[127] তদেব, ১৫৮-১৬৪।

নিয়োগ করেছিলেন। রথীন্দ্র দত্ত যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অত্যধিক পরিশ্রম এবং দক্ষতার অভাবের জন্য স্থানীয় লোকেদের এই কারখানায় যোগদানে অনীহা ছিল! কিন্তু স্থানীয় কৃষিজীবীদের তুলনায় দূরবর্তী স্থান থেকে শ্রমিক এনে নিয়োগের পেছনে যে অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের বিষয়টি মুখ্য ছিল তা এখানে স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায়। কারণ, শ্রমিকের বেতন প্রদান প্রসঙ্গে তাঁর পিতৃদেব যে 'হিসাবী ও অনুদার ছিলেন', এবং মাদ্রাজি শ্রমিকদের মাদ্রাজের কারখানার হারেই তিনি দিনপিছু চার আনা হিসাবে বেতন দিতেন। আর সাঁওতাল কুলিদের বেতন যে অপেক্ষাকৃত কম ছিল তা বলাই বাহুল্য।[128] প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালি কৃষিজীবী ও শ্রমিকের কর্মসংস্থানের যে প্রত্যাশা রেখেছিলেন তা অন্তত বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির প্রাথমিক পর্বে পূরণ হয় নি বলেই মনে হয়। এই বিষয়টি নিয়ে বোধহয় স্থানীয় স্তরেও অসন্তোষ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তা নইলে কেন ১৯৫০-এর দশক থেকে স্থানীয়দের কারখানায় নিয়োগ করা শুরু হবে? দূরদর্শী মনুজেন্দ্র বুঝেছিলেন যে, স্থানীয় কর্মসংস্থান হলে প্রশাসনিক স্তরে সহায়তা মেলা আরো সহজ হবে, কোম্পানির খানিক সুনামও হবে; আর 'গ্রামের লোকেরা কোম্পানীর কাজে বাধা দেবে না বরং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে'। তাছাড়া সেই সময় মাদ্রাজ ও সাঁওতাল পরগণা থেকে শ্রমিক জোগাড় করাও ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল।[129]

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাদের দেশীয় লবণ উৎপাদনের বেসরকারি প্রয়াসকে জাতীয়তাবাদী আবহে স্বাধীন উদ্যোগ রূপে তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সংযোগ ছাড়াও কোম্পানির 'প্রোফাইলে' (Profile) অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছিল স্বয়ং গান্ধীর সাথে মনুজেন্দ্র দত্তর মুখোমুখি সাক্ষাৎ। ১৯৩৭-এ, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে গান্ধী কলকাতায় এলে মনুজেন্দ্র তার সাথে দেখা করেছিলেন। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির উৎপাদিত লবণ ও বাইপ্রোডাক্টের পাঁচটি প্যাকেট দেখিয়ে তাঁকে কোম্পানির উদ্যোগ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। দাদনপাত্রবাড়ের কারখানায় উৎপাদিত এই লবণ দেখে গান্ধী খুশি হন এবং তাঁর আশীর্বাদ মনুজেন্দ্রদের ওপর থাকবে বলে জানিয়েছিলেন। তারপরেও অবশ্য গান্ধীর সাথে মনুজেন্দ্রর মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। ১৯৪৬-এর অক্টোবরে, সাম্প্রদায়িক সংঘাতে ধ্বস্ত কলকাতায় গান্ধী আসেন এবং বেলাঘাটার 'হায়দর-ই-মঞ্জিল' বাড়িতে কয়েকদিন থেকেছিলেন। সেই সময় গান্ধীর সাথে সাক্ষাতে মনুজেন্দ্র তাঁকে কোম্পানির কথা, এবং বাংলার লবণ শিল্পের সমস্যা সহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। পরদিন বিভিন্ন প্রথমসারির

[128] তদেব।

[129] তদেব, ১৬৪।

সংবাদপত্রের পাতায় গান্ধী-মনুজেন্দ্র সাক্ষাত এবং বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির কথা প্রকাশিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য যে, এই গান্ধী সংযোগ যেন বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির পক্ষে জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনের কাজ করেছিল। স্বদেশীয় লবণের এই শিল্পোদ্যোগ প্রসঙ্গে মানুষ আগ্রহী হয়েছিলেনন, এবং কোম্পানির শেয়ার কিনতেও সেইসময় বেশ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল।[130]

বিশ্বযুদ্ধের পর্বে স্থানীয় লবণ শিল্পের জন্য বেশ অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধের পাশাপাশি স্টিমার ও রেলওয়ে পরিবহণের খরচ বৃদ্ধি পেলে দেশের অন্যপ্রান্ত থেকে লবণ চালানে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় লবণ শিল্প যে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে তা কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংয়ে প্রফুল্লচন্দ্র জানিয়েছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র স্বাক্ষরিত মিটিংয়ের নথি থেকে জানা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুরুষোত্তমপুরের কারখানার আশু সম্প্রসারণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তার জন্য বাড়তি টাকার সংস্থানের পাশাপাশি খেলাপি শেয়ারহোল্ডারদের অনাদায়ী অর্থ মেটানোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল।[131] ১৯৪০-’৪১ সালে বাংলার সমুদ্রোপকূলে প্রায় আটটি বেসরকারি কোম্পানির সম্মিলিত উৎপাদন ছিল ২২,৫০৬ মণ লবণ, যার মধ্যে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি ৯,৮১৯ মণ লবণ উৎপাদন করে বৃহত্তম কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল [পরিশিষ্ট সারণি ৫.১ দেখুন]।[132] ১৯৪১-এর এপ্রিলে প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির কারখানা পরিদর্শনে এসেছিলেন। ‘জনহীন দুর্গম জলাভূমিতে’ গড়ে ওঠা ‘পূর্ণাঙ্গ লবণ কারখানা’ প্রত্যক্ষ করে তিনি ‘আনন্দিত’ হয়েছিলেন। তাঁর পরিদর্শনী রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে, উপকূলবর্তী এই কারখানায় ‘প্রভূত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিয়া বাংলার চাহিদা মিটাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে’; তৎসহ ‘লবণজাত রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য একটি উপশিল্পও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।’[133] ১৯৪১-’৪২ উৎপাদন মরসুমে উৎপাদিত লবণের পরিমাণ পূর্ববর্তী সব বছরকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। কাঁথি থেকে জলপথে নৌকা পরিবহণে সেই লবণ কলকাতা সহ অন্যত্র পৌঁছে দেওয়া শুরু হয়েছিল। একই সময়ে কোম্পানির লবণের নমুনা গুণমান নির্ণয়ের জন্য কানপুর স্থিত ভারত সরকারের অর্ডন্যান্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল। রাসায়নিক বিশ্লেষণের রিপোর্ট [১৭ জুন, ১৯৪২] কোম্পানির পক্ষে

[130] দেখুন, ‘গান্ধীজি ও পিতৃদেবের যোগাযোগ, সাক্ষাৎ, পত্রালাপ ও স্নেহভক্তি’ শীর্ষক পরিচ্ছেদ; তদেব, ৭৩-৮৩।

[131] বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির ডিরেক্টর রিপোর্ট, ২২শে জুলাই, ১৯৪০; তদেব, ৪০।

[132] ১৯৪০-৪১ পরিসংখ্যানের জন্য দেখুন, S. C. Aggarwal, *The Salt Industry,* 34.

[133] ১৯৪১ এর ২৫ এপ্রিল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরিদর্শন রিপোর্ট; দেখুন, রথীন্দ্র দত্ত, *পিতৃদেব,* ২০।

রীতিমতো উৎসাহজনক ছিল: সাদা মিহি লবণে দৃশ্যমান কোনো অশুদ্ধি ছিল না এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতি ছিল ৯৮.২৪%। কোম্পানির বিশ্বাস ছিল, বেঙ্গল সল্ট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের এবং বাজারে অন্যান্য লবণকে গুণমানের নিরিখে পেছনে ফেলে দিতে পারে। এই রিপোর্ট সেই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছিল।[134]

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির উদ্যোগ যখন মাথা তুলছে তখনই এক আকস্মিক বিপর্যয় নেমে আসে। ১৯৪২-এর অক্টোবরে এক ভয়াবহ সাইক্লোন ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের উপকূলভাগে আছড়ে পড়ে। ১৬ই অক্টোবর সকালে বিপুল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দাদনপাত্রবাড়ে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির কারখানা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়। কারখানায় অবস্থানরত বারোজন কর্মচারীর সাথে সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের একজন ইন্সপেক্টর ও পিয়নের মৃত্যু হয়।[135] উপকূলবর্তী অঞ্চলের ইতিহাসে অবশ্য এই বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি নতুন কিছু নয়। ঔপনিবেশিক পর্ব জুড়ে সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে বিধ্বংসী সাইক্লোনের একাধিক নজির পরিলক্ষিত হয়, যার প্রকোপে দেশীয় লবণ উৎপাদন ব্যবস্থা বারংবার বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং অগণিত উৎপাদকের মৃত্যু হয়েছিল।[136] ব্যক্তিগত বিনিয়োগে লবণ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়ে উনিশ শতকে জন পামারের মতো সম্পদশালী ব্যবসায়ীও শেষ জীবনে এই কারণে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।[137] মনুজেন্দ্র দত্ত অবশ্য এই বিপর্যয়জনিত প্রাথমিক হতাশা কাটিয়ে উঠে কারখানা পুনর্গঠনের কাজ নতুন উদ্যমে শুরু করেছিলেন। ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি কারখানা পুনর্গঠনের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়। ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে কোম্পানির লবণ উৎপাদন ও বিক্রয় আশাতীতভাবে ভালো হয়; শেয়ার হোল্ডারদের বার্ষিক ৩% ডিভিডেন্ট দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়। সাইক্লোন ও বন্যার পর কোম্পানির এই পুনর্গঠনের প্রশংসা করে সেন্ট্রাল এক্সাইজের পরিদর্শনকারী অফিসার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাংলায় লবণ শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনার রিপোর্ট পেশ করেছিলেন।[138]

১৯৪০-এর সূচনা থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস সর্বার্থেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়পর্ব রূপে চিহ্নিত; যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানি আগ্রাসনের আশঙ্কা, ১৯৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ,

---

134 তদেব, ৪৩।

135 তদেব, ৫০।

136 এই প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য গবেষণা: Benjamin Kingsbury, *An Imperial Disaster: The Bengal Cyclone of 1876* (London: Hurst, 2018).

137 Anthony Webster, *The Richest East India Merchan: The Life and Business of John Palmer of Calcutta, 1767-1836* (Woodbridge: The Boydell Press, 2007) 118-119.

138 দেখুন, 'সাইক্লোন-উত্তর বিধ্বস্ত কারখানার দ্রুত পুনর্গঠন' শীর্ষক পরিচ্ছেদ, রথীন্দ্র দত্ত, *পিতৃদেব*, ৫৩-৫৮।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণ-ধর্মঘট ইত্যাদির অভিঘাত চূড়ান্ত অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি করেছিল।[139] তাই সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলে ওঠার পরেও বাইরের এই ঝোড়ো পরিস্থিতি কোম্পানির ব্যবসাতে স্বভাবতই বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতা লবণ বাজারে প্রভাব ফেলে। নৌ পরিবহণ প্রায় বন্ধ থাকার পাশাপাশি লবণ বিক্রির পরিমাণও বেশ পড়তির দিকেই ছিল। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির বিক্রি যেমন বেশ কমেছিল, তেমনই প্রায় পঁচানব্বই হাজার টাকার লবণ অবিক্রিত হয়ে গুদামে পড়েছিল।[140] ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পূর্ববর্তী মাসগুলিতেও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তির আঁচ লবণ বিক্রয় ও পরিবহণের ওপর পড়েছিল। কারখানার উৎপাদন অবশ্য অব্যাহত ছিল। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে যথাক্রমে লবণের উৎপাদন ছিল ২৬,০৫৯ মণ ও ২৭,৩৪৬ মণ ; কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে ১৯৪৯-এর উৎপাদন মরসুমে তা কমে প্রায় ১৮ হাজার মণে নেমে গিয়েছিল এবং ক্ষতির পরিমাণ ছিল একচল্লিশ হাজার টাকা।[141] স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত বাংলায় বেসরকারি লবণোদ্যোগ এমনই ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল। সরকারি সহায়তা ছাড়া এই ব্যক্তিমালিকানাধীন উদ্যোগগুলির টিকে থাকা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পরে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো তৈরি করতে ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে উদ্যোগী হন। বলাবাহুল্য, তাঁর উদ্যোগেই ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেঙ্গল সল্ট কোম্পানিকে আর্থিক সহায়তা ও কারখানার সম্প্রসারণে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই সহায়তাতে পরবর্তী দুই দশকেরও বেশি সময় জুড়ে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি বাংলার বৃহৎ লবণ উৎপাদনকারী উদ্যোগের অন্যতম হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ রাজের অন্ত্যপর্বে গড়ে ওঠা এই বেসরকারি উদ্যোগের যথার্থ প্রসার ঘটেছিল স্বাধীন ভারতে।

---

[139] Tanika Sarkar and Sekhar Bandyopadhyay, eds., *Calcutta: The Stormy Decades* (Delhi: Social Science Press, 2015).

[140] রথীন্দ্র দত্ত, *পিতৃদেব*, ৬৯।

[141] তদেব, ৯৯-১০০।

পরিশিষ্ট সারণি ৫.১

১৯৪০-৪১ সালে বাংলায় উৎপাদনশীল লবণ কারখানাগুলির তালিকা ও লবণ উৎপাদনের পরিমাণ

Name of Factories	Quantity of Salt Produced Annually (Mds.)
The Premier Salt Manufacturing Co., Purusatampur, Midnapore	3,240
The Bengal Salt Company, Dadanpatra, Midnapore	9,819
The Pioneer Salt Manufacturing Co., Sisirganj, 24-Parganas.	526
The Indian Salt Manufacturing Co., Sudhirbanj, 24-Parganas.	22
The National Salt Manufacturing Co., Maipith, 24-Parganas.	1,090
The Premier Salt Manufacturing Co., Maipith, 24-Parganas.	1,752
The Lokmanya Salt works, Mausani, 24-Parganas.	2,323
The Chittagong Trading Union Ltd. Fulchari, Chittagogng	3,734
Total	22,506

সারণি গৃহীত হয়েছে, S. C. Aggarwal, *The Salt Industry in India* (Delhi: Govt. of India Press, 1956, 2nd Edition), 34.

উপসংহার

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের 'মনোপলি'-র প্রতিরোধ থেকে স্বরাজের দ্যোতনায় লবণের রূপান্তরের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে বহুমুখী তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়। অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণে সাম্রাজ্য 'মনোপলি-র মধ্য দিয়ে যদি দেশীয় লবণের ঔপনিবেশিকীকরণ করে থাকে তাহলে প্রতিস্পর্ধী অর্থ ও প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় লবণ কিভাবে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত স্বরাজের প্রতীক হয়ে ওঠে— সেই রূপান্তর সামাজিক ইতিহাসের পরিধিতেই অনুধাবন করা যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বাংলার দেশীয় লবণ সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণে ও বাণিজ্যিক মতাদর্শগত লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। ১৮৩০-এর দশক থেকে 'মনোপলি' বনাম 'মুক্ত বাণিজ্যের' দ্বৈরথে একদিকে ব্রিটিশ লবণ শুদ্ধ, শুভ্র, স্বাস্থ্যসম্মত এমন দাবির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যিক পণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল এবং তার অন্য-পিঠে ভারতীয় লবণ ভেজাল মিশ্রিত, 'কাদাটে' বা কালচে, অস্বাস্থ্যকর এমন দাবি তুলে ধরে উপনিবেশিত পণ্যের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা হয়েছিল। লবণ কেন্দ্রিক এই শ্রেষ্ঠত্বের বয়ান তুলে ধরে একদিকে সাম্রাজ্য যেমন উপনিবেশ থেকে নিজের পার্থক্য চিহ্নিত করেছিল, তেমনই উপনিবেশের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্যকে সঙ্গত ও বৈধ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। কোম্পানির 'সল্ট মনোপলি'-র বিলুপ্তি দাবি করে মুক্ত বাণিজ্যের দাবিতে লিভারপুল লবণের স্বার্থগোষ্ঠী, যথা- ব্রিটিশ বণিক, সাংসদ ও সংবাদপত্র একযোগে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ও গণপরিসরে তীব্র প্রচার-আন্দোলন চালিয়েছিল এবং বাংলার দেশীয় লবণকে উপনিবেশের নিকৃষ্ট 'অপর' পণ্য রূপে তুলে ধরেছিল।

উনিশ শতকে ভেজাল নুনের সমস্যা শুধু ভারতে নয়, ইংল্যান্ড তথা ইয়োরোপেও ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছিল এবং জনস্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটেনের পূর্বতন কলোনি আমেরিকাতেই লিভারপুল লবণ উনিশ শতক জুড়ে অশুদ্ধ, জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়েছিল। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণের তাগিদেই উপনিবেশে প্রতিযোগী পণ্যের বাজারি চাহিদাকে নির্মূল করতেই সাম্রাজ্য ভেজাল বিশ্লেষণের তথা অশুদ্ধি নির্ণয়ের রাজনীতি অবলম্বন করেছিল। লবণের শুভ্রতাকে কেন্দ্র করে অপরিচ্ছন্নতার দাবিতেও 'পণ্য বর্ণবাদের' (commodity racism) রেশ প্রকট হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাদা লবণ বনাম ভারতীয় কালো লবণের বৈপরীত্যমূলক ধারণায় নির্ধারিত ইয়োরোপীয় আধুনিক শুদ্ধতা ও শুভ্রতার মানদণ্ড উপনিবেশে

পাল্টা প্রতিরোধী বয়ানের সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতীয় নুনের গুণমান ও বর্ণ উভয়েই একদিকে যেমন স্থানীয় মৃত্তিকা, উৎপাদন ও পরিশোধন পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করত তেমনই অন্যদিকে দেশীয় জনরুচি, ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ীও নির্ধারিত হত।

ঔপনিবেশিক বাংলায়, সামাজিক পরিসরে জাত-ধর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত ধর্মীয় শুচি-অশুচির মানদণ্ডটি ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রিত ছিল। নুন গ্রহণে বাছ-বিচারের জন্য গণভোজে আলুনি [বিনা নুন] তরকারি পরিবেশন করার রেওয়াজ ছিল। দেশীয় লবণের 'অপর' রূপে বিদেশি লবণের উপস্থিতি বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ লবণে শুভ্রতা আনতে পরিশোধন-পদ্ধতিতে গরু-শুয়োরের রক্ত, চর্বি, অস্থি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, পরিবহণের সময়ও বিদেশি লবণে বিফ, হ্যাম ইত্যাদি সংরক্ষিত হয়— এমন ধারণাই জনমানসে ছড়িয়ে পড়েছিল। জাত-ধর্মনাশের ভয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বিদেশি লবণ গ্রহণে মানুষের দ্বিধা ও অনীহা প্রবল ছিল; ব্রিটিশ লবণের বাণিজ্যেও তার বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। বিদেশি লবণের অশুচিতাকে কেন্দ্র করে বাংলা সহ ভারতের অন্যান্য প্রান্তে এই শঙ্কা প্রবল ছিল এবং ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে তা গণ উন্মত্ততার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ভারতীয় সেনাদের জাত-ধর্ম নষ্ট করে তাদের ধর্মান্তরিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার লবণে গরু-শুয়োরের রক্ত বা হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছিল— এমন গুজবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজে বিদেশি সরকারের প্রতি বিশ্বাসহীনতাই ব্যক্ত হয়েছিল। 'মহাবিদ্রোহ' দমনেও ব্রিটিশ সরকার সামরিক সংস্কৃতিতে ভারতীয় লবণ-আনুগত্যের ধারণাকেই ব্যবহার করেছিল। বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাদের 'নমক হারাম' (লবণ শপথের বিশ্বাস ভঙ্গকারী) চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাদের দমন ও নিধন করতে যে ভারতীয় সেনারা সহায়তা করেছিল তারা 'নমক হালাল' তথা লবণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য সরকারের কাছে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছিল। লবণ যদি একাধারে ভারতীয় সেনাদের নির্ভরতা এবং আনুগত্যের প্রতীক হয়ে থাকে, তাহলে বিদেশি শাসক ইচ্ছাকৃতভাবে, বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রতারণামূলক পন্থায় দূষণ ও ধর্মান্তরের মাধ্যমে সেই লবণকেই সম্পূর্ণ দাসত্বের হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে— এমন ধারণাই মহাবিদ্রোহের পর্বে বিদ্রোহী সিপাহিদের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল। বিদেশি ব্রিটিশ লবণের বিরুদ্ধে অশুচিতা তথা অশুদ্ধির এই অভিযোগ অবশ্য অমূলক ছিল না। লিভারপুল লবণ উৎপাদনের অতীত খাতিয়ে দেখলে তা স্পষ্ট হয়। সাম্রাজ্যিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে অশুদ্ধি উপাদানে লবণ পরিশোধনের ইতিহাস অস্বীকার করে উপনিবেশের সামনে ব্রিটেন নিজের এক 'পরিশোধিত' অতীত তুলে ধরেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতিকে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজজীবনে বহুমুখী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তিতে উৎপাদকদেরা যেমন কর্মহীন হয়ে পড়েছিল, তেমনই করভারের কারণে দরিদ্র মানুষের ভাতের পাতে সামান্য লবণ জোটানো দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। বাংলার গ্রামজীবনের স্বয়ম্ভরতায় ও সংস্থানে 'ন্যূনতম' নুন কতখানি গুরুত্ব রাখত তার বাস্তবতা ব্রিটিশ সরকার জেনে-বুঝেও অর্থনৈতিক তাগিদে অবজ্ঞা করেছিল (কারণ, লবণ কর ছিল রাজস্বের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস)। সরকারি লবণ নীতির দ্বিচারিতা প্রকট হয় দুর্ভিক্ষের দিনে, যখন দুমুঠো ভাতের সাথে শুধু সামান্য নুনের ত্রাণ দিয়েই ঔপনিবেশিক 'মা-বাপ সরকার' ক্ষুধার্ত মানুষকে কোনোমতে বেঁচে থাকার রসদ জোগাত। সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সমষ্টিগত বহি:প্রকাশও সুতীব্র হয়েছিল লবণকে কেন্দ্র করে। বিপর্যয় বা নিদারুণ সংকটের দিনে বিক্ষুব্ধ মানুষ নুন-ভাতের ত্রাণকে প্রত্যাখান করার মাধ্যমেই 'মা-বাপ সরকারের' নৈতিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতেন। বাঙালি ভদ্রলোকের জীবনে লবণকে কেন্দ্র করে মূল্যবৃদ্ধির সমালোচনার পাশাপাশি নৈতিক-আধ্যাত্মিক সহ নানা মাত্রার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ন্যূনতম নুনের বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে দরিদ্র মানুষের সাথে ভদ্রলোকের শ্রেণিগত অবস্থানের স্পষ্ট প্রভেদ ছিল। যদিও ভদ্রলোকের স্মৃতিচারণে বা স্বেচ্ছাকৃত নুন-ভাত গ্রহণের বিরল, ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তে দরিদ্র জীবনে ন্যূনতম নুনের বাস্তবতাই স্বীকৃত হয়েছিল। বাজারি পরিসরে লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধে ভেজাল মিশ্রিত হওয়ার অভিযোগ উঠলে ও উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে অশুচিতার অভিযোগ মুখ্য হয়ে উঠেছিল। মূলত জাত-ধর্মনাশের অভিযোগে লিভারপুল লবণের অশুচিতাকে কেন্দ্র করে উগ্র হিন্দুত্বের প্রচার সেই সময় তীব্র হয়েছিল এবং স্বদেশি পর্বে বিদেশি লবণের 'সামাজিক বয়কটের' রাজনীতি এখানে শক্তি সঞ্চয় করেছিল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দুই দশকের (১৮৮৫-১৯০৫) কার্যকলাপে লবণ কর হ্রাসের দাবি প্রায়শই উত্থাপিত হয়েছিল। দরিদ্র মানুষকে সুরাহা দিতে এই দাবি তোলা হলেও তা ছিল সীমাবদ্ধ চরিত্রের, কারণ সরকারের সাথে সরাসরি সংঘাত এড়ানোর জন্য লবণ করের পূর্ণ বিলোপ বা দেশীয় মানুষের লবণ উৎপাদনের দাবি এখানে গুরুত্ব পায়নি। অন্যদিকে উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ গরীব মানুষ নিজের ও পরিবারের জন্য ভাতের পাতে সামান্য নুন জোগাড় করতে প্রায়শই অবৈধ লবণ উৎপাদনে জড়িয়ে পড়ত। জেল-জরিমানা-নিপীড়নের শাস্তি যেমন তাদের দমাতে পারেনি তেমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনের সাথে লবণ উৎপাদনকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীরা হিংসাত্মক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ত। উপকূলবর্তী গ্রামীণ জনতার

ধারাবাহিকভাবে 'অবৈধ' লবণ উৎপাদনে ও হিংসাত্মক ঘটনাতে জড়িয়ে পড়ার মধ্যে পুলিশ তথা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক 'প্রতীকী প্রতিরোধের' বয়ান পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ এই প্রতিরোধমূলক অবৈধ' কার্যক্রমই কয়েক দশক পরে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচিতে নৈতিক 'বৈধতা' পেয়েছিল যখন গান্ধীর আহ্বানে জনগণ প্রকাশ্যে লবণ তৈরি করে আইন অমান্য করেছিল।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে স্বদেশি নেতৃত্ব ব্রিটিশ লবণ সহ অন্যান্য বিদেশি পণ্য বয়কটের সর্বাত্মক আহ্বান জানিয়েছিলেন। চরমপন্থীদের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ধারণা কার্যকর করতে বিদেশি লিভারপুল লবণের কারবারি বা ব্যবহারকারীদের 'সামাজিক বয়কটের' হুমকি ও শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। বিদেশি লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধে উনিশ শতক জুড়ে পরিলক্ষিত ব্রাহ্মণ্য নিষেধাজ্ঞার পরম্পরাই স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে আরো সংহত-শক্তিশালী হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে লিভারপুল লবণের বিরুদ্ধে (গরু ও শুয়োরের রক্ত, চর্বি, অস্থি মিশ্রণের) ধর্মীয় অশুচিতার অভিযোগ তুলে ধরে স্বদেশি হিন্দু ও (নগণ্য সংখ্যক) মুসলিম নেতৃত্ব একযোগে বিদেশি বয়কট কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও আন্দোলন ক্রমশ হিন্দু চরিত্র পরিগ্রহ করায় এবং জোর জবরদস্তি বয়কট কার্যকরী করায় বিদেশি লবণের অশুচিতার ধারণা ক্রমশ আবেদন হারাতে থাকে।

স্বদেশি আন্দোলনকারীরা দরিদ্র মানুষের আহারে লবণের অপরিহার্যতার দিকটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন। সস্তা, বিদেশি পাঙ্গা লবণের বদলে বেশি দামের করকচ লবণ ব্যবহারে বাধ্য করায় গ্রামজীবনে অসন্তোষ ও সংঘাত তীব্র হয়েছিল। স্বদেশি নেতা-স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ এবং মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাতে ভদ্রলোক গোষ্ঠীর সাথে গ্রামীণ গরিব মানুষের শ্রেণিগত ব্যবধান আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বদেশি নেতৃত্বের বিদেশি লবণ বয়কটের আহ্বানে নিম্নবর্ণীয় নমঃশূদ্ররাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কারণ, নমঃশূদ্ররা সামাজিক স্তরে যে সম্মান ও গতিশীলতার দাবি করেছিল স্বদেশি কর্মসূচিতে তাদের সেই আশা-আকাঙ্খার কোনো প্রতিফলন হয় নি। বিদেশি লবণের বেচা-কেনা ও ব্যবহার জবরদস্তি বন্ধ করতে গিয়ে স্বদেশি নেতৃত্ব নমঃশূদ্রদের পাশাপাশি মুসলিমদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। লবণ-বয়কটকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠেছিল এবং কোথাও কোথাও তা দাঙ্গার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। হিন্দু, উচ্চ-বর্ণীয়, সম্পন্ন ভূম্যধিকারী ও পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যে আধারিত স্বদেশি সমাজ থেকে দরিদ্র, নিম্নবর্ণ, মুসলিমদের ব্যবধান যে ক্রমশ বেড়েছিল তা বিদেশি লবণের বয়কটকে কেন্দ্র করে

সংঘাতের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়। বিদেশি লবণ বয়কটে মানুষের সম্মতি (consent) আদায়ের বদলে স্বদেশি নেতৃত্ব জবরদস্তি বলপ্রয়োগের (coercion) পথ নেওয়ায় তার সামাজিক অভিঘাত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ১৯৩০-এ বাংলায় লবণ আইন অমান্যেও নমঃশূদ্র ও মুসলিম সমাজের বৃহৎ অংশ সাড়া দেয়নি। স্বদেশি নেতৃত্ব বিদেশি লিভারপুলের পরিপূরক হিসেবে মাদ্রাজের করকচ লবণকে তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু দেশীয় লবণ শিল্পের উৎপাদন বা পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে নীরব, নিস্পৃহ ছিলেন। গ্রামজীবনের সাথে শহরকেন্দ্রিক স্বদেশি নেতৃত্বের সংযোগহীনতা এবং দরিদ্র মানুষের সাথে শ্রেণিগত ব্যবধানের পাশাপাশি নিজের অনপরাধী ভাবমূর্তি সম্পর্কে সচেতনতাই বাঙালি ভদ্রলোককে লবণ উৎপাদনের ফৌজদারি অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে অবশ্য ভদ্রলোকের আইন ও দণ্ড সম্পর্কিত ধারণায় এক স্পষ্ট রূপান্তর আসে। লবণ আইন অমান্য করতে গান্ধীয় নৈতিক রাজনীতির আবেদনে তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৩০-এ দেশজুড়ে গণ-আন্দোলনমূলক লবণ আইন অমান্যের মধ্য দিয়ে গান্ধী সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। স্বরাজের প্রতীক রূপে লবণকে বেছে নেওয়া গান্ধীর কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ডাণ্ডি পদযাত্রার পূর্বে প্রায় চার দশক ধরে তিনি দারিদ্র্য-ক্ষুধা-অপুষ্টির প্রশ্নে লবণ করের বিরোধিতায় সরব ছিলেন। লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীর স্বরাজের ধারণা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী সমালোচনা সহ বিবিধ রাজনৈতিক ভাবনাকে আত্মস্থ করেই নৈতিকতার প্রশ্নে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছিল। লবণ করের মধ্যে গান্ধী পাশ্চাত্য সভ্যতার লোভ, আগ্রাসন, অনৈতিকতাকেই দেখেছিলেন এবং সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকেই নস্যাৎ করেছিলেন। দেহ ও মনের আত্মনিয়ন্ত্রণে সুস্বাস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য গান্ধী দীর্ঘসময় ধরে লবণহীন আহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। গান্ধীর সত্যাগ্রহের ধারণায় লবণহীন আহারের একাধিক তাৎপর্য ছিল। প্রথমত, লবণহীন আহার গ্রহণ করায় লবণ কর বিরোধিতা তাঁর কাছে সহজ হয়েছিল। জনতার সেবক রূপে গান্ধী নিজের জন্য নয়, লবণ-বঞ্চনার প্রতিকারে অপরের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, লবণকে বীর্য তথা পৌরুষের প্রতীকী ধারণার [যা ভারতীয় সহ বিভিন্ন সংস্কৃতিতে দেখা যায়] নিরিখে বিশ্লেষণ করলে, মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে লবণ সত্যাগ্রহের ভিন্ন তাৎপর্য ফুটে ওঠে। লবণ উৎপাদনের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য [মনোপলি] কায়েম করে ব্রিটিশরা যদি ভারতীয়দের পৌরুষ ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে গান্ধীর লবণের অধিকার ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম ভারতীয়দের হৃত পৌরুষ ও [যৌন] সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রকল্প হয়ে

উঠেছিল। লবণ সত্যাগ্রহ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম হয়ে ওঠায় ব্রহ্মচর্যের সাথে লবণ রহিত আহারের 'অস্বাদ' অনুশীলন গান্ধী জীবনে অপরিহার্য ছিল।

লবণ সত্যাগ্রহের রাজনৈতিক কর্মসূচিকেও গান্ধী ধর্মীয় রূপদান করেছিলেন। জনতার উদ্দেশ্যে লবণ আইন অমান্যের আহ্বানে গান্ধী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধারণাই তুলে ধরেছিলেন। সাধারণ জনতার কল্পনায় - যারা প্রাত্যহিক জীবনে লবণ-বঞ্চনার শিকার ও লবণ তৈরির অধিকার হারিয়েছিলেন - গান্ধী দৈবপ্রেরিত মুক্তিদাতা এবং লবণ মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। লবণের শুদ্ধতাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও গান্ধীর নৈতিক রাজনীতির কাছে প্রতিহত হয়েছিল। সত্যাগ্রহীদের উৎপাদিত লবণের গুণমানকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অব্যাহত প্রচার-যুদ্ধে রসায়নবিদ্যা ও ব্যাকটেরিয়োলজির বিশ্লেষণ অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। সত্যাগ্রহ লবণের শুদ্ধ, সংক্রমণমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেশ করে ভারতীয় রসায়নবিদ ও ব্যাকটেরিয়োলজিস্টরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চর্চা ও অনুশীলনে ব্রিটিশ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। লবণের গুণমান নির্ণয়ে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় সমাজে জাত-পাত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আধারিত লবণের অশুচিতার ধারণাও অনেকাংশে পিছু হটেছিল।

লবণকে কেন্দ্র করে গান্ধীর নৈতিক রাজনীতির আহ্বান বাংলার সমাজজীবনে বহুতর অর্থ ও তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়েছিল। উপকূলবর্তী অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে 'অবৈধ' লবণ উৎপাদনের ঘটনাগুলি, যা দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত ছিল, জাতীয়তাবাদী কর্মসূচিতে 'বৈধ' কার্যক্রম রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। 'অবৈধ' লবণ উৎপাদকরা যারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মামুলি অপরাধী বলে ভেবে এসেছিলেন, লবণ সত্যাগ্রহের কর্মসূচি তাদের আত্ম-ধারণায় আকস্মিক রূপান্তর এনেছিল এবং নিজেদের 'বৈধ' লবণ উৎপাদক হিসেবেই তারা গণ্য করেছিলেন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যদি লবণ উৎপাদনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে (আইনি ও প্রশাসনিক) নজরদারি, নিপীড়ন তথা নিয়ন্ত্রণের সূত্রে উপকূলের ঔপনিবেশীকরণ করে থাকে তাহলে গান্ধীয় সত্যাগ্রহের সংযোগে উপকূলের যে জাতীয়করণ হয়েছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। লবণের বস্তুগত মাত্রাকে (যথা- লবণের উৎপাদন, বিতরণ, বিক্রয়, ব্যবহার) কেন্দ্র করেই গান্ধী দেশজুড়ে প্রতীকী আইন অমান্যের কর্মসূচী পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সত্যাগ্রহীদের উৎপাদিত লবণ যাতে অশুদ্ধিমুক্ত, নিরাপদ, খাদ্যোপযোগী হয় তার জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ সম্বলিত সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। স্থানীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের

প্রচেষ্টাও এই পর্বে দেখা গিয়েছিল। সত্যাগ্রহীদের লবণকে ঘিরে বিভিন্ন স্থানে যেমন ব্যাপক উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল তেমনই তার চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতারণার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে জনগণকে সচেতন করা হয়েছিল। লবণকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ উপকূলীয় অঞ্চলে আরো সুতীব্র হয়ে উঠেছিল এবং গণস্মৃতিতে তার রেশ থেকে গিয়েছিল। লবণ আইন অমান্যের প্রতীকী কার্যকলাপ যে লবণের বস্তুগত মাত্রার সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে ছিল তা স্পষ্ট হয় যখন সত্যাগ্রহের সূচনার মাস দুয়েক পরেই জুন মাসে বর্ষার আগমনে লবণ সংক্রান্ত কর্মসূচি থিতিয়ে যায়।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির (১৯৩১) বোঝাপড়ায় লবণ আইন অমান্য স্থগিত হলেও লবণ করের বিলোপ হয় নি। ঔপনিবেশিক লবণ আইনে আংশিক পরিবর্তন করে শুধু উপকূলের মানুষকে লবণ তৈরির ও সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যেই তা বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। উপকূলবর্তী মানুষ তাদের লবণ উৎপাদনের অধিকার ফিরে পেলেও স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত তা নিরঙ্কুশ নয়, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত ছিল। লবণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গুরুতর শাস্তি, কোথাও লবণ উৎপাদনের অধিকার কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ও বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যরা সরব হয়েছিলেন। ১৯৩১ থেকে আমদানিকৃত লবণে শুল্ক বাড়ানো হলে ব্রিটিশ সহ বিদেশি লবণের ব্যবসায় পড়তির হার আরো ত্বরান্বিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে লবণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল এবং বাংলায় লবণ শিল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেছিল। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ বাংলায় লবণ উৎপাদনে নানান সীমাবদ্ধতা তুলে ধরলেও ভারতীয় এবং বাঙালি বিশেষজ্ঞরা সেই দাবি নাকচ করে উজ্জ্বল সম্ভাবনার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা প্রদানে অনীহার জন্য স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত বাংলায় সরকারি নয়, বেসরকারি উদ্যোগে দেশীয় লবণ শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৭-এ নির্বাচিত বাংলা প্রাদেশিক সরকার অবশ্য বেসরকারি লবণ শিল্পোদ্যোগকে সহায়তা করতে উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে বাংলায় লবণ সরবরাহে তীব্র সংকট দেখা গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষকালীন এই সংকটের প্রেক্ষিতেই বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগে সরকারি স্তরে আরো সহায়তা ও গুরুত্ব প্রদানের উদ্যোগ চোখে পড়ে। গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের ফলশ্রুতিতে বাংলায় লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ও বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার আশা সঞ্চারিত হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি গড়ে তোলার উদ্যোগে সামিল হয়েছিলেন। বিপুল

সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য তিনি বাংলায় বৃহৎ লবণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত এই কোম্পানিগুলি বাংলার মোট লবণ চাহিদা মেটানোর ধারেকাছেও ছিল না। তার পাশাপাশি ১৯৪০-এর দশকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ, সাইক্লোনের বিপর্যয়-জনিত প্রভাব কাটিয়ে উঠে উৎপাদন অব্যাহত রাখা ও ন্যূনতম লাভের মুখ দেখাই বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বাংলায় সরকারি স্তরে লবণ শিল্প যেমন গড়ে ওঠেনি, তেমনই বেসরকারি শিল্পোদ্যোগও সরকারের আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত সহায়তার মুখাপেক্ষী ছিল। স্বাধীনতার পর শিল্পপ্রসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সম্মিলিতভাবে উদ্যোগী হলে বাংলায় লবণ শিল্পোদ্যোগের যথার্থ প্রসার ঘটে।

ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ 'মনোপলি' থেকে স্বরাজের প্রতীকে লবণের রূপান্তরের ইতিহাস এক চিমটে লবণ ['A Pinch of Salt'] সহযোগেই এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভে পর্যালোচনা করার চেষ্টা হয়েছে—কারণ, খাঁটি ইংরেজি বাগধারায় যে 'A Pinch of Salt' কোনো কিছুকে ওপর থেকে দেখে বিচার নয়, বরং সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গীতে তলিয়ে দেখতে বলে![1] ব্রিটিশ মনোপলি-র বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অনুসন্ধানে অর্থনীতিকেন্দ্রিকতার বাইরে গিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতিতে লবণের নিহিত অর্থকে অনুধাবন করার প্রেরণাও 'A Pinch of Salt' যোগায়। লবণ সত্যাগ্রহের প্রেক্ষিতে ভাইসরয়ের সাথে দর কষাকষিতে গিয়ে গান্ধী সাধে কি আর এক চিমটে স্বদেশি লবণ নিয়ে গিয়েছিলেন, সামান্য নুনকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য কিভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল তা মজাচ্ছলে বোঝাতে![2]

বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে লবণের উৎপাদন, ভোগ, ব্যবহারে বহুমাত্রিকতা পরিলক্ষিত। তাই লবণকে কেন্দ্র করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ সহ বিবিধ প্রকরে বিন্যস্ত ভারতীয় সমাজে বহুস্তরীয় অর্থ, তাৎপর্য, প্রতিক্রিয়ার অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, লবণ প্রতীকী পৌরুষের ধারণাতে প্রতিভাত হলেও নারীর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তার ভিন্নতর ব্যাখ্যা ও সমালোচনা থাকতে পারে। গান্ধীই স্বয়ং প্রাথমিকভাবে ডান্ডী পদযাত্রায় এবং লবণ আইন অমান্যের কর্মসূচিতে নারীদের সামিল করতে চাননি। পরে তাদের প্রত্যয়ী যুক্তি ও প্রতিবাদে লবণ আইন অমান্যের অনুমতি দিয়েছিলেন। লবণকে কেন্দ্র করে নারীর ঘর ও বাহিরে ভূমিকা পৃথক বিশ্লেষণের দাবি রাখে এবং লবণের সামাজিক ইতিহাসকে তা আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে

---

[1] *Webster's New World Dictionary* Fourth Edition, Edited by Michael Agnes (New York: Pocket Books, 2003), 568.

[2] See, Chapter 11, Sarojini Sinha (compiled and edited) *A Pinch of Salt Rocks an Empire* (New Delhi: Children's Book Trust, 1985 e-book).

সহায়ক হতে পারে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, লবণের প্রতীকী পৌরুষের ধারণা একমাত্রিক ও চূড়ান্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঔপনিবেশিক সুদানে পুরুষ লবণ ('Male Salt') ও নারী লবণ ('Female Salt') উভয়ে মিশ্রিত করলে তবেই খাদ্যোপযোগী ও যথার্থ স্বাদের হয়ে উঠত।[3]

ঔপনিবেশিক পর্বে মানুষের জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যগুলি সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভিন্নতর অর্থ-প্রতিক্রিয়া তুলে ধরার পাশাপাশি শাসকীয় অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে কিনা সেই সম্ভাবনার দিকটি তলিয়ে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে ময়দা, আটা, ঘি, চিনি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ-ভারতে ভেজাল মিশ্রণের এবং অশুচিতার অভিযোগ ছিল। ময়দা, আটা, ঘি, চিনি ইত্যাদির অশুচিতাকে কেন্দ্র করে জাত-ধর্মনাশের এই আশঙ্কা মহাবিদ্রোহের সময়ে গণ-উন্মত্ততায় পরিণত হয়েছিল।[4] ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভেজাল ও অশুচিতার ধারণা এবং শরীরের সাথে তা কিভাবে আন্ত:সম্পর্কিত তা খাদ্যপণ্যের সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করা যায়।

লবণ যে মানুষের চিন্তা ও কর্ম উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে ও ভিন্নতর তাৎপর্যে প্রতিভাত হতে পারে এই পর্যালোচনায় তা রামমোহন থেকে গান্ধীর মতো 'আধুনিক ভারতের নির্মাতা'-দের জীবন ও কর্মকান্ড সূত্রে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের জীবন, ভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে বস্তু কিভাবে প্রভাবিত করে, কোন অভিমুখে নিয়ে যায় তা লবণের মতোই অন্যান্য পণ্যের সামাজিক ইতিহাস সূত্রে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করা যেতে পারে। আর লবণ যে গান্ধীর জীবনের সাথে ওতপ্রোত জড়িয়ে গিয়েছিল তা আর বোঝা যায় লবণ সত্যাগ্রহ-পরবর্তী পর্বে। লবণ করভারের সমালোচনা ও লবণ বিহীন আহারের পরীক্ষা উভয়েই তিনি কিভাবে অব্যাহত রেখেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাতেই এই উপসংহার প্রাসঙ্গিকভাবে সমাপ্ত হতে পারে।

---

[3] See, 'Report of the Chemical Laboratory' by Dr. William Beam, in Andrew Balfour edited, *Second Report of the welcome research Laboratory* (Dept. of Education, Govt. of Sudan, 1906), 220.

[4] এই বিষয়ের প্রাথমিক উল্লেখের জন্য দেখা যেতে পারে, John William Kaye, A History of the Sepoy War in India, 1857-58, Vol. I, (London: W.H. Allen & Co., 1864); গুজব, ষড়যন্ত্রের ভীতিকে ঘিরে মহাবিদোহের পর্যালোচনায় কিম ওয়াগনারও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন 'Rumours and Chapattis' শীর্ষক অধ্যায়ে, Kim A. Wagner, The Great Fear Of 1857: Rumours, Conspiracies and the making of the Indian Uprising (Oxford: Peter Lang, 2010) 61-78.

উত্তরকথন

লবণ সত্যাগ্রহের পরবর্তী পর্বেও গান্ধীর মননে ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লবণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে গঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সরকারগুলিকে গান্ধী জনস্বার্থে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে বলেন। কিভাবে লবণ কর কমানো যেতে পারে বা সবাইকে করমুক্ত লবণ সরবরাহ করা যেতে পারে সেই বিষয়ে তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভারতে মন্ত্রী মিশনের আগমনের প্রাককালে গান্ধী ১৯৪৬-এর ৬ মার্চ লর্ড ওয়াভেলকে লবণ কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত লবণ উৎপাদনের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব সরকার খতিয়ে দেখলেও তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দোলাচলে ছিল।[5] ১৯৪৬-এর ২রা এপ্রিল লর্ড পেথিক লরেন্সকে গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, লবণ করের বোঝা মানুষের উপর অব্যাহত থাকলে "সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে পারবে না।"[6] লবণ কর প্রত্যাহারের বিষয়টিতে কোনো সমাধান না হওয়ায় গান্ধী অধৈর্য এবং ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। ১৯৪৬-এর ৩ মে, গান্ধী শিমলায় ভাইসরয়ের কাছে আবারো বিষয়টি তুলে ধরে জানিয়েছিলেন যে, "লবণ [-এর বিষয়টি] আমার মাথা থেকে যায় নি। ইংরেজদের সম্মানের জন্য আমি বলছি এই 'মনোপলি' বিলোপে একদিনও দেরি হওয়া উচিত নয়।" 'মনোপলি' কি তা বোঝাতে ওয়াভেলের জ্ঞাতার্থে প্যারেলালের তৈরি করা একটি বিশদ নোটও গান্ধী পেশ করেছিলেন।[7] কিন্তু কোনো জবাব না পেয়ে গান্ধী (১১ মে, ১৯৪৬) ওয়াভেলকে খোঁচা দিয়ে লেখেন যে, দায়িত্ববোধহীন মন কিভাবে কাজ করে এটা তার চমৎকার উদাহরণ হতে পারে। ওয়াভেল সপ্তাহ খানেক আগের সাক্ষাতে গান্ধীকে জানিয়েছিলেন যে, ব্রিটিশরা সুনামের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু ব্রিটিশরা যে কাজের দুর্নাম নিয়েও তেমন কিছু মনে করে না— লবণ করের জের টেনে গান্ধী তার পাল্টা বিদ্রূপ এখানে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। লবণের 'মনোপলি' ও করভার ঘৃণ্য, তাই কালক্ষেপ না করে এগুলির বিলোপ করা জরুরি। আর সেইসময়ের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে তা আরো জরুরি হয়ে উঠেছিল। স্বভাবসিদ্ধ

[5] Pyarelal, Mahatma Gandhi - The Last Phase, Volume I (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1956), Ibid. 209.

[6] "As a means of raising revenue it is insignificant. The masses will hardly appreciate independence if the burden of the salt monopoly continues to afflict them." Gandhiji to Lord Pethick-Lawrence, April 2, 1946. Ibid. 209.

[7] Ibid. 210.

স্পষ্টবাচনে গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, তিনি জনতার প্রতি দায়বদ্ধ। তাঁর মন সর্বদা জনগণের কথা চিন্তা করে ও সাড়া দেয়। সেই বৃহত্তর দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি সরাসরি এই দাবি তুলেছিলেন।[8]

১৯৪৬-এর ২ সেপ্টেম্বর, লর্ড ওয়াভেলের ডাকে নেহরুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা শপথ নিয়েছিল। সেদিন সকালেই গান্ধীর ভাঙ্গি কলোনির বাড়িতে তাঁর আশীর্বাদ নিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আসেন। কিন্তু সোমবারের সেই দিনে গান্ধীর মৌনব্রত থাকায় তিনি চিরকুটে ভাবী মন্ত্রীদের জন্য এক সংক্ষিপ্ত অথচ সোজাসাপ্টা বার্তা দিয়েছিলেন: "প্রার্থনার সময় থেকেই আমি তোমাদের চিন্তা করছি। লবণ কর বিলোপ করো। ডাণ্ডি অভিযান মনে রেখো। হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করো। অস্পৃশ্যতা দূর করো। খাদি পরো।"[9] ১৯৪৭-এর মার্চ মাস পর্যন্ত লবণ কর অব্যাহত ছিল। নেহরুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা ১৯৪৬-এর অক্টোবর লবণ কর বিলোপের কথা ঘোষণা করলেও বাজেটের খাটতি নিয়ে উদ্বেগ থাকায়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় সাড়ে চার মাস আগে, ১৯৪৭-এর ১-লা এপ্রিল তা বাস্তবায়িত হয়েছিল।[10]মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদাগুলির সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে গান্ধী যেমন আজীবন লবণকে বিস্মৃত হন নি তেমনই লবণকে কেন্দ্র করে তাঁর সংগ্রামও মানুষের ইতিহাসে সহজে বিস্মৃত হবেনা:"It opened up the glorious vista of galvanising millions into a united constructive non-violent effort related to one of their basic needs."[11]

[8]"The only straight answer from my mind which thinks ever of the masses and is responsible and responsive to them would be to abolish the hateful monopoly and tax … especially in these days of famine." [Gandhiji to Lord Wavell, May 11, 1946.] Ibid. 200

[9]Pyarelal, *Mahatma Gandhi -The Last Phase*, 6.

[10]Miles Taylor, The Ungrudging Indian: The Political Economy of Salt in India, c. 1878–1947, *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 46:4, (2023) 791-805 [804]

[11]লবণ সত্যাগ্রহী ও পরবর্তিকালে গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব প্যারেলাল নায়ারের মন্তব্য,Pyarelal, *Towards New Horizon* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1959), 116-117.

উপাদান

ক. প্রাথমিক উপাদান

ক.১: সরকারি মহাফেজখানা

National Archives of India

Central Board of Revenue, May, June, July 1930.

Finance Dept. Separate Revenue, File No. 144, Part-C, June 1906.

Home Political, A Proceedings, No. 104, October 1908 [Confidential]; No. 32, February 1909; No. 41-50, September 1910; No. 441, 2 November 1906.

Home Public, A Proceedings, February 1907, File No. 210, 265 (Confidential).

List of Cases in which Intimidation, Social Ostracism, Etc. have been used in the enforcement of the Boycott Movement in the Eastern Bengal and Assam From June1906 to December 1909, Home Political-A Proceedings, September 1910, No. 41-50.

List of Cases of Intimidation, etc., practised in connection with the boycott, Home Political-A Proceedings, September 1910, No. 41-50.

Political Proceedings A, August 1907, No. 114.

Reports on the Native Newspapers (1901-1909).

ব্রিটিশ বাজেয়াপ্ত পুস্তক (Proscribed Literature)

হিন্দি

কুঞ্জবিহার, নথারাম, *নমকিন জঙ্গ* (কানপুর: প্রেম প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৩০)।

বাবুলাল, লাল,*গান্ধী গীতসাগর* (কানপুর সুরসারি প্রেস, ১৯৩০)।

রামচন্দ্র, *নমক কা গোলা* (দিল্লি মার্তণ্ড প্রেস, সন-তারিখহীন, আনু. ১৯৩১)।

বাংলা

মাইতি, প্রতাপ চন্দ্র, *স্বরাজ সঙ্গীত* (প্রকাশক এ. সি. মাইতি, ১৯৩১)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন, *মুক্তি-পথে* (কলিকাতা: প্রবাসী প্রেস, আনু. ১৯৩১)।

Nehru Memorial Museum and Library

Bengal Satyagraha Reports, *AICC Papers*, G 86/1930. (Microfilm).

West Bengal State Archives

Swadeshi and Political Cases, Home Confidential, File No. 94/1909, 1909, West Bengal State Archives (WBSA), Kolkata.

ক. ২: মুদ্রিত রিপোর্ট

ইংরেজি

Bengal Legislative Council Debates [hereafter BLCD], First Session, [Volume I, No. 1-13] (Alipore: Bengal Government Press, 1941).

BLCD, Second Session, [Volume II, 1-32], (Alipore: Bengal Government Press, 1940).

BLCD, 7 February to 25 October, 1944, First Session, [No. 1-90], (Alipore: Bengal Government Press, 1944).

BLCD,26 July to 25 September, 1946, First Session [No.2], (Alipore: Bengal Government Press, 1946).

East India Company's Charter, HC Deb 22 July 1833, vol. 19, cc1069-75 Available at http://hansard.millbanksystems.com/commons/1833/jul/22/east-india-companys-charter#S3V0019P0_18330722_HOC_37

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, *Monograph on Common Salt*, (Calcutta, 1930).

Fourth Report from the Select Committee on Indian Territories, together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence, and Appendix (The House of Commons, 30 June, 1853).

Government Review of Movement, in *The Indian Annual Register*, Vol. II July – Dec. 1930.

Ghose, Bhaskar & Bose, Sanat K., (edited), *Midnapore Correspondence of the Salt Districts Hidgellee Salt Divisions: Letter Received, 1786-1801* (Govt. of West Bengal: West Bengal District Records, 1971).

Ghose, Bhaskar & Bose, Sanat K., (edited), *Midnapore Correspondence of the Salt Districts Tamlook Salt Divisions: Letter Received, 1785-1796* (Govt. of West Bengal: West Bengal District Records, 1974).

Hamilton,H. C. ,'Notes on the Manufacture of Salt', in the Tumlook Agency, Appendix B, dated September 23, 1852, Appendix to Salt Report,1854.

Indian Annual Register, Vol. 1, January-June 1930.

Legislative Assembly Debates, 14 January to 18 February, 1931, Vol. I (Simla: Government of India Press, 1931).

Legislative Assembly Debates, 12 March to 25 March, 1931, Vol. III, (Simla: Government of India Press, 1931).

Legislative Assembly Debates, 28 February to 17 March, 1936, Vol. III (New Delhi: Government of India Press, 1936).

Legislative Assembly Debates, 1 to 13 November, 1944, Vol. IV, No. 1 (New Delhi: Government of India Press, 1944).

The Liberal and New Dispensation, XII: No. XV, (April 16, 1893).

Minutes of Evidence taken before the Select Committee on the Affairs of the East India Company, Vol. III: Revenue (House of Commons, 1832).

'Minute by H. M. Parker, Esq., Junior Member of the Board of Customs, Salt and Opium', Dated the 2nd of November, 1835, in *Report of the Commissioner appointed to enquire into Salt in British India* (London: Harrison, 1856).

'Minute by H. M. Parker, Junior Member of the Board of Customs, Salt and Opium,' Appendix E. No. 8, November 2, 1835, in *Report of the Commissioner appointed to enquire into Salt in British India* (London: Harrison, 1856).

'On the Supply of Salt for the Presidency of Madras', in Report of the Commissioner appointed to enquire into Salt in British India (London: Harrison, 1856).

Plowden, G., *Notes on the Manufacture, Storage, Sale, and Delivery of Salt in Chittagong Agency*, Appendix C, No. 2 in Appendix to Salt Report,1854.

Prospectus of The Bengal salt Company, Limited, 12 July, 1934. [Courtesy: Rathindra Dutta]

Question and Answers, Bengal Legislative Council Debates, Third Session, [Volume III] (Alipore: Bengal Government Press,1937).

Report on the Police of Lower Provinces of the Bengal Presidency, Annual Volume from 1876 to 1884 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, Published in the Years from 1877 to 1885).

Report on the Result of the Administration of the Salt Department During the Year 1860-61 (Calcutta: 1862).

Report from the Select Committee of the House of Lords 1930, House of Commons, 8 July, 1830.

Report of the Professor of Chemistry, *Twelfth Annual Report of the Ontario Agricultural College and Experimental Farm*, 1886 Sessional Papers No. 6 Part III *in First Session of the Sixth Legislature of the Province of Ontario*, Vol. XIX, Part II, Toronto: Warwick, 1887.

Simms, F. W., *Report on the Establishment of Water-Works to Supply the City of Calcutta* (Calcutta: Military Orphan Press, 1853).

The Regulations and Laws Enacted by the Governor General in Council, Vol. VII, (Calcutta: Baptist Missionary Press, 1828).

The Bengal Code, Volume III, (Calcutta, 1905, Third Ed.).

The Bengal Code [Edited Under the Orders of the Government of India], Vol. IV (Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, 1905, Third Edition).

বাংলা

প্রসপেক্টাস, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড্‌, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫।

ক. ৩: পত্র-পত্রিকা

বাংলা

আনন্দবাজার পত্রিকা, আশ্বিন, কার্ত্তিক১৩৪১।

ইসলাম প্রচারক, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ১৩১২।

জঙ্গিপুর সংবাদ, ১৬শ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা, ১৩৩৭।

নব্যভারত, আশ্বিন ১৩১৩;আষাঢ়১৩১৪।

নীহার, মার্চ, এপ্রিল ১৯৩০।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫।

মহাজন বন্ধু, ফাল্গুন ১৩১০;আষাঢ়১৩১১, ফাল্গুন ১৩১২।

মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৭;জ্যৈষ্ঠ১৩৩৭;আশ্বিন১৩৩৭।

ইংরেজি

Amrita Bazar Patrika, March, April 1930.

Calcutta Review, Vol. 33-37, 40, 1929-1931,

De Bow's review Vol. XXIII, New Orleans & Washington City, July-December, 1857.

Leader, Allahabad, May 1930

Liberty, March 1930.

Morning Post, January 1834.

Morning Herald, September 1846.

The Liberal and New Dispensation, Calcutta, Vol. XII, No. 2, (January 8, 1893).

The Oriental Herald, September1827.

The Indian News, 1846.

The Mining Journal, 1846.

The Times, September 1846.

The Review of Review (W.T. Stead edited), XXXIX, January-June 1909.

The British Medical Journal, May1903.

Time, Vol. XV, No. 13, 31 March 1930.

Times of India, Bombay, May1930.

ক. ৪: পুস্তিকা ও পুরাতন গ্রন্থ

Abbott, J., *The Keys of Power: A Study of Indian Ritual and Belief* (London: Methuen & Co., 1932).

Anonymous, *Monograph on Common Salt* (Calcutta: Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, 1930).

Accum, Frederick, *A Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons* (London: Longman 1820).

Anonymous Author, *Deadly Adulteration and Slow Poisoning Unmasked; or Disease and Death in the Pot and Bottle* (London: Sherwood, 1830) [e-book available https://www.gutenberg.org/

Balfour, Andrew, (ed.), *Second Report of the welcome research Laboratory* (Dept. of Education, Govt. of Sudan, 1906)।

Banerjea, Surendranath, *A Nation in Making: Being the Reminiscences of Fifty Years in Public Life* (London: Oxford University Press, 1925).

Banerjea, Pramathanath, *A History of Indian Taxation* (London: Macmillan, 1930).

Browne, Rev. J. Crave, *The Punjab and Delhi in 1857* [Vol. 1] (London: William Blackwood & Sons. 1861).

Desai, Mahadev, *The Gita According to Gandhi* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, August, 1946).

Griffiths, Walter G., *The Kol Tribe of Central India* (Calcutta: The Asiatic Society, 1946).

Hassall, Arthur Hill, *Food and its Adulterations* (London: Longman, 1855).

Hastings, James (ed.) *Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. III* (New York: Charles Scribner’s Sons, 1911).

Holland, Henry, *General View of the Agriculture of Cheshire* (London: Richard Phillips, 1808).

Jaini, Jagmanderlal, *Outlines of Jainism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1916).

Johnston, James F., *Chemistry of Common Life* (New York: D. Appleton, 1853).

Johnson, Samuel, *A Dictionary of the English Language* (London: W. Strahan, 1755).

Kaye, John William, *A History of the Sepoy War in India, 1857-58*, Vol. I, (London: W.H. Allen & Co., 1864).

Manley, J. J., Salt and other Condiments (London: International Health Exhibition, 1884).

Martin, James Ranald, *Notes on the Medical Topography of Calcutta* (Calcutta; Bengal Military Orphan Press, 1837).

McGregor, John, *Commercial statistics*, Vol. II, (London: Whittaker, 1850).

Mitchell, John, *A Treatise on the Falsification of Food* (London: Hippolyte Bailliere, 1848)

Mitchill, Samuel L. & Miller, Edward, *The Medical Repository, and Review of American Publications on Medicine, Surgery, and the Auxiliary Branches of Science*, 1804.

Morton, Rev. W., *দৃষ্টান্তবাক্যসংগ্রহ, A collection of Proverbs, Bengali & Sanskrit with their Translation and Application in English* (Calcutta: The Baptist Mission Press, 1832).

Ratton, J. J. L., *A Handbook of Common Salt* (Madras: Higginbotham and Co. 1877).

Ray, J., *A Complete Collection of English Proverbs* (London: J. Hughs, 1737, 3rd Ed.).

Ray, P.C., *India Before and After the Mutiny* (published in 1886) (Government of India: Publication Divisions, 2012).

Rees, J. D., *The Real India* (London: Methuen, 1908).

Risley, H.H., *Tribes and Castes of Bengal* (Calcutta, 1891).

Stewart & Murray, (ed.), *A Pamphlet on the Press versus the Salt Monopoly*(London: Old Bailey,1846).

Stevenson, Sinclair, *The Rites of the Twice-born* (Oxford University Press, 1920).

Smith, Adam, *The Wealth of Nations* [Edited by Edwin Cannan] (New York: The Modern Library, 1937).

Tomlinson, Charles, *The Natural History of Common Salt: Its' Manufacture, Appearance, Uses, and Dangers, in Various Parts of the World* (London: The Committee of General Literature and Education, 1850).

Watson, Thomas E., *The Story of France: From the Earliest Times to the Consulate of Napoleon Bonaparte* (New York: Macmillan, 1899).

ক. ৫: আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও চিঠিপত্র

বাংলা

দত্ত,রথীন্দ্র, *পিতৃদেব ও বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী* (কলকাতা: রথীন্দ্র দত্ত, ২০২২)।

মিত্র, কৃষ্ণকুমার, আত্মচরিত, (প্রবাসী প্রেস, মাঘ ১৩৪৩, ১ম সংস্করণ)।

ইংরেজি

Bapu's Letters to Mira, 1924-1948 (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1949).

Desai, Mahadev, Day-To-Day With Gandhi, Vol. 1 (Rajghat: Sarva Seva Sangh Prakashan, 1968).

Elwin, Verrier, *The Tribal World of Verrier Elwin: An Autobiography* ((New York: Oxford University Press, 1964)).

Gandhi, M. K., *An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth*, Translated from the original in Gujrati by Mahadev Desai (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1926).

Gandhi, M. K., *An Autobiography: The Story of My Experiments with Truth*, Edited by Tridip Suhrud (New Haven: Yale University Press, 2018).

Gandhi, Prabhudas, *My Childhood with Gandhiji* (Ahmedabad: Navajivan, 1957)

Nehru, Jawaharlal, *An Autobiography* (London: Bodley Press, 1939).

Polak, Millie Graham, 'In the South African Days', March 12, 1948, London, available at https://www.gandhi-manibhavan.org/gandhi-comes-alive/the-south-african-days.html

Polak, Millie Graham, *Mr. Gandhi: The Man* (London: George Allen, 1931).

Shirer, William L., *Gandhi: A Memoir* (New York: Simon and Schuster, 1979).

Speeches and Addresses of Raja Prafulla Nath Tagore (Calcutta; The Book Co. 1936).

ক. ৬: সাহিত্য ও অন্যান্য লেখাজোখা

বাংলা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯)।

গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ,*শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত,* চতুর্থ ভাগ, একবিংশ খণ্ড, (কলিকাতা: প্রভাস চন্দ্র গুপ্ত [প্রকাশক], দ্বিতীয় কথামৃত সংস্করণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ,*শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত,* প্রথম ভাগ, পঞ্চম খণ্ড, (ষষ্ঠ কথামৃত সংস্করণ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)।

গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ,*শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত,* দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্দ্দশ খণ্ড, (কলিকাতা: অনিল গুপ্ত [প্রকাশক], একাদশ কথামৃত সংস্করণ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), ১১৪।

গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ,*শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত,* চতুর্থ ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, (কলিকাতা: প্রভাস চন্দ্র গুপ্ত [প্রকাশক], দ্বিতীয় কথামৃত সংস্করণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

ঘোষ, বিনয় [সম্পা.], *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* ৪র্থ খণ্ড (কলিকাতা: পাঠভবন, ১৯৬০).

দত্ত,মহেন্দ্রনাথ,*কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা* (কলকাতা : মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩)।

নজরুল-রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১১ পুনর্মুদ্রণ)।

রবীন্দ্র রচনাবলীর বৈদ্যুতিন সংস্করণ,পরিশিষ্ট -আবদারের আইন- ৩ *রবীন্দ্র রচনাবলী* (nltr.org)(https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15973

রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রচনা সংকলন, পঞ্চম খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২)।

রায় চৌধুরি, গিরিজাপ্রসন্ন, *গৃহলক্ষ্মী,* দ্বিতীয় ভাগ (কলিকাতা, ১৩১১)।

বসাক, রাধাগোবিন্দ (অনূদিত), *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র,* (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭০, তৃতীয় সংস্করণ)।

রায়,দ্বিজেন্দ্রলাল, *পুনর্জন্ম* (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২১)।

রায়, অনুরাধা (সম্পা.), *স্বাধীনতা সংগ্রামের গান ও কবিতা বিংশ শতাব্দী* (সাহিত্য আকাদেমি ১৯৯৯)।

বন্দ্যোপাধ্যায়,বিভূতিভূষণ,*অশনি সংকেত* (কলিকাতা, ১৯৬১)।

বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রভাত মোহন,"শিশুর প্রশ্ন" [কবিতা], *মুক্তি-পথে* (কলিকাতা: প্রবাসী প্রেস, ১৯৩১)।

বন্দ্যোপাধ্যায়,চণ্ডীচরণ, *স্বদেশ-রেণু* (কলিকাতা, ১৩১২)।

বিষ্ণু দে (সম্পা.),*একালের কবিতা* (কলিকাতা: সম্বোধি পাবলিকেশনস, ১৯৬১)।

শর্মা, যোগেন্দ্রনাথ,*স্বদেশ সঙ্গীত* (কলিকাতা, ১লা আশ্বিন ১৩১২, তৃতীয় সংস্করণ)।

শর্ম্মা, সতীশচন্দ্র (অনূদিত), *চরক সংহিতা* (কলিকাতা: ১৩১১ বঙ্গাব্দ)।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা [গীতা মধুকরী], শ্রী শ্রীমৎ কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামী কর্তৃক বাংলায় বিরচিত (কলিকাতা: প্রকাশক আশুতোষ দাস ১৩২১)।

সরকার, যশোদানন্দন, *সুশ্রুত সংহিতা,* (কলিকাতা, প্রকাশক ও সালের উল্ল্যেখ নেই)।

সেন, দীনেশচন্দ্র, গৃহশ্রী (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৩০, নবম সংস্করণ)।

ইংরেজি

Acharya Prafulla Chandra Roy: A Collection of Writings, Vol. II A (Calcutta University, 2009).

Basu, B.D., (ed.), The Sacred Book of the Hindus: *Chhandoga Upanisad* (Allahabad: Panini Office, 1910).

Collected Works of Mahatma Gandhi [hereafter *CWMG*], Vol. I,IV, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XXVI, XXX,XXXIII, XLVIII, Electronic Book, (New Delhi: Publications Division Government of India, 1999).

Selected Works of Jawaharlal Nehru, Vol. 4 (New Delhi: Orient Longman, 1973).

Gandhi, M. K., *Hind Swaraj and other writings*, Edited by Anthony J. Parel (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

Gandhi, M. K., *From Yeravada Mandir Ashram Observances* (Ahmedabad: Navajiban, 1992 (1932)).

Griffith, T.H., *The Hymns of the Atharva-Veda* [Vol. VII, 76.I] (Benares: E.J. Lazarus & Co.,1895).

Mallanga, Vatsayana, *Kamasutra*, translated and edited by Wendy Doniger, Sudhir Kakar (UK: Oxford University Press, 2002).

Muller, F. Max, edited, *The Sacred Books of the East: The Satapatha-Brahamana* [Vol. XII, II-I-I.6] (Oxford: Clarendon, 1882).

Shastri, J.L., *The Garuda-Purāna* (Delhi: Motilal Banarsidas, 1957).

Sri Aurobindo, *The Doctrine of Passive Resistance* (Calcutta: Arya Publishing, 1948).

খ. সহায়ক গ্রন্থ

খ. ১: জীবনী

Dalal, Chandulal Bhagubhai, *Harilal Gandhi: A Life*, Edited and Translated by TridipSuhrud (New Delhi; Orient Longman, 2007).

Pyarelal, *Mahatma Gandhi, Volume 1 The Early Phase* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1965).

Pyarelal, *Mahatma Gandhi, The Last Phase Volume 1* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1956).

Pyarelal, *Towards New Horizon* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1959).

খ. ২: বিশ্লেষণধর্মী বই

বাংলা

হোসেন,এবাদত্,*মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন* (কলকাতা : সপ্তর্ষি, ১৯৫৬)।

গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ,*সাধক কবি রামপ্রসাদ* (কলকাতা: ভট্টাচার্য্য সনস্ লিমিটেড, ১৯৫৪)।

ঘোষ, বিনয় [সম্পা.], *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* ৪র্থ খণ্ড (কলিকাতা পাঠভবন, ১৯৬০)।

চক্রবর্তী,দীপেশ, *মনোরথের ঠিকানা* (কলকাতা:অনুষ্টুপ, ২০১৮)।

চক্রবর্তী, সুধীর, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১০)।

চক্রবর্তী, অরিন্দম,*ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস* (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৩)।

চট্টোপাধ্যায়,পার্থ,*জনপ্রতিনিধি* (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৩)।

চৌধুরি, কমল, সম্পাদিত, *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ* (কলকাতা: ভারবি, ১৯৯৯)।

দাশগুপ্ত, অশীন,*ইতিহাস ও সাহিত্য* (কলকাতা: আনন্দ, ১৯৮৯)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস, *বিভূতিভূষণের সংসার*(কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১১)।

বিশ্বাস, দিলীপ কুমার,*রামমোহন সমীক্ষা* (কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৮৩)।

বেদানন্দ, স্বামী, *শ্রী শ্রী যুগাচার্য্য জীবন চরিত, সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবন চরিত* (কলিকাতা: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ১৯৭৮)।

ভট্টাচার্য,কালীকৃষ্ণ,*বঙ্গের রত্নমালা* (কলিকাতা: ১৩১৭)।

মিত্র, উদয়ন, *জানা অজানা মহাফেজখানা* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯)।

রায়, অনুরাধা,*ইতিহাসের হরেক গেরো* (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৯)।

রণজিত গুহ রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ ২০১৯)।

সেন,সত্যরঞ্জন,*প্রবাদ-রত্নাকর* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, ১৯৫৭)।

স্যানাল, হিতেশরঞ্জন,*স্বরাজের পথে* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০১৪)।

ইংরেজি

Aggarwal, S. C., *The Salt Industry in India* (Delhi: Govt. of India Press, 1956, 2nd Edition).

Amin, Sonia Nishat, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939* (Leiden: E. J. Brill, 1998).

Anderson, David M.& Killingray, David, *Policing the Empire: Government, Authority and Control, 1830–1940* (Manchester: Manchester University Press, 1991).

Anderson, Benedict, *Imagined Communities: reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (UK: Verso, 1983).

Ankersmit, Frank, *Sublime Historical Experience* (Stanford: Stanford University Press, 2005).

Appadurai, Arjun (ed.), *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspectives* (UK: Cambridge University Press, 1986).

Arnold, David, *Toxic Histories, Poison and Pollution in Modern India* (UK: Cambridge University Press, 2016).

Arnold, David (ed.), *Imperial Medicine and Indigenous Societies* (Manchester, 1988).

Arnold, David, *Gandhi: Profiles in Power* (USA: Routledge, 2001).

Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste, Protest and Identity in Colonial India, The Namasudras of Bengal 1872-1947* (Richmond: Curzon Press, 1997).

Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal 1872-1947* (Richmond: Curzon Press, 1997).

Bandyopadhyay, Gitasree, *Constraints in Bengal Politics, 1921–1941, Gandhian Leadership* (Calcutta: Sarat Book House, 1984).

Barnhart, Robert K. (edited), *The Barnhart Dictionary of Etymology* (USA: H.W. Wilson, 1988).

Barui, Balai, *The salt Industry of Bengal 1757-1800; A Study in the Interaction of British Monopoly control and Indigenous Enterprise* (Calcutta, K.P. Bagchi, 1985).

Basu, Aparna, *Mridula Sarabhai: Rebel with a Cause* (New Delhi: Oxford University Press, 1996).

Basu, Shrabani, *For King and Another Country: Indian Soldiers on the Western Front, 1914-18* (New Delhi: Bloomsbury, 2015).

Batabyal, Rakesh, *Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali, 1943-47* (New Delhi; Sage, 2005).

Berge, Ann La, *Mission and Method: The Early Nineteenth-Century French Public Health Movement*, (UK: Cambridge University Press, 1992).

Bhattacharya, Sabyasachi, *The Financial Foundations of the British Raj: Ideas and Interests in the Reconstruction of the Indian Public Finance 1858-1872*(New Delhi: Orient Blackswan, 2005).

Bowbrick, P.,*The economics of quality, grades and brands* (New York: Routledge, 1992)

Broomfield, J.H., *Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal* (California: University of California Press, 1968).

Brown, Judith M., *Gandhi and Civil Disobedience, The Mahatma in Indian Politics: 1928-34* (London: Cambridge University Press, 1977).

Brown, Rebecca, *Gandhi's Spinning Wheel and the Making of India* (NY: Routledge, 2010)

Burnett, John, *Plenty and want: A Social History of food in England from 1815 to the Present Day* (Routledge[e-book], 2013, 3rd Edition).

Case, Margaret, *South Asian History: A Guide to Periodicals, Dissertation and Newspaper* (Princeton: Princeton University Press, 1968).

Chakravarti, Satis Chandra (ed.), *The Father of Modern India* (Calcutta: Rammohun Roy Centenary Committee, 1935).

Chakrabarty, Dipesh, *Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies* (Delhi: Permanent Black, 2004).

Chakrabarti, Mohit, *The Gandhian Philosophy of the Spinning Wheel* (New Delhi: Concept Publishing, 2000).

Chakrabarti, Pratik, *Bacteriology in British India Laboratory Medicine and the Tropic* (New York: University of Rochester Press, 2012).

Chandra, Bipan, *The Rise and Growth of economic Nationalism in India: Economic Policies of Indian National Leadership, 1880-1905* (New Delhi: People’s Publishing House, 1966).

Chatterjee, Srilata, *Congress Politics in Bengal 1919-1939* (London: Anthem Press, 2002).

Caplan, Patricia (ed.), *The Cultural Construction of Sexuality* (London: Routledge, 1987).

Cohn, Bernard, *Colonialism and its Forms of Knowledge*, Delhi: Oxford University Press, 1997.

Dalton, Dennis, *Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action* (New York: Columbia University Press, 2012).

Das, Abhay Charan, *The Indian Ryot, Land Tax, Permanent Settlement and the Famine* (Howrah: Howrah Press, 1881).

Das, Suranjan, *Communal Riots in Bengal 1905-1947* (Oxford University Press, Delhi, 1993).

Dumont, Louis, *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications* (Chicago: The University of California Press, 1970).

Driver, Felix, (ed.), *Oxford Dictionary ofNational Biography*(Oxford University Press, 2004), Available at http://www.oxforddnb.com/view/article/3855?docPos

Dirks, Nicholas, *The hollow Crown: Ethnohistory of an Indian Kingdom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).

Dirks, Nicholas B., *The Scandal of Empire: India and the Creation of Imperial Britain* (New Delhi: Permanent Black, 2006).

Eaton, Richard M., *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760* (University of California Press, 1996).

French, Michael, and Jim Philips, *Cheated not Poisoned? Food Regulation in the United Kingdom 1875-1938*(Manchester: Manchester University Press, 2000).

Gandhi, Leela, *Affective Communities: Anticolonial Thought, Fin-de-Siecle Radicalism, and the Politics of Friendship* (Durham: Duke University Press, 2006).

Gambhirananda, Swami, *History of the Ramakrishna Math and Mission* (Calcutta: Advaita Ashrama, 1957).

Gould, William, *Hindu Nationalism and the Language of Politics in Late Colonial India* (UK: Cambridge University Press, 2004).

Greenough, Paul, *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44* (New York: Oxford University Press, 1982).

Guha, Ramchandra, *Gandhi the years that changed the world 1914-1918* (India: Penguin Random House, 2018).

Guha, Ramchandra, *The Unquiet woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya* (Delhi: Oxford University Press,1991).

Guha, Ranajit (ed.), *Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society*, Vol. III (Delhi, Oxford University Press, 1989).

Guha, Ranajit, *Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India* (USA: Harvard University Press, 1997).

Gupta, Ranjan Kumar, *The Economic Life of a Bengal District Birbhum 1770-1857* (The University of Burdwan, 1984).

Habermas, Jürgen, (translated by Thomas Burger) *The Structural Transformation of The Public Sphere: an Enquiry into A Category of Bourgeois Society*, (Massachusetts: MIT Press, First MIT Paperback edition, 1991).

Hamlin, Christopher *A Science of Impurity: Water Analysis in Nineteenth Century Britain* (Bristol: Hilger, 1990).

Hyde, Francis E., *Liverpool and the Mersey: An Economic History of A Port 1700-1970* (Newton Abbot: David & Charles, 1971).

Imy, Kate, *Faithful Fighters: Identity and Power in British India* (New Delhi: Bloomsbury, 2023).

Islam, Sirajul and Aklam Hussain, eds., *History of Bangladesh, 1704-1971 Vol. 1, Political history* (Bangladesh: Asiatic Society of Bangladesh, 1997).

Joshi, P. V., (ed.) *Rammohan Roy and the Process of Modernization in India* (Delhi: Vikas, 1975).

Jones, Ernest, *Essays in Applied Psycho-Analysis*, Vol. II (New York, 1964).

Kaul, Chandrika, *Communications, Media and Imperial Experience: Britain and India in the Twentieth Century* (UK: Palgrave Macmillan, 2014).

Keneally, Thomas, *Three famines: starvation and politics* (US: Public Affairs, 2011).

Kolff, Dirk A., *Naukar, Rajput and Sepoy: The Ethnohistory of the Military Labour Market in Hindustan, 1450–1850* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

Kumagai, Yukihisa, *Breaking into the Monopoly: Provincial Merchants and Manufacturers' Campaigns for Access to the Asian Market, 1790-1833* (London: Brill, 2013).

Kingsbury, Benjamin, *An Imperial Disaster: The Bengal Cyclone of 1876* (London: Hurst, 2018).

Kurlansky, Mark, *Salt: A World History* (UK: Vintage, 2003).

Lal, Vinay, *Of Cricket, Guiness and Gandhi: Essays on Indian History and Culture* (New Delhi: Penguin, 2003).

Larson, Gerald James, *Classical Saṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning* (Delhi: Motilal Banarasidas, 2001).

Laszlo, Pierre, *Salt: Grain of Life*, Translated by Mary Beth Mader (New York: Columbia University Press,2001).

Leech, Edmund, *Aspects of Caste in South India, Ceylone and South India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).

Lev, Shimon, *Soulmates: The Story of Mahatma Gandhi & Hermann Kallenbach* (Hyderabad: Orient Blackswan, 2012).

Lourdusamy, J., *Science and national consciousness in Bengal 1870–1930* (Hyderabad: Orient Longman, 2004).

Lury, C., *Consumer Culture* (New Jersey: Rutgers University Press, 1996).

Majumdar, Uma, *Gandhi and Rajchandra, The making of the Mahatma* (Lexington Books, 2020).

Marshall, P. J., *Bengal, The British Bridgehead: Eastern India, 1740-1828* (Cambridge University Press, 2006).

Marx, K. Capital: Vol. I. A Critical Analysis of Capitalist Production, Moscow: Progress Publishers, 1971.

McClintock, Anne, *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest* (New York: Routledge, 1995).

Mehta, Uday Singh, *Liberalism and Empire: A Study in Nineteenth-Century British Liberal Thought* (Chicago: The University of Chicago Press, 1999).

Metcalf, Thomas, *Ideologies of the Raj* (New Delhi: Cambridge University Press, 1998).

Mennell, Stephen, *All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present*, (University of Illinois Press, 1985)

Mintz, Sidney, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (New York: Viking-Penguin. 1985).

Mukherjee, S.N., *Calcutta: Myths and History* (Calcutta: Subarnarekha, 1977).

Mukherjee, Tilottama & Dasgupta, Nupur (edited), *Religion, Landscape and Material Culture in Pre-modern South Asia* (Routledge, 2023).

Naidu, Ch. M., *Salt satyagraha in Coastal Andhra* (Delhi: Mittal, 1986).

Olivelle, Patrick, *Dharmasutras: The Law Codes of Apastamba, Gautama, Baudhayana and Vasistha* (Delhi: Motilal Banarasidas, 2000).

Prasad, Srirupa, *Cultural Politics of Hygiene in India, 1890–1940: Contagions of Feeling* (Palgrave Macmillan, 2015).

Prakash, Om, *Food and Drinks in Ancient India: From Earliest Times to C. 1200 A.D. (*Delhi: Munshi Ram Manohar Lal, 1961).

Radhakrishna, Meena, *Dishonoured by History? Criminal Tribes and British Colonial Policy* (New Delhi, Orient Longman, 2001).

Ramanna, Mridula, Health Care in Bombay Presidency (Delhi, Primus Books, 2012).

Ramagundam, Rahul, *Gandhi's Khadi: A History of Contention and Conciliation* (New Delhi: Orient Longman, 2008).

Rathee, Ravindra, *True to Their Salt: Indian Soldiers and the British Empire* (Amberley Publishing, 2022).

Ray, Kavita, *History of Public Health: Colonial Bengal, 1921–1947*(Calcutta: K.P. Bagchi and Co., 1998).

Ray, Utsa, *Culinary Culture and in Colonial India, A Cosmopolitan Platter and the Middle Class*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

Redford, A., *Manchester Merchants and Foreign Trade, 1794–1858* (Manchester: Manchester University Press, 1934).

Richardson, J. G. (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986).

Robertson, B. C., *Raja Rammohan Ray the Father of Modern India* (Delhi, Oxford University Press, 1995).

Rosenthal, Joshua M., *Salt and the Colombian State: Local Society and Regional Monopoly in Boyaca, 1821-1900* (Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2014).

Rotter, Andrew J., *Empires of the Senses: Bodily Encounters in Imperial India and Philippines* (New York: Oxford University Press, 2019).

Roy, Rajat*, Social Conflict and Political unrest In Bengal: 1875-1925* (Delhi: Oxford University Press, 1984).

Roy, Rohan Deb, *Malarial subjects: Empire, Medicine and Nonhumans in British India, 1820-1909* (UK: Cambridge University Press, 2017).

Roy, Kaushik, *Hinduism and the Ethics of Warfare in South Asia: From Antiquity to the Present* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

Sarkar, Hemchandra, *Rammohun Roy: The father of Modern India* (Calcutta; Brahmo Mission Press, 1910).

Sarkar, Sumit, *Modern India* (Delhi: Pearson, 2014).

Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908* (New Delhi: People's Publishing House, 1973).

Sarkar, Tanika, *Bengal, 1928-1934, The Politics of Protest* (Delhi: Oxford University Press, 1987).

Sarkar, Tanika*, Hindu wife, Hindu Nation*: *Community, Religion and Cultural Nationalism* (New Delhi: Permanent Black, 2003).

Sarkar, Sumit, *Writing Social History* (Delhi: Oxford University Press, 1997).

Sarkar, Tanika & Bandyopadhyay, Sekhar (eds)., *Calcutta: The Stormy Decades* (Delhi: Social Science Press, 2015).

Sanyal, Hitesh Ranjan, *Social Mobility in Bengal* (Calcutta: Papyrus, 1981).

Sartori, Andrew, *Bengal in Global Concept History: Globalism in the age of Capital* (Chicago: University of Chicago Press, 2008)

Sen, Amartya, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*(Oxford: Clarendon Press, 1981).

Sen, Amiya P.,*Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905: Some Essays in Interpretations*(Delhi: Oxford University Press, 1993).

Sinha, N.K., et. al. [edited], *Midnapore Salt Papers: Hijili and Tamluk (1781-1807)* (West Bengal Regional Records Survey Committee: Dasgupta, 1954).

Sinha, Sarojini, (compiled and edited), *A Pinch of Salt Rocks an Empire* (New Delhi: Children's Book Trust, 1985 e-book).

Sitaramayya, B. Pattabhi, *The History of the Indian National Congress (1885-1935),* (Published by the Working Committee of the Congress, 1935).

Strachey, John, *India* (London: Keagun Paul, 1988).

Taylor, Miles, Empress: Queen Victoria and India (New Haven: Yale University Press, 2018).

Topik, Steven C., and Wells, Allen, eds. The Second Conquest of Latin America: Coffee, Henequen, and Oil during the Export Boom, 1850–1930 (Austin: University of Texas Press, 1998).

Trautmann, Thomas R., *Aryans and British India* (New Delhi: Vistaar, 1997).

Veblen, Thorstein, *Theory of the Leisure Class, An Economic Study in the Evolution of Institutions* (New York: Penguin Classic Edition, 1994).

Venkatraman, V., "Kaliyuga Prahalatha: The Personification of Mahatma Gandhi in the Seditious Literature of the Madras Presidency, 1920-1933" in *SSRN Electric Journal*, August 2018, 1-12.

Wagner, Kim A., *The Great Fear Of 1857: Rumours, Conspiracies and the making of the Indian Uprising* (Oxford: Peter Lang, 2010).

Weber, Thomas*, On the salt march: The Historiography of Mahatma Gandhi's March to Dandi* (New Delhi: Rupa, 2009).

Wilbraham, George, *Thoughts on the Salt Monopoly in India* (London: James Ridgway, Feb. 1847).

Webster's New World Dictionary Fourth Edition [Edited by Michael Agnes] (New York: Pocket Books, 2003).

Webster, Anthony, *The Richest East Indian Merchant: The Life and Business of John Palmer of Calcutta, 1767-1836* (U.K.: The Boydell Press, 2007).

Weiner, Annette B.& Schneider, Jane (ed.), *Cloth and Human Experience*, (Washington, D.C.: Smithsonian Institute Press, 1991).

Wolfenstein, E. Victor, *Revolutionary Personality Lenin, Trotsky, Gandhi* (Princeton: Princeton University Press, 1971).

Zastoupil, Lynn, *Rammohun Roy and the making of Victorian Britain* (Palgrave Macmillan, 2010).

খ. ৩: প্রবন্ধ

ইংরেজি

Amin, Sahid, "The Pedagogy of Nationalism", *Seminar,* issue no. 686, (October 2016): 37.

Anderson, Warwick, "Excremental Colonialism: Public Health and the Poetics of Pollution," *Critical Inquiry,* Vol. 21, No. 3 Spring, (1995): 640-669.

Arnold, David, "Salt: An Afterword", *South Asia: Journal of South Asian Studies,* 46:4, (2023): 886-894.

Arnold, David, "The "Discovery" of Malnutrition and Diet in Colonial India", *Indian Economic & Social History Review,* 31:1, (1994): 1–26.

Barui, Balai, "Malangi Unrest in Lower Bengal: 1770-1810", *Revolt Studies,* 1, No. 2, (December, 1985): 1-21.

Bayly, C. A., "Rammohun Roy and the Advent of Constitutional Liberalism in India, 1800-1830", *Modern Intellectual History,* 4:1, (2007): 25-41.

Bhargava, Meena, "Visibility through Resistance: The Malangis and Salt Making in Eighteenth Century Bengal", *Indian Historical Review,* 33, no. 1, (2006): 24–43.

Chaloner, W. H., "William Furnival, H. E. Falk and the Salt Chamber of Commerce, 1815-1889: Some Chapters in the Economic History of Cheshire", *Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire,* Vol. 112, (1960).

Chakrabarty, Dipesh, "Minority Histories, Subaltern Pasts", *Post Colonial Studies,* 1, no. 1, (1998):15-29.

Chakraborty, Pratik, "Science, nationalism, and colonial contestations: P.C. Ray and his Hindu Chemistry", *The Indian Economic & Social History Review, 3*7: 2 (2000): 185-213.

Charme, Stuart, "Religion and the theory of masochism in Journal of Religion and Health",22, no. 3, (1983): 221-233.

Fisher, Judith L., "Tea and Food Adulteration, 1834-75." BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-Century History. Ed. Dino Franco Felluga, Available at:https://branchcollective.org/?ps_articles=judith-l-fisher-tea-and-food-adulteration-1834-75

Jha, Sadan, "Charkha, 'Dear Forgotten Friend' of Widows: Reading the Erasures of a Symbol", *Economic and Political Weekly,* Vol. 39, No. 28 (Jul. 10-16, 2004): 3113-3120

Kalpagam, U., "Colonial governmentality and the 'economy'", *Economy and Society,* 29: 3, (August, 2000): 418-438 [420].

Kanda, Sayako, "Environmental Changes, the Emergence of a Fuel Market, and the Working Conditions of Salt Makers in Bengal, c. 1780–1845," *International Review of Social History,* Volume 55, No. S18: (December (2010): 123 – 151.

Kothiyal, Tanuja, “Salt, Sovereignty and Law in Colonial India: The Case of Rajputana Salt in the Late Nineteenth Century”, South Asia: *Journal of South Asian Studies,*46, no. 4, (2023): 774-790.

Kumar, Deepak, Racial Discrimination and Science in Nineteenth Century India, *The Indian Economic and Social History Review*, Vol. XIX, No. I, (1982): 63-82.

Menon, Nikhil, “Gandhi's Spinning Wheel”, *Journal of the History of Ideas,* Vol. 81, No. 4 (October 2020): 643-662.

Miller, D. Consumption and Commodities, Annual review of Anthropology Vol. 24, (1995): 141-161.

Moxham, Roy,“Salt Starvation in British India: Consequences of High Salt Taxation in Bengal Presidency, 1765 to 1878”, *Economic & Political Weekly,* 36, no. 25 (2001): 2270–74.

Mukherji, Projit Bihari, “Parachemistries: Colonial Chemopolitics in a zone of contest,” *History of Science*, Vol. 54, Issue 4, (December 2016): 362-382.

Nag, Jitendra Kumar, “History of Bengal's Salt Industry,” *Modern Review*, Vol. 66 (Sept. 1939): 300-03.

Ponte, Stefano & Gibbon, Peter, “Quality standards, conventions and the governance of global value chains”, *Economy and Society*, 34:1, (2005): 1-31.

Ray, Indrajit, “Imperial Policy and the Decline of the Bengal Salt Industry under Colonial Rule: An Episode in the “De-industrialisation” Process”, *Indian Economic and Social History Review* 38, no. 2 (2001): 181–205.

Rastell, Thomas, “Account of the Salt Springs and Salt making at Droitwich in Worcestershire”, originally published in 1674 N. 142, 1059; and reprinted in the *Philosophical Transactions* of the Royal Society of London, Abridged Volume II, (London: C. and R. Baldwin, 1809).

Serajuddin, A. M., The Salt Monopoly of the East India Company's Government in Bengal, *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 21, No. 3 (Oct., 1978).

Seth, Sanjay, “Rewriting Histories of Nationalism: The Politics of “Moderate Nationalism” in India, 1870-1905”, *The American Historical Review*, 104, no.1, (Feb.1999): 95-116.

Spivak, Gayatri Chakravorty, “The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives, *History and Theory*, 24:3, (Oct., 1985): 247-272.

Taylor, Miles, “The Ungrudging Indian: The Political Economy of Salt in India, c. 1878–1947”, *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 46, no. 4 (2023): 791-805.

Webster, A., “The Strategies and Limits of Gentlemanly Capitalism: The London East India Agency Houses, Provincial Commercial Interests, and the Evolution of British Economic Policy in South and South East Asia 1800–1850,” *The Economic History Review* LIX, no. 4 (2006): 743–64.

Wright, H. R. C., ‘Reforms in the Bengal Salt Monopoly, 1786-95,’ *Studies in Romanticism*, Vol. 1, No. 3 (Spring, 1962).

খ. ৪: অপ্রকাশিত পি এইচ ডি সন্দর্ভ

Barui, Balai Chandra, *The Salt Industry of Bengal: The Relations of Production in the Industry and Trade in Salt 1757-1800*, Ph.D. Thesis, (University of Calcutta, 1979).

Eyles, D., *The Abolition of the East India Company's Monopoly 1833*, (Ph.D. dissertation, University of Edinburgh, 1955), 184–98. Available at https://era.ed.ac.uk/handle/1842/6815

Hajkowski, Stanisław, *The Cultural Transition and the Attitudes of Polish Immigrant Families Towards Divorce and Parental Authority in the United States, 1931-1940*(Ph.D. Diss., The Catholic University of America: 2010).

Mukhopadhyay, Anindita, *Legal and penal Institutions Within a Middle-Class Perspective in Colonial Bengal: 1854-1910* (Ph.D. Thesis, SOAS, London,1996). Available at: https://eprints.soas.ac.uk/28506/1/10672665.pdf

খ. ৫: ওয়েব লিঙ্ক

Prayer, Mario. "The «Gandhians» of Bengal. Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942." *Rivista Degli Studi Orientali* 74 (2001): 1–363.Available at: http://www.jstor.org/stable/41913060.

Proceedings of the First Indian National Congress held at Bombay in 1885,134-35, cited in https://www.mkgandhi.org/civil_dis/salt_tax.htm

Report of the Fourth Indian National Congress held at Allahabad, 1888, 92, cited in https://www.mkgandhi.org/civil_dis/salttax.htm

Report of the Eighth Indian National Congress held at Allahabad, 1892,72, Cited in https://www.mkgandhi.org/civil_dis/salt_tax.htm

Reports on the Native Newspapers (1875-1899, 1910-1915), Internet Archive (Open Access) Available at: https://archive.org/

Shaheen, Leila, "Manners in the Middle East," *Saudi Aramco World*, 16:2 (March/ April 1965) available at: https://archive.aramcoworld.com/issue/196502/manners.in.the.middle.east.htm